প্রকাশক :
শ্রীদেবব্রত মিত্র বি. কম.
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৯

মুদ্রণে :
এম্ সন্,
৫৩/১ ডাঃ নিলমনি সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯০

॥ সূচীপত্র ॥

'কারামাজভ কাহিনী'র অনুবাদ

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক তুহিন-শীতল প্রত্যূষ। সেন্টপিটারস্‌বুর্গ শহরের সেমেনভ ময়দানে কুড়িটি তরুণ পাশাপাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান। কারো অঙ্গে কামিজটুকু ছাড়া আর কোনো পোষাক নেই। রাজনৈতিক আসামী এরা। আটমাস ধরে বন্দীজীবন ভোগ করার পর শেষ পর্যন্ত অন্ধ কারাগার থেকে এসেছে প্রভাতোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তরে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হোলো। প্রথম তিনজন বন্দীকে দাঁড় করানো হোলো এক দেয়ালের সামনে, চোখে বেঁধে দেওয়া হোলো কাপড়ের আবরণ। তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো একসারি সৈনিক টোটাভরা বন্দুক নিশানা করে। অন্য বন্দীরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তাদের পালা কখন আসবে তারই প্রতীক্ষায়। গুলি ছুড়বার নির্দেশ দেবার আর বন্দুক নিশানা করে। অন্য বন্দীরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তাদের পালা কখন আসবে তারই প্রতিক্ষায়। গুলি ছুড়বার নির্দেশ দেবার আর এক মুহূর্ত বাকি। ঠিক এমনি সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শাদা নিশান উড়িয়ে দ্রুতবেগে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলেন, ঘোষণা করলেন যে পরম কারুণিক রুশ সম্রাট প্রথম নিকোলাসের হৃদয় গলেছে,—বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব,—তার পরিবর্তে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একজন বন্দী উচ্চকিত অট্টহাস্য করে উঠল,—উন্মাদ হয়ে গেল সারাজীবনের মতো।

মৃত্যুপথযাত্রী এই বন্দীদলের অন্যতম ছিলেন ফিয়োডোর ডস্টয়েভ্‌স্কি। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন মস্কোর এক অবৈতনিক হাসপাতালের ডাক্তার,—ধর্মভীরু, অথচ গম্ভীরদর্শন ও রুক্ষ মেজাজী। হাসপাতালের সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কোয়ার্টারে তাঁর সংসার। শিশুকাল থেকেই দারিদ্র্য, নিষ্ঠুরতা ও ব্যাধির সঙ্গে ডস্টয়েভ্‌স্কির পরিচয় হয়। মাতৃবিয়োগ হয় নিতান্ত কৈশোরে।

তার কয়েক বৎসর পরে পিতাকেও তিনি হারান,—ক্রুদ্ধ প্রজারা তাঁকে হত্যা করে। ডস্টয়েভ্‌স্কি তখন এক সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়তনের ছাত্র। মাতাপিতৃহীনের সম্ভাবনাহীন ভবিষ্যৎ। এই শিক্ষায়তনে ডস্টয়েভ্‌স্কি চার বছর কাটান। শেখেন নচিত্র অঙ্কন, কিন্তু আসলে অনুরক্ত হন সাহিত্যের প্রতি। কুড়ি বছর বয়সে স্থির রেন যে সাহিত্যসেবাই হবে জীবনের ব্রত,—দারিদ্র্যই হবে জীবনযাত্রার পাথেয়।

রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্য এর কয়েক বৎসর পরে রাজরোষে পড়েন ডস্টয়েভ্‌স্কি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ার তুহিন রাজ্যে। পুরো চারটি বছর তাঁর এই নির্বাসনে কাটে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম, সান্ত্রীদের অকথ্য অত্যাচার, পাপাচারী দুর্বৃত্ত কয়েদীদের বীভৎস নিত্যসঙ্গ। সেখান থেকে নজরবন্দী সৈনিকরূপে এক সৈন্যদলের সঙ্গে বদলী হন এশিয়াস্থ এক দুর্গম নরককুণ্ডে। সেখানে

কাটে আরো পাঁচ বছর। ন-বছর পরে তিনি মুক্তি পান,—তারপর আবার সভ্যজগতে প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাবর্তন নয়, পুনরুজ্জীবন। বয়স তখন আটত্রিশ। নির্বাসনের আগে তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর সাইবেরিয়াতে বসে লিখেছিলেন ঐ প্রেতরাজ্যবাসীদের কাহিনী। নির্বাসনের নিষ্ঠুরতা সারাজীবনের মতো তাঁর মনে গভীর চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। এতোদিন পরে পুরানো সূত্রে নূতন গ্রন্থি বাঁধলেন, সাহিত্য-রচনা আবার শুরু হোলো। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর এই সাধনা অনির্বাণ ছিল। তাঁর রচনাবলীর তালিকা এই ভূমিকায় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন,—বিশ্বের চিরন্তন সাহিত্য-সভায় তাঁর সৃষ্টির স্থায়ী আসন।

রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে ডস্টয়েভ্স্কি তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশবাসীর কাছ থেকে প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন, কিন্তু পাননি অর্থ, পাননি শান্তি। অকারণ রাজরোষ রাহুর মতো তাঁর ভাগ্যের উপর উদ্যত ছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে ফিরে এসে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সরকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হয়, কয়েক বৎসর পরে মারা যান তাঁর প্রথমা স্ত্রী ও সহোদর ভ্রাতা। ভাইএর ঋণভার ও সংসারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন, যখন তাঁর নিজের উদরান্নের সংস্থান নেই। নানাভাবে অর্থ-সংগ্রহ করে আর একটি পত্রিকা পুনরায় তিনি প্রকাশ করেন, কয়েক মাসের মধ্যে রাজরোষে এরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' রচনা যখন আরম্ভ করেন, তখন কুচক্রী প্রকাশকের কাছে তাঁর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সমস্ত স্বত্ব বন্দক পড়ে আছে এই শর্তে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নূতন উপন্যাস শেষ করে দিতে না পারলে পুরোনো বইএর সব অধিকার বাজেয়াপ্ত হবে। সারাজীবন নিত্যশত্রু দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করেছেন ডস্টয়েভ্স্কি—সারাজীবন লেখনী চালনা করেছেন উত্তমর্ণদের তাগিদে, প্রকাশকদের কাছে করেছেন মুষ্টিভিক্ষা। নিজের রচনাকে প্রকাশকের হাতে তুলে দেবার আগে একটিবার পড়ে দেখবার সময়ও তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন।

এছাড়া নির্বাসনের যুগ থেকে তিনি নিত্যসঙ্গী করে আনেন কঠিন সন্ন্যাস রোগ। এই রোগের পুনঃপুনঃ আক্রমণে তাঁর মনের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসা হবে কী করে? সময় কই, অর্থ কোথায়? চিকিৎসকরা বহু উপদেশ দিয়েছে, কিন্তু সে সব উপদেশে কর্ণপাত করার উপায় কই?

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক বন্ধুকে লেখা চিঠি:

'লিখছি, সমানে লিখে চলেছি, ভালো লাগেনি বলে ছিঁড়েও ফেলেছি অনেকগুলো পাতা। কী কষ্ট লিখতে, এর চেয়ে জেলখানার হাড়ভাঙা খাটুনি ভালো। দিন রাত্রি সমানে কাজ করি, তবু যতোটা লিখতে চাই, তা হয়ে ওঠে না। মনে যদি শান্তি থাকত তাহলে হয়তো পেরে উঠতাম। মানসিক শান্তি কথাশিল্পীর পক্ষে কতো

দরকার,—নইলে সে চিন্তা করবে কেমন করে, কেমন করে রাঙিয়ে তুলবে তার কল্পনা? কিন্তু শান্তি নেই। পাওনাদাররা ঘিরে ধরেছে, দিনের পর দিন শাসিয়ে যাচ্ছে জেলে পুরবে বলে। কিন্তু জেলে যদি পোরে, তাহলে তো সর্বনাশ! একেবারে চুরমার হয়ে যাব, এতো বড়ো উপন্যাসটা আর শেষ হবে না। এদিকে রোগটা বেড়েছে,—ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে—শাসাচ্ছে ডাক্তার।'

মানুষ অভ্যাসের দাস। এই অভ্যাসের দাসত্ব ডস্টয়েভস্কিকে একদিনও স্থির থাকতে দেয়নি. সারাজীবন ঘুরিয়েছে নানাস্থানে। সঙ্গে সঙ্গে জুয়ার নেশা,—যা তাঁকে পাগল করেছিল, বারে বারে সর্বস্বান্ত করেছিল। তদুপরি তাঁর মূর্ছারোগের পটভূমিকা রচনা করেছিল দ্বিমুখী উন্মত্ততা,—এক উন্মত্ততা অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের বিলাস বাসনার,—অপর উন্মত্ততা নিরন্তর সত্য, পুণ্য ও ঈশ্বরানুসন্ধানের। জাগরণে ও মূর্ছায় এই উন্মত্ততার নিত্য যন্ত্রণা তাঁর আত্মাকে দীপ্ত করে রেখেছিল অনিবার। জীবনের শেষভাগে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাহচর্যে ও যত্নে তিনি কথঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করেছিলেন।

গোগোল, তুর্গেনিভ, গনচারভ, টলস্টয় প্রমুখ রুশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দের সমযুগবর্তী ছিলেন ডস্টয়েভস্কি। তাঁর যুগ রুশসাহিত্যের বাস্তবধর্মী যুগ। কিন্তু ইয়ুরোপের রোমান্টিকধর্মী লেখকদের প্রতিও ডস্টয়েভস্কি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন,—এ প্রসঙ্গে ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগো ও জার্মান কাহিনীকার হফ্‌মানের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উভয় প্রকারের সাহিত্যিকের থেকে ডস্টয়েভস্কির মনোভঙ্গি একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। কাহিনী-প্রধান হলেও তাঁর সাহিত্য কাহিনী-প্রধান নয়, বর্ণনা-সমুজ্জ্বল হলেও তাঁর রচনায় বর্ণনা গৌণ। মানবমনের অনুভূতির বৈচিত্র্য আর গভীরতা, তার ধ্যানধারণা আর আদর্শ-কল্পনা, তার মন-চৈতন্যের বাসনা-বঞ্চনা, তার ব্যাকুল আত্মার দার্শনিক অনুসন্ধান,—এই তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। ঘটনা তাঁর উপন্যাসে দুর্নিবার বেগে ঘটে চলে, পাথরে-ঘষা স্ফুলিঙ্গের মতো চমক লাগায় ঘটনা-ঘটনের পারম্পর্য, এই রহস্য-নিবিড় বেগবত্তা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির চেতন ও অবচেতন মনের নিভৃততম কন্দরকে ভীমবেগে মন্থন করে নির্লজ্জ আবেগে একসঙ্গে অমৃত ও বিষকে উৎসর্জন করে।

এই মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা অনুভূতি নিয়ে আদর্শ নিয়ে কথা বলে অনেক। সুদীর্ঘ ভারাক্রান্ত কথোপকথন। কিন্তু তারা যা বলে, তা শুধু কথার কথা নয়,—তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ। প্রেম আর হতাশা, বাসনা আর বঞ্চনা, পাপ আর আত্মস্বীকৃতি, তীর্থসন্ধান আর উন্মত্ততা—কতো প্রচণ্ড বিপরীতধর্মী আর উন্মার্গগামী অনুভূতি! এই সব অনুভূতি বাস্তব মানুষের রূপধারণ করে ডস্টয়েভস্কির রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে,—কখনো বা দিনের উজ্জ্বল আলোয়, কখনো বা ছায়া-ছায়া প্রদোষ-অন্ধকারে। তাদের সংলাপ, তাদের হাসিকান্না আর সম্ভোগ আর যন্ত্রণার বাক্যচ্ছবি। ডস্টয়েভস্কির কাহিনীর মধ্যে পারম্পর্য আছে

কিন্তু মমতা নেই, পরিতৃপ্তি আছে কিন্তু শান্তি নেই,—আর আছে ঘটনাঘটনের দুর্দমতা, তীব্রতা আর প্রচণ্ডতা। হত্যা ও নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও শিশু-নির্যাতন, দৈহিক ও মানসিক পাশবিকতা তাঁর বহু কাহিনীর আরম্ভ পটভূমিকা রচনা করেছে। আবার প্রবল ধর্মানুরক্তি, দুরন্ত আত্মোৎসর্গ, আতীব্র আত্মজিজ্ঞাসা ও মধুর ঈশ্বরানুসন্ধান তাঁর রচনাকে নব নব প্রত্যুষ-প্রভায় উদ্ভাসিত করেছে।

তাঁর সৃজিত চরিত্রাবলীও বিচিত্র। ক্ষুৎপীড়িত ছাত্র, বাসনা-বাতুল ভাঁড়, নিষ্ঠুরা সতীসীমন্তিনী, কল্যাণবতী দেহোপজীবিনী, ধর্মকামী লম্পট ও মর্মকামিনী কুমারী, সাধু ও তস্কর, ধ্বংসোন্মাদ বিপ্লবী ও ধর্মোন্মাদ সাধু—এই পৃথিবীর আলোকিত রাজবর্ত্মে ও ছায়ান্ধকার গলিপথে কতো অবিস্মরণীয় মানুষের ভিড়! মানবমনের আকাঙ্ক্ষা-হতাশা, নীতি-দুর্নীতিবোধ, আদর্শ ও বাস্তবের প্রকট ও নিগূঢ় সংঘাতের প্রচণ্ড বিবৃতি ডস্টয়েভ্স্কির রচনায় উদ্ঘাটিত। ভাগ্যের অভিশাপে ও মানুষের অত্যাচারে নিত্যবিড়ম্বিত যে মানুষের জীবন, দৈন্যের অনন্ত পারাবারে যার নিত্য অবগাহন,—দুঃখের অসীম তিমিরে বিশ্বাস ও আনন্দের আলোক-বর্তিকা তাকেও শান্তির পথ দেখায়,—সেই পরম পন্থাকে ডস্টয়েভ্স্কি চিত্রিত করেছেন তাঁর রচনার মানচিত্রে। যে-মানুষ ঈশ্বর ও সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থের বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যার অমোঘ পরিণাম অপরাধ ও শাস্তি,—তার চিন্তার বিকৃতি ও তার মগ্নচৈতন্যের বীভৎসতা তাঁর লেখনীর উজ্জ্বল প্রহারে উদ্ভাসিত হয়েছে,—যেমন মেঘাবরণের মধ্য দিয়ে চকিত বিদ্যুৎপ্রহারে ঘনকৃষ্ণ আকাশ ও মৃত্তিকা ঝলকিত হয়ে ওঠে।

এই যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, যার অন্তস্তলে পাপ ও পুণ্য, মহত্ত্ব ও নীচতা, প্রজ্ঞা ও মূঢ়তা, ন্যায় ও অন্যায়, স্বর্গ ও নরক এক অত্যাশ্চর্য মিশ্রণে একীভূত হয়ে গেছে,—এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'কারামাজভ কাহিনী'। এটি ডস্টয়েভ্স্কির শেষ রচনাও। এই বিরাট গ্রন্থ তিনি ষাট বৎসর বয়সে লিখতে আরম্ভ করেন ও প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। ডস্টয়েভ্স্কির পরিণততম রচনা এই গ্রন্থ, তাঁর বিরাট প্রতিভার আকাশচুম্বী নিদর্শন। প্রস্তাবনা ও উপসংহারসহ সুবৃহৎ বারোটি অংশে এই মহান্ উপন্যাস সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য সমালোচককে বিভ্রান্ত করে। একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে এতো প্রকারের চরিত্র ও ঘটনা এবং এতো বহুমুখী চিন্তাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এমনই আশ্চর্য শিল্পকৌশলে সেই বিচিত্র বহুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, পাঠকের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

জার-শাসিত রুশিয়ার নানাপ্রকারের চরিত্রের সমাবেশ কারামাজভ কাহিনীতে আমরা পাই,—জমিদার, শাসক, পণ্ডিত, ভাঁড়, কৃষক, সাধু। এ যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশসমাজের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা। যে পরিবারকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গ্রথিত, তার কর্তা একজন বিত্তশালী লম্পট,—বার্ধক্য যার হীন লালসাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, ঘৃণিত স্বার্থ চরিতার্থের প্রয়োজনে যে মহানন্দে ভণ্ডামির মুখোশ পরে থাকে। যৌন-লালসার আক্রমণে একই নারী নিয়ে তার প্রথম পুত্রের সঙ্গে তার

প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—যে পুত্র ছন্নছাড়া, আশাহীন অন্ধকারে যে আত্মহত্যার দুঃস্বপ্ন দেখে। দ্বিতীয় সন্তান নাস্তিক বুদ্ধিবাদী,—সত্যকে সত্য বলে মানে না, ধর্মকে অস্বীকার করে। কিন্তু তার অবিশ্বাস আর অস্বীকার নিতান্ত নিরর্থক,—তাই জীবনের আনন্দযজ্ঞের দ্বারে এসে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ফিরে যায়। তৃতীয় পুত্র সাধু, সাধু-সঙ্গে তার নবযৌবন অভিষিক্ত,—ধর্মবোধ ও ঈশ্বরভক্তি তার তরুণ হৃদয়কে সর্বমানবের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রসারিত করেছে। তার নবীন দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ইশারা,—যে ভবিষ্যৎ প্রসন্ন উত্তম আশাপ্রজ্বল। আর এক পুত্র জারজ,—জন্ম যার অন্ধকারে, আত্মহত্যার অন্ধকার যার জীবনের পরিণাম। এদের ঘিরে আছে প্রাচীন সাধু ও আধুনিকা নটিনী, আত্মোৎসর্গকারিণী সতী, আর লাস্যময়ী কুটিলা কামিনী। সমস্ত কাহিনী রাজপথ থেকে অন্ধগলির মধ্যে নানা ধারায় বয়ে চলেছে এক অমোঘ পরিণতির উদ্দেশ্যে, যে পরিণতি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর,—যে পরিণতি রক্তাক্ত হত্যা।

উচ্চশিক্ষিত বাঙালী পাঠক গত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে ডস্টয়েভ্স্কির সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। বিশেষত উনিশশো সতেরো সালের মহান রুশ বিপ্লবের পর থেকে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত দেশবাসী রুশসাহিত্য ও রুশ ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আধুনিক যুগের রুশ লেখকদের মধ্যে আমাদের দেশে যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় তিনি মাক্সিম গোর্কি। তাঁরই পরে ডস্টয়েভ্স্কির লোকপ্রীতি। ডস্টয়েভ্স্কির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বঙ্গভাষায় রূপান্তরণ আমাদের মাতৃভাষারই অঙ্গে নূতন ও উজ্জ্বল অলংকার। ডস্টয়েভ্স্কির অন্য কোনো বৃহৎ উপন্যাস বঙ্গভাষায় পূর্ণাঙ্গরূপে অনূদিত হয়ে এখনো সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। বন্ধুবর মদন দত্ত এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা গুরু দায়িত্ব। তবে এই সুবিশাল গ্রন্থকে একটিমাত্র খণ্ডে প্রকাশ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। ক্রেতা ও পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন দুই খণ্ডে।

পরিশেষে অনুবাদকের স্বল্প নিবেদন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার এই অমর কাহিনীর বঙ্গানুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। শ্রমসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রমের গ্লানি আমাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তর্জমা করতে করতে আমার বারে বারে মনে হয়েছে, এ যেন আমার এক আশ্চর্য তীর্থযাত্রা। এই দীর্ঘ দুর্লঙ্ঘ্য যাত্রায় আমি চলেছি সেই দেবতারই উদ্দেশ্যে যার নাম আধুনিক মানবমন। 'কারামাজভ কাহিনী' সেই মনের গভীর কেন্দ্রস্থলে আমাকে উত্তরণ করে নিয়ে গেছে। দেবতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা অসাধ্য,—তাই হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে প্রণাম করতে হয়। মানবমনের বিচিত্র-গভীর রহস্যকেও সম্যক উপলব্ধি করার সাধ্য কার? তবু আমি জানি, 'কারামাজভ কাহিনী'র অনুবাদের মাধ্যমে বিনম্র অনুভূতির উপচারে মানব-হৃদয়োপান্তে একটি প্রণাম আমি নিবেদন করেছি।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



প্রথম অধ্যায় : পারিবারিক ইতিবৃত্ত

এক

এই কাহিনীর নায়ক আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ কারামাজভ,—ফিয়োডোর পাভলোভিচ কারামাজভের তৃতীয় পুত্র। ফিয়োডোর কারামাজভ ছিল আমাদের এ অঞ্চলের একজন ভূস্বামী,—অনেকদিন হয়ে গেলেও যে করুণ ও বীভৎসভাবে লোকটার মৃত্যু হয়েছিল, সে ঘটনা এখনো অনেকের স্মৃতিতেই জীবন্ত আছে। নামে জমিদার হলেও ফিয়োডোর প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের মধ্যে জীবনের অতি অল্প সময়ই কাটিয়েছে। আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষটা,—কুৎসিত নোংরা তার চরিত্র, অকারণ নিষ্ঠুরতার জঞ্জাল। চরিত্র লোকটার যতোই ঘৃণ্য হোক—নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান তার ছিল টনটনে,—নিজের অর্থসম্পত্তির সামান্যতম হিসেবে তার ভুল ছিল না কখনো। লোকটা যখন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে তখন তার কিছুই ছিল না বলতে গেলে। নামেই জমিদার,—সমসাময়িক জমিদারদের মধ্যে তার ভূসম্পত্তি ছিল যৎসামান্য। পরের পদলেহন করেই তার জীবনের শুরু। কিন্তু একবার যে তার হাতের মুঠোয় এসে পড়ত, ছিনে জোঁকের মতো রক্ত শুষত তার। যখন সে মরে তখন কেবল কাঁচা টাকাই সে রেখে যায় প্রায় দশ লক্ষ রুবল। অপরের রক্ত শুষে পয়সা করাই শুধু নয়, এমনি অর্থহীন বীভৎস চরিত্রের লোক সারা মহকুমায় দ্বিতীয় একটি ছিল না। এমনি লোকের বিষয়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অভাব হয় না, অভাব হয় জীবনকে সার্থক করে তুলবার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তার।

বিয়ে করেছিল দু-বার। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে হয়েছিল, নাম ডিমিট্রি। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান, বড়োটির নাম আইভান, আর ছোটটির নাম আলেক্সি। ফিয়োডোর পাভলোভিচের প্রথমা স্ত্রী আডেলাইডা আইভানোভনা আমাদের মহকুমার মিউসভ নামে বেশ সম্পন্ন এক জমিদার পরিবারের মেয়ে। পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এমনি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে কী করে যে এমন একটা কুদর্শন গুণহীন লোককে স্বামী নির্বাচন করেছিল তা আমাদের কল্পনার বাইরে। যৌবনের প্রাচুর্যে আর প্রাণচঞ্চলতায় উজ্জ্বল ছিল মেয়েটি,—এমনি মেয়ে আজকাল অনেক চোখে পড়লেও নিতান্ত দুর্লভ ছিল সে যুগে। সে যুগকে আমরা রোম্যান্টিক বলে আখ্যা দিই, তার কারণ হৃদয়াবেগ আর জীবনস্বপ্নের পরিপূর্ণ প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে বাধা ছিল সে যুগে। তখনকার কালের একটি মহিলাকে আমরা জানি, যিনি বছরের পর বছর ধরে এক ভদ্রলোককে এক বিচিত্র মিলন-সম্ভাবনাহীন ভালোবাসার পর শেষ পর্যন্ত এক ঝড়ের রাত্রে গভীর এক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন করেন। প্রেমাস্পদকে বিয়ে করার পক্ষে প্রকৃত বাধা যতো না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আর অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তিনি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছিলেন,—শেক্সপীয়ারের ওফেলিয়ার ভাগ্যকে অনুকরণ করবার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার চরম

সার্থকতা। যেখান থেকে তিনি জলে ঝাঁপ দেন, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি প্রচুর মনোমুগ্ধকর ও কাব্যময় না হোতো,—নদীটি যদি বেগবতী স্রোতোজ্জ্বলা তটিনী না হোতো,—মোট কথা মৃত্যুর পরিস্থিতিটা যদি কিছুটা কম রোমান্টিক হোতো,—তাহলে হয়তো আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ভদ্রমহিলার সংযত থাকত।

আডেলাইডা আইভানোভ্‌নাও সম্ভবত এমনি রোমান্টিক ভাববিলাসের মোহে আত্মবিকাশের স্বাভাবিক পথে নানা সামাজিক ও স্বকল্পিত বাধায় জর্জরিত হয়েই এই বিবাহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শ্রেণীগত বাধা ও পারিবারিক আভিজাত্যবোধের বিরুদ্ধে এই বিবাহ তার নারীমনের বিদ্রোহের অভিব্যক্তি, এরই মধ্যে সে কল্পনা করে নিয়েছিল মুক্তির সন্ধান। অতি নীচমনা ঘৃণ্য যে লোক, ভাঁড়ামি আর দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই যার বাহ্যিক স্বরূপ,—অলীক কল্পনার মোহে একটি মুহূর্তে সেই লোকটিকেই ভালো লেগেছিল নারীর, তার অসামাজিকতার মধ্যেই স্বপ্নাতুরা খুঁজেছিল বিদ্রোহী প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। সে লোকটাকে শুধু বিয়েই করেনি,—গোপনে গৃহত্যাগ করে বিয়ে করেছিল,—এই গৃহত্যাগই ইন্ধন জুগিয়েছিল তার বন্দী প্রাণের রক্তিম ভাবালুতায়। ফিয়োডোর পাভলোভিচের তখন যা অবস্থা, তাতে এমনি একটা সুযোগ গ্রহণ করতে তার বিন্দুমাত্র বাধেনি। যে কোনো উপায়েই হোক, স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াই তার তখন একমাত্র লক্ষ্য। বড়ো ঘরের জামাই হওয়া আর কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর কন্যাপণ লাভ করা—জিভে জল এসেছিল তার এ সুযোগে। ভালোবাসার কোনো প্রশ্নই এখানে ওঠে না—আডেলাইডারের রূপযৌবন থাকা সত্ত্বেও তাকে বিন্দুমাত্র ভালোবাসেনি ফিয়োডোর। ফিয়োডোরের জীবনে এটাও কম আশ্চর্য নয়,—সারাজীবন সামান্যতম ইঙ্গিতে মেয়েমানুষের পিছনে যে দৌড়েছে, তার অনুভূতিতে এমনি সৌন্দর্যবতী প্রথমা স্ত্রী কোনো স্পর্শই রাখতে পারেনি।

ফিয়োডোরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করবার অনতিবিলম্বেই মোহভঙ্গ হোলো আডেলাইডা আইভানোভ্‌নার। দেখল সে, তার স্বামীর জন্যে গভীর বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। এমনি বিবাহের যা স্বরূপ তা প্রকাশ হতে খুব বেশি দেরি হোলো না। মেয়ের পরিবার অবশ্য এ বিয়েকে সহজেই স্বীকার করে নিল আর উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ের যা প্রাপ্য তা সবই তার নামে গচ্ছিত করে দিল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য চরমে উঠল দিনে দিনে। স্বামীর চাইতে স্ত্রীর উদারতা যে অনেক বেশি ছিল তার প্রমাণ আডেলাইডা স্বামীকে টাকা দিতে কার্পণ্য করেনি এবং স্বামীদের সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার রুবল ফিয়োডোর হাতিয়ে নিয়েছিল। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশস্বরূপ একটি গ্রামের জমিদারী আর শহরে একটি সুন্দর বাড়ি আডেলাইডা পেয়েছিল। এই স্থাবর সম্পত্তিকে নিজের নামে লিখিয়ে নেবার জন্যে এবার ফিয়োডোর স্ত্রীর ওপর সমানে চাপ দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, অন্তত শুধু ক্লান্তিবশেই আর স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই আডেলাইডা স্বামীর নামে দানপত্র করে দিত, যদি না তার বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন মাঝে পড়ে তাকে

বাধাসৃষ্টি করত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ তো লেগেই ছিল, মারামারিও যে হোতো না তা নয়। তবে জনশ্রুতি যে, স্বামী যতো না স্ত্রীকে মারত, স্ত্রীই স্বামীকে মারত তার বেশি। আডেলাইডার রূপ ছিল, মেজাজ ছিল গর্বোন্মত্ত, যৌবনপুষ্ট দেহে শক্তিও ছিল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত সে একদা এক সহায়সম্বলহীন তরুণ ছাত্রের সঙ্গে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে চলে গেল। স্বামীর হাতে রেখে গেল তিন বৎসর বয়সের একমাত্র সন্তান মিটিয়াকে।

স্ত্রীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োডোর পাভলোভিচ বাড়িতে হারেম বানিয়ে ফেলল, বন্যা বইয়ে দিল মত্ততা আর উচ্ছৃঙ্খলতার। মাঝে মাঝে যখন দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কুৎসিততার ক্লান্তি আসত তখন সে বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে সারা অঞ্চলে টহল দিয়ে বেড়াত, যাকে পেত তারই সামনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে স্ত্রী-বিচ্ছেদের দুঃখ জানাত, আর অশ্লীল ভাষায় অকথ্য ভঙ্গিতে স্ত্রীর দুর্নাম করত। নিজেদের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর দৈনন্দিন ব্যবহার নিয়ে এমন সব ঘৃণ্য বিবরণ লোকসমাজে জাহির করত, যা কোনো স্বামী নিজের মুখে বলতে পারে না। সর্বসমক্ষে বঞ্চিত স্বামীর অভিনয় করে আর রসিয়ে-রসিয়ে নিজের শোকের কথা আবৃত্তি করে কী সুখ পেত, কোন্ আত্মরতির আস্বাদ পেত তা সেই জানত। নিজের স্ত্রীর নামে কলঙ্ক ছড়িয়ে আর স্ত্রীর প্রতি মেকি ভালোবাসার শোক দেখিয়ে সে যে জেনেশুনেই লোক-দেখানো ভাঁড়ামো করছে, তা বুঝতে কারুরই বাকি থাকত না। অনেক স্পষ্টবক্তা মুখের ওপর বলত, - বৌ পালিয়ে তো তোমার উন্নতি হয়েছে ভায়া! দুঃখই করো আর যাই করো, আগে ছিল একটি আর এখন হয়েছে অগুন্তি।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর খবর ফিয়োডোরের কানে এল। বেচারী তার সেই ছাত্র-প্রেমিকটির সঙ্গে পিটারস্বুর্গে পৌঁছেছে ও সেখানে একেবারে মুক্ত জীবনে গা ঢেলে দিয়েছে। একেবারে যেন ক্ষেপে উঠল ফিয়োডোর, এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এখনি সে পিটারস্বুর্গে যাবার বন্দোবস্ত করে ফেলল বলে। কিন্তু কেন যে যাবে নিজের মনেই সে জানে না। যেতই হয়তো শেষ পর্যন্ত, তবে যাবার আগে মানসিক শক্তিসংগ্রহের জন্যে মদের বোতলের ছিপি সে খুলল, কদিন পড়ে রইল চুর হয়ে। এমনি সময়ে তার স্ত্রীর হঠাৎ-মৃত্যুর সংবাদও তার বাপের বাড়ির লোকেরা পেল। কেউ বলে অভাগিনী মরেছে টাইফয়েড জ্বরে, কেউ বলে ক্ষুধার জ্বালায়। এই খবর ফিয়োডোরের কানে যখন পৌঁছলো তখনও নেশা তার পুরোপুরি। সেই অবস্থায় ছুটে রাস্তায় বার হয়ে সে আকাশের দিকে দুহাত তুলে আনন্দে চিৎকার করতে লাগল,—ভগবান, ইয়া ভগবান! এইবার ওর সন্তানটাকে শান্তিতে তোমার কাছে টেনে নাও। কারো কারো মতে অবশ্য আনন্দে মত্ত হয়নি সে, বরং শিশুর মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিল। হয়তো দুই-ই সত্যি। স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সে হয়েছিল ঠিকই, আবার যে স্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে গেল তার জন্যে চোখের জল ফেলতেও সে কার্পণ্য করেনি। মানুষ যতোই হীন হোক, তারও মনে একটা কল্পনাতীত সারল্য লুকিয়ে থাকে বইকি।

দুই

এমনি লোক বাপ হিসেবে যে কেমন হবে তা ধারণা করা শক্ত নয়। জন্মদাতা হওয়া সহজ, কিন্তু পিতৃত্বের দায়িত্ব এমনি চরিত্রের লোকের কাছে আশা করা বৃথা। একমাত্র সন্তানকে সে পরিত্যাগ করল একেবারে। এর কারণ রাগ নয়, বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে মনে মনে সে দুঃখ-বিতৃষ্ণা পোষণ করে এসেছিল তাও নয়। আসল কথাটুকু ভুলেই গেল সে, খেয়ালই রইল না তার ছেলের কথা। দিনমানে সে যাকে পায় তার কাছে দুঃখ-শোকের কথা আউড়িয়ে-আউড়িয়ে শ্রোতার সহানুভূতি কুড়োবার চেষ্টা করে, আর রাত্রিবেলা মদ আর স্ত্রীলোক নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় বাড়িটাকে নরককুণ্ড বানিয়ে তোলে। তিন বছরের মিটিয়া বাড়ির পুরোনো চাকর গ্রিগরির হাতে মানুষ হয়। চাকরটা যদি না থাকত তাহলে কেউ দেখবার থাকত না শিশুটিকে।

শিশুটির মায়ের দিকের পরিবারও তাকে ভুলেই ছিল অনেক দিন পর্যন্ত। তার দাদামশাই আগেই গত হয়েছিলেন, বিধবা দিদিমা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মস্কোতে, মাসিরা সব বিয়ে করে নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ভৃত্যদের কুঁড়েঘরে গ্রিগরির রক্ষণাবেক্ষণে এক বছর মিটিয়া রইল। বাপেরও যদি তাকে মনেই পড়ত, তাহলেও ঐ চাকরের ঘরেই তার আশ্রয় হোতো, কেননা বাপের খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার পথে বাড়িতে তার উপস্থিতি বাধাস্বরূপই হোতো। এমনি সময়ে প্যারিস থেকে পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ মিউসভ বলে এক ভদ্রলোকের আগমন হোলো। ইনি মিটিয়ার মা'র দূরসম্পর্কের ভাই হতেন। বয়সে যুবা, বিদেশে ভ্রমণ করে ও পড়াশুনো করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ও ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। উত্তর-জীবনে তিনি বহুকাল বিদেশে কাটিয়েছিলেন।

রাশিয়া ও বাইরের অনেক প্রগতিশীল বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রুধোঁ ও বাকুনিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল তাঁর, ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের তিনদিন-ব্যাপী প্যারিস বিপ্লবে যোগ দিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন,—পরিণত বয়সে যৌবনস্মৃতির এ গল্প বলে তিনি খুব গর্ববোধও করতেন। দেশে জমিদারী ছিল, হাজার খানেক প্রজা তাঁর। আমাদের শহরের অদূরেই ছিল তাঁর জমিদারী; আমাদের বিখ্যাত মঠের জমির গায়েই ছিল তাঁর সম্পত্তির সীমানা। নদীতে মাছ ধরার বা জঙ্গলের কাঠ কাটার,—কিসের যেন অধিকার নিয়ে মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তাঁর মামলা চলেছিল। যা হোক, প্যারিস থেকে স্বদেশে ফিরে তরুণ পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচের কানে আডেলাইডা আইভানোভ্নার জীবনের দুঃখকর পরিণতির খবর পৌঁছলো। দূর সম্পর্কের বোনটির জন্যে মনে স্নেহবাষ্প তাঁর জমা ছিল। মিটিয়ার ব্যাপারে তিনি সরাসরি ফিয়োডোর পাভলোভিচের সঙ্গে দেখা করলেন ও প্রস্তাব করলেন যে মিটিয়ার শিক্ষাদীক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করতে চান। প্রথমটা ফিয়োডোর তো চমকেই উঠল,—তাই নাকি? বাড়িতে মিটিয়া বলে তার নিজের ছেলে একটা আছে, কিন্তু অভিনয়ে সে সুদক্ষ। এমনি সন্তানবাৎসল্যের অভিনয় সে করল, বুঝবার জো নেই যে সে কতো

বড়ো অক্ষম পিতা। শেষ পর্যন্ত ফিয়োডোরের সঙ্গে পিয়তর আলেক্‌জান্দ্রোভিচ মিটিয়ার অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। জমিদারীর কাজকর্ম গুছিয়ে আবার প্যারিসে ফিরে যাবার মুখে তিনি মিটিয়াকে মস্কোতে তাঁর এক আত্মীয়ার কাছে রেখে গেলেন। প্যারিসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বাচ্চা মিটিয়াকে ভুলে যেতে তাঁরও দেরি হোলো না। মস্কোর মহিলাটি মারা যাবার পর মিটিয়া আশ্রয় পেল তাঁর এক মেয়ের সংসারে। শোনা যায়, মিটিয়াকে আবার চতুর্থবার নতুন আশ্রয়ে যেতে হয়েছিল। সে কথা থাক। ফিয়োডোর পাভলোভিচের প্রথম সন্তানের জীবনের মোটামুটি ঘটনাগুলি এখানে বলে নিতে চাই, কেননা তা না হলে আমার কাহিনীর বিলম্ব হয়ে যাবে।

এই মিটিয়ারই ভালো নাম ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ। ফিয়োডোরের তিন ছেলের মধ্যে এই বড়ো ছেলেরই মনে শিশুকাল থেকে বিশ্বাস ছিল যে তার বাপ মস্ত বড়োলোক, সাবালক হয়ে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যখন সে হবে তখন স্বাধীন জীবনযাপনে তার কোনো ভাবনা থাকবে না। এলোমেলোভাবে কাটে তার বাল্য আর কৈশোর। স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হতেই এক সামরিক বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হয়। তারপর ককেশাসে যায়, ও সেখানে কর্মোন্নতি হলেও অস্থির জীবনযাপন করে অনেক পয়সা ওড়ায়। যতোদিন না বাপের কাছ থেকে টাকা পায় ততোদিন সমানে ঋণের ওপর ঋণ করতে তার বাধেনি। সাবালক হবার আগে সে বাপের কাছ থেকে একটি কপর্দকও আদায় করতে পারেনি। সাবালক হবার পর প্রথম সে দেশে আসে, তাও কয়েকদিনের জন্যে বাপের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে একটা পাকা ব্যবস্থা করতে। বাপের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে এই তার প্রথম পরিচয়। পারিবারিক সম্পত্তির পরিমাণের আসল হিসাব সে বাবার কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, সেবার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতিয়ে ও মাসিক একটা বাঁধা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেই সে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেয়। সেই সময়েই ফিয়োডোর পাভলোভিচ ধরতে পারে যে পারিবারিক সম্পত্তির আয় আসলে যতো তার চেয়ে অনেক বেশি বলে ডিমিট্রির ধারণা। তার ঐ ভুল ফিয়োডোর ভাঙতে চায়নি, এতে তারই সুবিধা। সে বুঝতে পারে যে তার ছেলে দাম্ভিক, অমিতব্যয়ী ও অসংযত,—একমাত্র কাঁচা টাকার ওপর তার নজর। মাঝে মাঝে টাকা পাঠালেই ছেলে দূরে বসে সন্তুষ্ট থাকবে, কাছে এসে বিরক্ত করবে না। বছর চারেক এমনিভাবে চলবার পর ডিমিট্রি আবার দেশে আসে। টাকার প্রয়োজন তখন তার অনেক বেড়েছে। বাপের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করাই তার মতলব। হিসাবপত্র নাড়াচাড়া করে সে দেখে, পারিবারিক সম্পত্তির কোনো অংশই তার আর নেই। কাঁচা টাকার বিনিময়ে বাপের নামে এটা-ওটা দলিলপত্র মাঝে মাঝে যতো সে সই করেছে, তার বিনিময়ে বাপ তাকে তার সব পাওনাই মিটিয়ে দিয়েছে,—বরং বাপের কাছেই এখন তার ঋণ। এমনটি যে হবে তা তার কল্পনারও বাইরে ছিল। ফাঁকি দিয়েছে! নিজের বাপ ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে পথের ভিখারী করেছে তাকে। আগুন হয়ে ওঠে সে। এর পর যা ঘটে সেই ঘটনা থেকেই এই কাহিনীর শুরু। পাঠকদের সামনে সে ঘটনা উপস্থাপন করার আগে ফিয়োডোর পাভলোভিচের অপর দুই পুত্রের কথা বলে নেওয়া দরকার।

চার বছর বয়সে প্রথম সন্তান মিটিয়া হাত থেকে নেমে যাবার কিছুদিন পরেই ফিয়োডোর পাভলোভিচ আবার দ্বিতীয় বিবাহ করে। এই বিবাহ স্থায়ী হয় আট বৎসর। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সোফিয়া আইভানোভ্না। খুবই অল্পবয়সী মেয়ে,—অন্য এক প্রদেশে ব্যবসা উপলক্ষে গিয়ে মেয়েটির ওপর তার নজর পড়ে। ফিয়োডোর পাভলোভিচ মাতাল অসচ্চরিত্র হলেও ব্যবসায় বুদ্ধি তার প্রখর ছিল, টাকা খাটাতে সে কারুর চাইতে কম জানত না, কাজে কোনো ফাঁকি ছিল না তার। মেয়েটি মাতা-পিতৃহীনা। অনাত্মীয়া এক ধনী বিধবা মহিলার আশ্রয়ে সে থাকত। রক্ষয়িত্রী ভালোও যেমন বাসতেন, অলস নিষ্ঠুরতায় মেয়েটির ওপর অত্যাচারও করতেন তেমনি।

মেয়েটিকে বিবাহ করার প্রস্তাব ফিয়োডোর মহিলাটির কাছে পাঠাল। পাণিপ্রার্থীর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে মহিলা প্রস্তাব নাকচ করলেন। প্রথমবারের বিয়ে যে পন্থায় হয়েছিল এবারও সেই একই পন্থা অবলম্বন করল ফিয়োডোর। মেয়েটির কানে কানে বললে,—পালিয়ে চলো আমার সঙ্গে। এটা ঠিক যে তার চরিত্রের আর একটু বেশি পরিচয় যদি মেয়েটির থাকত, তাহলে কিছুতেই সে এ-পথে পা বাড়াতো না। কিন্তু প্রথমত সে অন্য প্রদেশের মেয়ে;—দ্বিতীয়ত ষোড়শী কিশোরী সে, আশ্রয়দাত্রীর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার বাসনা মধ্যে মধ্যে তার মনে চেপে বসে। অতএব বেচারী আশ্রয়দাত্রীকে ছেড়ে আশ্রয়দাতার অধিকার স্বীকার করে নিল। আশ্রয়দাত্রী তো সব খবর জেনে রেগেই আগুন। এ বিয়েতে ফিয়োডোরের একটি কপর্দকও লাভ হোলো না। তবে পণের আশা ফিয়োডোর করেনি। এতোদিন এতো পাপমলিন নারীরূপ নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর এই অপাপবিদ্ধা কুমারীর সরল সৌন্দর্যই হঠাৎ আকৃষ্ট করেছিল তার মতো জঘন্য লম্পটকে।

বিয়ের পরে প্রায়ই তার স্বভাবসুলভ নোংরা হাসি হেসে সে বলত,—হে' হে', আমার নতুন বউএর চোখের নিষ্পাপ চাউনি একেবারে ক্ষুরের মতো আমার বুকের মধ্যেটা কেটে দু-ফাঁক করে দ্যায়। আসলে নবোদ্ভিন্নযৌবনা নববধূর প্রতি লালসা ছাড়া আর কোনো উচ্চতর ভাব তার মনে ছিল না। যেহেতু বিয়ে করে সে কোনো পণ পায়নি, দয়া করে অরক্ষণীয়াকে গ্রহণ করেছে, অতএব স্ত্রীর প্রতি সামান্যতম সম্মান বা সমাদর দেখানোর প্রয়োজন তার নেই। মেয়েটির দৈন্যদশা আর স্বাভাবিক নম্রতা-ভীরুতার সুযোগ নিয়ে বিবাহিত জীবনের সামান্যতম সম্ভ্রমবোধকে ধুলোয় লুটোতে তার বাধা রইল না। পথের বারবনিতাকে ঘরে এনে তার স্ত্রীর চোখের সামনেই বীভৎস লাম্পট্যের নিদর্শন দেখাতে তার এতটুকু আটকাত না। অবস্থা এমনি দাঁড়াল যে পুরোনো একগুঁয়ে ভৃত্য গ্রিগরি, যে তার প্রথম গৃহস্বামিনী আডেলাইডা আইভানোভ্নাকে দুচোখে দেখতে পারত না, নববধূর দুঃখে সেও বিচলিত হোলো। তার পক্ষ নিয়ে সে প্রভুকে মাঝে মাঝে এমন ভাষায় তিরস্কার করতে লাগল যা কোনো ভৃত্যের মুখে

অসম্ভব। একদিন তো সে প্রভুর বৈশবিহারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দূরে দূরে করে বেশ্যার পালকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও ভয় পেল না। স্বাস্থ্য ভাঙল বধূর। ক্রমে দাঁড়াল সেই মানসিক ব্যাধি, যাকে গ্রাম্যলোকে বলে ভূতে পাওয়া। ঘন ঘন মূর্ছা হতে লাগল, সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও দেখা দিল আস্তে আস্তে। এরই মধ্যে স্বামীর ঔরসে তার দুটি ছেলের জন্ম হোলো ; প্রথম আইভান জন্মাল বিয়ের বৎসরেই, দ্বিতীয় ছেলে আলেক্সি এল তার তিন বছর পরে। তারো বছর চারেক পরে চোখ বুজল দুর্ভাগিনী।

মা'র মৃত্যুর পর এই দুই ছেলের অবস্থাও হোলো ঠিক তাদের বড়ো ভাই মিটিয়ার মতো। বাপ তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না, তারা মানুষ হতে লাগল ভৃত্য গ্রিগরির কুটীরে। সোফিয়ার আশ্রয়দাত্রী মহিলা গত আট বৎসর ধরে খোঁজখবর রাখতেন, তাঁর পালিতা কন্যার বিধ্বস্ত জীবনের দুঃখ ও সাংঘাতিক ব্যাধির সংবাদে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—ঠিক হয়েছে, বেইমানির শাস্তি ভগবানের হাতে। কিন্তু সোফিয়া আই-ভানোভ্নার মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরেই তিনি একদিন হঠাৎ উদয় হলেন আমাদের শহরে। মাত্র আধঘণ্টা তিনি শহরে ছিলেন—এটুকু সময়ের মধ্যেই কাজ সারলেন প্রচুর। সোজা গেলেন ফিয়োডোর পাভলোভিচের বাড়িতে। আট বছর পরে যখন তাকে দেখলেন তখন তার ঘোর মত্তাবস্থা। শোনা যায় যে ফিয়োডোরের মুখোমুখি হওয়া মাত্র কোনো কথা না বলে তার দু-গালে সজোরে দুটো চড় কষালেন তিনি, তারপর ডানহাতে তার মাথার চুলের মুঠি ধরে সজোরে লাগালেন তিন টান। তারপর তেমনি নির্বাক গাম্ভীর্যে তিনি সোজা গেলেন ভৃত্য-কুটীরে শিশুদুটির সন্ধানে। তাদের নোংরা চেহারা, ছিন্ন মলিন পোষাক দেখে দ্বিতীয়বার ক্ষেপে উঠলেন তিনি, গ্রিগরির কানে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বাচ্চা দুটিকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে সোজা গাড়িতে তুললেন। গ্রিগরি অনুগত ভৃত্যের নীরব বিনম্রতায় ঘুষিটা সহ্য করে নিল, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বিনীত নমস্কার জানিয়ে বললে,—ছেলে দুটির ভার তা হলে আপনি নিলেন।

মহিলা চোখ পাকিয়ে বললেন,—বটে! বোকা হাঁদা কোথাকার! গাড়ি ছেড়ে দিল।

ফিয়োডোর পাভলোভিচ ভেবে-চিন্তে দেখল, ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। তার বাচ্চাকে অপরে প্রতিপালন করুক, এতে তার অসুবিধে কী? মহিলাটির হাতে একজোড়া চড় খাওয়ার গল্পটা উল্টে সবিস্তারে সকলের কাছে সে বলে বেড়াল কিছুদিন।

যাঁর কাছে মা ছিল আশ্রিতা, ছেলেরাও শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল তাঁরই কাছে। মহিলাটি এর কিছুদিন পরেই গত হলেন, কিন্তু দুই শিশুর প্রত্যেকের নামে হাজার রুবল করে তিনি উইল করে গেলেন মৃত্যুকালে। নির্দিষ্ট করে গেলেন যে, এই টাকা শুধু তাদের মানুষ হবার জন্যেই ব্যয় হবে। একুশ বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত এই টাকা নির্দিষ্ট অংশে তারা শিক্ষার জন্যে পাবে। মহিলার ভূসম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী হলেন সে অঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, নাম ইয়েফিম পেট্রোভিচ পোলেনভ। ফিয়োডোর পাভলোভিচকে চিঠি লিখলেন তিনি। উত্তরে ফিয়োডোর জানালেন তার

অনেক কথাই লিখল বটে, কিন্তু ছেলেদের প্রতিপালনের নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব স্বীকার করল না। ইয়েফিম পেট্রোভিচ বুঝলেন ব্যাপারটা। ছেলে দুটির ওপর তাঁর মায়া পড়েছিল, বিশেষ করে ছোট আলেকসির উপর। তিনি খুবই মহদাশয় লোক ছিলেন। নিজের খরচে তিনি তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুললেন। প্রত্যেকের পিছনে হাজার রুবলের অনেক বেশি তাঁর খরচ হোলো, কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার দু-হাজার রুবল তিনি স্পর্শ করলেন না। দু-জনে যখন বড়ো হোলো, তখন সেই টাকা আর তার সুদ মিলিয়ে প্রায় দ্বিগুণ টাকা তারা পেল।

আইভান ছিল কেমন গম্ভীর আত্মসচেতন প্রকৃতির ছেলে, যদিও ভীরু নয় মোটেও। দশ বছর বয়েস হতে না হতেই সে বুঝতে পারে যে সে পরাশ্রিত,—বাপ আছে তার, কিন্তু সে বাপের নাম মুখে আনতেও লজ্জা। খুব শিশুকাল থেকেই লেখাপড়ায় তার বিশেষ বুৎপত্তি প্রকাশ পায়। তেরো বছর বয়স হতেই সে ইয়েফিম পেট্রোভিচের গৃহ পরিত্যাগ করে মস্কোর এক শিক্ষায়তনে ঢোকে, ও একজন নামকরা শিক্ষকের বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এই শিক্ষক ছিলেন ইয়েফিম পেট্রোভিচের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে তখন পেট্রোভিচ আর তাঁর এই শিক্ষক-বন্ধু দু-জনেই মারা গেছেন। পেট্রোভিচের কাছে গচ্ছিত হাজার রুবল তখন দু-হাজারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা আইভানের নামে বর্তাবার কোনো নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত তিনি করে যেতে পারেননি। আইনঘটিত নানা বাধা এড়িয়ে সেই টাকা হাতে পেতে আইভানের অনেক দেরি লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু বছর তার অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে কাটে। কিন্তু এতো কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও একবারও সে বাপকে একটি লাইনও লেখেনি। তার কারণ, হয় আত্মসম্মানবোধ বা অভিমান, না হয় নিতান্ত স্বাভাবিক ধারণা যে অমন বাপের কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা।

প্রথম প্রথম অল্প বেতনে ছাত্র পড়িয়ে তারপর খবরের কাগজে ছোট ছোট প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ বিক্রী করে সে পড়ার খরচ চালায়। সম্পাদকরা তার রচনাগুলির তারিফ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষের দিকে বিভিন্ন কাগজে নানা বিষয়ের পুস্তক-সমালোচনাও সে প্রকাশ করে। শিক্ষা শেষ করার পর গচ্ছিত দু-হাজার রুবল আদায় করে বিদেশযাত্রার মুখে সে একটি খ্যাতনামা পত্রিকায় দেশের ধর্মযাজক পরিচালিত বিচারালয় সম্বন্ধে আশ্চর্য একটি প্রবন্ধ লেখে এবং এই প্রবন্ধটি বহু সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত বিবৃত করে নিজের মন্তব্যও সে প্রকাশ করে। প্রবন্ধটি পড়ে ধর্মধ্বজেরা ভাবেন, সে তাঁদেরই প্রশংসা করেছে, আবার যারা ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, এমন কি যারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাদেরও ধারণা হয় যে লেখক তাদেরই দলে। প্রবন্ধটি নানা মহলে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করে, শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করেন যে প্রবন্ধকার কুটিল কৌশলে আর নির্মম ঔদাসীন্যে বিদ্রূপ করেছে উভয় দলকেই। এই প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করছি, কারণ এটি আমাদের শহরের মধ্যেও খুব আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং মঠবাসীরা আরো আশ্চর্য হয়ে যায় এই কথা জেনে যে, এমনি প্রবন্ধের লেখক আমাদেরই শহরের

ঐ ফিয়োডোর পাভলোভিচটার ছেলে। আর ঠিক এই সময়ই লেখক স্বশরীরে এসে উদয় হয় আমাদের মাঝখানে।

আইভানের মতো ছেলের এতোদিন পরে পিতৃগৃহে আবির্ভাব আমারও খুব আশ্চর্য লাগে। তার এই আগমনের পরবর্তী ফলাফল ভেবে আমার মনে এই সংশয় আরো ঘন হয়েছে—কেন ও এসেছিল? কী উদ্দেশ্য নিয়ে? এমনি উচ্চশিক্ষিত ও গর্বিত তরুণ,—এদিকে সাবধানীও যথেষ্ট,—কী প্রয়োজন হোলো এতোদিন পরে তার কুখ্যাত পিতৃগৃহে ফিরে আসবার? শুধু তাই নয়, যে বাবা শিশুকাল থেকে তাকে দেখেনি, ছেলেকে একটি পয়সা দিতেও যে নারাজ, তেমনি বাপের সঙ্গে মাসের পর মাস সদ্ভাবে কেমন করে সে কাটাতে লাগল? এতে শুধু আমি না, আরো অনেকেই অবাক হয়ে গেল। ফিয়োডোর পাভলোভিচের প্রথমা স্ত্রীর আত্মীয় পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ মিউসভও এই সময় জমিদারী পর্যবেক্ষণের জন্যে প্যারিস থেকে দেশে আসেন। আইভানের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তার শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীর পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হন।

তিনিও বলেন,—এমন ছেলে এখানে পড়ে থেকে করছে কী? টাকার অভাব নেই জেনেছি, বিদেশে যাবার মতো পাথেয় নিজের হাতেই আছে। বাপের কাছে কোনো আর্থিক সাহায্য ও চায় না, চাইলেও পাবে না তা নিঃসন্দেহ। বাপের মতো সুরা আর নারীতেও আসক্তি নেই। তবু বাপ দেখি. ছেলেকে নিয়ে বিমোহিত। ছেলেও দিব্যি আছে বাপের সঙ্গে। আশ্চর্য।

সত্যিই বাপের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল আইভান। বাপের চারিত্রিক নোংরামিও ছেলের সান্নিধ্যে এসে অনেকটা সংযত হয়েছিল। ভালো লাগুক না লাগুক, ছেলের বাধানিষেধ অনেকটা সে শুনতে বাধ্য হয়েছিল। পরে আমরা জেনেছিলাম, বড়ো ভাই ডিমিট্রির প্রয়োজনেই আইভান এসেছিল। বড়ো ভাইএর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা জীবনে তার এই প্রথম। তবে মস্কোতে থাকতে দাদার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তার ছিল। দাদারই কোনো একটি বিশেষ প্রয়োজনে বাবার কাছে মধ্যস্থতা করতে সে এসেছিল। কী প্রয়োজন তা পাঠকরা একটু পরেই জানতে পারবেন। তবে এ সত্ত্বেও আইভানের পিতৃগৃহে আবির্ভাবটা সকলের চোখেই বিচিত্র লেগেছিল।

সারা পরিবার এতোদিন পরে একত্র হোলো। ছোটভাই আলেক্সি বাড়ি ফিরে আসে সর্বপ্রথম,—প্রায় এক বছর হোলো। এখানকার মঠবাসীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। সাধু-জীবনের শিক্ষানবিশের পোষাক মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই সে অঙ্গে পরেছে। বাসনা তার সারাটা জীবন মঠবাসী হয়েই কাটাবে।

চার

সর্বকনিষ্ঠ ভাই আলেক্সির বয়েস যখন কুড়ি, আইভানের বয়েস তখন চব্বিশ, আর ডিমিট্রির বয়েস সাতাশ। ধার্মিক জীবনের প্রতি আকর্ষণে আলেক্সির মনে সংস্কারগত

ভাবালুতা বা অলৌকিকের প্রতি আগ্রহ ছিল না। অল্প বয়স থেকেই পবিত্র জীবনের অভিলাষ ও উচ্চতর মানবতাবোধ তাকে টানে। সাধারণ সংসারী জীবনের পাপ লোভ আর পরশ্রীকাতরতাকে এড়াবার জন্যেই সে সাধু হবার সংকল্প করেছে। এই জীবনকেই মহত্তর মার্গে নিয়ে যেতে পারে যে আলোক তারই সন্ধানী সে। আমাদের প্রসিদ্ধ সাধু জোসিমাকে সে যেমন ভালোবাসে তেমনি শ্রদ্ধা করে, তাঁর জীবনাদর্শে সে অনুপ্রাণিত। শিশুকাল থেকেই আলেক্সি একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। মাত্র চার বছর বয়সে সে তার মাকে হারায়, কিন্তু মা'র স্মৃতি সারা জীবন তার মনে জাগরূক থাকে,—মা'র প্রত্যক্ষ স্পর্শ সারা জীবন সে অনুভব করে। এমনি স্মৃতি সাধারণ লোকের মনে দু-চার বছর থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু বিস্মৃতির অন্ধকারে নিত্য আলোকবর্তিকার মতো সমস্ত জীবন ধরে প্রতিভাত থাকা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে। একটি দৃশ্য তার মনে সর্বদা ছায়াপাত করে;—বসন্তের একটি শান্ত সন্ধ্যা, খোলা জানালা দিয়ে অস্তমান সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি ঘরে এসে পড়েছে; ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপের ওপরে মেরী মাতার দিব্যমূর্তি। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মা সেই মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে আকুল প্রার্থনা করছে, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে মা'র শীর্ণ দুটি গাল, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলকে সমর্পণ করছে বিশ্বমাতৃকার চরণে। এমন সময় ঘরে দৌড়ে এল একজন ধাত্রী। ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে মায়ের কোল থেকে, মাতৃমূর্তির স্নেহকরুণ দৃষ্টির সান্নিধ্য থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মা'র মুখের ব্যথাবিহ্বল আর্তবর্ণিত রূপটি জীবনে কখনো মুছবে না আলিওশার স্মৃতিপট থেকে।

শিশুকাল থেকেই আলিওশা কম কথা বলে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার তার আকর্ষণ কম। তার কারণ এ নয় যে সে রুক্ষ মেজাজের অসামাজিক লোক, কারণ এই যে সে আত্মস্থ। তার নিজের ভাবনা-চিন্তা তার কাছে এতো বড়ো যে তাই নিয়েই সে মশগুল, অপরের সঙ্গে মেলামেশার চাহিদা সে অনুভব করে সামান্যই। কিন্তু লোকজনের আসঙ্গে বিতৃষ্ণা তার নেই। ভালোবাসে সে মানুষকে,—সকলকে বিশ্বাস করে অকপটে, যদিও এ নয় যে সে অতিসরল বা মূর্খ।

অপরকে বিচার করতে সে চায় না। যে যাই করুক, কারো সমালোচনা করতে বা কাউকে ঘৃণা করতে সে নারাজ। দুঃখ সে পায়, কিন্তু দুঃখ দেয় না, - সহজ একটা মমত্ববোধে সে সকল মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই সে মানুষের ব্যবহারে আশ্চর্য হয় না, ভয়ও পায় না কখনো। কুড়ি বছর বয়সে বাপের কাছে যখন সে ফিরে এল, ওখানকার কুৎসিত লাম্পট্যের আবহাওয়ায় তার নিষ্পাপ মন প্রচণ্ড আঘাত পেল। সে কিন্তু বিচার করল না তার বাপকে,—ঘৃণা করল না, অনুযোগ করল না একটিবারের জন্যেও,—শুধু নীরবে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেকে। বাপ তার সম্মুখীন হোলো অবিশ্বাস আর বদমেজাজী রুক্ষ ব্যবহার নিয়ে। কিন্তু দেখল, ছেলে বড়ো ভাবে, কথা বলে তার অনেক কম। দু-সপ্তাহ যেতে না যেতেই বাপ নেশার ঘোরে ছেলেকে বুকে টেনে নিল, উন্মত্ত হৃদয়াবেগে কেঁদে ভাসিয়ে দিল ছেলের সামনে। ভালোবাসতে শুরু করল ছেলেকে, যে ভালোবাসা কাউকে কখনো সে বাসেনি।

প্রত্যেকে ভালোবাসত এই আলেক্সিকে, তার ছেলেবেলা থেকেই। ইয়েফিম পেত্রোভিচ পোলেনভের আশ্রয়ে যখন ছিল, তখন সে-পরিবারের প্রত্যেকের হৃদয় সে জয় করে নিয়েছিল নিজের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির গুণে। স্কুলেও সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। স্বভাবত সে অমিশুক, কিন্তু নীচমনা নয়, নির্ভীক অথচ গর্বিত নয়, অপমানকে গায়ে মাখে না কিন্তু কাপুরুষ বলে নয়,—সহপাঠীরা তার এইসব গুণে সহজে আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। একলা এক কোণে বসে পড়তে সে ভালোবাসত,—তবু তাকে ভালোবাসত সবাই। তাকে নিয়ে অনেক ব্যাপারে মজা করত সবাই, কিন্তু সেই মজার পিছনে কারো কোনো বিদ্বেষ থাকত না। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে, এমন কি অভিজাত বংশের ছেলেদের মধ্যেও অশ্লীল কথাবার্তার প্রচলন খুবই থাকে। নোংরা আলাপ-আলোচনায় পল্টনের লোকদেরও তারা হার মানায়। এমনি অশ্লীলতায় তারা বীরত্ববোধ করে, নতুন ছেলে এই বিদ্যা রপ্ত করে জাতে ওঠে। আলিওশা এমনি সব কথা সহ্য করতে পারত না, কানে আঙুল দিয়ে পালাত। অন্য ছেলেরা তাকে চেপে ধরে কান থেকে আঙুল সরিয়ে কানের কাছে অশ্লীল চিৎকার জুড়ে মজা দেখত। নিরুপায় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত আলিওশা, কিন্তু কখনো কাউকে কটুকথা বলত না বা অভিযোগ করত না কারো নামে। যারা তাকে অত্যাচার করত, শেষ পর্যন্ত হার মানত তারাই। পড়াশুনায় সে ভালো ছেলেদের অন্যতম ছিল, যদিও প্রথম হতে পারত না পরীক্ষায়।

ইয়েফিম পেত্রোভিচের যখন মৃত্যু হয়, তখনো তার স্কুলের শিক্ষা শেষ হতে দু-বছর বাকি। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর শোকাকুলা বিধবা পত্নী সপরিবারে দেশত্যাগ করে দীর্ঘকালের জন্যে ইটালিতে বসবাস শুরু করেন। পেত্রোভিচের দু-জন দূরাত্মীয়া মহিলার কাছে আলিওশা আশ্রয় পায় যাঁদের সে আগে কখনো দেখেনি। এই আশ্রয়-দানের পিছনে কী চুক্তি ছিল তা সে জানত না। কার আশ্রয়ে সে আছে, কার অন্নে সে প্রতিপালিত হচ্ছে, এ নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না আলিওশার। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল তার দাদা আইভানের, পরাশ্রয়ী-বৃত্তির বেদনাবোধে যার বাল্য আর কৈশোরে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল মন। এর কারণ এই যে অর্থের কী মূল্য তা সে বুঝতই না। যে তার সংস্পর্শে এসেছে সেই পেয়েছে তার এই হৃদয়-সারল্যের পরিচয়। সবাই জানত যে, যদি কখনো অনেক টাকাও তার হাতে আসে, এক মুহূর্তে কোনো সৎউদ্দেশ্যে বা কোনো ঠগের হাতে সমস্ত টাকাটা তুলে দিতে সে পারে। ছাত্রজীবনে হাত খরচের জন্যে যা সে পেত, হয়তো একদিনেই সব খরচ হয়ে যেত বা খরচের উপায়ের অভাবে পড়ে থাকত মাসের পর মাস।

পরবর্তী জীবনে পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন ও তার সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে, পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র ছেলে যাকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় অচেনা মানুষে ভর্তি কোনো অজানা শহরে ছেড়ে দিলেও সে কষ্ট পাবে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরবে না। কেননা লোকে সেধে এসে তাকে আশ্রয় দেবে, আহার দেবে। এই দান গ্রহণের পিছনেও কোনো গ্লানি থাকবে না, কেননা যারা ওকে দেবে, দিয়ে সুখ পাবে তারাই।

জিন্‌নাদিরাভে আলেক্‌সি শিক্ষা সম্পূর্ণ করেনি। শিক্ষা শেষ হবার এক বছর থাকতে সে তার আশ্রয়দাত্রীদের কাছে ঘোষণা করলে, বিশেষ একটা জরুরী প্রয়োজনে বাবার কাছে সে ফিরে যেতে চায়। মহিলারা দুঃখ পেলেন, ইচ্ছা না থাকলেও বাধা দিতে পারলেন না। নতুন জামাকাপড় ও পথখরচ বাবদ যথেষ্ট অর্থ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। অর্ধেক টাকা সে ফিরিয়ে দিল মহিলাদের। বললে,—ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতেই ভালো লাগবে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োডোর পাভলোভিচ তাকে প্রশ্ন করল,—কেন পড়াশুনো শেষ না করেই সে চলে এল। উত্তর দিল না কোনো। এটুকু মাত্র বলল যে তার মা'র সমাধিস্থানটা দেখবার জন্যে সে এসেছে। আসলে কেন সে এল, কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে—তা সে নিজেই সম্ভবত জানত না। ফিয়োডোর পাভলোভিচ তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সমাধিটা ছেলেকে দেখাতে পারল না। কবরে মাটি দেবার পর দ্বিতীয় দিন আর সে সেখানে যায়নি, কোথায় যে কবরটা ছিল এতোদিনে ভুলেই গেছে একেবারে।

এর আগে বেশ কয়েক বছর ফিয়োডোর পাভলোভিচ শহরে ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন-চার বছর পরে সে দক্ষিণ রুশিয়ায় যাত্রা করে। ওডেসা শহরে অনেক বছর কাটায়। সেখানে একপাল অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ইহুদী মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে তার আলাপ হয়, জীবনযাত্রাটাও আরো নোংরা স্তরে নেমে আসে। এদের সংস্পর্শে এসে একটা গুণ তার হয়, পয়সা করবার আর জমাবার আশ্চর্য ক্ষমতা সে লাভ করে। আলিওশা দেশে ফিরবার মাত্র বছর তিনেক আগে সে নিজে ফিরে আসে। বয়সের অনেক বেশি বার্ধক্যের ছাপ তার চোখে-মুখে পড়ে, আবার ব্যবহারে এতোদিন প্রবাস-বাসের ফলে ভব্যতার ছাপ না পড়লেও দাম্ভিকতা ফুটে ওঠে প্রচুর। দুশ্চরিত্রতায় ভাটা তো পড়েই না বরং সে ব্যাপারে তার দুষ্প্রবৃত্তি আরো বীভৎসরূপে প্রকট হয়। অন্তত লক্ষ রুবলের মালিক হয়ে ফেরে সে। নতুন ব্যবসা শুরু করে; মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো শুঁড়িখানা সে খোলে, আর শুরু করে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা। অধুনা তার চেহারাও আরো জঘন্য হয়ে যায়, বদ্‌খেয়াল মাত্রা ছাড়ায়। কখন কী যে করে আর কী যে করে না তার ঠিক নেই; অত্যন্ত ছন্নছাড়া মেজাজ,—সর্বদাই মদে চুর হয়ে থাকে। সেই পুরাতন ভৃত্য গ্রিগরি তাকে সামলে সামলে রাখে। আলিওশা ঘরে ফেরার পর থেকে ফিয়োডোরের নৈতিক অসংযমটা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হোলো;—এই অকালবৃদ্ধ হতভাগ্যটির মনের মধ্যে অনেক দিনের মূর্ছিত শুভবুদ্ধির তন্দ্রা যেন ভাঙল।

গ্রিগরিই আলেক্‌সিকে তার মা'র সমাধিটা চিনিয়ে দেয়। শহরের সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় গ্রিগরি। সেখানে একটি কোণে অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন একটি সমাধি। সমাধি-ফলকের ওপর মৃতের নাম, বয়স ও মৃত্যু-তারিখ লেখা, তার নিচে মৃতের উদ্দেশ্যে কয়েক লাইন নিতান্ত সাধারণ কবিতা পর্যন্ত,—এই আলেক্‌সির মায়ের কবর। এটা গ্রিগরিই কাজ। নিজের অর্থে সে করেছে, ফিয়োডোর ওডেসাতে অন্তর্ধান

করার পরে। কৃত্য সারে সে। মায়ের সমাধির সামনে মাথা নিচু করে ছেলের মুখে এই সমাধি-রচনার কাহিনী আলেক্সি স্তব্ধ হয়ে শুনল, ফিরে গেল একটি কথা না বলে। ছেলে বড়ো না বিচলিত হোলো, বাপ যেন এতোদিনে লজ্জা পেল তার অনেক বেশি। স্ত্রীর আত্মার উদ্দেশ্যে শান্তি-স্তোত্র পাঠের মানসে সে গির্জায় হাজার রুবল দান করে বসল। দিল সে আলেক্সির মা'র নামে নয়,—তার প্রথমা পত্নীর নামে,—যার হাতে এককালে সে মার খেয়েছিল অনেকবার। যেদিন এতোবড়ো পুণ্য কর্মটা করল, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা আকণ্ঠ মাতাল হয়ে সে ছেলের সামনে ধর্মযাজক আর মঠবাসী সন্ন্যাসীদের নামে এমনি সব অশ্লীল কথা বলল যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

মা'র সমাধিক্ষেত্র দেখতে যাবার কয়েকদিন পরে আলিওশা বাপকে বলল যে সে মঠবাসী হতে চায়, মঠের কর্তৃপক্ষেরও আপত্তি নেই তাকে ব্রতচারীরূপে গ্রহণ করতে। এখন শুধু বাপের অনুমতির অপেক্ষা।

ফিয়োডোর জানত, ছেলের মনে সাধু জোসিমার প্রভাব কতো গভীর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে,—হ্যাঁ, জোসিমার মতো সাধু হয় না, সত্যিকারের সে সাধু। তা তুইও খোকা ওর মতো সাধু হয়ে যেতে চাস্?

ঘাড় নাড়ল আলিওশা।

ফিয়োডোরের তখন অর্ধ-প্রকৃতিস্থ অবস্থা। মাতালের আধো-বোকা আধো-কুটিল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বললে,—এ আমি বুঝতেই পেরেছিলাম, ওই পথেই তুই যাবি। ঐ পথে যাবার জন্যেই তুই তৈরি হচ্ছিলি দিনে দিনে। ধর্, তোর নিজের দু-হাজার পাউন্ড তো আছে, সে টাকাটা মনে কর তোর বিয়ের যৌতুক। তা ছাড়া আমি আছি। তোকে আমি এতো ভালোবাসি, আমি কী আর তোকে বঞ্চিত করতাম? কদিনই-বা আছি আর! তবে হ্যাঁ, টাকা খরচ করলেই গেল। মঠে গেলে একটি পয়সা তোর খরচ নেই। হ্যাঁ, অবশ্য ওরা যদি চায় তো আমি দেব। তোর ভালোর জন্যে যা চায় সব দেব। কিন্তু চাইবে কী? যদি না চায় বয়েই গেল, ঘরের টাকা ঘরেই রইল। হ্যাঁ, খরচ আছে বই কি কোথাও কোথাও। একটা মঠের কথা আমি জানি। সেখানে শহরের বাইরে একটা জায়গা আছে, বুঝলি? তিরিশটে মেয়েমানুষ সেখানে থাকে। সবাই জানে, তারা ঐ মঠের সাধুদের বাঁধা মেয়েমানুষ। খাসা ব্যবস্থা, নিত্য নতুন মুখ বদলাও। কিন্তু আমাদের মঠে সেটি হবার জো নেই। মেয়েমানুষের বালাই তো নেই-ই, খাওয়ার খরচাও কম। নিত্যি উপোস তো লেগেই আছে। সত্যিকারের সাধু সব।

পাকা জুয়াড়ীর মতো সে বলে চলল,—তোকে ভালোবাসি, কিন্তু তাই বলে তোর পথে বাধা হব আমি? মোটেও না। পাপ, পাপে ভরে গেছে সারা দুনিয়াটা। আমিই কী পাপ করেছি কম? তুই যদি সাধু হোস, আমার হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার একটা লোক আমি পাব বুড়ো বয়সে। ভয় ছিল, মরলে নরকে টেনে নিয়ে গিয়ে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবে, সে দুর্ভাবনা আর ভাবতে হবে না। হ্যাঁরে,

আমি না হয় বোকা-সোকা, তুই তো সব জানিস। নরকে ছাদ আছে তো? নইলে কাঁড়কাঠ পাবে কোথায়? ঝোলাবেই বা কী করে?

শান্ত গম্ভীর গলায় বাপের স্নিগ্ধ মুখের দিকে চোখ তুলে আলিওশা বললে,—না, নরকে কাঁড়কাঠ নেই।

নেই! ঠিক বলছিস নেই? বুঝেছি, শুধু কাঁড়কাঠের ছায়া আছে। তাই ভেবেই লোকে ভয় পায়। মঠে যখন তুই সাধু হবি তখন ওপারের সব খবর তুই জানবি, তাই না? আমাকে এসে বলবি কিন্তু সব, সব মিথ্যে ভয় ঘুচিয়ে দিবি সত্যি কথা বলে, কেমন? তা তোর ভালোই হবে। এখানে তোর মাতাল বুড়ো বাপ আর একপাল নষ্ট মেয়েমানুষ, এই নিয়ে না থেকে পুণ্যের রাজ্যে তুই থাকবি। তুই তো একেবারে দেবদূত হয়ে যাবি রে! বিশ্বাস হোলো না? বেশ, ফিরে আসিস আবার। শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে যদি ফিরেই আসতে চাস, বুড়ো বাপ ঠিক তোর জন্যে বসে থাকবে। তুই ছাড়া কেউ আমাকে বোঝেনি, সবাই আমাকে ঘেন্না করেছে, তা কি আমি জানি না রে?

কপটতাকে ছাড়িয়ে গেল মত্ততা। হাউ হাউ করে বকতে লাগল বুড়ো।

পাঁচ

অনেকের ধারণা হতে পারে, আমার এই কাহিনীর নায়ক আলিওশা অতি দুর্বল পুরুষত্বহীন স্বপ্নবিলাসী তরুণ, চেহারাতেও জীর্ণশীর্ণ রক্তশূন্য ম্লান। এ ধারণা ভুল। বয়স তখন তার সবে উনিশ,—দীর্ঘ সুপুষ্ট তার অঙ্গ, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে প্রাণের আনন্দে দেহমন তার ভরপুর। সুন্দর তার চেহারা, মাথাভর্তি ঘন বাদামী চুল, কমনীয় মুখশ্রী, বড় বড় চোখে গভীর শান্ত দৃষ্টি। ভাবুক সে, মুখে তার গাম্ভীর্যের প্রকাশ। তাই বলে স্বপ্নবিলাসী সে নয়, পরম বস্তুবাদী তার মন। একথা ঠিক, মঠবাসী হবার পর ধর্মের অলৌকিক প্রকাশগুলিকে সে বিশ্বাস করত। তবে আমার ধারণা, যে প্রকৃত বস্তুবাদী, অলৌকিক ঘটনাঘটন তার পথে বাধাস্বরূপ হতে পারে না। বস্তুবাদী কখনো অন্ধবিশ্বাসী হতে পারে না, যতো অলৌকিকেরই সম্মুখীন সে হোক না কেন। প্রকৃত বস্তুবাদী যদি অবিশ্বাসী হয় তাহলে অলৌকিককে অবিশ্বাস করার মানসিক শক্তি তার থাকবেই; যদি কোনো অলৌকিক ঘটনা অত্যন্ত বাস্তব বলে তার সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে হয় সে নিজের ইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করবে, নয় সে সেই অলৌকিককে নব-উদ্ঘাটিত বাস্তব বলেই স্বীকার করে নেবে, অলৌকিক বলে নয়। বস্তুবাদীর মনে অলৌকিক থেকে বিশ্বাস জন্ম নেয় না, বিশ্বাসের বলেই সে অলৌকিককে গ্রহণ করে। বস্তুবাদী যা বিশ্বাস করে, তার মধ্যেকার সব কিছু অলৌকিককেও সে বিশ্বাস না করে পারে না।

লৌকিক শিক্ষা আলিওশা সম্পূর্ণ করেনি, তাই বলে তার মন নির্বোধ বা অপরিণত নয়। এই পথ অন্ধকার থেকে আলোকের পথ, অজ্ঞান থেকে প্রকৃত জ্ঞানের, এই

বিশ্বাসের জন্যেই সে শিক্ষা অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে আসে। সত্যসন্ধানী সে, আদর্শবাদী, ও যা বিশ্বাস করেছে, বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে সন্তোভে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়নি। তাই সুখ তাকে প্রলোভিত করেনি, ডরায়নি সে দুঃখকে। অনেক চিন্তার পর ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর মানবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যেদিন সে নিঃসংশয় হয়েছে, সেইদিনই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে,—আমার জীবন এই অমরত্বের জন্যেই উৎসর্গ করব, আর কিছুর জন্যে নয়। ঠিক এমনিভাবেই, তার মন যদি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঈশ্বর আর আত্মাকে অস্বীকার করত তাহলে নাস্তিক্যবাদকে গ্রহণ করতে সে দ্বিরুক্তি করত না, জীবনকে উৎসর্গ করত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণায়। কেননা আজকের দিনে সমাজবাদ শুধু শ্রমিক সমস্যা নয়, তার অনেক বেশি। মানুষ পৃথিবী থেকে স্বর্গে যায় একথা সমাজবাদীরা বিশ্বাস করে না, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য সম্ভাবনায় তারা প্রত্যয়শীল।

ঈশ্বরের সন্তান বলেছিলেন,—সম্পূর্ণ হতে চাও তো যা আছে সব দান করে আমাকে অনুসরণ করো।

আলিওশা মনে মনে বলে,—হ্যাঁ, দেব সব, কিছুই রাখব না। যাব শেষ পর্যন্ত। পবিত্র মাতৃমূর্তির সামনে সন্তান কোলে নতজানু হয়ে বসা তার মায়ের মূর্তিটা ভেসে ওঠে কল্পনায়। সব কিছু ছেড়ে সে চলে আসে আমাদের শহরে, সাধু জোসিমার শরণ নেয়। সাধু জোসিমা আমাদের মঠের শেষ মঠবন্ধু। আমাদের মঠের প্রকৃত গর্ব তিনিই। তাঁরই দর্শনলাভের জন্যে দূরদূরান্ত থেকে কতো যাত্রী এই মঠে আসে।

এই মঠবন্ধুর কাছে ব্রতচারীকে আত্মদান করতে হয়। তাঁর আত্মায় আপন আত্মাকে বিলীন করতে হয়, তাঁর ইচ্ছায় সমর্পণ করতে হয় আপন ইচ্ছাকে। এই একান্ত অথচ ভয়ংকর সর্বসমর্পিত আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় শিক্ষা—আত্মসংযমের, আত্মজয়ের। আরম্ভ করতে হয় দাসানুদাস হয়ে, তবেই না প্রভুত্ব মিলবে—এই অহংটার ওপর চূড়ান্ত প্রভুত্ব। মঠবন্ধুর কাছে আত্মদানের প্রক্রিয়া সহজ নয় এই কারণে যে ব্রতচারীর আপন বলতে কিছু আর থাকে না, যতোদিন না ঐ পরম আপনটা তার হাতের মধ্যে আসে।

কথিত আছে, খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগে সিরিয়ার এক মঠের এক ব্রতচারী তাঁর মঠবন্ধুর এক নির্দেশ পালন না করে মঠ ছেড়ে দেশ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে মিশরে চলে যান। সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচারে তিনি রত হন ও শেষ পর্যন্ত বিধর্মীর অত্যাচারে ধর্মের জন্য তিনি প্রাণদান করেন। তাঁর দেহটি উদ্ধার করে সাধুর উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে যখন সমাধিস্থ করা হবে, এমনি সময় ধর্মযাজক যথারীতি ঘোষণা করলেন,—খৃষ্টধর্মে প্রাথমিক দীক্ষা যার যার হয়নি তারা এখান থেকে সরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ অজ্ঞাত মন্ত্রবলে শবাধারসমেত তাঁর দেহটা নিক্ষিপ্ত হয় গির্জার বাইরে। উপস্থিত যারা ছিল, সবাই তো স্তম্ভিত হয়ে যায়। তখন প্রকাশ পায়, ধর্মের জন্য আত্মাহুতি দিলে কী হবে, ব্রতচারী-জীবনে গুরুর নির্দেশ তিনি লঙ্ঘন করেছিলেন,—গুরুর মার্জনা ছাড়া তাঁর আত্মার মুক্তি নেই।

মঠবৃদ্ধ জোসিমার বয়স পঁয়ষট্টি। রুশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রথম যৌবনে তিনি সৈন্যবিভাগে ছিলেন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারীরূপে ককেশাসে। একনিষ্ঠ ভক্তিতে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করল আলিওশা। তাঁর কুটীরে আশ্রয় নিয়ে তাঁরই সেবায় নিযুক্ত করল নিজেকে। কোনো বন্ধন তার ছিল না, মঠ ছেড়ে বাইরে যতোদিন খুশী কাটাবার অনুমতিও তার ছিল। মঠবাসীর পোষাকও যে সে অঙ্গে ধারণ করল, তা স্বেচ্ছায়। গুরু কোনো সাধারণ বাধানিষেধ আরোপ করলেন না নবীন ব্রতচারীর ওপর, শুধু তাকে দিলেন তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদ।

ক্ষমতা আর যশ দুইয়েরই সীমা ছিল না সাধু জোসিমার। বৎসরের পর বৎসর ধরে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে এসেছে, পাপ স্বীকার করেছে, রোগে প্রার্থনা করেছে ঔষধ, শোকে শান্তি, বিপদে পরিত্রাণ। আশ্চর্য শক্তি ছিল তাঁর। নতুন কেউ এলে তার মুখ দেখেই তিনি বলতে পারতেন কী তার প্রার্থনা। অপরিচিতের মনের খবরও তাঁর কাছে অজ্ঞেয় থাকত না।

দিনের পর দিন আলিওশা লক্ষ্য করেছে, অধিকাংশ নবাগতই তাঁর কুটীরে ঢোকে দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি নিয়ে। তাঁর দর্শনলাভের পর কুটীর থেকে যখন বার হয়ে আসে তখন চরিতার্থতার আনন্দে মুখ তাদের উদ্ভাসিত। কখনো কঠোর হতে দেখেনি সে জোসিমাকে। সর্বদা মুখে তাঁর ক্ষমাস্নিগ্ধ হাসি, দুচোখে তাঁর করুণাঘন দৃষ্টি। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা বলত,—পুণ্যবানদের সঙ্গে সাধু জোসিমার কোনো কারবার নেই, যে যতো পাপী তার প্রতি তাঁর ততো করুণা। মঠের দু-একজন যে তাঁকে হিংসা করত না তা নয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মঠের খুব কর্তাস্থানীয় লোক, আজ উপবাস, কাল মৌনব্রত লেগেই ছিল তাঁর। অধিকাংশ মঠবাসীই ছিল জোসিমার পক্ষে, অনেকে তো তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসত, ভক্তি করত। ফাদার জোসিমা যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী, আলিওশা তা আন্তরিক বিশ্বাস করত। যেমন সে বিশ্বাস করত ঐ গির্জা থেকে ভ্রান্ত ব্রতচারীর কবর উড়ে যাওয়ার কাহিনীতে। স্বচক্ষে সে দেখেছে, কতো যাত্রী আসে মুমূর্ষু সন্তান বা রুগ্ন পরিজন নিয়ে জোসিমার কাছে। তিনি অশক্তদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন,—পরদিন চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে যাত্রীরা বিদায় নেয় বুকে দৃঢ় আশ্বাস নিয়ে যে রোগ এবার সারবেই। গুরুর এই অলৌকিক শক্তি আর এই প্রচণ্ড জনপ্রীতিতে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আলিওশা,—গুরুর যা গৌরব তা নিয়ে শিষ্যের গর্বের শেষ নেই। রুশিয়ার দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে,—অধিকাংশই গ্রাম্য কৃষাণ পরিবার,—কুটীরের সামনে প্রাঙ্গনে তারা ভিড় জমায়, জোসিমা যখন বার হন, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে, চুম্বন করে তাঁর পা, মাথায় তুলে নেয় তাঁর চলার পথের মাটি। মেয়েরা তুলে ধরে শিশুদের, তাদের কপালে প্রভু ভানহাতের স্পর্শটুকু রাখলে শয়তানের ভয় আর কখনো হবে না। বৃদ্ধ দু-একটি কথা বলেন ওদের সঙ্গে, প্রার্থনা করেন ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আশীর্বাদ করেন সকলকে, তারপর বিদায় দেন সস্নেহ নিলিপ্ততে। অধুনা রোগে বার্ধক্যে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। প্রত্যেকদিন

কুটীর থেকে বার হতে পারেন না। কুটীরদ্বারে ভক্তেরা অপেক্ষা করে দিনের পর দিন। আলিওশা বুঝতে পারে ঐ অগণিত লোকে কেন তাঁকে ভক্তি করে এতো, কেন তাঁর মুখ দেখে চোখের জল ফেলে, কেন কাঙালের মতো আসে তাঁর সামান্যতম স্পর্শটুকুর আশায়। রুশিয়ার কৃষাণদের সে জানে, অত্যাচারে অবিচারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাদের মূক চোখে হতাশ শ্রমের নিত্য হাহাকার। চিরবঞ্চিত এই দরিদ্র কৃষাণের দল,—মাথা নিচু করেই তারা স্বস্তি পায়, অচলা বিশ্বাসে উপাসনা করতে না পারলে তাদের সান্ত্বনা কোথায়?

"আমাদের মধ্যে পাপ আছে, অবিচার আছে, প্রলোভন আছে। তবু এই পৃথিবীতেই কোথাও আছেন সেই পরম পুরুষ, সর্বপুণ্যের সমস্ত সত্যের যিনি আধার। একদিন আসবে যেদিন এই ধরণীই পুণ্যভূমি হয়ে উঠবে, সত্যের সিংহাসন হবে পাতা।"

আলিওশা জানে, এই বিশ্বাস নিয়েই ঐ সাধারণ মানুষের দল বেঁচে আছে। এও তার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই যে সত্যের প্রতিভূ ফাদার জোসিমা, যাঁর পুণ্যস্পর্শের আশায় কৃষাণ-জননীরা কোলের সন্তানকে তুলে ধরে। ভাবে সে,—আমার গুরুর মতো পুণ্যাত্মা কজন? এই পৃথিবীতে একদিন সেই পুণ্যদিন আসবে যেদিন মানুষে-মানুষে হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা আর থাকবে না, থাকবে না ধনী-দরিদ্রের উচ্চনীচের ভেদাভেদ, সবাই হবে ঈশ্বরের সন্তান; সেইদিন পৃথিবীতে যিশুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সেইদিনেরই সংকেত আমার গুরুর চোখে, সেইদিনেরই আশ্বাস আমার গুরুর বাণীতে।

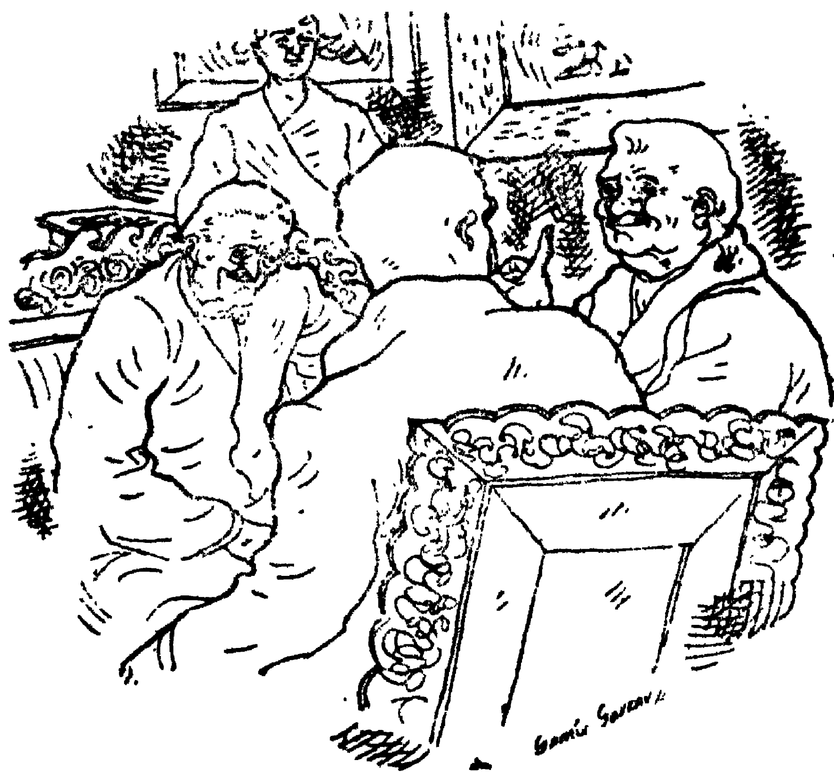
আইভান আর ডিমিট্রি পিতৃগৃহে এল,—একজন আগে, একজন পরে। আলিওশা খুশী হোলো খুব, এতোদিন পরে ভায়েদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে। নিজের ভাই আইভানের চেয়ে সৎ-ভাই ডিমিট্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব জমল তার বেশি। আলিওশা নিজে চাপা প্রকৃতির মানুষ। সে লক্ষ্য করল, দাদা আইভানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া শক্ত। আইভানও খুব চাপা, নিজের চিন্তাতেই মগ্ন, জীবনের কোনো দৃঢ়নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আর সব বিষয়ে সে উদাসীন। আলিওশা ভাবল, তার দাদা যেমন পণ্ডিত, তেমনি নাস্তিক,—তার মতো ব্রতচারীকে হয়তো অবজ্ঞার চোখেই দেখে। আইভানের সম্বন্ধে ডিমিট্রিও যখন কথা বলে, বলে খুব শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে। তার কাছ থেকে আলিওশা জানতে পারল, কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফলে তার দুই ভাইএর মধ্যে সম্পর্কটা এতো নিবিড় হয়েছে। আশ্চর্য হোলো আলিওশা। তার দুই দাদার মধ্যে অমিলের শেষ নেই, আইভানের তুলনায় ডিমিট্রির শিক্ষাদীক্ষা তো কিছুই না, জীবনযাত্রাও দুজনের সম্পূর্ণ আলাদা, তবু আইভান বলতে ডিমিট্রি অজ্ঞান।

এই সময় সাধু জোসিমার কুটীরে বাপ আর বড়ো দুই ছেলে—এই তিনজনের মধ্যে একটা আলোচনার ব্যবস্থা হোলো। ডিমিট্রি আর তার বাপের মধ্যে সম্পর্কটা এ সময়ে চূড়ান্ত খারাপ হয়ে এসেছে, একের প্রতি অপরের বিতৃষ্ণার অন্ত নেই,—এমনি সময়ে ফিয়োডোর পাভলোভিচ একদিন অনেকটা ঠাট্টাচ্ছলেই প্রস্তাব করল,—সবাই মিলে

জোসিমার ঘরে বসে একদিন আলোচনা করা যাক, সাধুসঙ্গে কথাবার্তা বললে হয়তো অনেকটা শান্তভাবে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। ডিমিত্রি কখনো জোসিমাকে দেখেনি। তার ধারণা হোলো, বাপ তাকে ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু কদিন ধরে বাবার সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ করার জন্যে তার মনে দুঃখও জমেছিল কিছুটা, তাই সে প্রস্তাবটা স্বীকার করল। এখানে বলা উচিত যে ডিমিত্রি বাপের সঙ্গে না থেকে শহরের অন্যত্র আলাদা বসবাস করছিল। পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ মিউসভ তখন এ অঞ্চলে ছিলেন। তিনি ব্যাপারটা শুনে খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন ও এই আলোচনায় উপস্থিত থাকতে চাইলেন। ভদ্রলোক উদারনৈতিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন,—মঠ ও সাধু-সন্দর্শনের কৌতূহল তাঁরও মনে জাগল। মঠের সঙ্গে জমিসংক্রান্ত মামলা তখনো তাঁর চলছিল,—মঠাধ্যক্ষের কাছে তিনি একটা আপস মীমাংসার প্রস্তাব পাঠালেন। বৃদ্ধ জোসিমা আজকাল লোকজনের সঙ্গে দেখাই করতেন না, খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবু অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। আলোচনার দিন স্থির হোলো। মৃদু হাসি হেসে আলিওশাকে তিনি বললেন,—দ্যাখো, এরা সব ভেবেছে কি? বিচার করবার আমার কতোটুকু অধিকার?

দুশ্চিন্তা হোলো আলিওশার। সে জানত, একমাত্র ডিমিটি ছাড়া কেউ এই আলোচনাকে গুরুত্ব দেবে না—বকাবকি আর ঝগড়া যতোই করুক না কেন। আইভান আর মিউসভ তো শুধু বৃদ্ধ জোসিমাকে দেখবার কৌতূহল নিয়ে আসবে, বাপ পাবে ভাঁড়ামি করবার নতুন একটা সুযোগ। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদের মিটমাট সে কামনা করে, কিন্তু তার প্রধান চিন্তা তার গুরুকে নিয়ে। তাঁকে যদি কেউ অবজ্ঞা করে, এই তার সবচেয়ে ভয়। একমাত্র দাদা ডিমিটিকেই সে অনুরোধ করতে পারে। তাই সে করল, চিঠি পাঠাল তাকে একটা। উত্তরে ডিমিটি লিখল,—ভয় নেই, এই আলোচনাসভা যদিও তার বাবার একটা নতুন ফাঁদ পাতার কৌশল বলেই তার ধারণা, তবু সে জোসিমাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর সামনে অসংযম প্রকাশ করে তাঁর মর্যাদার হানি সে করবে না।

এ চিঠি সত্ত্বেও আলিওশা খুব একটা আশ্বাস পেল না।



দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাধু-সন্দর্শন

আগস্ট মাসের উজ্জ্বল উষ্ণ দিন। মঠবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার সময় ঠিক হয়েছে সকাল সাড়ে এগারোটার সময়, সকালবেলাকার উপাসনার পরে। প্রথমে একজোড়া চমৎকার ঘোড়ায়-টানা দামী এক খোলা গাড়িতে চেপে উপস্থিত হলেন মিউসভ। তাঁর সঙ্গে তার একজন আত্মীয়,—বছর কুড়ি বয়সের তরুণ, নাম পিয়তর ফোমিচ কাল্‌গানোভ। ছেলেটি মিউসভের সঙ্গেই কদিন আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। মিউসভ তাকে উপদেশ দিচ্ছেন বিদেশে যেতে, জুরিক কিংবা জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। ছেলেটি সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী। তবে কেমন চিন্তাকুল আনমনা তার দৃষ্টি,—জীবনের পথ এখনো বেছে নিতে পারেনি বলেই যেন কেমন আড়ষ্ট ও গম্ভীর প্রকৃতির, কথা কম বলে। তবে যখন কোনো আলোচনায় যোগ দেয়, বুদ্ধিদীপ্ত মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থবান, আরো অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। আলিওশার সে বন্ধু।

পুরোনো একটা ভাড়া-করা ঘোড়ার গাড়ি চেপে উপস্থিত হোলো ফিয়োডোর পাভলোভিচ আর তার ছেলে আইভান। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ডিমিট্রিকে পাকা খবর পাঠানো হয়েছে, তবু এখনো সে উপস্থিত হয়নি। অদূরের হোটেলে গাড়ি থেকে নেমে সবাই পায়ে হেঁটে চলল মঠের দ্বার পর্যন্ত। ফিয়োডোর ছাড়া দলের আর কেউ মঠ দেখেনি, মিউসভ বোধ হয় ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো গির্জাতেই ঢোকেননি। বাহ্যিক উদাসীন ভাব বজায় রেখে তিনি অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কেবল গির্জাটি ছাড়া মঠের অন্য সব পুরোনো-পুরোনো বাড়িঘর দেখে তিনি খুব একটা আকৃষ্ট হলেন না। প্রার্থনা শেষে উপাসকরা খালি মাথা হেঁট করে ফিরছে। কয়েকটি অভিজাত মহিলাও চোখে পড়ল,—একজন বয়স্ক সেনাপতিও। এঁরা নিশ্চয়ই বাইরের ঐ হোটেলে এসে উঠেছেন। গেট পার হতেই ভিখারীরা এসে ছেঁকে ধরল। ছোকরা কাল্‌গানোভ কেবল ভিক্ষা দিল তাদের, কেমন লজ্জিত মুখে চট্ করে পকেট থেকে একটি দশ-কোপেকের মুদ্রা বার করে একটা বৃদ্ধা ভিক্ষুনীর হাতে ফেলে দিয়ে এগোলো। তার এই পুণ্যকাজ দেখে দলের কেউ কিছু মন্তব্য করল না, তবু তাতেই সে বোধ হয় লজ্জিত হোলো আরো বেশি।

মঠের দরজায় অতিথিদের কোনো বিশেষ সম্বর্ধনার ব্যবস্থা নেই, যদিও এদের মধ্যে আছেন একজন প্রতাপশালী জমিদার, মঠের বিরুদ্ধে মামলার সমর্থ লড়াই যিনি চালাচ্ছেন, আর একজন তো সবে মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে মৃতা স্ত্রীর নামে হাজার রুবল দান করেছে।

মিউসভ গির্জার দু-পাশের সমাধিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রায় তাঁর মুখে এল, —হুঁ, ধর্মস্থানে মৃতের কবরের ব্যবস্থাটুকু করতে জীবিতের কিন্তু কম খেসারত দিতে হয় না। তবে চেপে গেলেন সে কথাটা। তিক্ত বিদ্রূপের বদলে সোজাসুজি রাগত

স্বরে বললেন,—আচ্ছা জায়গা বটে! কোথায় যাব তা জিজ্ঞেস করব কাকে! কর্তাব্যক্তিদের কারোরই তো পাত্তা নেই। খালি সময় নষ্ট!

বলতে না বলতেই সামনে এসে দাঁড়ালো লম্বা গলাবন্ধ-কোট গায়ে এক টাকমাথা বৃদ্ধ। বললে,—ফাদার জোসিমাকে দেখতে যাবেন? তিনি থাকেন মঠের পেছন দিকে কিছু দূরে একটা কুটীরে।

ফিয়োডোর বললে,—হ্যাঁ, তা জানি। তবে কিনা কোন্ দিক দিয়ে যেতে হয় মনে পড়ছে না। অনেক দিন পরে আসছি কি না!

বেশ তো, আমার সঙ্গে আসুন, আমার নাম মাক্সিমভ। টুনাতে কিছু জমিজমা আছে। আমিও তাঁর দেখা পাব বলেই এসেছি।

গেট থেকে বার হয়ে মঠের কিনারের মেঠো-রাস্তা দিয়ে পথপ্রদর্শকের পিছু পিছু সবাই চলল।

কিছুটা যাবার পর তাদের সামনে এগিয়ে এল একটি সাধু। শীর্ণ পান্ডুর লোকটির দেহ। মাথা হেঁট করে গভীর সম্মানসূচক অভিবাদন জানিয়ে সে বললে,—ফাদার সুপিরিয়র আমাকে পাঠিয়েছেন। ফাদার জোসিমার কুটীর পরিদর্শন শেষ হলে আপনারা সবাই তাঁর ওখানে আসবেন। আপনাদের সকলকে মধ্যাহ্নভোজে তিনি নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

অ্যাঁ, তাই নাকি? সোৎসাহে বললে ফিয়োডোর পাভলোভিচ,— মধ্যাহ্নভোজ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাব। কথা দিলাম ভায়া, ব্যবহারে একটুকু বেচাল পাবে না। কিহে ভায়া পিয়ত্তর, তুমিও যাবে তো!

অবশ্যই যাব। এঁদের সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতেই তো আমি এসেছি। তোমাকে নিয়েই আমার কেবল যা অসুবিধে!

বটে? তবু তো আমার ডিমিট্রি ব্যাটা এখনো আসেনি।

একেবারে না এলেই আমি বাঁচি। তুমি ভেবেছ কি? তোমার সংসর্গ আর তোমাদের এই ঝামেলা আমার খুব ভালো লাগে, তাই না? ও হ্যাঁ, আপনি ফাদার সুপিরিয়রকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। নিশ্চয়ই যাব আমরা।

সাধুটি বললে,—চলুন, তাহলে ফাদার জোসিমার কাছে আপনাদের আমি পৌঁছে দিয়ে যাই।

কয়েক পা এগিয়ে মিউসভ বললেন,—দ্যাখো ফিয়োডোর, এইমাত্র তুমি এখানে অভব্য ব্যবহার করবে না বলে কথা দিলে, মনে থাকে যেন। নিজেকে যদি সংযত না রাখ, কি একটি বাজে কথা যদি বলো অথবা ভাঁড়ামি করো তো আমি তোমার সঙ্গে নেই বলে দিচ্ছি।

দাঁত বার করে মাথা নাড়ল ফিয়োডোর।

কুটীরের কাছাকাছি পৌঁছে ফিয়োডোর বললে,—এই, এইবার চিনতে পেরেছি। এই তো দরজা, এসে গেছি।

গেটের ওপর খৃষ্টীয় সাধুসন্তদের অনেকগুলি মূর্তি আঁকা। ফিয়োডোর বুকের

ওপর ক্রুশচিহ্ন করে প্রত্যেকটি সাধুকে সম্মান জানাল। তারপর বললে,—কথায় আছে না, রোমে যখন যাবে, রোমানদের মতো ব্যবহার করবে। এ কথা আমি মানি। দেখেছ তো, দরজা জুড়ে পুণ্যাত্মাদের কড়া পাহারা। এই দরজা দিয়ে সব গলবে, কিন্তু এক ফোঁটা মেয়েমানুষ গলবে না। নরকের নয়, এ স্বর্গের দ্বার। তা সন্ন্যাসী ভায়া, জোসিমা তো শুনেছি বড়ো বড়ো ঘরের মেয়েদেরও দর্শন দেন, ঠিক না?

সাধু বললে,—ঐ যে পাশের দেউড়ি দেখছেন, সাধারণ মেয়েরা ঐখানে অপেক্ষা করে। ওর পাশে ঐ যে দুটি ঘর, ও দুটি মহিলাদের থাবার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। কুটীরের ভিতর থেকে ওখানে যাবার আলাদা একটা সরু রাস্তা আছে। ফাদার সুস্থ থাকলে সেই পথ দিয়ে তিনি যান। মাদাম হোলাকভ বলে হারকভ থেকে এক মহিলা তাঁর রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে একটা ঘরে আছেন। হয়তো প্রভু তাঁকে দেখা দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। তবে আজকাল তিনি খুব কমই বার হন, শরীর তো ভালো নয়।

ব্যস্ ব্যস্, এইটেই আমি জানতে চাইছিলাম। আশ্রম থেকে মেয়েমহলে যাবার একটা চোরা-রাস্তা আছে কি না। তা না হলে চলে। কিছু মনে কোরো না ভায়া, তবে অ্যাথসের মঠে গিয়ে দেখেছি সেখানে ভারি যাচ্ছেতাই ব্যবস্থা। সারা মঠের চৌহদ্দির মধ্যে মেয়েমানুষ বাদ দাও,—গরু, মুরগী, মাদী মাছিটি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। আরে ছ্যা, ছ্যা!

ফিয়োডোর পাভলোভিচ, ধমকে উঠলেন মিউসভ,—এ রকম করলে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না বলে দিচ্ছি। আমি সঙ্গে না থাকলে এরা তোমাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

আশ্রমের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ফিয়োডোর বললে,—চটো কেন ভায়া! এই দ্যাখো, অ্যা! এযে গোলাপের বিছানা! খাসা একেবারে।

গোলাপ নয়, তবে সারা আশ্রম ঘিরে নানা মৌসুমী ফুলে ভরা সুন্দর একটি বাগান।

ফিয়োডোর সাধুকে বললে,—আগে এখানে মঠবন্ধ থাকতেন যিনি, কী যেন নাম,—ভার্সোনোফি না? তার এসব ফুল-টুলের শখ ছিল না। বুড়ো নাকি মেয়েদের ধরে লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙাতো! সত্যি?

সাধু বললে,—হ্যাঁ, সাধু ভার্সোনোফির ব্যবহার কিছুটা রুক্ষ ছিল বটে! তবে আপনি যা বলছেন তা নয়, অনেকটাই বোকা লোকেদের রটনা।

আশ্রম-গৃহে দরজার সামনে ততক্ষণে তারা পৌঁছে গেছে। মিউসভ বললে,—ফিয়োডোর পাভলোভিচ আবার তোমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। ভেতরে ঢুকে একটুও যদি অসভ্যতা করো তো ঠিক তোমাকে তাড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি।

আহা! তোমার হয়েছে কী বলতো? কুটিল হাসি হেসে ফিয়োডোর উত্তর দিল,—ভয় করছে? জমানো পাপগুলো সব কটকট করছে বুঝি? লোকে বলে, জোসিমা লোকের মুখ দেখলেই মনের খবর সব টের পান। তাই বলে তুমি তাতে ভয় পাবে? যারা বলে তারা তো মুখ্যু লোক! আর তুমি কি না খাস প্যারিস ফেরত পণ্ডিত।

উত্তর দেবার সময় পেলেন না মিউসভ। রাগে মনটা জ্বলতে লাগল তাঁর। তিনি নিজেকে সংযত করে আশ্রম-গৃহে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলেন,—না, ছোটলোকটার সঙ্গে কথা বাড়ালে নিজেকে আর সামলাতে পারব না। তাতে এতো লোকের সামনে নিজেকেই নিচু করা হবে।

দুই

আশ্রমের বহির্বাটীতে সবাই প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গেই শয়নকক্ষ থেকে এ ঘরে প্রবেশ করলেন সাধু জোসিমা। ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন আরো দুজন সাধু, একজন মঠের গ্রন্থাগারিক, অপরজন ফাদার পাইসি নামে এক পণ্ডিত। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের এক তরুণ, সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, পরনে সাধারণ পোষাক। ছেলেটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, মঠেই আশ্রয় নিয়ে আছে।

ফাদার জোসিমা ঢুকলেন,—তাঁর একধারে আলিওশা, অন্যধারে আর একজন ব্রতচারী। সাধু দুজন উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে মাটিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর করচুম্বন করলেন। সাধু জোসিমা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর নতমস্তকে তাঁদেরও আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। গভীর গাম্ভীর্য ও পরম হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই প্রণাম ও আশীর্বাদের আদান-প্রদান সম্পন্ন হোলো। মিউসভের কিন্তু মনে হোলো এ যেন বাড়াবাড়ি, বিশেষ করে আগন্তুকদের দেখাবার জন্যেই এই ঘটনা। আগন্তুকদলের সকলের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। করচুম্বন আর আশীর্বাদ ভিক্ষার এই অনুষ্ঠানে তার মনটা কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি কেবল মাথা নিচু করে বৃদ্ধ সাধুকে সাধারণ নমস্কার জানিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। ফিয়োডোর পাভলোভিচও মিউসভের অক্ষম অনুকরণে নমস্কারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিল। আইভানও তাই,—দুহাত পাশে চেপে রেখে মাথাটা সামনের দিকে হেলিয়ে সে সাধুকে অভিবাদন করল মাত্র। কাল্‌গানোভ বেচারী এমনি ঘাবড়ে গেল যে সে কিছুই করতে পারল না। আশীর্বাদের জন্যে জোসিমা ডান হাতটি তুলে ছিলেন। হাত নামিয়ে তিনি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালেন ও সকলকে বসতে অনুরোধ করলেন। মুখটা লাল হয়ে উঠল আলিওশার। ঠিক এই ভয়ই সে করেছিল যে উপযুক্ত সম্মান তার গুরুকে এরা দেবে না।

চামড়া-ঢাকা খুব পুরোনোকালের মেহগনি কাঠের একটা সোফায় সাধু জোসিমা বসলেন। অতিথিরা বসলেন মুখোমুখি অনুরূপ চামড়া-ঢাকা পুরোনো চারটি চেয়ারে। সাধুরা একজন বসলেন দরজার কাছে, আর একজন জানলায়। দুই ব্রতচারী ও ছাত্রটি সসম্ভ্রমে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোট্ট ঘরটি, রঙ-ওঠা ধূসর তার দেয়াল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবগুলির দরিদ্র প্রাচীন রূপ। জানলার ধারে দুটি পুষ্পপাত্র, দেয়ালে কয়েকটি ধর্মমূলক ছবি।

যিশু-মাতার বিরাট মূর্তি একটি দেয়ালে, তার সামনে জ্বলন্ত একটি প্রদীপ। এ ছাড়া দেয়ালে দেবদূতদের কয়েকটি কাঠখোদাই, গজদন্ত নির্মিত একটি ক্রস, ইটালির শিল্পীদের কয়েকটি চিত্র। হাটে কিংবা মেলায় সস্তায় বিক্রী হয় এমনি কয়েকটি সাধুসন্তের ছবিও আছে। এক দেয়ালে রাশিয়ার বিশপদের একসার তৈলচিত্র।

মঠবাসীর ঘরের নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশ। মিউসভ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলেন জোসিমার প্রতি। নিজের অন্তর্দৃষ্টির ওপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা, জীবনে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন, বয়সেও পঞ্চাশ হোলো, শিক্ষিত সজাগ মনে আত্মাদরের অভাব নেই। প্রথম দর্শনেই জোসিমাকে তাঁর ভালো লাগল না। ছোটখাট মানুষটি, জীর্ণ দেহ সামনের দিকে বার্ধক্যে ঝুঁকে পড়া, বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি, কিন্তু দেখায় যেন আরো দশ বছরের বুড়ো। শীর্ণ বলিরেখাকীর্ণ মুখ, ছোট ছোট জ্বলজ্বলে দুটি চোখ। মাথার চুলকটি সাদা, সাদা ছুঁচোলো দাড়ি। সরু রেখার মতো পাতলা দুটি ঠোঁটে সর্বদা হাসির আভাস। নাকটা পাখির ঠোঁটের মতো খাড়া আর সামনের দিকে বাঁকানো। মিউসভের মনে হোলো, চেহারার মতো মনটাও লোকটার ছোট, অথচ দম্ভে ভরপুর।

দেয়ালের ঘড়িতে বারোটা বাজল।

ফিয়োডোর পাভলোভিচ বকবক শুরু করল। বললে সে,—দেখুন প্রভু, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক বারোটায় আমরা উপস্থিত, কিন্তু আমার ছেলে ডিমিট্রির দেখা নেই। সময় মেনে আমি সারাজীবন চলি. সময়ের খেলাপ মানেই কথার খেলাপ। সময় মানা রাজাদের রীতি।

জ্বলে উঠলেন মিউসভ। বললেন,—আঃ, থামো না। সময় মানো বলেই কি রাজা হয়ে গিয়েছ নাকি?

না না, রাজা হইনি। সে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না ভায়া, আমি রাজা হতে যাব কোন্ দুঃখে?

জোসিমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে আবার বলে চলল,—লোকে বলে, প্রভু, আমি ভাঁড়। তা প্রভু, ভাঁড়ই ভালো। কী বলতে কোথায় কী বলে ফেলি, লোকে হাসে, ভাবে আমি বোকা। ভাবুক তারা। আসলে কিন্তু বোকা আমি নই। লোককে আমি খুশী করে চলি। ব্যবসাদার মানুষ, কর্তা. লোকে খুশী না হলে আমাকে খুশী করবে কেন? কী বলেন? তবে হ্যাঁ, অনেকে বোঝে না। আমি ভদ্রতা করি, কেউ কেউ অন্য অর্থে সেটা নেয়। অনেক দিন আগেকার কথা বলি। একজন খুব শাঁসালো ভদ্রলোক, ভারী ধর্মপরায়ণা তাঁর স্ত্রী। খাতির করে ভদ্রলোককে বললাম,—আহা, আপনার স্ত্রী! স্পর্শমাত্রেই শিহরণ! ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। নোংরা মন কি না? কোথায় খুশী হবেন, তা না, উল্টে আমারই সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে ছেড়ে দিলেন। আমাকে কেউ বুঝল না প্রভু, কেউ বুঝল না। বলতে যাই ভালো, হয়ে পড়ে মন্দ।

বিরক্ত চাপা গলায় মিউসভ বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক এখন যা হচ্ছে।

ফাদার জোসিমা স্তব্ধ হয়ে দুজনকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

হচ্ছে? ঠিক বলছ, হচ্ছে? আহা হা, কী বুদ্ধিমান তুমি ভায়া? তুমি ঠিক বুঝেছ, আর আমি কিছু বুঝিনে? ভাঁড়ামিটা আমার জীবনে ঘুচল না, একেবারে শিশুকাল থেকে এই ভাঁড়ামির শয়তানটা আমার বুকে বাসা বেঁধেছে। তবে কিনা এটা ছোট-খাট শয়তান। আসল সেই বুড়ো শয়তানটার সঙ্গে আমার কোনো কারবার নেই। মাঝে মাঝে সন্দেহ উপস্থিত হলে কী হয়, ভগবানকে যে বিশ্বাস করি কায়মনোবাক্যে প্রভু! আর এই আমাদের মিউসভ ভায়া, এ মস্ত পণ্ডিত প্রভু, বিদ্যের দিগ্‌গজ, কিন্তু জিগ্যেস করুন তো, ওর বুকে কার বাসা, ভগবানের না শয়তানের?

মিউসভ উঠে দাঁড়ালেন। অপমানে ঘৃণায় লাল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ। অন্য শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে আছে কথাবার্তার ধরণ দেখে। একান্ত অনুগত শ্রদ্ধাপ্লুত মন না নিয়ে মঠবৃদ্ধের এই আশ্রম-প্রকোষ্ঠে কখনো কেউ প্রবেশ করেনি। কতো লোক এসেছে এখানে,—ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ; সব এসেছে, অবিশ্বাসীও আসেনি তা নয়, কিন্তু অশ্রদ্ধার এমনি অভব্য প্রকাশের সঙ্গে এই প্রকোষ্ঠ পরিচিত নয়। সন্ন্যাসীদের মুখে কথা নেই, কিন্তু তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, মিউসভেরই মতো আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠবেন কি না ভাবছেন। আলিওশা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে—চোখে তার জল। ভাবছে সে, বাপ তো তার ঐ রকমই, কিন্তু দাদা আইভান,—সে কেন বাবাকে বাধা দিচ্ছে না, সে কেন চুপটি করে বসে নিরাসক্ত চোখে মজা দেখছে। ছাত্রবন্ধুটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না সে লজ্জায়, বন্ধুর মনে যে কী হচ্ছে, ঠিক সে বুঝতে পারছে।

ফাদার জোসিমাকে উদ্দেশ্য করে মিউসভ বললেন,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভেবেছিলাম, আপনার মতো মহৎ ব্যক্তির সামনে এসে অন্তত ফিয়োডোর পাভলোভিচ নিজেকে সংযত রাখবে। ভুল ভেবেছিলাম। এ জানলে ওর সঙ্গে কখনো আমি আপনার কাছে আসতাম না।

মিউসভ বেশি কিছু বলতে পারলেন না, গৃহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

উঠে দাঁড়ালেন মঠবৃদ্ধ। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বললেন,—শান্ত হোন্ আপনি, সামান্যতে কেন বিচলিত হবেন? যাবেন না, বসুন।

পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচের দুহাত ধরে তিনি তাঁকে তাঁর আসনে বসালেন। তারপর নিজের আসনে গিয়ে আবার বসলেন।

এবার হঠাৎ আকুল স্বরে চিৎকার করে উঠল ফিয়োডোর, প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে চায়,—বলুন প্রভু বলুন, আমি অন্যায় করেছি? রাগ করেছেন আপনি? আমার প্রাণের আনন্দ দিয়ে আপনার প্রাণে কি আঘাত দিয়ে ফেলেছি?

জোসিমা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,—না বৎস, তুমিও বিচলিত হয়ো না। মনে করো, এ তোমারই ঘর। যেমনভাবে কথা বলতে চাও তেমনিই বলো। লজ্জা কিসের?

যেমন বলতে চাই? যা খুশী? না প্রভু, অতোটা সইবে না। আপনারও না,

আমারো না, আমার আসল স্বরূপটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমার সম্বন্ধে কতো কথাই কতো লোকে বলে, তবু যেটুকু চাপা থাকবার সেটুকু চাপাই থাকে। আপনাকে দেখে, প্রভু, প্রাণে আমার আজ বড়ো আনন্দ হচ্ছে, সে আনন্দটুকু চাপতে বলবেন না।

দাঁড়িয়ে উঠল ফিয়োডোর পাভলোভিচ। মাথার ওপর দুহাত তুলে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল,—ধন্য! ধন্য সেই মাতৃজঠর যা থেকে আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, বিশেষ করে ধন্য সেই দুটি স্তন যা থেকে আপনি দুগ্ধ পান করে বড়ো হয়েছেন। এই যে আপনি আমাকে লজ্জা করতে বারণ করলেন, এতেই আমি জানলাম যে আমার সারা জীবনের দুঃখ আপনি বুঝেছেন। প্রভু, এই লজ্জাই তো আমার সর্বনাশ করল। লোকে বলে আমাকে ভাঁড়, সে লজ্জাতেই তো আমি ভাঁড়ামি করি। ওরা যদি একবার আমাকে ঠিকমত বুঝত, বলত আমি কতো বুদ্ধিমান, আমি কতো স্নেহশীল, তাহলে ভগবান, কতো ভালো লোক আমি হতে পারতাম। প্রভু, মিথ্যে মুখোশ পরেই আমার সারাজীবন কাটল। বলুন, আমার কি উদ্ধার হবে না? কী করলে আমার মুক্তি হবে?

জোসিমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফিয়োডোর। এও তার এক নতুন ভাঁড়ামি কি না বোঝা শক্ত।

ফাদার জোসিমা তার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাস্যে বললেন,—কী তোমাকে করতে হবে তা তুমি নিজেই জানো। তবু আমার মুখ থেকে শুনতে চাও? মাতাল হোয়ো না, বাকসংযম কোরো। সংযম করো তোমার লোভকে, লালসাকে। ভাঁটিখানা করে তো অনেক পয়সা করেছ, ওগুলো বন্ধ করে দাও। আর, মিথ্যে কথা কখনো বোলো না। এ যদি করতে পারো, তাহলে তোমার ভয় কি?

মিথ্যে কথা!

হ্যাঁ, শুধু অপরের কাছে নয়, তোমার নিজের কাছেও। নিজেকে যে মিথ্যে দিয়ে ভোলায়, সত্যকে চিনেও সে কখনো চিনতে পারে না। আত্মসম্মান সে ভোলে, পরকেও সম্মান করতে পারে না। প্রেমকে সে অস্বীকার করে, লালসায় কলুষিত করে দেহমন। মনুষ্যত্বকে সে বিসর্জন দেয়, পশুত্বকে সে বরণ করে নেয়। প্রকৃত মান-অপমান বোধ তার থাকে না, মিথ্যে অপমানকে সে বড়ো করে দেখে, অস্বীকার করে সত্য সম্মানকে। এইবার ওঠো, মিথ্যে অভিনয় না করে তোমার আসনে গিয়ে স্থির হয়ে বোসো।

লাফিয়ে উঠল ফিয়োডোর। সশব্দে চুম্বন করল জোসিমার দক্ষিণ হাতে। তাঁর শেষ কথায় এতোটুকু অপ্রতিভ না হয়ে বললে,—প্রভু, কী তৃপ্তি! এমনি করে কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলেনি। মিথ্যে অপমান! ঠিক কথা, সারাটা জীবন এই মিথ্যে অপমানেই তো ভুগলাম! মিথ্যে কথা বলে বলে জীবনটাই মিথ্যে হয়ে গেল। প্রভু, আমি মিথ্যের রাজা। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। এবার আমার একটা সন্দেহ কেবল ঘুচিয়ে দিন। গত দু-বছর ধরে ভাবছি আপনার কাছে এসে এই সমস্যাটার সমাধান করে নেব। প্রাচীন সাধুদের জীবনীতে কোথায় নাকি লেখা আছে, বিধর্মীরা কোন্ এক সাধুকে বলি দিয়েছিল। গলাটা দু-টুকরো হয়ে যাবার পর

খড়টা সোজা দু-পায়ে উঠে দাঁড়াল, মুণ্ডটাকে ডান হাতে তুলে নিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আহা! কী বিচিত্র লীলা! প্রভু, এ কাহিনী কি সত্যি নয়?

না, সত্য নয়, জোসিমা বললেন।

গ্রন্থাগারিক বললেন,—সাধুদের জীবন নিয়ে এই অলীক কাহিনী কোন্ গ্রন্থে আপনি পেয়েছেন?

আমি কোথা থেকে পাব? যা শুনেছি তাই বলছি। এই যে আমাদের সত্যবাদী বিদ্যোদিগ্‌গজ পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ, এই আমাকে বলেছে।

কক্ষনো বলিনি আমি। তোমার সঙ্গে আমি কথাই বলিনে।

বলেছ বইকি ভায়া। আমাকে ডেকে নিয়ে না বললেও আমার সামনে এই মিথ্যে গল্প তুমি বলেছ। আজ না, তিন বছর আগেকার কথা। এই গাঁজাখুরি গল্প বলে আমার ধর্মবিশ্বাসে এমনি জোর তুমি ঘা দিয়েছ যে সেই ঘায়ের ফাটল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সেই জন্যেই না প্রভুর কাছে কথাটা তুললাম!

উপস্থিত কারো বুঝতে বাকি রইল না যে ফিয়োডোর আবার ভাঁড়ামি শুরু করেছে, তবু অস্বস্তিতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মিউসভ।

বাজে কথা। যতো সব বাজে কথা, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন তিনি,—হয়তো বলেছি, তা বললেও সে ঠাট্টা করে। বইএ কোথাও আমি পাইনি, তবে প্যারিসে এক পণ্ডিতের মুখে মনে হচ্ছে এমনি একটা কাহিনী শুনেছিলাম। ভোজসভায় বসে ভদ্রলোক গল্প করছিলেন বটে, তবে ভোজে বসে নানারকম গল্প নানান্ লোকে করে।

বাঃ, বাঃ, চমৎকার! তুমি তো ভায়া ভোজ খেয়ে ঢেকুর তুললে, আর আমার ধর্মবিশ্বাসটি যে গেল।

অনেক কষ্টে রাগ সংযত করে মিউসভ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—তোমার আবার ধর্ম, তোমার আবার বিশ্বাস! যাও, যাও, আর নোংরামি কোরো না। খুব শুনিয়েছ!

সাধু জোসিমা হঠাৎ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—আমাকে কয়েক মিনিটের জন্যে আপনারা ক্ষমা করবেন। বাইরে আরো কয়েকজন আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁরা আপনাদের আগে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করে এখুনি আসছি।

প্রকোষ্ঠের দরজায় পা দিয়ে পিছন ফিরে স্মিত মুখে তিনি ফিয়োডোরকে বলে গেলেন,—আর কিন্তু মিথ্যে কথা বলা চলবে না, কেমন?

আলিওশা ও তার সঙ্গী অপর ব্রতচারীটি জোসিমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। এতোক্ষণ আলিওশা রুদ্ধনিশ্বাসে বসেছিল; এই পরিবেশ থেকে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে। গুরু যে খুশীমনে আছেন, তার বাবার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হননি, এটাও তার পক্ষে অবশ্য কম স্বস্তি নয়।

তিন

আশ্রমের দেয়ালের ধারে কাঠের ঢাকা বারান্দা। সেখানে প্রায় কুড়িটি কৃষাণ রমণীর ভিড়। দুজন অভিজাত মহিলাও আছেন সেখানে, ভিড় এড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, – মাদাম হোলাকভ আর তাঁর মেয়ে।

মাদাম হোলাকভের বয়েস তেত্রিশ – রূপবতী, সুবেশিনী। স্বামীকে হারিয়েছেন বছর পাঁচেক—বিত্তশালিনী বিধবা। তাঁর মেয়েটির বয়েস চোদ্দ, আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগছে। গত ছ-মাস থেকে সে চলৎশক্তিরহিত, চাকাওয়ালা আরামকেদারায় বসিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় তাকে। মিষ্টি মুখখানি রোগশীর্ণ হলেও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। দীর্ঘ পল্লব ঘেরা বড়ো বড়ো চোখ-দুটি তার দুষ্টুমি মাখানো। সম্পত্তি সংক্রান্ত কয়েকটা ব্যবস্থার জন্যে মাদাম হোলাকভ কদিনের জন্যে আমাদের শহরে এসেছেন, কাজ মিটলেই মেয়েকে নিয়ে বিদেশযাত্রা করবেন। দিন তিনেক আগে একবার ফাদার জোসিমার কাছে এসেছিলেন, আজও আবার এসেছেন দর্শনলাভের আশায়।

মেয়ের ঠেলাগাড়ির পাশে একটা চেয়ারে মা বসে আছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ সাধু। সাধুটি এ মঠের নয়, অনেক দূর থেকে তিনি এসেছেন জোসিমার আশীর্বাদ ভিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে।

ফাদার জোসিমা বারান্দায় এসে প্রথমেই গেলেন কৃষাণ রমণীদের কাছে। বারান্দার সিঁড়ির নিচের ধাপে তারা ভিড় করে আছে। বারান্দার ওপর উঠে জোসিমা দুহাত প্রসারিত করে তাদের সকলকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। একটি উন্মাদিনী নারীকে তাঁর সামনে প্রথমে আনা হোলো। প্রসব-বেদনার মতো কেমন একটা অজ্ঞাত অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। তার কপালে হাত রেখে জোসিমা ক্ষুদ্র একটি প্রার্থনা করলেন। শান্ত হোলো নারী।

এমনি অজ্ঞাত মানসিক রোগগ্রস্তা নারীদের সাধারণত ভূতে-পাওয়া বলে। তাদের ব্যবহারে উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশের অন্ত থাকে না। ধর্মমন্দিরে নিয়ে এলে সাধুর মন্ত্রে ও স্পর্শে তারা সাময়িকভাবে শান্ত হয়। অবিশ্বাসীরা বলে,—এ রোগ রোগই নয়, অলসতার ফন্দি মাত্র, উপযুক্ত শাসন করলেই ভূত ছাড়ে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও বলেন যে, কৃষাণ মেয়েদের মধ্যে এমনি মানসিক বিকৃতি একটা অনিবার্য ব্যাধি। ব্যবহারিক জীবনের দুঃখদুর্দশা থেকেই এমনি ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এদের মতো অত্যাচারিত আর কেউ হয় না ;—অমানুষিক পরিশ্রম এদের করতে হয় ঘরে বাইরে, পুরুষের হাতে শারীরিক পীড়ন ও প্রহার নিত্যই লেগে আছে, তাছাড়া পুনঃ পুনঃ সন্তান ধারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রসব ব্যবস্থা এবং প্রসবের পরে বিশ্রামের অভাব,—এ সবই এই মানসিক রোগের কারণ। উন্মত্ততার মধ্যেও এই বিশ্বাস তাদের মনে থাকে যে সাধুর আশীর্বাদে শয়তানের ভর তাদের দেহমন থেকে নামবে।

সাধু জোসিমার শান্তিবাণীতে উন্মত্তা মেয়েটি একটু শান্ত হোলো দেখে অন্য রমণীরা ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কেউ তাঁর পোষাকের প্রান্ত চুম্বন করতে লাগল, কারো চোখে এল জল।

আর একটি রমণীর দিকে এবার জোসিমা তাকালেন। বয়সের অনুপাতে মেয়েটির জীর্ণ শীর্ণ শরীর, সারা মুখে শোকের কালিমা। হাঁটু গেড়ে নিশ্চল হয়ে বসে সে কেমন উন্মত্ত আচ্ছন্ন চোখে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল জোসিমার মুখের দিকে।

জোসিমা বললেন,—তুমি তো অনেক দূর থেকে আসছ, তাই না ?

ক্রন্দনবিধুর ক্লান্ত স্বরে মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে বললে,—অনেক দূর থেকে, অনেক, অনেক দূর থেকে।

শোকের প্রস্তরমূর্তি হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে, কাঁপছে দুঃসহ আবেগে। কৃষাণ রমণীদের শোকের ভাষা থাকে না। বেদনার নিত্য ক্ষতকে বুকের মধ্যে নীরবে তারা পুষে রাখে। আবার কখনো বা এই দুঃখ প্রকাশ পায়, আর্তনাদে, অশ্রুজলে। গোপন ক্ষতকে যখনই খুলে দেখে, তখনই না কেঁদে পারে না।

ফাদার জোসিমা উৎসুক চোখে মেয়েটিকে দেখলেন, তারপর বললেন,—তুমি তো গাঁয়ের মেয়ে নও !

না বাবা, আমরা শহুরে। চাষী-গৃহস্থ আমরা, তবে শহরেই আমাদের বাসা। তোমার নাম আমি অনেক দূর থেকে শুনেছি। তাই তোমাকে দেখতে এসেছি বাবা। কোলের শেষ ছেলেটা মরে গেল, তাকে মাটি দিয়ে তীর্থ করতে বেরুলুম, মনের জ্বালা জুড়তে। যে মঠেই যাই, তারা বলে,—সাধু জোসিমার কাছে যাও, তাঁর কাছে গেলেই তোমার যন্ত্রণা ঘুচবে।

কিসের জ্বালা তোমার মা, কিসের এত কান্না ?

আমার ছেলে বাবা, আমার শেষ সন্তান ! চারটে ছেলে আমার হয়েছিল। একটাও রইল না। ভগবান শেষটাকেও টেনে নিল। প্রথম তিনটে যখন যায়, এত দুঃখ পাইনি। শেষটাও কোল খালি করে চলে গেল,—তার দুঃখ যে ভুলতে পারিনে বাবা। তার জামা, তার কাপড়, তার খেলনা সব আমি চোখের সামনে সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকি, আর সর্বক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদি। স্বামীকে বললাম,—এ আমি পারব না, পাগল হয়ে যাব। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, আমি তীর্থে যাব। তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াই, ঘরে ফিরতে পারিনে। স্বামীকে ভুলেছি, সহ্য করতে পারিনে তাকে,—সে আমার ভাঙা ঘরে বসে বসে মদ খায়। থাক্ সে, মরুক সে, আমি আর ফিরে যাব না।

শোনো মা শোনো, মঠবৃদ্ধ বললেন,—অনেক দিন আগেকার একটা কথা বলি। তোমারই মতো এক বিষাদিনী জননী তার একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তোমারই মতো কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়িয়েছিল মন্দিরের এক সন্ন্যাসীর সামনে। সন্ন্যাসী তাকে বললে,—বুঝতে পারিসনে তুই, ওরা যারা পৃথিবীতে দুদিন মাত্র না কাটাতেই স্বর্গে যায়, ঈশ্বরের সামনে কী রকম সাহস নিয়ে তারা দাঁড়ায় ? ঈশ্বরকে তারা বলে,—কেন

আমাদের পাঠালে ? আর দু'দিন না যেতে ফিরিয়েই বা আনলে কেন ? ঈশ্বর তাদের সকল স্বাভাবিক অনুযোগ বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবদূত করে দেন। সন্ন্যাসী বললে,—আনন্দ করো মা, তোমার সন্তান আজ স্বর্গে দেবদূতদের মধ্যে আসন পেয়েছে। সেই প্রাচীন সন্ন্যাসীর কথা মিছে নয়। তোমারও শিশু ঈশ্বরের কোলে বড়ো আদরে স্থান পেয়েছে। বড়ো সুখে সে আছে। সে কথা ভেবে তুমিও চোখের জল মোছো।

মা তাকিয়ে রইল জোসিমার মুখের দিকে। একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—আমার স্বামী নিকিতাও ঐ কথা বলেই আমাকে প্রবোধ দেয়। জানি আমি, আমার সন্তানকে ভগবান তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন, ওপারে গিয়ে সুখে আছে সে। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ঘোচে কই ? আমার কোল যে আঁধার হয়ে গেল। ও দূরে থাক, তবু যদি দূরে থেকে উঁকি মেরেও ওর চাঁদমুখটা একবার দেখতে পেতাম, মা বলে ওর ডাক একবার যদি শুনতে পেতাম, একটিবার যদি শুনতে পেতাম ওর ছোট ছোট পা দুখানির শব্দ। কিন্তু আমার কাছ থেকে একেবারে যে চলে গেছে, ওর কাপড় ওর খেলনা সব ফেলে রেখে চলে গেছে,— সে শোকের আমার সান্ত্বনা কোথায় বাবা ?

বুকের মধ্যে থেকে শিশুর একটি ছোট পোষাক বার করল অভাগিনী জননী, তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কাঁদতে লাগল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার শীর্ণ দুটি কাঁধ।

অস্ফুট স্বরে বৃদ্ধ বললেন,—সন্তানহারা র‍্যাচেল তুমি, তোমার শোকে সান্ত্বনা কোথায় ? পৃথিবীর যতো পুত্রহীনার দুঃখ তোমার বুকে আগুন জ্বালিয়েছে, সে আগুন তো নিভবে না। কাঁদো মা, শোক করো, কিন্তু দুঃখ কোরো না। মনে রেখো, স্বর্গ থেকে তোমার সন্তান তোমার প্রতিবারের কান্নাকে দেখছে, দেখাচ্ছে ঈশ্বরকে। এই কান্নাই একদিন শান্ত পবিত্র আনন্দ-বেদনার রূপ নেবে, মনের সমস্ত ক্লেদ মার্জনা করবে এই পুত্রশোক। তোমার মৃত-শিশুর আত্মার শান্তির জন্যে আমিও প্রার্থনা করব মা। প্রার্থনা করব, তোমার শোক যেন পবিত্র হয়, তোমার স্বামী যেন দীর্ঘজীবী হয়।

স্বামী ?

হ্যাঁ, স্বামী। বড়ো অন্যায় করেছ তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্যাগ করে। ফিরে যাও তার কাছে। স্বর্গ থেকে তোমাকে ছেলে দেখছে তার বাপকে তুমি ছেড়ে গেছ, এতে সে দুঃখই পাচ্ছে। তার অশরীরী আত্মা তোমার ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে যায়, মা-বাপকে দেখতে পায় না। সেও দুঃখে কাঁদে। কেন তাকে দুঃখ দেবে ? দেরি কোরো না মা, তোমার স্বামীর আশ্রয়ে শীঘ্র তুমি ফিরে যাও।

যাব বাবা, ঠিক বলেছ তুমি। আমি ছাড়া ওরই বা আর কে আছে। এখুনি রওনা হব।

সাধু জোসিমা দু-পা এগিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধার সামনে। বৃদ্ধা গ্রাম্য তীর্থ-

চাষিনী নয়, পরনে শহুরে পোষাক। তার চোখের দৃষ্টিতেই প্রকাশ যে যেন কোনো একটি বিশেষ কথা বলতেই সে মঠবৃদ্ধের কাছে এসেছে। বৃদ্ধা বললে,—সে একজন সামরিক কর্মচারীর বিধবা, শহরেই থাকে। তার একটি মাত্র ছেলে ভ্যাসেন্কা কার্গ-ব্যপদেশে সাইবেরিয়াতে ইর্কুটস্ক শহরে বদলি হয়েছে এক বছর হোলো। দু-একবার চিঠি লিখেছিল, তারপর বুড়ী মাকে ভুলে গেছে একেবারে। কেমন করে সে তার একমাত্র সন্তানের মন ফিরে পাবে ?

বললে সে,—আমাদের পাড়ার এক বড়মানুষের বৌ আমাকে কি বুদ্ধি দিলে জানো বাবা ? বললে, তোমার ছেলে মরে গেছে এমনি ছল করে গির্জাতে গিয়ে তার আত্মার মুক্তির জন্যে সংকল্প করো। দেখো তাতে তার মনে গিয়ে বাজবেই, ঠিক সে চিঠি দেবে তোমাকে। তুমি বলো বাবা, তা কি আমি করতে পারি ?

জোসিমা বললেন,—নিশ্চয়ই না মা, ও কথা মনেও ভেবো না। জীবিত লোকের আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করার মতো পাপ আর নেই। তাছাড়া মা হয়ে তুমি করবে এই কাজ ? ছলনা করবে ভগবানের সঙ্গে ? ছি ছি ! প্রার্থনা করো তোমার ছেলে যাতে সুস্থ থাকে, দীর্ঘজীবী হয়, মানুষ হয়। আমি বলছি তোমাকে, এতেই ভগবান সত্যিকারের প্রসন্ন হবেন। তোমার ছেলেও দুদিন পরে ঠিক তোমাকে চিঠি লিখবে। তোমার ছেলে বেঁচে আছে, কাজ করছে, তবে আর তোমার দুঃখ কিসের মা ?

দুটি জ্বালাধরা শুষ্ক চোখের স্থিরদৃষ্টি এতক্ষণ সাধু জোসিমাকে নীরবে অনুসরণ করছিল। যুবতী, চাষীর মেয়ে, রুক্ষ ক্ষয়রোগীর মতো চেহারা। সাধুর সামনে যেতে ভয়, দাঁড়িয়ে আছে নীরবে।

কী মা ? কী হয়েছে তোমার ?

সাধুর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃদু গলায় মেয়েটি বললে,—প্রভু ! আমার প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে হবে ? যে পাপ আমি করেছি, সেই পাপ যে দিনরাত্তির আমাকে ভয় দেখায়।

সিঁড়ির ধাপে সাধু জোসিমা বসে পড়লেন। মেয়েটি তাঁর গা ঘেঁষে মৃদু গলায় বলতে লাগল। বলতে শুরু করেই হঠাৎ যেন কোন্ আতঙ্কে কেঁপে উঠল তার দেহ, —গত তিন বছর হোলো আমি বিধবা হয়েছি। বড়ো যন্ত্রণার ছিল আমার বিবাহিত জীবন। বয়সে ছিল আমার থেকে অনেক বড়ো,—মারত আমাকে, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিত প্রতি দিনরাত। একবার অসুখে পড়ল। আমি সেবা করতাম, আর মনে মনে ভাবতাম, রোগ সারলেই আবার উঠে দাঁড়াবে, আবার জঘন্য নিপীড়ন শুরু করবে আমার ওপর। এমনি করে একদিন পাপবুদ্ধি আমার মাথায় এল…

জোসিমা তাড়াতাড়ি মেয়েটির ঠোঁটের ওপর একটি আঙুল স্পর্শ করলেন, বললেন,—আস্তে !

মেয়েটি খুব চুপি চুপি কথা বলতে লাগল মঠবৃদ্ধের কানে কানে। কথা শেষ হতে বেশি সময় লাগল না।

জোসিমা এবার শুধোলেন,—তিন বছর আগে ?

হ্যাঁ, তিন বছর ! প্রথমটা ভাবতামই না। কিন্তু তারপর নিজে রোগে পড়লাম রোগ তো নয়, দুঃস্বপ্ন। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে এখন আর মুক্তি নেই !

কতোদূর থেকে তুমি আসছ মা ?

তিনশো মাইলেরো বেশি।

এ পাপ কি তুমি কোনো ধর্মযাজকের কাছে কখনো স্বীকার করেছ ?

দুবার করেছি, তবু মুক্তি পাইনি। এখন মরতেও যে আমার ভয় করে প্রভু !

ভয় কোরো না মা, স্নেহগম্ভীর কণ্ঠে জোসিমা বললেন,—ভয় কিসের ? শুধু অনুতাপ করো। অনুতাপের অশ্রুজলে সব পাপ ধুয়ে যাবে, ঈশ্বর তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন। এমন কোনো পাপ এই ঈশ্বরের পৃথিবীতে নেই মা, প্রকৃত অনুতাপে যে পাপের মার্জনা নেই। এত বড়ো কোন্ পাপ মানুষে করতে পারে বলতো, যে পাপ ঈশ্বরের ভালোবাসার চাইতেও বড়ো ?

ঈশ্বর তোমাকে তোমার পাপ সত্ত্বেও ভালোবাসেন। শুধু প্রতি মুহূর্ত ধরে অনুতাপ করো, কিন্তু ভয় কোরো না একবিন্দু। একটি বিশ্বাস মনে রেখো যে একজন প্রকৃত অনুতাপী পাপীর পুণ্য দশজন পুণ্যাত্মার চেয়েও অনেক বেশি। মানুষকে বিশ্বাস কোরো, প্রাণভরে ভালোবেসো, কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ মনে রেখো না।

যে একলা মানুষটাকে ভালোবাসতে পারোনি, সেই মৃত স্বামীর অত্যাচারের কথা ভেবে বিন্দুমাত্র গ্লানি রেখো না মনে। অনুতাপ করলেই যে ভালোবাসতে হবে মা, আর ভালো যদি বাসো, ঈশ্বর তোমাকে ভালো না বেসে যাবেন কোথায় ? প্রেম এমনই জিনিস, তাতে যে শুধু তোমার পাপ ঘোচে তাই নয়, সারা পৃথিবীর পাপ তার স্পর্শে অকলঙ্ক হয়ে যায়।

মেয়েটির অঙ্গে জোসিমা তিনবার ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ করলেন, নিজের গলা থেকে একটি কবচ খুলে নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলেন। মেয়েটি বাক্যহারা হয়ে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়াতে এবার জোসিমার চোখ পড়ল আর একটি কৃষাণ বধূর ওপর। স্বাস্থ্যবতী তরুণী মাতা, কোলে কয়েক মাসের সন্তান।

হাসিতে ভরে গেল জোসিমার মুখমণ্ডল, বললেন,—কীগো ? তুমি কোথা থেকে ?

ভিসেগোরী থেকে আসছি বাবা।

অ্যাঁ ! এতোবড় একটা দামাল মেয়ে কোলে নিয়ে পাঁচ মাইল হেঁটেছ ! কেন ? তোমার আবার কী হোলো ?

কী আবার হবে ঠাকুর ? আমি শুধু আপনার দর্শন পেতে এসেছি। আগেও আপনার কাছে এসেছিলাম, আমাকে আপনার মনে নেই ? লোকমুখে শুনলাম, আপনার নাকি খুব অসুখ,—মরনাপন্ন অবস্থা। মন টিকল না, ভাবলাম, যাই নিজের

চোখে দেখে আসি। এই যে দেখলাম আপনি উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, বুকটা জুড়িয়ে গেল আমার। আপনি আরো বিশ বছর বাঁচবেন বাবা, আপনার পরমায়ুর জন্যে কতো লোক প্রার্থনা করে তা কি আপনি জানেন ?

সবাইকে আমার ধন্যবাদ মা।

ভালো কথা ঠাকুর, একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই। এই নিন, ষাটটা কোপেক, আমার জমানো পয়সা। আমার চাইতেও যে গরীব তাকে আপনি কোপেক কটা দান করবেন। আপনার দর্শন যখন মিলল, আমার এই সামান্য দানটুকু আপনার হাত দিয়েই হোক।

বেশ মা, দাও আমার হাতে। তুমি বড়ো ভালো মেয়ে। খুব ভালোবাসি আমি তোমায়। তোমার এই দান আমার হাত দিয়ে হবে এতো আমারই ভাগ্য। তারপর, এটি কে, তোমার মেয়ে ?

হ্যাঁ বাবা, আমার মেয়ে, নাম ওর লিজাভেটা।

মঙ্গল হোক তোমার আর তোমার মেয়ের। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। তুমি এসে বড়ো আনন্দ দিলে মা, খুশীতে মনটা ভরিয়ে দিলে আমার। যাও মা, অনেক পথ যেতে হবে, এবার যাত্রা করো, আর দেরি কোরো না।

হাত বাড়িয়ে কৃষাণী-মা আর তার সন্তানকে প্রসন্ন আশীর্বাদ করলেন ফাদার জোসিমা।

চার

চাষীর মেয়েদের সঙ্গে জোসিমার আন্তরিক মেলামেশার দৃশ্য দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন মহিলা ভাবাবেগে বারে বারে চোখের জল মুছছিলেন। ইনি মাদাম হোলাকভ। জোসিমা তাঁর কাছে যেতেই তিনি উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন,—কী যে আমার প্রাণে হচ্ছে এই দৃশ্য দেখে, মুখে তা আমি বলতে পারিনে ফাদার ! সারা মন-প্রাণ দিয়ে শুধু অনুভব করি, কী অপার করুণা আপনার মানুষের প্রতি, আর আপনার প্রতি মানুষের কী অচঞ্চল শ্রদ্ধা !

জোসিমা উত্তরে শুধু বললেন, -আমায় কিছু বলবে ! মেয়ে কেমন আছে তোমার ?

মেয়ের কথা বলতেই তো এসেছি, ভদ্রমহিলা বললেন,—আর এসেছি আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে। যদি আপনার সঙ্গে আজ দেখা না হোতো, সারাদিন আপনার ঘরের জানলার ধারে বসে থাকতাম এক মুহূর্তের দর্শন লাভের আশায়। গত বৃহস্পতিবার আপনি আমার মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে লিজা সেরে উঠেছে একেবারে।

কই সেরেছে ? এখনো তো দেখছি চেয়ারে বসিয়ে রাখতে হয়।

না ফাদার, অনেক সেরেছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে আর জ্বর হয় না। রাত্রে ভালো ঘুম হয়। আগে সারাদিন কাঁদত, এখন নতুন আলো ফুটেছে চোখে, গালে

লেগেছে রঙ। পায়ের জোর পাচ্ছে আগের চেয়ে, বলে আর দিন পনেরো পরেই নাচে শুরু করবে আবার। আপনার এই ক্ষমতায় বড়ো বড়ো ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে। আয় লিজা, ফাদারকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দে।

চেয়ারের ওপর খাড়া হয়ে বসে গম্ভীর মুখে হাত জোড় করে জোসিমাকে অভিবাদন করল মেয়েটি। পরমুহূর্তেই হাসি ঝিলকিয়ে উঠল তার চোখে-মুখে, আলিওশার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে,—মা, এই তো সেই!

আলিওশার সামনে করমর্দনের জন্যে দামী দস্তানা ঢাকা হাতটা বাড়িয়ে মহিলা বললেন,—আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, কেমন আছ তুমি? আমার মেয়ে তোমার জন্যে একটা চিঠি এনেছে।

মঠবন্ধু সপ্রশ্ন চোখে আলেক্সির মুখের দিকে তাকালেন। মায়ের সঙ্গে করমর্দন সেরে সে আড়ষ্ট পায়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে ডান হাতটি বাড়াল।

মুখটা গম্ভীর করল লিজা। তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললে,—কাটেরিনা আইভানোভ্না বলেছেন যতো শীঘ্র সম্ভব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অনুরোধ অন্যথা করলে চলবে না।

বিস্মিত মুখে আলিওশা বললে,—আমাকে দেখা করতে বলেছেন? আমি! আমাকে কী দরকার?

তাড়াতাড়ি মা বললেন,—ব্যাপারটা ডিমিত্রি ফিয়োডোরোভিচকে নিয়ে। তবে ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কেন তা জানিনে, তবে এত অনুরোধ যখন করেছে তখন তোমার গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করাটা কর্তব্য বইকি।

বিভ্রান্ত কণ্ঠে আলিওশা বললে,—কিন্তু আমি তো তাঁকে একবার মাত্র দেখেছি!

কী চমৎকার মেয়ে! কতো বড়ো মন! কিন্তু কী কষ্ট পেল, কতো সহ্য করল! ভগবান জানেন, আরো কতো দুঃখ বেচারীর কপালে লেখা আছে!

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে আলিওশা তাড়াতাড়ি বললে,—বেশ তো, যাব আমি। বলবেন, দেরি করব না মোটেই।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লিজা,—ঠিক তো! মা, বলিনি আমি, ঠিক যাবেন। জানি আমি খুব ভালো লোক আপনি। আজ মুখোমুখি বলেই ফেললাম।

মা খুশী মুখে বললেন,—থাম্ এবার। হ্যাঁ বাবা আলেক্সি, লিজা আমাকে কতোবার বলে তোমার কথা, কিন্তু আমাদের বাড়ি তুমি তো মোটেই আসো না। একেবারে ভুলে গেছ আমাদের, তাই না?

একটু লাল হয়ে উঠল আলিওশা। মৃদু সলজ্জ হাসি। জোসিমার দৃষ্টি আর তার ওপর ছিল না, লিজার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে দূরাগত এক তীর্থযাত্রী সাধুর সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। সাধুটি এসেছে বহুদূরের উত্তর দেশের এক ক্ষুদ্র মঠ থেকে তাঁকে দেখতে।

সাধু লিজাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—এমনি দুরারোগ্য ব্যাধি সারাবার ক্ষমতা কী করে আপনি পেয়েছেন?

জোসিমা বললেন,—সারেনি তো এখনো। একটু আরাম বোধ করছে কেবল। নানা কারণে তা সম্ভব। একেবারে সারানো কি আমার ক্ষমতা ভাই? সে ক্ষমতা ঈশ্বরের। আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আমার বাসায় বিশ্রাম নেবেন। কথা বলব তখন আপনার সঙ্গে, কেমন? আর কদিনই বা বলব,—শরীর অসুস্থ, দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে।

কে বললে? মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন,—ভগবান এতো শীঘ্র কিছুতেই আপনাকে আমাদের কাছ থেকে টেনে নেবেন না। আরো অনেক, অনেক বছর আপনি বাঁচবেন। আর, কে বলেছে আপনার অসুখ? চেহারাতে খারাপ স্বাস্থ্যের কোনো লক্ষণ আপনার নেই। আপনাকে খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে ফাদার!

ঠিক বলেছ মা, আজ আমি খুব ভালো আছি। কিন্তু এটা সাময়িক, আমার কি রোগ তা আমি জানি। তবে হ্যাঁ, আজ আমি হাসিতে আছি, আনন্দে আছি—বড়ো খুশী হলাম একথা তোমার মুখে শুনে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান আনন্দ। পরিপূর্ণ আনন্দের যে অধিকারী, সেই অধিকারী একথা বলবার,—প্রভু, আমার জীবনে তোমারই প্রকাশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধু মহাপুরুষরা ছিলেন এই আনন্দের অধিকারী।

মহিলাটি বলে উঠলেন,—কতো উঁচু কথা, কতো আশ্বাসের কথা আপনি বল্লেন ফাদার। আপনার মুখের এক একটি কথা মর্মে গিয়ে বেঁধে। কিন্তু আমার মনে আনন্দ কোথায়? তার এক কণার আস্বাদও যে পাইনে। আজ যখন আবার আপনার দর্শন পেলাম তখন একটা কথা বলি আপনাকে। একথা সেদিন বলতে সাহস পাইনি। বড়ো অসুখী আমি, যন্ত্রণার আমার শেষ নেই।

কথাগুলি বলে মহিলা দুহাত জোড় করে তুলে ধরলেন জোসিমার দিকে।

জোসিমা শুধোলেন,—কিসের যন্ত্রণা তোমার?

যন্ত্রণা অবিশ্বাসের।

অবিশ্বাস? ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না তুমি?

না প্রভু, তা নয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন, পরলোক—এ সবই আমার মনে ধাঁধা লাগায়। মনে হয়, এ রহস্যের কোনো সমাধান নেই। শুনুন আপনি, আপনি বৈদ্যরাজ, ব্যাধি আপনি সারান। মানুষের আত্মার আপনি গভীর তত্ত্বজ্ঞ, আমার কথা আপনি বুঝবেন। মৃত্যুর পরে পরলোক যদি থাকে, সেই পরলোকের কথা ভেবে আমি ভয় পাই, অন্তর আমার শিউরে ওঠে। কাউকে একথা মুখ ফুটে বলতে আমি পারিনি। বলুন আপনি,—এই স্বীকারোক্তি শুনে আপনি আমাকে কী ভাবলেন?

দুহাত জোড় করে মহিলা ব্যাকুল নয়নে তাকালেন ফাদারের দিকে।

জোসিমা বললেন,—তোমার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা তা ভাববার তোমার দরকার নেই। তুমি যে সত্যিই কষ্ট পাচ্ছ, তা আমি বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদ ফাদার, ধন্যবাদ। দেখুন, কতো সময় আমি চোখ বন্ধ করে ভাবি,

অবিশ্বাসী আমি একলাই, আর কেউ তো নয়। ওদের বিশ্বাসের উৎস কোথায়? অনেকে বলে, ভয় থেকেই বিশ্বাসের জন্ম, প্রকৃতির ভয়ালতা দেখে মানুষ নিতান্ত ভয়ে ভয়েই বিশ্বাসকে সহজ বলে মেনে নিয়েছে। এতে আমার মন ভরে না,—সারা জীবন বিশ্বাস করলাম, কিন্তু মৃত্যুর পর পড়ে রইলাম আমি কবরের অন্ধকারে, আর আমার সারা জীবনের বিশ্বাস হারিয়ে গেল কোথায়! আমি শিশু নই, পাখি-পড়া অভ্যাসের মতো বিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখতে পারিনে। আমি চাই সত্য, আমি চাই বৈজ্ঞানিক উত্তর। যারা বিশ্বাস করে বলে, তাদের কাছে আমি ভাবালুতাই পেয়েছি, তা নিয়ে তারা খুশী। কিন্তু আমার শুষ্ক প্রাণে ভাবালুতা নেই ফাদার, আমার প্রশ্ন পাষাণের ভার হয়ে বসে থাকে বুকের ওপর।

ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তুমি পাবে না। যুক্তি দিয়ে পাবে না, যদি পাও বিশ্বাস দিয়েই পাবে।

কী করে পাবো?

প্রেমের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে। শুধু মুখেই ভালোবাসা নয়, নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারিক ভালোবাসা। এই ভালোবাসা যতো বাড়বে, ততোই তোমার ঈশ্বরোপলব্ধিও বাড়বে,— তোমার আত্মা যে অবিনশ্বর, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু নেই— এই সত্য ততোই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে তোমার মনে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নিষ্কামভাবে যেদিন পরকে ভালোবাসতে পারবে, সেদিন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই সামান্য দ্বন্দ্ব আর তোমার মনে ঠাঁই পাবে না।

তাহলে আর একটা কথা বলি ফাদার। মানুষের প্রতি ভালোবাসায় আমার সারা মন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এই ভালোবাসার, জন্যে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে, এক এক সময় মনে হয় আমার যা আছে সবকিছু বিলিয়ে দিই, এই মেয়েটাকে পর্যন্ত ছেড়ে বৈরাগিনী হয়ে পথে বার হয়ে পড়ি। চোখ বুজে সেই ব্যাকুলতা যখন আমি অনুভব করি, সেই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের স্বপ্ন আমি দেখি,—তখনই শক্তিতে সাহসে আবার বুক ভরে যায়। তখন মনে হয়, কীসের অবিশ্বাস, কীসের বাধা-বেদনা? মনে হয়, আমি সব ছেড়ে সেবিকা হয়ে বার হয়ে যাব। যারা পীড়িত, যারা রোগাক্রান্ত, নিজে হাতে শুশ্রূষা করব তাদের, চুম্বন করব আমি তাদের ক্ষতে।

জোসিমা মৃদু হাসলেন, বললেন,—অন্য কিছু স্বপ্ন না দেখে এমনি শুভস্বপ্ন যে তুমি দ্যাখো, এও ভালো। স্বপ্ন দেখতে দেখতে হয়তো কোন্ দিন সত্যিই তুমি কোনো একটা মহৎ কাজের প্রেরণা পাবে।

মহিলাটি চুপ করলেন না। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চললেন,—কিন্তু ঐ সেবিকার জীবনেই বা কতোদিন আমি তৃপ্তি পাব? এই তো আমার সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে যন্ত্রণার প্রশ্ন। সংশয় আমার ঘোচে না। দুচোখ বন্ধ করে আমি মনে মনে নিজেকে বলি,—বেশ তো, যাও না। কিন্তু ওপথে কতোদিন তোমার নিষ্ঠা থাকবে? যে রোগীর দুর্গন্ধিত ক্ষতের পরিচর্যা তুমি করবে, সে যদি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, তোমার পরোপকারের মূল্য সে যদি না দ্যায়, উল্টে তোমার দুর্নাম যদি সে করে?

এই তো পৃথিবীর নিয়ম! তাই না? তাহলে, কতোদিন থাকবে তোমার ভালোবাসা, তোমার পরোপকারবৃত্তি? আসলে ফাদার, প্রেমের বৃত্তিতেও আমার মনটা ভাড়া-করা চাকরের মতো। হাতে হাতে আমি দাম চাই, সে দাম স্বীকৃতি, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা। মূল্য যদি না পাই, তাহলে ভালোবাসতেও আমি পারিনে।

উত্তেজনায় মহিলাটির কণ্ঠ আর সারা শরীর তখন কাঁপছে। নির্লজ্জ আত্ম-উন্মোচনের এ উত্তেজনা।

শান্ত গলায় জোসিমা বললেন,—তোমার কথা শুনে আমার একটি ডাক্তারের কথা মনে পড়ছে। লোকটির যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিল খুব। তোমারই মতো এমনি অকপটে সে আমায় বলেছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত মানবসমাজের মঙ্গলের জন্যে অন্তরজোড়া তার ব্যাকুলতা, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অসহ্য লাগে তার প্রত্যেক লোককে,—কাছের মানুষকে তার যতো অসহ্য লাগে, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে দূরের সমস্ত মানবজাতির প্রতি প্রেমে তার মন ততো উদ্বেল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ফাদার, সত্যিই এমনি যার হয়, সে করে কী? তার কি কোনো আশাই নেই?

কে বললে নেই? প্রেমের স্বপ্নের দামও কি কম! স্বপ্নের মধ্যে ফাঁকি আছে, কিন্তু এই ফাঁকিকে যদি তুমি এতো স্পষ্ট করে বুঝতে পেরে থাকো, সেই অভিজ্ঞানই সত্যের পথে তোমাকে টানবে। আর শুধু স্বীকারোক্তির তৃপ্তিতেই যদি স্বীকারোক্তি করো, আমার কাছে আত্ম সমালোচনা করার সুখটুকুই যদি কেবল পাও, তাহলে কিছুই হবে না, স্বপ্ন নিয়েই থাকবে। ছায়া নিয়েই জীবন কাটবে, প্রকৃত চরিতার্থতার সন্ধান কখনো পাবে না।

ফাঁকি নেই আপনার কাছে। আপনার চোখে আমার সব কিছু ধরা পড়ে গেছে ফাদার। আপনার কথায় বুঝতে পেরেছি, আত্ম-সমালোচনার তৃপ্তিই আমার মোহ। নিজেকে ছোট করেই আমি সুখ পাই, দৈন্য ঘোষণা করেই আমার গর্ব।

বেশ তো, কিন্তু সত্যিই যদি ওর চেয়ে আরো বড়ো সুখ, বড়ো গৌরব মনে-প্রাণে চাও তার পথ তো বন্ধ নেই। মিথ্যার আশ্রয় কখনো নিয়ো না, অন্তত নিজের প্রতি মিথ্যাচার কখনো কোরো না। নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না, অপরকেও না। নিচু কোরো না কাউকে, নিজেকেও না। ভয় পেয়ো না কাউকে, সাহস রাখো নিজের ওপর। পরানুরক্তির যে স্বপ্ন তুমি দ্যাখো, সে স্বপ্ন বড়ো মধুর। প্রকৃত আত্মত্যাগের পথ কিন্তু বড়ো কঠোর। কল্পিত পরোপকার কল্পিত মূল্যও খোঁজে। কিন্তু প্রকৃত পরোপকারের কোনো প্রতিদান নেই,—তা শুধু নিষ্কাম নির্লিপ্ত আত্মদান। সেই আত্মদানের পথে যদি এগোতে পারো, তাহলে আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, অলক্ষ্যে থেকে ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবেন। আচ্ছা, এবার আমি চলি? আরো অনেকে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

ভদ্রমহিলা নতজানু হয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন। এবার বললেন,—আশীর্বাদ করুন, আমার লিজাকে একটু আশীর্বাদ করে যান।

বড় হয়ে গেছে! কৌতুক হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন,—ভারি দুষ্টু মেয়েটা। একটুও ভালোবাসিনে। সমানে দুষ্টুমি করছিলে আর আলেক্সিকে জ্বালাচ্ছিলে—দেখিনি বুঝি আমি?

সত্যিই লিজা এতোক্ষণ সমানে আলিওশাকে নিয়ে মজা করছিল। একদৃষ্টে আলিওশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এই ছিল তার খেলা। আলিওশা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে, লিজার চোখে চোখ পড়লেই সে লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক আকর্ষণে লিজার দিকে একটু তাকাতেই লিজার চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছিল তার দৃষ্টি, লিজার মুখের বিজয়িনী হাসিতে আরো লজ্জা পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বেচারী একেবারে জোসিমার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু লিজার দৃষ্টি থেকে তার অব্যাহতি নেই। লিজার দিকে মুখ ফিরিয়েই দেখে, একেবারে চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে লিজা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই খিলখিল করে হেসে উঠল লিজা। জোসিমাও চোখ পাকিয়ে বললেন,—কেন ও বেচারীকে তুমি ঠাট্টা করছ? দুষ্টু মেয়ে!

হঠাৎ লিজা গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ নিচু করে আরক্ত মুখে অভিমান ভরে বললে,—ও কেন কথা বলছে না আমার সঙ্গে? কেন ভুলে গেছে আমাকে? ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে কতো খেলেছি, কতো বন্ধু ছিলাম দুজনে। দুবছর আগে ও যখন চলে যায় তখন বলেছিল, কখনো আমাকে ভুলবে না, জীবনে না। আর আজ আমাকে চিনতেই পারে না, না? কেন, আমি কি খেয়ে ফেলব ওকে? আমার কাছে এলে, আমার সঙ্গে কথা বললে ওর জাত যায়? কেন আমাদের বাড়ি আসে না? আপনি মানা করেননি আমি জানি। কেননা সব জায়গায় ও যায়, খালি আমাদের বাড়ি ছাড়া। মুখ ফুটে কেমন করে আমি ডাকব? ভুলে যাওয়া যে সহজ নয় তা নিজে বোঝো না? ইঃ, এখন সাধু হয়েছেন, সন্ন্যাসির জোব্বা চড়িয়েছেন গায়ে। ঐ ঝলঝলে জোব্বা পরে দৌড়ুক না একবার, কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখি।

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল লিজা। জোসিমা কথা শুনছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর ডান হাতটা চুম্বন করতে গিয়ে লিজা হঠাৎ হাতটা চেপে ধরল তার দুচোখের ওপর। আর হাসি নেই, অশ্রুতে ভিজিয়ে দিল বৃদ্ধের হাত। অস্ফুটস্বরে বললে,—আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না ফাদার। আমি বোকা মেয়ে, কোনো গুণ নেই আমার। আমার সঙ্গে দেখা করতে না চেয়ে, আমাকে এড়িয়ে ঠিকই করেছে আলিওশা।

বৃদ্ধ বললেন,—না গো না। আমি ঠিক ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। দেরি হবে না, দেখো।

পাঁচ

আপন প্রকোষ্ঠের বাইরে মঠবৃদ্ধের কাটল প্রায় আধঘণ্টা। সাড়ে বারোটা বেজেছে, কিন্তু যার জন্যে আজকের এই বৈঠক, সেই ডিমিট্রিরই দেখা নেই। সে কথা খেয়ালও যেন নেই কারুর। ঘরে ফিরে জোসিমা দেখলেন, জোর তর্কবিতর্ক চলেছে। সবচেয়ে বেশি কথা বলছে আইভান আর সাধু দুজন। মিউসভও আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করছেন, তবে তাঁকে কেউ আমল দিচ্ছে না, এতে তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হচ্ছে। এর পূর্বেও আইভানের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আইভানের সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যভাব অসহ্য লেগেছে তাঁর। মনে মনে তিনি বলেছেন,—সারা ইয়ুরোপের প্রগতিবাদী বলতে যাদের বোঝায়, তাদের সামনের দলে এতোদিন থেকেছি আমি, আর এ যুগের ছেলেরা কিনা আমাকে গ্রাহ্যই করে না।

ফিয়োডোর পাভলোভিচের ওপর নির্দেশ ছিল শান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকবার। চুপ করেই সে ছিল খানিকক্ষণ। মিউসভের অবস্থা দেখে মজা লাগছিল তার,—ভাবছিল কী করে তাঁকে আরো জব্দ করা যায়। প্রতিশোধ নেবার সুযোগের অপব্যবহার করল না সে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে মিউসভের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে,—সাধুবাবাকে সেলাম ঠুকেই তুমি সরে পড়লেই তো পারতে বাপু! তাহলে আমাদের মতো এইসব ছোটলোকদের সঙ্গসুখটা আর ভোগ করতে হোতো না। কিন্তু যাবে কী করে? একবার সুযোগ যখন পেয়েছ তখন বসে বসে বিদ্যে জাহির না করলে চলবে কেন?

ইস্, তুমিও বকতে শুরু করলে? এই, এই আমি চললাম।

আরে পাগল, গেলেই হোলো? তুমি যাবে সবাইকার শেষে।

রাগে জ্বলে উঠলেন মিউসভ, কিন্তু সুবিধেমতো একটা উত্তর দেওয়া হয়ে উঠল না। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন ফাদার জোসিমা।

আলোচনা মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। বৃদ্ধ তাঁর আসনে বসে সকৌতুক হৃদ্যতায় সকলের দিকে তাকালেন। ক্লান্তি তাঁর রক্তহীন মুখে পরিস্ফুট, কিন্তু তিনি চান না যে সভা ভাঙুক, আলোচনা বন্ধ হোক। কী উদ্দেশ্য তাঁর। ভাবল আলিওশা।

গ্রন্থাগারিক ফাদার ইয়োসিফ বললেন আইভানকে নির্দেশ করে,—আমরা এই ভদ্রলোকের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম ফাদার। ইনি অনেক নতুন কথা বলেছেন। ধর্মযাজক-পরিচালিত বিচারালয় ও বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঁর প্রবন্ধ। আসলে ধর্মযাজক সম্প্রদায়েরই একজনের রচিত একটি বইএর সমালোচনা প্রসঙ্গে ইনি এটি লিখেছেন।

আইভানের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জোসিমা বললেন,—তোমার প্রবন্ধটির কথা আমি শুনেছি, আমি দুঃখিত যে ওটি পড়ে উঠতে পারিনি এখনো। বলো, তোমার প্রবন্ধের কী বিষয়বস্তু?

আশঙ্কার তার ছিল, আইভানের উত্তরে হয়তো দম্ভ কিংবা বিদ্রুপ প্রকাশ পাবে। আইভান কিন্তু যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে সপ্রতিভতা নিশ্চয় মঠবৃন্দের কথায় উত্তর দিল। সে বললে,—আমি প্রথমেই এই কথা বলতে চেয়েছি যে রাষ্ট্র আর ধর্ম, এদের মধ্যে কে বড়ো, কার অধিকার অপরের চেয়ে বেশি—এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের কোনো নিষ্পত্তি কখনো হবে না,—এই দুইএর মধ্যে আপস মীমাংসারও কোনো প্রকৃত পথ নেই। আমার বিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি নিজে একজন ধর্মযাজক,—তিনি লিখেছেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে গির্জার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। আমি বলেছি যে,—না, সমস্ত রাষ্ট্রেরই আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন গির্জার আওতায়, রাষ্ট্রের মধ্যে গির্জা আশ্রয় পাবে, সে আবার কী কথা? আমার কথা যে খৃষ্টীয় সমাজের এই একটি আদর্শ হওয়া উচিত, কী করে সমগ্র রাষ্ট্রকে সে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে।

পণ্ডিত ও গম্ভীরদর্শন সাধু পাইসি মাথা নেড়ে বললেন,—ঠিক, ঠিক, খুবই সত্যি কথা।

মিউসভ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এসব কথায়। বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি,—বাঃ, এর মানে তো পোপের জয় জয়কার!

তাঁর এই মন্তব্যে কান না দিয়ে ফাদার ইয়োসিফ বললেন,—ধর্মযাজকের বক্তব্য শুনুন ফাদার। তাঁর প্রথম কথা হোলো, জনগণের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রেরই, এর মধ্যে আর কোনো প্রতিষ্ঠানের মাথা গলানো উচিত নয়। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হোলো, ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোনো প্রকার আইন বা বিচার-ব্যবস্থায় গির্জার কোনো অধিকার নেই। তার কারণ, গির্জা হচ্ছে মূলত ধর্মপ্রতিষ্ঠান, অবিশ্বাসীকে ধর্মজীবনে প্রবুদ্ধ করাই তার একমাত্র ব্রত। ভদ্রলোকের তৃতীয় বক্তব্য হোলো, খৃষ্টীয় রাজ্য এ পৃথিবীর রাজ্য নয়, তার প্রতিষ্ঠা ইহলোকের ওপারে।

ফাদার পাইসি বললেন,—ছি ছি! যাজক-সম্প্রদায়ের লোক যিনি নিজে, তাঁর এমনি অর্থহীন বাগাড়ম্বর! আইভানের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে চললেন,—আপনি ঐ যে বইটির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, সে বইটি আমি পড়েছি। খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য এ পৃথিবীর নয়, এ কথা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি আমি। খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য যদি এই পৃথিবীর না হয়, তাহলে এ পৃথিবীতে খৃষ্টেরই-বা স্থান কোথায়? যিশুখৃষ্ট এই পৃথিবীতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন—খৃষ্টীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। স্বর্গরাজ্য এ পৃথিবীর নয় সত্য, স্বর্গেই তা আছে। কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পথ এই পৃথিবীর খৃষ্টীয় রাজ্যের মধ্যে দিয়েই। গির্জা কেবল মন্দির নয়, প্রতিষ্ঠান—এ এক রাজ্য, যে রাজ্য তার সীমানার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে একদিন টেনে নেবে, এই ঈশ্বরের বিধান।

হঠাৎ নিজের উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করলেন ফাদার পাইসি। মঠবাসী সাধুদের কথা নিস্তব্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে আইভান এতোক্ষণ শুনছিল। এবার সে ক্লান্ত কণ্ঠে ফাদার জোসিমাকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করল,—আমার প্রবন্ধে আমি এই কথা বলেছি

কাদার যে খৃষ্টের আবির্ভাবের পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে ধর্ম শুধু গির্জাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবিশ্বাসী রোমক সাম্রাজ্য প্রথম যখন খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করে তখন তার অখৃষ্টীয় রাষ্ট্রের মধ্যে গির্জাকে সে স্থান দেয় মাত্র। রাষ্ট্রের অন্য সমস্ত বিভাগে খৃষ্টধর্মের কোনো স্পর্শ ছিল না। সে যুগের রোমক সাম্রাজ্যের সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে খৃষ্টধর্মের প্রভাব পড়েনি। রাষ্ট্রব্যবস্থায় অখৃষ্টীয় ধ্যানধারণার প্রভাব ছিল পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম কিন্তু অখৃষ্টীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে- সুলভ স্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট হয়নি—তার পথ তার আদর্শ ঈশ্বর-নির্দিষ্ট—সেই পথেই সে চলেছে—সেই পথ বিশ্ববিজয়ের পথ। রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম তার নিজের নির্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই লক্ষ্য ধর্মের পূর্ণ আদর্শের বিরোধী। সমগ্র রাষ্ট্রকে ধর্ম টেনে আনবে তার আশ্রয়ে। রাষ্ট্রই রূপান্তরিত হবে ধর্মরাষ্ট্রে। তাতেই ধর্মের চরম সংকল্পের পূরণ, তাতেই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

ফাদার পাইসি বললেন,—ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনি মতবাদ খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল যে গির্জা পরিবর্তিত হবে রাষ্ট্রে—এই পরিবর্তনকে বলা হোতো নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তন। রাষ্ট্রের মধ্যেই ধর্ম নিজেকে বিলীন করবে,—তাতেই প্রতিষ্ঠিত হবে যুগধর্ম, তাতেই বিজ্ঞানের আর সভ্যতার পথ সুগম হবে। গির্জা যদি এই আত্মবিলোপকে স্বীকার না করে, তাহলে রাষ্ট্রের মধ্যে আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রেরই তত্ত্বাবধানে তার খণ্ডিত অস্তিত্বকে বজায় রাখা হবে। আধুনিক ইয়ুরোপের সমস্ত রাষ্ট্রেই এই মতের প্রাবল্য—কেবল আমাদের এই রুশিয়া ছাড়া। এখানে আমরা বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রই আশ্রয় পাবে গির্জায়, নিজেকে খৃষ্টীয় ধর্মের উপযোগী করে নিয়ে। তাই হোক, সার্থক হোক আমাদের এই বিশ্বাস।

বাঁকা হাসি হেসে হাঁটুর ওপর এক পা তুলে মিউসভ বললেন,—যাক, আপনাদের কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম। আপনাদের আদর্শ আর স্বপ্নে খুব বেশি তফাত নেই, যে স্বপ্ন কখনো ফলবে না। যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, কূটনীতি থাকবে না, ব্যাঙ্ক থাকবে না, থাকবে শুধু সোশ্যালিজম—এই জাতীয় ইয়ুরোপীয় স্বপ্ন আর কি? আপনারা যে এখুনি রাষ্ট্রের হাত থেকে তার ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অপরাধীদের কাউকে বেত, কাউকে জেল, কাউকে ফাঁসি দিতে শুরু করছেন না—এইটুকু জেনেই আমার অশান্তি ঘুচল।

দ্বিধাবিহীন কণ্ঠে আইভান উত্তর দিল,—রাষ্ট্রের বিচারশালা যদি না থাকে, অপরাধীর বিচারের ভার যদি থাকে শুধু ধর্মসম্প্রদায়েরই হাতে, তাহলে লোককে জেলে পুরবার আর ফাঁসিতে ঝুলোবার দরকারই হবে না। অপরাধ বদলাবে, বদলাবে অপরাধের প্রতি বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী। একদিনেই অবশ্য নয়, তবে আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই।

সত্যি বলছ? মিউসভ শুধোলেন,—রহস্য করছ না তো?

রাষ্ট্র যে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আইভান বলে চলল,—সেই সমাজ যদি একান্তভাবে ধর্মসমাজে রূপান্তরিত হোতো, তাহলে অপরাধীদের মাথা কাটবার দরকার

হোতো না, সে অপাঙ্‌ক্তেয় হোতো সেই সমাজের চোখে যে সমাজ ধর্মসমাজ। আবার ধর্মসমাজই তাকে শোধন করে নিয়ে নিজের কোলে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব নিত। রাষ্ট্র যান্ত্রিকভাবে শাসন করে মাত্র, অপরাধীর পাপস্খালনের দিকে তার লক্ষ্য নেই।

মিউসভ বললেন,—স্বপ্ন যা বলছ তা অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

এতোক্ষণে কথা বললেন মঠবন্ধু জোসিমা। মিউসভের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন,—

স্বপ্ন কেন বলছেন? এই তো সত্য। যিশুখৃষ্টের ধর্মানুশাসন যদি আজ না থাকত তাহলে কোথায় থাকত পাপের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংযম, কে দিত অপরাধীর প্রকৃত শাস্তি? পাপের বিরুদ্ধে সংযমের নির্দেশ রাষ্ট্রের অনুশাসনে নেই, রাষ্ট্রের সাজা অপরাধীর মনকে শিক্ষিত করে না, শুধু বিষাক্তই করে তোলে। যে শাস্তি অপরাধীর বিবেককে স্পর্শ করে না, সে শাস্তি শাস্তিই নয়।

আর একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলুন ফাদার,—মিউসভ বললেন।

কেন? এই দেখুন না, কঠোর শাস্তি বলতে আমরা বুঝি বেত্রাঘাত কিংবা সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস। এমনি ধরনের কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করেও অপরাধীকে সংশোধন করা যায় না, নিবৃত্ত করা যায় না অপরাধ। অপরাধীর সংখ্যাও বেড়েই চলে। একজন অপরাধীকে সমাজ থেকে বহির্ভূত করার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় দুজন নতুন অপরাধী এসে দাঁড়ায়। এ যুগেও কখনো যদি কোনো অপরাধী আত্মসচেতন হয়, আত্মদোষ স্খালন করে, সংস্কার করে আপন চরিত্রকে,—তা সে করে ধর্মেরই অনুশাসনে, বিবেকেরই নির্দেশে। যদি সে উপলব্ধি করে যে সে খৃষ্টীয় সমাজের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, অমান্য করেছে খৃষ্টের বিধান, তবেই অনুতাপ করে,—রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছে বলে কখনো অনুতপ্ত হয় না সে। পাপী যদি একমাত্র কখনো উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে সে পাপ করেছে, তখনই সে অনুতাপ করে, তখনই সে সংশোধনের পথে পা দেয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধে অন্যায়ের উপলব্ধি নেই, অনুতাপের প্রেরণা নেই। রাষ্ট্রের চোখে যে অপরাধী, ধর্ম তাকে আজ শাস্তি দেয় না, গির্জা তার বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করে না। একবার রাষ্ট্র যাকে শাস্তি দিয়েছে, গির্জা আবার তাকে নতুন করে শাস্তি দেবে কোন্ মুখে? কিন্তু গির্জা যদি তাকে শাস্তি দিত, সে শাস্তি হোতো করুণার দ্বারা অভিষিক্ত, সে শাস্তি দিয়ে রাষ্ট্রীয় সমাজের মতো অপরাধীকে সে পরিত্যাগ করত না, আরো বিষাক্ত আরো দুর্ধর্ষ করে তুলত না তার মনকে,—তার ঐ পাপকলুষ মনকে পবিত্র করে আবার তাকে ফিরিয়ে আনত আপন কোলে। অপরাধী আজ চিন্তা করবার অবসরই পায় না যে সে খৃষ্টান সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই শাস্তিভোগ করেও তার পরিত্রাণ নেই, অবসান নেই তার হতাশার। সমাজও তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখে বিতৃষ্ণার আর ঘৃণার ব্যবধানে। ধর্ম কিন্তু পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে নয়,—যে পাপী সেও ঈশ্বরের সন্তান, তারও অন্তরে ধর্মের স্পর্শ। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মের শাসন যদি প্রবর্তিত হোতো, তাহলে অপরাধী যে উদ্ধার পেত তাই নয়, অপরাধের

সংখ্যাও অনেক হ্রাস পেত। অপরাধের প্রতি ধর্মশাসনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য রকমের হোতো,— অপরাধী পেত আশ্বাস, পীড়িত পেত আশ্রয়, পাপীর মন আপনি খুঁজে নিত আত্ম-সংশোধনের পথ।

শান্ত মৃদু হাসি হেসে জোসিমা বলে চললেন,—একথা ঠিক যে খৃষ্টীয় সমাজ আজ প্রস্তুত নয়, মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধর্মপ্রাণের শক্তিতেই এই সমাজের আশ্রয়। কিন্তু ধার্মিকের অভাব কখনো হবে না, ভিন্ন ভিন্ন অখৃষ্টান সমাজ একদিন একটি মাত্র সর্বশক্তিমান খৃষ্টীয় সমাজে পরিণত হবে,—এ বিশ্বাসও টলবার নয়। তাই হোক, সার্থক হোক এই বিশ্বাস। কবে হবে, কে জানে? ভাবনাই বা কেন তা নিয়ে? সমস্ত ঘটনাঘটনের পিছনে কাজ করে চলেছে ঈশ্বরের লীলা,—যাকে ভাবি দূরে, তিনি হয়তো তাকেই ভাবেন কাছে,—যাকে ভাবি অসম্ভব, তাঁর অদৃশ্য সংকেতে তারই সম্ভাবনার আভাস হয়তো দেখা দিল বলে। পূর্ণ হোক, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ফাদার পাইসিও গভীর শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করলেন,—তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

চাপা বিরক্তিভরে রুদ্ধ কণ্ঠে মিউসভ উচ্চারণ করলেন,—আশ্চর্য!

অতি সাবধানে ফাদার ইয়োসিফ শুধোলেন,—কিসে আপনার এতো আশ্চর্য লাগছে ভাই?

আশ্চর্য লাগবে না? এ যে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! রাষ্ট্র উঠে গেল, রাষ্ট্রের শাসন মিলিয়ে গেল হাওয়ায়, আর তার জায়গায় বসল কিনা গির্জা? সৈন্যের বদলে সাধু? এযে স্বয়ং পোপেরও স্বপ্নের বাইরে!

ফাদার পাইসি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,—আপনি সম্পূর্ণ ভুল করছেন। গির্জা যে রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হবে এ ছিল রোমের স্বপ্ন, এর পিছনে ছিল শয়তানের প্রলোভন। আমাদের আদর্শ তা নয়। আমরা চাই যে রাষ্ট্রই পরিবর্তিত হোক ধর্মরাজ্যে, সেই ধর্মরাজ্য সমস্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাক। এই আদর্শ পোপের কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত, এই আদর্শই আমাদের রুশীয় ধর্মসংস্থার ভিত্তি। এ এক নতুন তারা, এই তারার উদয় হবেই।

নিরুত্তর রইলেন মিউসভ। এই স্তব্ধতার মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন তাঁর আত্মশ্লাঘা। মূক ওষ্ঠের ফাঁকে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি। আলিওশা কম্পিত বক্ষে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল। এই সমস্ত আলোচনা সে গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনছে। একবার সে তাকাল রাকিতিনের দিকে, দরজার পাশে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে সেও আলোচনা শুনছে মনোযোগ দিয়ে। গালদুটো তার লাল হয়ে উঠেছে। আলিওশা বুঝল, রাকিতিনেরও মনে উত্তেজনার শেষ নেই।

আবার মুখ খুললেন মিউসভ। গুরুগম্ভীর চালে শুরু করলেন,—যদি অনুমতি দেন তো একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করি। কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে ডিসেম্বর বিপ্লবের ঠিক ক'দিন পরেই প্যারিসে এক খুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর বাড়িতে চমৎকার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন রাজনৈতিক গুপ্তচর-বিভাগের একজন চাঁই। তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে

আমার খাতির দেখে আমার সঙ্গেও তিনি বেশ অকপটেই কথাবার্তা বলেছিলেন। আশা করি আপনারা জানেন যে আলাপ-আলোচনার ভদ্রতায় ফরাসীরা সব বিদেশীকে হার মানায়। কথা হচ্ছিল সোশ্যালিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে। এ ভদ্রলোক ভারি আশ্চর্য একটা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—দেখুন, সোশ্যালিস্টই বলুন আর বিপ্লবীই বলুন, নাস্তিকই বলুন আর অ্যানার্কিস্টই বলুন,, এদের আমরা ভয় পাইনে। এদের ওপর আমাদের কড়া নজর থাকে, আর কী যে এদের মতিগতি তাও আমাদের অজানা থাকে না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই কতকগুলো অদ্ভুত জাতের লোক আছে—ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করে, ধর্মের নামে তারা পাগল,—আবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সোশ্যালিস্ট। এই লোকগুলোকেই আমাদের সবচেয়ে ভয়। নাস্তিক সোশ্যালিস্টদের চেয়ে ঐ খৃস্টান সোশ্যালিস্টরাই হোলো অনেক বেশি বিপজ্জনক। আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমার ঠিক সেই কথাটাই আজ আবার মনে পড়ল।

সোস্নাস্জি ফাদার পাইসি প্রশ্ন করলেন,—আপনি তাহলে আমাদেরও ঐ জাতের লোক মনে করেন, তাই না? আপনার চোখে আমরা সোশ্যালিস্ট?

এ প্রশ্নের একটা সদুত্তর ভেবে নেবার সময় পেলেন না পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ। দরজাটি খুলে গেল, ঘরে ঢুকল ডিমিত্রি ফিয়োডোরোভিচ। চমকে উঠল সকলে, তার আসবার কথাটা সবাই যেন ভুলেই গিয়েছিল এতোক্ষণে।

ছয়

ডিমিত্রি ফিয়োডোরোভিচ মাঝারি লম্বা চেহারার সুপুরুষ যুবা। বয়সে আটাশ। তবে বয়সের তুলনায় তাকে আরো অনেক বড়ো দেখায়; মুখটাও কেমন শীর্ণ বিবর্ণ, অসুস্থতার ছাপ তাতে। বড়ো বড়ো তার কালো চোখে কেমন নিরাসক্ত দৃষ্টি। এমনকি যখন কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে বা রাগ করেও সে কথা বলে, তখনো তার চোখের দৃষ্টি কেমন একটা উদাসীনতাকে ধরিয়ে দেয়। কৌতুকের হাসি হাসলেও সেই হাসি তার চোখে ধরা পড়ে না, অবচেতনের কোন্ অজানা গাম্ভীর্যের রূপ তখনো মোছে না তার চোখ থেকে। সম্প্রতি অত্যন্ত অস্থির আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন সে যাপন করছে, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া করছে বাপের সঙ্গে। তার এই হালচাল শহরে কারুর অজানা নেই, তাকে নিয়ে নানান্ গুজব পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

পরিপাটিভাবে সাজগোজ করে ডিমিত্রি এসেছে। গায়ে দামী স্যুটকোট, হাতে কালো দস্তানা, মাথায় বনেদী টুপি। সম্প্রতি সে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে এসেছে,—ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, সযত্নরক্ষিত গোঁফ। ভাবে ভঙ্গীতে সামরিক দৃঢ়তা। দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে উপস্থিত সকলকে একবার দেখে নিল, তারপর সোজা এগিয়ে গেল মঠবৃদ্ধের সামনে। খুব নিচু হয়ে তাঁকে অভিবাদন করল সে। জোসিমা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর ডান হাতে সসম্ভ্রমে চুম্বন করে ডিমিত্রি বললে,—অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার, ক্ষমা করুন

আমাকে। বাবা যে লোকটাকে পাঠিয়েছিল, সে আমাকে স্পষ্ট বলেছিল যে বেলা একটার সময় আসতে হবে। কিন্তু এখন দেখছি—

জোসিমা বললেন,—সামান্যই দেরি হয়েছে তোমার। কী হয়েছে তাতে? কোনো ক্ষতি হয়নি আমাদের।

করুণা আপনার। পরম অনুগৃহীত হলাম আমি।

মঠবৃদ্ধকে আর একবার অভিবাদন করল ডিমিট্রি। তারপর হঠাৎ তার বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকেও সসম্মানে মাথা নিচু করে অভিবাদন করল।

ছেলের কাছ থেকে এতোটা খাতির লাভের জন্যে প্রস্তুত ছিল না ফিয়োডোর। তবে সেও ঘাবড়াবার পাত্র নয়। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেও ছেলেকে সমানভাবে প্রত্যভিবাদন করল। মুখে আনল এমনই গম্ভীর ছাপ যে তাতে তার ধূর্তামিই প্রকট হয়ে উঠল সকলের চোখে। উপস্থিত অন্য সকলকে অভিবাদন করে ডিমিট্রি লম্বা পা ফেলে গেল জানালার ধারে। সেখানে ফাদার পাইসির পাশে খালি চেয়ারে চুপ করে বসল।

আলোচনা আবার শুরু হবার কথা। ফাদার পাইসির প্রশ্নের উত্তর এখনো মিউসভের দেওয়া হয়নি। তিনি উদাসীন মুখ করে বললেন,—থাক, এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাইনে। তাছাড়া দেখুন, আইভান ফিয়োডোরোভিচ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর বোধহয় এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে।

বিশেষ কিছু কথা নয়, আইভান বললে,—তবে কিনা ইয়ুরোপের যাঁরা উদারনৈতিক, এদেশেও যাঁরা নিজেদের উদারপন্থী বলে থাকেন,—আমি দেখেছি, তাঁরা ধর্মের লক্ষ্য আর সোশালিজমের লক্ষ্য,—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পান না। উদারপন্থী আর পুলিস,—দুজনেরই যে ধ্যানধারণা এক, এটা জেনে আমার খুব উপকার হোলো। প্যারিসের গল্পটা আপনি ভালোই বলেছেন, পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ।

কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন মিউসভ। বললেন,—আপনারা অনুমতি দিন, এ আলোচনাটা বন্ধ হোক। তার বদলে আর একটা ঘটনা আপনাদের বলি। ঘটনাটা আইভান ফিয়োডোরোভিচকে নিয়েই। দিন পাঁচেক আগে এমনি এক বৈঠক বসেছিল। অনেক মহিলাও ছিলেন সেখানে। আইভান সেই সভায় কী বলেছে জানেন? বলেছে, মানুষ যে তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবেই কোনো স্বাভাবিক আইনে একথা বলে না। মানুষে মানুষে যতো প্রেমপ্রীতির নিদর্শন এ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে দেখা গেছে, তা মানুষের কোনো প্রকৃতিগত ধর্মের বলে নয়,—মানুষ অমরত্বে বিশ্বাস করে বলেই। আইভান বলেছে,—মানুষের যা কিছু শুভবুদ্ধি তার মূল উৎস তার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস;—এ বিশ্বাস যদি ঘুচে যায় তাহলে মানুষের মনুষ্যত্বেরও কোনো পরিচয় আর থাকবে না। তখন আর নীতি-দুর্নীতি বলে কিছু থাকবে না, নরমাংসভোজও মানুষের পক্ষে তখন স্বাভাবিক হবে। সে আরো বলেছে যে অমরত্বে বিশ্বাস যাদের নেই, আস্থাও নেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে, তাদের পক্ষে কী আইন

কী নীতি সবই বদলে যেতে বাধ্য। যাকে সমাজ বলে পাপ, যাকে বলে অন্যায়,—তাই এ সব অবিশ্বাসীদের পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নয়, সম্মানজনক কাজ বলেই পরিগণিত হওয়া উচিত। এই রকম কথা যে লোক বলে, তার বুদ্ধি আর যুক্তি যে কতো পাকা তা আপনাদের বুঝে নিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে না।

হঠাৎ ডিমিত্রি বলে উঠল,—মাপ করবেন, তাহলে এ কথা কি ঠিক যে, যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে যে কোনো রকম পাপ কাজ অস্বাভাবিক তো নয়ই, বরং তা নিতান্তই সঙ্গত, এই কি আমাদের মেনে নিতে হবে?

ঠিক বলেছেন,—বললেন ফাদার পাইসি।

যুক্তিটা আমার মনে থাকবে। যেমন হঠাৎ কথা আরম্ভ করেছিল, তেমনি হঠাৎই চুপ করল ডিমিত্রি। সকলেই একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

এবার ফাদার জোসিমা আইভানকে শুধোলেন,—সত্যি কি এই তোমার বিশ্বাস?

আইভান বললে,—হ্যাঁ ফাদার। আত্মা যে অবিনশ্বর, এই বিশ্বাসই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে এই পার্থিব জীবনে পাপপুণ্যের কোনো পার্থক্য নেই।

জোসিমা বললেন,—সত্যিই যদি এ বিশ্বাস তোমার হয়, তাহলে তোমার মতো দুর্ভাগা আর দুটি নেই।

মুচকি হেসে আইভান জিজ্ঞাসা করল,—দুর্ভাগা কেন ফাদার?

তার কারণ আত্মা যে অবিনশ্বর তা হয়তো তুমি নিজেই বিশ্বাস করো না, নিজের আঙুলে তোমার প্রবন্ধে তুমি যা লিখেছ তাতে তোমার নিজেরই হয়তো আস্থা নেই।

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল আইভানের গাল। মুখ ফুটে চকিতে বার হোলো মৃদু আত্মস্বীকৃতি,—হয়তো আপনি সত্যিই বলেছেন ফাদার, আমি কিন্তু ঠাট্টা করে কোনো কথা বলিনি।

তা আমি জানি। সত্যিই প্রশ্ন জেগেছে তোমার মনে, যার উত্তর তুমি এখনো পাওনি। তোমার মন জুড়ে রয়েছে দ্বিধা আর হতাশা, যাকে তুমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আর সৌখীন সমাজে তর্কবিতর্ক করে চাপা দিয়ে রাখতে চাও। আস্থা-অনাস্থার বেদনা থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই, যতোদিন চরম প্রশ্নটির উত্তর তুমি না খুঁজে পাও।

মঠবৃদ্ধের মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে এক বিচিত্র হাসি হেসে আইভান বললে,—কিন্তু হ্যাঁ কি না, কেমন করে আমি জানব? কে করবে আমার এই সংশয়ের সমাধান?

হ্যাঁ-এর পথেই এর উত্তর, জোসিমা উত্তর দিলেন,—না-এর পথে গেলে পথ খুঁজে পাবে না। সংশয়ের বেদনা—এই তোমার হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বেদনা বহন করবার মতো মহৎ হৃদয় সৃষ্টিকর্তাই তোমাকে দিয়েছেন, ধন্যবাদ দাও তাঁকে। তাঁরই করুণায় নিজেরই অন্তরে তোমার প্রশ্নের উত্তর একদিন তুমি পাবে, পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে তোমার জীবনের যাত্রাপথ।

আইভান তার আসন থেকে উঠে জোসিমার সামনে এসে নীরবে নতজানু হয়ে

ইসেন। দক্ষিণ হাত প্রসারিত করে তেমনি নীরবে জোসিমা আশীর্বাদ করলেন তাকে। আবার ফিরে এসে আসনে বসল আইভান ; মুখে আর প্রদীপ্ত আভা।

ফাদার জোসিমা আর আইভানের কথাবার্তা সকলের মৌন মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। মুহূর্তের জন্যে সারা ঘর জুড়ে নেমেছিল কেমন একটা পবিত্র গাম্ভীর্য। আলিওশার মনে বিস্ময় আর অস্বস্তি। স্তব্ধতা ভাঙল, যখন মিউসভ হঠাৎ নিজের কাঁধদুটো ঝাঁকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োডোর পাভলোভিচ লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

চিৎকার করে বললে সে,—প্রভু আমার, জয় হোক, জয় হোক আপনার। এই যে ছেলেটা দেখছেন, আইভান, বড়ো ভালো এ, টনটনে এর কর্তব্যজ্ঞান,—এ আমার সাদা ঘোড়া। আর ঐ যে দেখছেন, আমার আর এক ছেলে ডিমিট্রি, ওর নামেই আমার নালিশ,—ও হোলো কালো ঘোড়া। সুপুত্তুর আর কুপুত্তুর,—এদের মাঝখানে আমি একেবারে অথর্ব গোবেচারা বাপ! বাঁচান আপনি আমাকে, ভবিষ্যদ্বাণী করুন কোথায় আমার গতি। দোহাই আপনার বাবা।

ক্লান্ত নিম্ন কণ্ঠে মঠবন্ধু বললেন,—আর ভাঁড়ামি কোরো না, অযথা নিচুও কোরো না নিজের সন্তানদের।

স্পষ্ট বোঝা গেল, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

আগেই আমি জানতাম যে এখানে ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছু হবে না। বিরক্তকণ্ঠে ডিমিট্রি বললে,—ক্ষমা করুন আমাকে ফাদার, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, আমাদের সকলকে আজ এখানে ডেকে আপনি মহা ভুল করেছেন। এটা কোনো মীমাংসার ক্ষেত্রই নয়, আমার বাবাও কোনো মীমাংসা চায় না। ও চায় খানিকটে কেচ্ছা। মতলব ছাড়া এক পা চলে না ও,— খানিকটে নোংরা ছড়াক, এই ওর মতলব।

অ্যাই দ্যাখো, বললে ফিয়োডোর,—আমি মতলববাজ, আমি দুর্বুদ্ধির রাজা, যতো দোষ সব আমার। এই যে পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ, তুমি পর্যন্ত আমার নামে ঐ কথা বলে বেড়াও। কেন, কী করেছি আমি? সবাই বলে, ছেলেদের ফাঁকি দিয়েছি আমি। তাদের টাকা আমি আমার জুতোর সুকতলার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আইন নেই? আদালত নেই? যাও না, কতো টাকা তোমার ছিল, উড়িয়েছ কতো, আর কতো আছে তোমার আমার কাছে, সব প্রমাণ হবে সেখানে। তোমার চিঠি, তোমার দলিল, তোমার হ্যাণ্ডনোট সব আমি দাখিল করব সেখানে। কী হে পিয়তর ভায়া, কথা বলছ না কেন এখন? আমার দোষ তো সব সময়েই দেখছ, কিন্তু আমার এই কুপুত্তুরটিকে তুমি চেনো না? ওকে ফাঁকি দিয়েছি আমি? কতো টাকা ও আমার কাছে ধারে, তা তুমি জানো? তার সমস্ত দলিল আমার কাছে আছে। ওর বদখেয়ালির খরচ আরো আমি যোগাবো? যার কেলেঙ্কারিতে সারা শহরে আর কান পাতা যায় না? এর আগে ও যেখানে ছিল সেখানকার এক ভদ্রঘরের মেয়েকে নষ্ট করবার লোভে ও হাজার-দুহাজার রুবল উড়িয়েছে। বুঝেছ হে ডিমিট্রি,

ও ব্যাপারে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে। বিশ্বাস করবেন কি প্রভু, ওর আগেকার মিলিটারি কর্তা, নামকরা একজন কর্নেল,—তাঁরই মেয়ে, যেমন রূপে তেমনি গুণে,— মেয়েটিকে ও সম্প্রতি পটিয়েছে, বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে; আর তারই চোখের সামনে এখন কিনা আর এক মনভোলানীর পেছনে ঘুরঘুর করছে। এ মনভোলানীও যে সে নয়, ভদ্রঘরের বউ,—স্বাধীন মেজাজের হলে হবে কি, ধর্মভয় আছে তো, তাই আসল দরজা খুলবার পাত্রীই নয়। পুত্তুর আমার কি চায় জানেন? সোনার চাবি দিয়ে বন্ধ দরজা খুলবে, তাই টাকা চাই। কতো টাকা এরই মধ্যে ঐ মনভোলানীর পেছনে উড়িয়েছে তার ঠিক নেই, তবু টাকা, আরো টাকা, ধার করে হোক, যে করে হোক। এই টাকা নিয়েই প্রভু আমার সঙ্গে ছেলের ঝগড়া।

কিছুক্ষণ দম নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে চলল,—কী হে সুপুত্তুর, বলব নাকি, ফাঁস করে দেব নাকি, এতো টাকা তোমার দরকার কার জন্যে?

থামো তুমি! গর্জন করে উঠল ডিমিট্রি,—আড়ালে যা খুশি তাই বোলো, কিন্তু আমার সামনে সম্মানী ভদ্রমহিলার নাম ঠোঁটে পর্যন্ত এনো না। ভালো হবে না তাহলে বলে দিলাম।

হাতের তেলোয় চোখের জল মুছে ডুকরে উঠল ফিয়োডোর,—ভালো হবে না, তোর বাপকে তুই সবার সামনে ভয় দেখাস? বাপের আশীর্বাদের কোনো দাম নেই তোর কাছে? বাপ হয়ে যদি আমি তোকে অভিশাপ দিই? তোর ভালো হবে তাতে?

রাগে আগুন হয়ে আবার ডিমিট্রি গর্জে উঠল,—নির্লজ্জ ভাঁড় কোথাকার!

কী বললি? তোর আপন বাপকে তুই একথা বললি? বলুন আপনারা, নিজের বাপের সঙ্গে এমনি ব্যবহার যে করে, অন্য লোকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার সে করবে। এই তো সেদিনকার কথা,—এখানকারই এক ভদ্রলোক, মিলিটারিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন, নানান্ বিড়ম্বনায় পড়ে চাকরিটি খোয়ান,—তবে এমনিতে খুব মানী লোক, তাঁকে ডিমিট্রি কী করেছে জানেন? হপ্তা তিনেক আগের ব্যাপার, এক শুঁড়িখানার মধ্যে থেকে তাঁর দাড়ি ধরে রাস্তায় টেনে এনে আমার গুণধর পুত্র তাঁকে মার লাগিয়েছে। ভদ্রলোকের অপরাধ, তিনি কোনো এক ব্যাপারে আমার হয়ে কিছু কাজ করেছিলেন।

রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিল ডিমিট্রি। আর সামলাতে পারল না নিজেকে,—মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে! দুশো সত্যি হলে কী হয়। বাবা যা বলছে, হ্যাঁ, তা আমি করেছি। আপনাদের সর্বসমক্ষে আমি অনুতাপ করছি, লোকটার সঙ্গে সেদিন জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছিলাম বলে। কিন্তু সত্যি কথাটা কি বলো তো বাবা? এই মিলিটারি-খেদানো ক্যাপ্টেনটি,—তোমার হয়ে এ লোকটা গিয়েছিল সেই মহিলার কাছে যাকে তুমি মনভোলানী বলছিলে। তোমার নাম করে তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিল,—তোমার কাছে আমার সই করা যতোগুলো হুণ্ডি আছে, সেগুলো তিনি যেন নিজের নামে নিয়ে নেন, আর আমি তোমার কাছে সম্পত্তির অংশ দাবি করা মাত্র তিনি যেন আমার নামে কেস্ ঠুকে দেন,—যাতে করে আমি জেলে যেতে পারি। তুমি বলছ কিনা মহিলাটির

ওপর আমার নজর। আমি জানিনে তোমার মতলব? আসল নজর তোমার! মেয়েটি নিজে আমাকে তোমার সব মতলব খুলে বলেছে, আর টিটকিরি দিয়েছে তোমাকে। এক ঢিলে দু-পাখি তুমি মারতে চাও। আমি জেলে গেলে তোমার টাকা বাঁচে, আর এই মেয়েটির ব্যাপারেও তোমার স্বার্থসিদ্ধি হয়। আমি জানিনে?

উপস্থিত আর সকলকে উদ্দেশ্য করে ডিমিট্রি বলতে লাগল,—দেখুন আপনারা, দুশ্চরিত্র ছেলের সাধু বাপটিকে আপনারা ভালো করে দেখুন। রাগের বশে আমি অসংযত হয়ে পড়েছি, আমার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি জানতাম এখানে এই সভা ডাকার মতলব কেন হয়েছিল ওর। শুধু আমার নামে বেশ ভালো করে দুর্নাম রটানোর দুর্বুদ্ধিই ওর ছিল। আজ যদি আমার বাবা সব দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিত, আমি নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করতাম। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা তো দেখলেন, ও যে শুধু আমাকেই অপমান করল তা নয়, এমন একটি মহিলার নামেও কলঙ্ক ছড়ালো, যাঁকে আমি এতো সম্মান করি যে তাঁর নাম পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে আমি মুখে আনতে সংকোচ বোধ করছি। তবে হ্যাঁ, এবার থেকে আমি বদ্ধপরিকর, ও আমার বাবা হতে পারে, কিন্তু সকলের সামনে ওর সমস্ত কু-মতলব আমি ফাঁস করবই।

কথা আটকে এল ডিমিট্রির মুখে। কিন্তু চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করতে লাগল, নিশ্বাস নিতে লাগল সে টেনে টেনে। এসব কথা শুনে ঘরের সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, অস্বস্তিভরে সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, একমাত্র সাধু জোসিমা ছাড়া। অন্য সাধুদের চোখে গম্ভীর ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছিল, তাঁরা শুধু মঠবৃদ্ধের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। জোসিমা স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তাঁর আসনে,—তাঁর মুখের ম্লানিমা উত্তেজনার নয়, রোগক্লান্তির। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল কেমন একটা মৃদু করুণ হাসি। একটিমাত্র ইঙ্গিতেই তিনি এই কুরুচিপূর্ণ আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারতেন; কিন্তু স্থির তিনি কিসের যেন অপেক্ষায়, সকলের দিকে তিনি তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলেন,—কি যেন বুঝতে পারছেন না, তাকে সম্যক উপলব্ধির প্রতীক্ষায়।

লজ্জায় ঘৃণায় মিউসভের যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। ডিমিট্রি চুপ করা মাত্র তিনি চড়া গলায় শুরু করলেন,—আজকের এই নোংরা কথাবার্তার জন্যে আমরা সকলেই দায়ী। কী রকম ঘৃণ্য লোকের তাগিদে এখানে এসেছি তা আমি জানলেও এতোটা যে হবে তা আমি কল্পনাও করিনি। এ প্রসঙ্গ এখুনি বন্ধ হোক। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন ফাদার, আমি আগে কিছুই জানতাম না, এসব ব্যাপার আমি এই প্রথম শুনছি। ছি ছি ছি! কোথাকার কোন্ এক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক, তার সঙ্গে ছেলের কী সম্বন্ধ, তা নিয়ে বাপের হিংসে। আর সেই স্ত্রীলোকেরই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাপ কিনা নিজের ছেলেকে জেলে পুরতে চায়। ইস্! এই বাপ-ছেলের সংসর্গে আমি এসে পড়েছি, এদের এই ঘৃণিত ঝগড়া নিয়ে মাথাব্যথা করছি আমি। ঘুণাক্ষরেও যদি এইসব ব্যাপার আমি জানতাম! ঠকিয়েছে, আমাদের সবাইকে ঠকিয়েছে এরা!

ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ ! ' হঠাৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফিয়োডোর পাভলোভিচ,—তুমি যদি আমার ছেলে না হতে তাহলে এখনি তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে যেতাম আমি ! জানো ? হ্যাঁ, পিস্তল নিয়ে, তিন পা দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে !

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক-বার সে মাটিতে পা ঠুকে নিল।

ডিমিট্রি যেন নিতান্ত যন্ত্রণায় ভ্রূকুঞ্চন করল, অবর্ণনীয় ঘৃণাভরে তাকাল বাপের দিকে। কন্ঠ-সংযত চাপা গলায় বললে সে—আমি ভেবেছিলাম, হ্যাঁ ভেবেছিলাম এতোদিন পরে আমার বাকদত্তাকে, প্রণয়িনীকে নিয়ে আবার ফিরে আসছি নিজের দেশে, নিজের ঘরে,—শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তি নিয়ে আমার বৃদ্ধ বাপের কাছে।' এসে দেখলাম, এ আমার বাপ নয়,—এ একটা লম্পট, একটা ভাঁড়, একটা শয়তান !

আবার চিৎকার করে উঠল বুড়ো ফিয়োডোর; প্রতিটি কথায় দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল সে,—লড়বই, হ্যাঁ, আমি ডুয়েল লড়বই হতভাগা তোর সঙ্গে। আর ওহে পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ মিউসভ, তোমাকেও বলি, ঐ যাকে তুমি ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ বললে এইমাত্র, তার মতো একজন সম্মানী মেয়ে তোমার নিজের পরিবারের মধ্যেও একটা মিলবে না। এই যে হতভাগা ডিমিট্রি নিজের বাকদত্তাকে ফেলে ঐ মেয়ের পেছনে ঘুরছে, কেন বলো তো ? তার ঐ বাকদত্তা এই মেয়ের কড়ে আঙুলের যুগ্যিও না, সেই জন্যেই তো ? হুঁ, তাকে তুমি বলছ কিনা নষ্ট মেয়েমানুষ, হুঃ !

ফাদার ইয়োসিফের মুখ ফুটে বার হোলো,—কী লজ্জা !

লাল হয়ে উঠেছিল কাল্‌গানোভের মুখ। চুপ করেছিল সে এতোক্ষণ। সেও না বলে পারলে না,—সত্যি, কী লজ্জা, কী কেলেঙ্কারি !

কাঁধদুটো উঁচু করে ডিমিট্রি তার বাপের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে ক্রোধকর্কশ চাপা গলায় বললে,—এমন লোক বেঁচে থেকে সারা পৃথিবীতে কলঙ্ক ছড়ায়, এমন লোক মরে না কেন ?

কী বললি ? তুই বাপের মরণ কামনা করলি ? আবার হাউহাউ করে উঠল ফিয়োডোর,—শোনো সাধুবাবারা, পিতৃহত্যার পাতকীর কথা শোনো। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাদেরও বলি, ঐ যাকে সবাই নষ্ট মেয়েমানুষ বলছে, যার কথা শুনে লজ্জায় তোমাদের মাথা কাটা গেল, এটাও জেনে রাখো, তোমাদের চাইতে অনেক পুণ্য তার। ছেলেবেলায় সংসর্গদোষে হয়তো একটু পা পিছলিয়েছিল, কিন্তু এখন সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। ভালোবাসা বিলিয়ে অনেক পুণ্য সে যোগাড় করেছে,—ঐ বলে না, যে মেয়ে ভালোবাসে, ঈশ্বরও তাকে ক্ষমা করেন !

তা করেন, ফাদার ইয়োসিফ বললেন,—কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমা এমনিধারা ভালোবাসার জন্যে নয়।

ভুল, সাধুবাবা ভুল। তোমরা তো মঠে বসে বসে মালপো খাও আর ভাবো, ঐ মালপো খেয়েই স্বর্গে যাবে। ভালোবাসার তোমরা বোঝো কী ? এবার থেকে রোজ একটা করে কুমড়ো খেয়ো সবাই, তারপর ঝুলির মধ্যে ঐ কুমড়ো খাওয়ার পুণ্যটা ভরে রেখো।

অসহ্য হয়ে উঠেছে,—অস্ফুটস্বরে বললেন কেউ কেউ।

নিতান্ত অকল্পনীয়ভাবে এই অবাঞ্ছিত দৃশ্যে ছেদ পড়ল। ফাদার জোসিমা হঠাৎ তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আলোচনার রকম-সকম দেখে নির্বাক আলিওশার মনে দুশ্চিন্তার ঝড় উঠেছিল, সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের দুর্বল বাহুটি চেপে ধরল। ফাদার জোসিমা কম্পিত এগিয়ে ডিমিত্রির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর নতজানু হয়ে বসে পড়লেন তার সামনে। আলিওশা ভাবল, এ বুঝি বৃদ্ধের শারীরিক দুর্বলতার ফল, কিন্তু আসলে তা নয়। নতজানু হয়ে বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ডিমিত্রির পায়ের কাছে মাথা নিচু করলেন, তাঁর কপালটি ঘরের মেঝে স্পর্শ করল। আলিওশা এমনই আশ্চর্য হয়ে গেল যে, প্রভুকে সাহায্য করতে সে ভুলে গেল। আস্তে আস্তে মাথা তুলে জোসিমা আবার উঠে দাঁড়ালেন। মুখে তখন তাঁর বিচিত্র এক হাসি।

মাথা হেলিয়ে উপস্থিত সকলকে অভিবাদন করে জোসিমা বললেন,—আমাকে মাপ করুন আপনারা এবার। আচ্ছা বিদায়!

বাক্যহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ডিমিত্রি। কী আশ্চর্য! আমার পায়ে মাথা রাখলেন জোসিমা? এ কী সম্ভব? হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ করে দু-হাতে মুখ ঢেকে সে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ডিমিত্রির অনুসরণে অন্য অতিথিরাও হতভম্ব মনে ঘর থেকে বার হয়ে এলেন, জোসিমার কাছ থেকে ঠিকমতো বিদায় নিতেও তাঁরা পারলেন না। কেবল সাধুরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

ফিয়োডোর পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। আশ্রম থেকে বার হবার পথে সে বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল,—এ আবার কী কাণ্ড! অ্যাঁ? বুড়ো কিনা ছেলেটার পায়ে মাথা ঠেকালো? এ আবার কেমন ধারা? মানে কী এর?

তিক্তকণ্ঠে মিউসভ উত্তর দিলেন,—পাগলাগারদের পাগলের কাণ্ড! তার আবার মানে! যাক, এবার মুক্তি। শোনো ফিয়োডোর পাভলোভিচ, তোমার সঙ্গে আর আমি নেই। কই, সে সাধুটি আবার গেল কোথায়?

ফাদার সুপিরিয়রের কাছ থেকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ নিয়ে যে সাধুটি এসেছিলেন, জোসিমার গৃহদ্বারের বাইরেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন এতোক্ষণ।

মিউসভ তাঁকে বললেন, দয়া করে আমার একটি উপকার আপনাকে করতে হবে। ফাদার সুপিরিয়রকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন, আমার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবেন যে একবারে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত কারণেই তাঁর নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

নাও! অপ্রত্যাশিত কারণে? ফিয়োডোর বললে,—আরে, সে কারণটা তো হচ্ছি আমি। বুঝলেন সাধুবাবা, আমার সংসর্গ এড়াতে চায় বলে মিউসভ ভায়া নেমন্তন্নটাকে পর্যন্ত এড়াতে চায়। খুব হয়েছে, তুমি নেমন্তন্ন রাখতে যাও, আমি যাব

না, বাড়ি গিয়েই খাব। হয়েছে এবার? হায় হায়, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে কিনা—

আত্মীয়? কে বলেছে? তোমার মতো ছোটলোকের আমি আত্মীয়?

অস্বীকার করলে কী হবে ভায়া, চটলেই বা কী হবে? পরমাত্মীয় তুমি আমার। গির্জার খাতাপত্রে সব লেখা আছে। তা যাও, নেমন্তন্ন খেতে তুমি যাও। তুইও যা আইভান, আমি বাড়ি ফিরে আবার গাড়িটা পাঠিয়ে দেব।

সত্যি তুমি বাড়ি যাচ্ছ? মিথ্যে কথা বলছ না তো?

কী বলো তুমি পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ! এই যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল, এর পরে মঠে আর বেশীক্ষণ থাকা আমার পোষায়? এই যে সাধুবাবারা, আমাকে আপনারা মাপ করুন। সত্যি, বড়ো বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম বুড়োর ঘরে। কারুর বুকের ছাতি ধরুন সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মতো, আর কারুর বুকের ছাতি ঐ ঘেয়ো কুকুরের মতো। আমার প্রাণ, বাবারা, নিতান্ত ঐ কুকুরের প্রাণ। বলুন তাহলে,—মঠের চাটনিভোজের জন্যে বসে থাকা আর আমার উচিত? ইস্, কী লজ্জা! এবার শুধু মানে মানে সরে পড়তে পারলে হয়!

মিউসভের দিকে একটা চুম্বন ছুঁড়ে দিয়ে উল্টোদিকে পা চালাল ফিয়োডোর। সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন মিউসভ। একটু পরে আগেকার মতোই তিক্ত কণ্ঠে বললেন,—না, সত্যি, ফাদার সুপিরিয়রের নিমন্ত্রণটা এড়ালে চলবে না। তাছাড়া তাঁর কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়াও উচিত।

আইভান বললে,—নিশ্চয়ই, তাছাড়া বাবা যখন থাকবে না তখন অসুবিধে কী? ক্ষমা তো চাইবই, তাছাড়া বলব, এসব গোলমালের জন্যে আমরা দায়ী নই।

হ্যাঁ, তোমার বাবা না থাকলেই বাঁচি। দুত্তোর এই নিমন্ত্রণের! চলো।

সাধুটির সঙ্গে দুজনে এগোলেন। মিউসভের দুচোখ ভর্তি ঘৃণা, সে ঘৃণা আইভানের প্রতিও। মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন, দ্যাখো, কেমন ভোজ খেতে চলেছে, কিছুই যেন হয়নি। লজ্জার স্পর্শমাত্র নেই মুখে। কতো আর হবে, কারামাজভ বংশের ছেলে তো!

সাত

আলিওশা ফাদার জোসিমার হাত ধরে আস্তে আস্তে তাঁকে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর বসাল। ঘরটা খুবই ক্ষুদ্র, আড়ম্বরবিহীন। সরু লোহার একটি খাট, এক কোণে পড়ার একটি টেবিল, ক'খানি ধর্মগ্রন্থ তার ওপর। সাধু পরিশ্রান্ত হয়ে শয্যার ওপর ঢলে পড়লেন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। আলিওশার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, কী যেন ভাবছেন। তারপর বললেন,—যাও এবার তুমি। তাড়াতাড়ি ফাদার সুপিরিয়রের বাড়ি যাও, সেখানে তোমার দরকার হবে।

আলিওশা অনুরোধ করল,—না, আপনার কাছেই আমাকে থাকতে দিন।

না, তা হয় না। ওখানে আবার অশান্তি শুরু হবে, তোমার থাকা প্রয়োজন। যদি দ্যাখো পাপের ছায়া ওখানে জেগে উঠেছে, মনে মনে প্রার্থনা কোরো। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলি, ভবিষ্যতে এখানে তুমি থাকবে না, এ তোমার জায়গা নয়। ঈশ্বর যখন আমাকে ডেকে নেবেন, তারপর তুমি মঠ ছেড়ে একেবারে চলে যেয়ো।

চমকে উঠল আলিওশা।

ভাবনার কী আছে? সারা জীবন একস্থানে তো কেউ থাকে না। তোমার জীবন যাত্রীর জীবন, নানা পথে তোমাকে যাত্রা করতে হবে। সংসারও করতে হবে। অনেক কাজ তোমার। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস নিয়েই জীবনের পথে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যিশু থাকুন তোমার অন্তরে, তাঁকে যদি তুমি পরিত্যাগ না করো, তিনিও তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না। অনেক দুঃখ তুমি পাবে, দুঃখের মধ্য থেকেই আবার আনন্দও পাবে তুমি। অনেক কাজ করতে হবে তোমাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাও, ভয় পেয়ো না শ্রমকে, ভয় পেয়ো না বেদনাকে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই শেষ উপদেশ কটি মনে রেখো।

গুরুর কথাগুলি প্রচণ্ড নাড়া দিল আলিওশার মনে। কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠের প্রান্ত।

মৃদু হাসি হেসে আবার জোসিমা বললেন,—কী এসে যায় বাবা? শোকের ঊর্ধ্বে কী আছে তার সন্ধান যে পায় না সেই শোক করে, যে পায় সে করে আনন্দ,—সে জানে, মৃত্যু হোলো পরিত্রাণ। আমি এবার একটু প্রার্থনা করব বাবা। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না। ভাইদের কাছে থাকো, শুধু এক ভাই নয়, দুই ভাইএরই।

আলিওশাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে সাধু জোসিমা দক্ষিণ হাত তুললেন। আলিওশা কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না। ডিমিট্রির পায়ে কেন তিনি মাথা নত করেছিলেন, কী সেই বিচিত্র ব্যবহারের গূঢ় রহস্য তা জানবার জন্যেও তার মন ব্যাকুল ছিল। কিন্তু গুরু নিজে যখন এ নিয়ে তাকে কিছু বলেননি, তখন নিজে থেকে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস আলিওশার হোলো না।

আশ্রম থেকে বার হয়ে মঠের দিকে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল আলেক্সি। হঠাৎ একটা ব্যথা যেন বাজল তার বুকে, জোসিমার কণ্ঠ যেন সে আবার শুনল কানে। তিনি যেন বলছেন,—আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর কথা অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু তিনি যদি ছেড়ে যান, আলিওশা বাঁচবে কী করে? প্রভুর মুখ যদি কখনো আর না দেখে, তাঁর বাণী যদি কখনো আর না শোনে, তাহলে কী নিয়ে সে থাকবে? প্রভু বলেছেন,—শোক কোরো না, মঠ পরিত্যাগ করে চলে যাও। কোথায় সে যাবে? জীবনের কোন্ নতুন পরীক্ষার সে সম্মুখীন হবে এবার? পথের দু-ধারের বুড়ো পাইন গাছগুলোর শীর্ষদেশের দিকে সে তাকাল। কোনো সমাধান নেই তার ভাবনায়।

পথের বাঁকটা ঘুরেই সে দেখল অদূরে র‍্যাকিতিন অপেক্ষা করছে।

আলিওশা তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল,—কি হে? তুমি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ নাকি?

দাঁত বার করা হাসি হেসে র‍্যাকিতিন বললে,—তোমার জন্যেই তো। তোমার খুব তাড়া আমি জানি। ফাদার সুপিরিয়রের ওখানে মস্ত ভোজ আজ, সেখানে তুমি চলেছ, তাই না? আমি তো সেখানে যাব না। তুমি দাঁড়াও না, একটু গল্প করি। আচ্ছা, ঐ যে অদ্ভুত দৃশ্য একটু আগে দেখলাম, ওর মানে কী বলো তো?

কোন্ দৃশ্য?

আহা, বোঝো না যেন! সেই যে তোমার ভাই ডিমিট্রির পায়ে ঠকঠক করে মাথা ঠোকা—

ও, তুমি ফাদার জোসিমার কথা বলছ?

তা নয় তো আর কার?

ঠকঠক করে মাটিতে মাথা ঠুকেছিলেন তিনি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে আমার মুখে কথাটা হয়তো খুব সম্মানসূচক শোনাল না। সত্যি এর মানে কী বলো তো?

কী বলব মিশা, আমি নিজেই জানিনে।

তোমাকে বলেননি? আমি অবশ্য এটাই ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়, ওর মানে কিছুই নেই, খালি একটা চাল। তবে মানে না থাকুক, উদ্দেশ্য আছে।

উদ্দেশ্য?

বোঝো না? খবরটা ছড়াবে,—শহর থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে। ধর্মপ্রাণ লোকেরা এমনি একটা কাণ্ড নিয়ে নানা কথা বলবে। আসলে জোসিমার তীক্ষ্ণ নাক, তিনি আগে থেকেই শুঁকেছেন ভীষণ একটা অপরাধ ঘটল বলে। তোমাদের পরিবারে পাপের তো আর শেষ নেই।

কিন্তু অপরাধ কেন?

বলছি ঘটল বলে। র‍্যাকিতিন আগ্রহভরে বলে চলল,—তোমার বড়লোক বাপ আর তোমার দুই দাদার মধ্যে ভীষণ একটা ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছে। যা ঘটবার তা যখন ঘটবে, সবাই তখন বলবে,—ঠিক, জোসিমা আগে থেকেই ভবিষ্যৎটা দেখেছিলেন, তাই না মাথা খুঁড়েছিলেন ছেলের পায়ে। ঐ মাথা খোঁড়ার মধ্যেই ছিল সাধুর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ইঙ্গিত। ধর্মপাগলদের রকমই ঐ। তারা বলবে,—জোসিমা ঠিক অপরাধের ছবি দেখেছিলেন, আগে থাকতে চিনিয়ে দিয়েছিলেন অপরাধীকে। হাজার হোক, সাধু তো! সাধুর রকমই ঐ। ধর্মাত্মা লোককে সে শাসন করে, আর খুনী অপরাধীর পায়ে মাথা রাখে।

কী অপরাধ? কে কাকে খুন করছে? কী বলছ তুমি? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল আলিওশা।

কে কাকে খুন করবে তার আঁচ তুমি নিজে পাওনি? আলিওশা, তুমি

কখনো মিথ্যে কথা বলো না।* সত্যি বলো তো, কোনো সন্দেহ জাগেনি তোমার মনে ?

একটুখানি স্তব্ধ থেকে আস্তে আস্তে আলিওশা বললে,—হ্যাঁ, জেগেছে।

জেগেছে ? এমনি উত্তর রাকিতিন আশা করেনি, সে আবার বললে,—ঠিক বলছ ?

আলিওশা ধীরে ধীরে বললে,—না, আগে আমি ভাবিনি, তবে তোমার অদ্ভুত কথাগুলো শুনে এখন আমার মনে হচ্ছে, আমারও মনে কেমন একটা ধারণা যেন হয়েছিল।

তাহলে শোনো বলি। আমার কথা শুনে নয়, আজ তোমার বাবা আর ডিমিট্রিকে দেখে অবধি নিশ্চয় তোমার মনে হচ্ছিল, ভয়ানক একটা কিছু ঘটল বলে। আমিও তো দেখেছি সব! আমার ধারণা ডিমিট্রি লোকটা সৎ, কিন্তু ভয়ানক উত্তেজনাপ্রবণ। কিছুটা দূর সে তোমার সঙ্গে যাবে, কিন্তু তার বেশি পা বাড়ালেই আর রক্ষা নেই। তখনই সে ছুরি উঁচোবে তোমার বুকের ওপর। কিন্তু বাপটা তোমার মাতাল ভাঁড়, সে বোঝে না কতোটা সে এগোবে, আর কোথায় গিয়ে থামতে হবে। তখন দুজনেই লড়ে যাবে, আর নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে নিজেরাই।

ও, এই কথা ? না মিশা, একথা আমি ভাবিনি। এখানেই তুমি ভুল করেছ।

ভুল করেছি। তাহলে তোমারই বা মুখ শুকিয়ে উঠেছে কেন ? আচ্ছা, শোনো বলি। এই যে তোমার দাদা ডিমিট্রি, আমি বিশ্বাস করি লোকটা সৎ, কিছুটা বোকাও বলতে পারো। কিন্তু তাহলে কি হবে ? নেশা যাবে কোথায়—লালসার নেশা ? সে যে রক্তের মধ্যে, তোমার বাপের কাছ থেকেই তো সে পেয়েছে। তুমি জানো, তোমাকে দেখলে আমার আশ্চর্য লাগে। কারামাজভ হয়েও তুমি এমনি সাধু হলে কেমন করে ? কামুকতা যে তোমাদের বংশের রোগ। এদিকে তোমার বাবা আর দুই দাদা—এই তিন কামুক ছুরি শানাচ্ছে। ওদের দলে তুমি যদি যাও তাহলে এক গণ্ডা পূর্ণ হবে।

আলিওশার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। সে বললে,—ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল। ডিমিট্রি ওকে ঘৃণা করে।

কাকে ? গ্রুশেঙ্কাকে ? ভুল ভারী তোমারই। ঘৃণা যদি করত তাহলে ওর জন্যে নিজের বাকদত্তাকে পরিত্যাগ করতে পারত না। ভালোবাসার ব্যাপার তুমি কি বোঝো ? হঠাৎ যদি কোনো মেয়ের রূপ দেখে নেশা লাগে, অবশ্য তেমনি নেশাখোর হওয়া চাই, তাহলে তার জন্যে নিজের বাপ মা সন্তান দেশ সব কিছু সে-লোক ছাড়তে পারে। এমনি নেশার বশে যে সাধু সে চুরি করে, যে বিশ্বাসী সে হয় জোচ্চর, যে নিতান্ত মানবপ্রেমিক, খুন করতে তার বাধে না। পুশকিন মেয়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে কাব্যে তাদের চরণ বন্দনা করত,—এ লোক কবিতাও লেখে না, আর শুধু পায়ের দিকে তাকিয়েও থাকে না, শিরায় শিরায় রক্ত তার কেঁপে ওঠে। গ্রুশেঙ্কার ওপর যদি বিতৃষ্ণাও হয়, তবু ডিমিট্রির কোনো উপায় নেই, ওকে ছাড়তে সে পারবে না।

হঠাৎ আলেক্সি বললে,—তা আমি বুঝি।

বোঝো? হ্যাঁ, স্বীকার করেই ফেলেছ দেখছি। তাহলে বলো, তোমাদের বংশের এই কামুকতা নিয়ে তুমি আগে ভেবেছ। আরে ভাই, তুমি তো ধীর স্থির, একেবারে সাধুপুরুষটি। কিন্তু তুমিও যে কখন কী হয়ে উঠবে কে বলতে পারে? মা'র কাছ থেকে তুমি পেয়েছ ধর্মভীরুতা, কিন্তু বাবার রক্তকে বাদ দেবে কী করে? তাতে যে আগুন জ্বলছে! আরে, কাঁপছ কেন? বলো, যা বলছি সত্যি নয়? আরে ভায়া, জানো, গ্রুশেংকা আমাকে কতোবার বলেছে, তোমাকে একবার তার কাছে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। ও তো তোমার জন্যেও পাগল! বলে, একবার তোমাকে কাছে পেলে তোমার সন্ন্যাসির পোষাক ঘুচিয়ে ছাড়বে। যাই বলো, মেয়েটা কিন্তু আশ্চর্য ধরনের!

তা বটে, আলেক্সি উত্তর দিল,—আমার হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ো। বোলো, আমি কখনো তার কাছে যাচ্ছিনে। এবার শেষ করো তোমার কথা। তারপর আমার ধারণা আমি তোমাকে বলব।

শেষ করার আর আছে কী? রাকিতিন গড় গড় করে বলে চলল,—এতো জলের মতো সোজা। তুমি তো সাধু, তোমার মনেও যদি বাসনা-বিলাস বাসা বেঁধে থাকে, তাহলে তোমার ভাই আইভানের অবস্থাটাও ভাবো! সেও তো কারামাজভ। সে ধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ লেখে ঠাট্টা করবার জন্যে, অবিশ্বাসী হয়েও ঈশ্বর নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে। আসলে মস্ত ফাঁকিবাজ। মিটিয়ার বাকদত্তাকে নিজে যাতে বাগাতে পারে, এখন সেই চেষ্টা করছে। মিটিয়ারও তাতে আপত্তি নেই। বরং তাতে তারই সুবিধে। তার বাকদত্তা যদি ছোট ভাইদের সঙ্গে ভিড়ে যায়, গ্রুশেংকাকে নিয়ে সরে পড়তে পারবে। কিন্তু গণ্ডোগোল বাঁধিয়েছে তোমার বাপ ফিয়োডোর, মাঝখানে পড়ে সেই এখন গ্রুশেংকার জন্যে পাগল। তাকে দেখলে এখন বুড়োর জিভ দিয়ে জল পড়ে। তার কথা উঠল বলেই তো জোসিমার ঘরে মিউসভের সঙ্গে ও অমন বিশ্রীভাবে ঝগড়াঝাটি করল। প্রথম প্রথম গ্রুশেংকা ছিল তোমার বাবার কয়েকটা গোপন ব্যবসার কর্মচারিনী, তারপর আজকাল হঠাৎ চোখ ফুটেছে, দুবেলা নানা রকম প্রস্তাব করছে গ্রুশেংকার কাছে—খাসাখাসা সব কুপ্রস্তাব। এদিকে ছেলেও পাগল,—বাপ-বেটায় লড়াই লাগল বলে। গ্রুশেংকা কিন্তু কোনো দিকেই টলছে না, দুজনকেই খেলাচ্ছে, দেখছে কার দৌড় কতোটা। ও জানে, বাপের কাছ থেকে টাকা সে এখন অনেক বাগাতে পারে, কিন্তু বুড়ো বিয়ে ওকে করবে না, নেশা ছুটলে টাকার আশাও ঘুচবে। এদিকে ছেলের পয়সা না থাকলেও সে ওকে বিয়ে করতে রাজি। দ্যাখো কাণ্ডটা! স্যামসনভ বলে এক বুড়ো লম্পট ব্যবসাদারের রক্ষিতা ছিল গ্রুশেংকা। তাকে বিয়ে করতে ডিমিট্রি রাজি, কাটেরিনা আইভানোভ্নার মতো বনেদী ঘরের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে ফেলে। বাপ-বেটার খুনোখুনি শুরু হলে তোমার আইভানদাদার সুবিধে। সে তখন কেটে পড়বে কাটেরিনা আর তার বিয়ের যৌতুক ষাট হাজার রুবল নিয়ে। ডিমিট্রি তো সেদিন এক মদের আড্ডায় গলাবাজি করে বলেছে, কাটেরিনার মতো

মেয়ের যোগ্য সে নয়, যোগ্য যদি কেউ থাকে সে তার ভাই আইভান। কাটেরিনাও এখন দোমনা হয়ে রয়েছে—আইভান না ডিমিত্রি, ডিমিত্রি না আইভান! তোমার আইভান ভাই কী কম ওস্তাদ! দ্যাখো না, কতো বড়ো পণ্ডিত সে! তোমরা তাকে মাথায় তুলেছ, আর সে মুচকি মুচকি হাসছে!

দ্রুকুঞ্চিত করল আলিওশা। কিছু রুঢ়স্বরেই বললে,—সবজান্তার মতো বলছ যে! এতো খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

এই নাও! এদিকে আমাকে বলতে বলছ, আবার শুনে ঘাবড়েও যাচ্ছ। আমার কথা যে সত্যি তা তোমার ব্যবহারেই প্রমাণ হচ্ছে।

না, আইভানকে তুমি পছন্দ করো না বলেই একথা বলছ। টাকার লোভ আইভানের নেই।

বটে! ষাট হাজার রুবল যৌতুক, আইভান গ্রাহ্যই করে না, না? তাছাড়া কাটেরিনা আইভানোভনার রূপ? সে লোভও নেই তার?

টাকার লোভের অনেক উর্ধ্বে আইভান, তুমি তাকে চেনো না। টাকা সে চায় না, সুখে তার অভিলাষ নেই। হয়তো দুঃখের সন্ধানেই সে ফিরছে।

থাক, জানা আছে। ওসব অভিজাতদের দিবাস্বপ্ন।

আঃ, মিশা! জানো না তুমি, আলিওশা বললে,—আইভানের আত্মায় বিপ্লবের আহ্বান। শিকলপরা ওর মন। সেই শিকল ও ভাঙতে চায়,—সন্দেহের শিকল, নিরুত্তর প্রশ্নের শিকল। আইভান লাখ টাকা চায় না, সে চায় তার প্রশ্নের উত্তর, তার অবিশ্বাসের নিরসন।

এতো তোমার নিজের কথা নয়, তোমার দাদার কথারই প্রতিধ্বনি তুমি করছ,—শুনিয়ে দিল রাকিতিন। ঈর্ষার হলাহল তার কথার স্বরে আর ভঙ্গিতে! বলে চলল সে,—আহা, সত্যিই তো! কতো সন্দেহ তার মনে, কতো বড়ো সমস্যা তার মাথায়! মূর্খের সমস্যা বললেও ভালো কথা বলা হবে। প্রবন্ধটা দ্যাখো না, বোকা-পণ্ডিতের প্রবন্ধ, আর তেমনি তার থিয়োরি। বলে কিনা আত্মার অমরত্ব যদি না থাকে, তাহলে ধর্ম বলেও কিছু থাকে না—যে যাই করুক না কেন, অন্যায় হয় না তাতে। শয়তান আর বদমাইসের পক্ষে ভারি মুখরোচক থিয়োরি। লক্ষ্য করোনি, তোমার আর এক ভাই মিটিয়া শুনেই কেমন তারিফ করে উঠেছিল,—হুঃ, এই বদমাইসের থিয়োরি নিয়ে এতো সমস্যা, এতো ব্যাকুলতা! ভাঁড়ামোরও একটা সীমা আছে। তুমি মনে রেখো, অমরত্বে বিশ্বাস না করলেও, মানুষ যা সত্য, যা ধর্ম, তার শক্তি নিয়ে বাঁচবেই। স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রী,—মনুষ্যত্বের কাছে অমরত্বের চেয়েও এরা অনেক বড়ো!

বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়েছিল রাকিতিন, হঠাৎ কী ভেবে সংযত করল নিজেকে। বাঁকা হাসি হেসে শেষ করল,—যাক, যথেষ্ট বলেছি, আর না। কিন্তু কী হোলো? হাসছ কেন তুমি? ভাবছ, আমিও বুঝি একটা বোকা ভূত?

না, না, তা কেন? আলিওশা বললে,—কী যে বলো, তোমাকে বোকা ভাবতে পারি আমি? আমি হাসছিলাম অন্য একটা কথা ভেবে।

কী ভেবে আবার ?

কথা বলতে বলতে এই যে তুমি এতোটা গরম হয়ে উঠলে, এতে আমার মনে পড়ল, কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার ওপর তোমারও নজর কম নেই। অনেক দিন আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন বুঝি, আইভানের ওপর তোমার রাগটা কিসের। হিংসের রাগ, তাই না ?

হিংসে ? বয়ে গেছে—কাটেরিনার জন্যেও না, তার টাকার জন্যেও না। তবে বিতৃষ্ণা বলতে পারো। কিসের জন্যে আইভানকে আমার ভালো লাগবে ? জানো, আমার নামে ও যা-তা বলে।

তোমার সম্বন্ধে আইভানকে ভালোমন্দ কোনো কথা বলতে আমি শুনিনি।

তুমি জানো, পরশুদিন কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার বাড়িতে বসে সে সমানে আমার দুর্নাম করেছে। এতেই বোঝো কে কাকে হিংসে করে। বলেছে যে আমি যদি চটপট সাধু হয়ে না যাই, তাহলে নিশ্চয়ই পিটার্সবুর্গে গিয়ে সেখানকার শাঁসালো একটা পত্রিকায় বাঁধা লেখকের কাজ নেব। দশ বছর ধরে ঐ কাগজে লেখার পর শেষ পর্যন্ত কাগজটার মালিক হব আমি। আমার লেখায় থাকবে সংস্কৃতি আর উদারনীতির পরিচয়,—তার ওপর সাম্যবাদের পালিশ। কিন্তু আমার নজর থাকবে দু-দলের ওপরই, দু-পক্ষকেই আমি হাতে রাখব নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে। সাম্যবাদের যতো বুকনিই আমি আওড়াই, তাতে আমার মোটা পয়সা করা, আর কোনো একটা ইহুদী মহাজনের সাহায্যে সেই পয়সা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা আটকাবে না। শেষ পর্যন্ত আমি পিটার্সবুর্গে মস্ত এক বাড়ি তুলব। সে বাড়ির নিচের তলায় থাকবে আমার বই প্রকাশের অফিস, আর ওপরের তলাগুলোয় থাকবে ভাড়াটের দল। এমন কি পিটার্সবুর্গের কোন্ অঞ্চলে আমার বাড়িটা হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে।

হাসি চাপতে পারল না আলিওশা, সে বললে,— বাঃ, বাঃ, চমৎকার ! যা বলেছে ও তা খাঁটি সত্যি, হবেই হবে দেখো।

ওঃ, আলেক্‌সি ফয়োডোরোভিচ, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমারও আটকায় না দেখছি !

আরে না, না, ঠাট্টা করব কেন ? কী একটা অন্য কথা মনে পড়তে আমার হাসি এসেছিল। ভালো কথা, এসব তুমি শুনলে কোথা থেকে ? আইভান যখন কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার বাড়িতে বসে এসব কথা বলছিল, তুমি নিশ্চয়ই তখন সেখানে ছিলে না ?

আমি ছিলাম না, তবে ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ ছিল। গ্রুশেংকার ঘরে বসে কাল ডিমিট্রি নিজে এ কাহিনী বলছিল। আমি গ্রুশেংকার শোবার ঘরে বসে নিজের কানে শুনেছি। ডিমিট্রি পাশের ঘরে ছিল বলে গ্রুশেংকার শোবার ঘর থেকে বার হবারও উপায় আমার ছিল না।

ওহো, তাইতো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে গ্রুশেংকা তোমার আত্মীয়া !

এতোক্ষণে বেদম চটে উঠল রাকিটিন,—অ্যাঁ, একথা তোমায় কে বলেছে ?

তোমাদের কারামাজভদের ধরণই এই রকম। তোমার বাপ তো পরের রক্ত শ্বেছে, তাই গর্ব, তোমাদের মতো বনেদী বংশ আর নেই। আমি পুরোহিতের ছেলে, তাই বলে যা-তা অপমান করবে নাকি? গ্রুশেংকা বাজারের একটা বেশ্যা, তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা?

লাল হয়ে উঠল আলেক্সি। তাড়াতাড়ি সে বললে,—মাপ করো ভাই আমাকে, আমি তোমাকে অপমান করব ভেবে বলিনি। গ্রুশেংকা যে এমনি ধারা মেয়ে তা আমি জানতাম না। আমি শুনেছিলাম, ও তোমার আত্মীয়া। তাছাড়া তুমি প্রায়ই ওর বাড়ি যাও, প্রেম করতে যে যাওনা তা তুমি নিজ মুখেই বলেছ। সত্যি, গ্রুশেংকা মেয়েটা এতো খারাপ? আর যে যাই করুক, তুমিও এতো ঘৃণা করো তাকে? তবে···

তবে, আমি ওর বাড়ি যাই কেন? আমার খুশি, তোমার সে জানার দরকার নেই। তবে আত্মীয়তার কথা যা বললে,—ওর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে আমার চাইতে তোমার বাবা-দাদা অনেক ব্যস্ত, এই কথাটা মনে রেখো। যাক, খুব হয়েছে। তুমি এবার রান্নাঘরে যাও। আরে, আরে, ও কি হোলো? খুব দেরি করে ফেললাম? খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি? না, নিশ্চয়ই তোমার বাপ আবার একটা গোলমাল বাঁধিয়েছে। ঐ দ্যাখো, তোমার বাপ ফাদার সুপিরিয়রের বাড়ি থেকে বার হয়েছে, তার পেছনে ছুটছে তোমার দাদা আইভান। বাড়ির সামনে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফাদার ইসিডোর চীৎকার করছেন, ওদিকে তাঁর দিকে হাত নেড়ে তোমার বাবাও চেঁচাচ্ছে। গালাগাল দিচ্ছে নিশ্চয়ই। বাঃ, ঐ তো মিউসভও দেখি গাড়িতে উঠলেন। মাক্সিমভও দৌড়ুচ্ছে দেখছি। বলি, হোলো কী? অ্যাঁ, ভোজসভায় মারামারি! কে কাকে ঠ্যাঙালো বলো তো?

রাকিতিনের উত্তেজনা অলীক নয়। সত্যই ফাদার সুপিরিয়রের ভোজসভায় অত্যন্ত লজ্জাকর একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল সবে মাত্র।

আট

ফাদার সুপিরিয়রের গৃহে আইভানকে সঙ্গে নিয়ে মিউসভ যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁর মনে দুর্ভাবনার ও অনুশোচনার অন্ত ছিল না। সৌজন্য আর ভব্যতার প্রতিমূর্তি তিনি,—যে লোকটাকে ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তাঁর পক্ষে শোভন ছিল, ফাদার জোসিমার আশ্রমে তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁকে কিনা আত্মসংযম হারাতে হোলো—এ কি কম লজ্জার? ফাদার সুপিরিয়রের গৃহের দরজায় পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি ভাবতে লাগলেন,—না, এখানকার সাধুদের দোষ কী? তারা তো অতি ভদ্র। জোসিমার ঘরে যা হবার তা হয়ে গেছে, এবার ভদ্রতা কাকে বলে আমিও দেখাব। আজেবাজে কোনো তর্ক করব না, ভদ্রতা দিয়ে এদের আমি জয় করব। ওরা বুঝবে যে ঐ মূর্খ অসৎ ভাঁড়টার সঙ্গে সত্যি আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

তিনি এও স্থির করলেন যে কাঠকাটা আর মাছ ধরার অধিকার নিয়ে মঠের সঙ্গে যে

মামলা চলেছে, সেই মামলাও তিনি এবার তুলে নেবেন। কোথায় জঙ্গলের কাঠ আর কোথায় নদীর মাছ—কে খোঁজ রাখে তার! মিছিমিছি গোঁয়ার্তুমির ঝগড়া জিইয়ে রেখে কী লাভ?

ফাদার সুপিরিয়রের ঘরে ঢুকে তার এই সব সুপরিকল্পনা মনের মধ্যে আরো দৃঢ় হোলো। ফাদার সুপিরিয়রের গৃহে দুটিমাত্র ঘর। ঘর দুটি ফাদার জোসিমার ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো আর আরামদায়ক হলেও আড়ম্বরের বাহুল্য বর্জিত। সামনের ঘরটির আসবাবপত্র মেহগনি কাঠের, চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার, নিতান্ত সাধারণ শান-বাঁধানো ঘরের মেঝে। কিন্তু সবকিছু পরিচ্ছন্নতায় ঝকঝক করছে, তাছাড়া নানা রকমের সুন্দর ফুল সাজানো রয়েছে জানলায় জানলায়। ঘরের মাঝখানে পাতা খাবার টেবিলটি বেশ বড়ো। ধবধবে টেবিলক্লথ, মঠে প্রস্তুত নানা প্রকার পানীয়ের সুদৃশ্য কয়েকটি পাত্র। ভোদ্‌কার পাত্র অবশ্য নেই। রান্নাঘরে ঢুকে রাকিতিন পরে খবর নিয়েছিল যে সুখাদ্যের বন্দোবস্তও হয়েছিল প্রচুর। রাকিতিনের অভ্যাস ছিল সব কিছুতেই মোড়লি করা। তাই ফাদার সুপিরিয়রের রান্নাঘরেও ছিল তার যাতায়াত। সে নিজেকে মস্ত একটা কিছু ভাবত, তার বৃথা আত্মশ্লাঘার ইন্ধন যোগাতো কুটিল মনের পরশ্রীকাতরতা।

এই ভোজসভায় অবশ্য রাকিতিনের মতো সামান্য লোকের যোগদানের উপায় ছিল না। তাই সে ছিল দূরে দূরে। মঠের অধিবাসীদের মধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ফাদার ইয়োসিফ, ফাদার পাইসি, আর অপর একজন সাধু। আইভান আর কাল্‌গানোভকে নিয়ে মিউসভ যখন পৌঁছলেন তখন তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। অপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাক্সিমভ, সেও অপেক্ষা করছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে। অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ফাদার সুপিরিয়র ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। শীর্ণ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, পাকধরা মাথার চুল, গম্ভীর মুখে আত্মনিগ্রহের ছাপ। সারা দেহে কর্মিষ্ঠতার পরিচয়। নীরবে তিনি অতিথিদের অভিবাদন করলেন। এবার কিন্তু সকলেই তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্যে মাথা নিচু করল। আইভান আর কাল্‌গানোভ নিতান্ত সরলভাবে তাঁর হস্ত চুম্বন করল। মিউসভও তাই করতে গিয়েছিলেন, তার আগেই অবশ্য ডানহাতটি সরিয়ে নিলেন ফাদার সুপিরিয়র।

গম্ভীরকণ্ঠে সসম্ভ্রমে মিউসভ বললেন,—আপনার কাছে আমরা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি এজন্য যে আপনার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক অনুপস্থিত। তিনি হচ্ছেন ফিয়োডোর পাভলোভিচ। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আজ ফাদার জোসিমার আশ্রমে তাঁর ছেলের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে করতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কয়েকটা গর্হিত কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে তিনি নিজের অন্যায় উপলব্ধি করে খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি এই ভোজে উপস্থিত হবেন না। আমাকে আর তাঁর ছেলে এই আইভানকে বলে গেছেন, আপনি যেন নিজগুণে তাঁকে ক্ষমা করেন, তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সময় মতো তিনি এই অন্যায়ের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করে যাবেন।

এমন চমৎকার গুছিয়ে প্রস্তাবনাটা করে মিউসভের মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বিরক্তিভাব কেটে গেল, আবার প্রাণে জেগে উঠল প্রসন্ন বিশ্বপ্রেম।

ফাদার সুপিরিয়র সামান্য একটু মাথা নিচু করে গম্ভীরভাবে তাঁর কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেন,—উনি যে এলেন না এজন্যে আমিও আন্তরিক দুঃখিত। হয়তো সকলের সঙ্গে এক টেবিলে বসলে ও'র মনের সব উষ্মা কেটে যেত। যা হোক, আপনারা দয়া করে বসুন।

খৃষ্টমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ফাদার সুপিরিয়র প্রার্থনা করলেন। সকলেই ভক্তিভরে মাথা নিচু করলেন। মাক্সিমভ আবেগে গদগদ হয়ে বুকের ওপর দুহাত জোড় করে চেপে ধরল।

এদিকে ঠিক এই মুহূর্তেই ফিয়োডোর পাভলোভিচের মাথায় চরম কৌতুকটা এল। সত্যিই সে ভেবেছিল বাড়ি ফিরে যাবে। ফাদার জোসিমার আশ্রমে অমনি ব্যবহার করার পর কিছুই যেন হয়নি এমনি ভান করে নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়া সত্যিই সে মনে করেছিল সম্ভব নয়। কিন্তু হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছে গাড়িতে পা দিয়েই সে থমকে গেল। মনে মনে সে ভাবলে,—ওঃ, তোমরা সবাই মস্ত পণ্ডিত আর আমি ভাঁড়, তোমরা সবাই মস্ত গুণী আর আমি একটা নচ্ছার! তাই না? দাঁড়াও, আর একটু ভাঁড়ামি করে দেখাচ্ছি কে ভাঁড়,—তোমরা না আমি! জ্বালা ধরল তার বুকের মধ্যে। সবাইএর ওপর সে প্রতিশোধ নেবে, বুঝিয়ে দেবে ভালো করে। তার মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে কে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—আচ্ছা, অমুককে তুমি অতো ঘৃণা করো কেন? ও তোমার কী করেছে? নির্লজ্জ অহংকারে সে উত্তর দিয়েছিল,—ও আমার করবে কী? আমিই একবার আচ্ছা জব্দ করেছিলাম ওকে। তারপর থেকেই ওকে ঘৃণা করি।

সেই কথাটা মনে পড়ে ফিয়োডোরের মুখে কুটিল হাসি ফুটল। ইতস্তত করল সে এক মুহূর্ত। তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠল তার চোখ, অস্ফুট স্বরে বললে,—হুঁ, শুরু যখন করেছি, শেষটাই বা বাদ দিই কেন? তার মনের ভাবটা হোলো এই রকম,—লজ্জা তো আমার বিন্দুমাত্র নেই, আমার নির্লজ্জতাতে ওরা দেখি কতো লজ্জা পায়!

গাড়িওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে সে মঠের মধ্যে আবার ঢুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা পৌঁছল ফাদার সুপিরিয়রের গৃহদ্বারে। কোনো নির্দিষ্ট মতলব তার মাথায় তখনো আসেনি, তবে সে জানে, প্রয়োজন হলে আইনত অপরাধ বাঁচিয়ে চরম অসভ্যতা করতেও সে পিছপাও হবে না। সে জানে, অবস্থা অনুসারে নিজেকে সংযত করতেও সে পারে,—সে যে ভাঁড়। সবে প্রার্থনা শেষ হয়েছে, অতিথিরা টেবিলে বসতে যাচ্ছেন, ঠিক এমনি সময়ে সে এসে দাঁড়াল ভোজন-কক্ষের দরজায়। সকলের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠে চিৎকার করে ঘোষণা করল,—হেঁ-হেঁ বাবা, ভেবেছিলে আমি সরে পড়েছি। এই দ্যাখো, আসল সময়ে ঠিক এসে হাজির হয়েছি।

হঠাৎ চমকে উঠে নির্বাক বিস্ময়ে সকলে তাকাল তার দিকে। প্রত্যেকেরই মনে হোলো, এইবার মহা কেলেঙ্কারি একটা হোলো বলে। মিউসভের মনের প্রশান্তি মুহূর্তে মুছে গেল। সারা বুক আবার ভরে উঠল বিতৃষ্ণার কালো বিষে, একেবারে যেন ক্ষেপে উঠলেন ভদ্রলোক।

তাড়াতাড়ি টুপিটা হাতে তুলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তিনি ক্রোধকম্পিত গলায় চিৎকার করে উঠলেন,—পারব না, এ আমি সহ্য করতে পারব না, কিছুতেই না।

পারবে না? কিছুতেই পারবে না? কী পারবে না হে ভায়া? সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল ফিয়োডোর, তারপর ফাদার সুপিরিয়রকে বললে,—বলুন প্রভু, আমি থাকব না ফিরে যাব? আজ আমি আপনার অতিথি কিনা বলুন?

সুপিরিয়র বললেন,—নিশ্চয়ই, স্বাগত আপনি।

অন্য নিমন্ত্রিতদের দিকে ফিরে তিনি বললেন,—আপনাদের আমি একান্ত অনুরোধ করছি, এ মুহূর্তে আপনাদের বিবাদ আপনারা ভুলে যান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে প্রসন্ন মনে এক পরিবারের মতো এক টেবিলে বসুন, আমার এই দরিদ্র আয়োজন সার্থক হোক।

না, না, কিছুতেই না, আবার চেঁচিয়ে উঠলেন মিউসভ,—এ অসম্ভব।

সত্যিই তাঁর পক্ষে আত্মসংবরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

বেশ, তোমার পক্ষে যদি অসম্ভব, তাহলে অসম্ভব আমার পক্ষেও। তুমি যদি থাকো তো আমিও থাকব। তুমি উঠে যাও, আমিও উঠে যাচ্ছি। শুনুন প্রভু, আপনি সকলকে বললেন, এক পরিবারের মতো ব্যবহার করতে, আর এ লোকটা কিনা আমার আত্মীয় হয়ে আত্মীয়তা স্বীকার করে না। ঠিক কিনা? কি হে ভন সোন্, বলো না? অ্যাঁ, তুমি ভন সোন্ই তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়। বাঃ, তুমিও জুটেছ এখানে?

শেষের কথাগুলো মাক্সিমভ নামে বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীটির উদ্দেশ্যে। মাক্সিমভ বললে,—আমাকে বলছেন?

তোমাকে নয় তো কাকে, ফাদার সুপিরিয়রকে? উনি কি ভন সোন্?

কিন্তু আমিও তো ভন সোন্ নই। আমার নাম মাক্সিমভ।

বললেই হোলো? আলবৎ তুমি ভন সোন্। হ্যাঁ, ঠিক সেই লোক। শুনুন কর্তা, ভন সোনের কাহিনী। একটা বেশ্যা-বাড়িতে খুন হয়েছিল লোকটা। খুন করে তার বুড়ো দেহটা একটা কাঠের বাক্সর মধ্যে পুরে বেশ্যারা সেই বাক্স মাল-গাড়িতে তুলে একেবারে পিটারসবুর্গ থেকে মস্কোতে চালান করে দিয়েছিল। মড়াটাকে যখন বাক্সবন্দী করে তখন বাজনা বাজিয়ে গান করেছিল বেশ্যার পাল। এই যে লোকটা দেখছেন, এ সেই ভন সোন্, পুনর্জন্ম পেয়ে উঠে এসেছে।

কী ব্যাপার? এসব বলছে কী?

মিউসভ বললেন কাল্গানোভকে,—চলো, আর না এখানে।

ফিয়োডোর পাভলোভিচের গলা ভেঙে পড়ল কর্কশ চিৎকারে,—না, যাওয়া চলবে

না। এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। জোসিমার আশ্রমে বসে আমি সাধুবাবাদের মালপোয়া ভোজের কথা বলেছিলাম বলে আমার পরমাত্মীয় পিয়তর ভায়া আমার ওপর রাগ করেছিল। ভায়া আমার মস্ত পণ্ডিত আর বনেদী লোক, যেমনি ওর দেমাক, তেমনি অভিমান। আমি লোকটা সাদামাটা। লোকে বলে আমি ভাঁড়, তাই আমার অভিমান নেই, আছে সাঁত্যকারের মান। আমি আজ এখানে কেন আসতে চেয়েছিলাম জানেন? সমস্ত ব্যাপারটা নিজের চোখে ভালো করে দেখতে, আর যা বলবার তা বলতে। আমার ছেলে আলেক্সি এখানে রয়েছে পরিত্রাণের আশায়। আমি তার বাবা, তার ভালোমন্দ আমিই দেখব। আমি ভাঁড়ামি করেছিলাম বটে, কিন্তু সব কিছু লক্ষ্য করছিলাম। প্রভু, আপনারা এসব শুরু করেছেন কী? যে পড়ে সে পড়েই থাকে, এই হোলো সাধারণ কথা, কিন্তু সে যদি আবার উঠতে চায়? ধর্মের বিধান হোলো, পাপ স্বীকার করো। এই স্বীকারোক্তি মস্ত একটা ধর্মানুষ্ঠান। নিতান্ত গোপনে গুরুর কাছে এই স্বীকারোক্তি করতে হয়, সবাইএর সামনে তা করলে তার কোনো দাম থাকে না। কিন্তু আপনারা এই স্বীকারোক্তিকে একটা কেচ্ছায় নামিয়ে এনেছেন। এ কী অন্যায় ব্যাপার! এ নিয়ে আমি কর্তাদের কাছে লিখব, আর আমার ছেলে আলেক্সি, ওকেও আমি সরিয়ে নিয়ে যাব এখান থেকে।

আসলে ফিয়োডোর একটা দুর্বল জায়গার খোঁজ করছিল যেখানে সে আঘাত দিতে পারে। এক সময় আমাদের এই মঠ ও অন্যান্য মঠ সম্বন্ধে কুৎসা রটেছিল,—সে কুৎসা আর্চবিশপের কানেও পৌঁছেছিল যে, প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান ছেড়ে সাধুভজনাই প্রবল হয়ে উঠছে ইত্যাদি। এ সমস্ত রটনার মূলে কোনো ভিত্তি ছিল না বলে অচিরে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল এদের। কিন্তু ফিয়োডোর পাভলোভিচের ঘৃণিত মন এই পুরোনো কুৎসাকে নতুন করে ঝালাবার সুযোগ নিল। কোনো ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্বন্ধেই তার কিছুমাত্র বোধ ছিল না, তার এই অভিযোগও ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন, তবু একবার যখন বকতে শুরু করেছে তখন তাকে থামায় কে?

পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ বললেন,—নিয়ে যেয়ো তোমার ছেলেকে। এখন বাজে কথা থামাও।

ফাদার সুপিরিয়র শান্তকণ্ঠে বললেন,—মাপ করবেন, এ কথা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেই আছে যে, যে লোক তোমার নিন্দা করবে, অন্যায় করে কুৎসা রটনা করবে, সেও তোমার বন্ধু। সে তোমার সংশোধক, সে তোমার পরিত্রাতা। অতএব আপনার কথায় আমাদের উপকারই হোলো। আপনি আমার মাননীয় অতিথি, ধন্যবাদ।

নত হয়ে ফিয়োডোরকে অভিবাদন করলেন সুপিরিয়র।

আরে থামুন মশাই, থামান আপনার ধর্মকথার বাঁধাবুলি! যতো সব মিথ্যে আর জোচ্চুরি। মুখে মধু আর হাতে ছুরি। এসব আমরা ঢের দেখেছি। ঐযে বললাম না, খালি মালপোয়া সাঁটলেই পুণ্য হয় না, আর মাঝে মাঝে উপোস করলেই স্বর্গের রাস্তা খোলে না। ইঃ! ও রকম উপোস আমিও অনেক করতে পারি। সাধুবাবারা, সোজা কথাটা বলি, সারা জীবন মঠের মধ্যে বসে আর পরের

পয়সায় মালপোয়া না খেয়ে দুনিয়ায় বাঁদ বার হয়ে আসতে তাহলে আর এতো সাধুগিরি ফলাতে হোতো না। ওঃ! টেবিলে তো দেখছি ভালো ভালো খাবার আর বোতল-গেলাসের ছড়াছড়ি,—শুধু মালপোয়া, কুমড়ো হলেও না হয় হোতো। বলি, এসব যোগাচ্ছে কে? দেশের চাষী, দেশের শ্রমিক,—তাদের রক্তজল-করা পয়সায় ধর্মের নামে ফুর্তি চলেছে। সাধুবাবা না হাতি! রক্ত-চোষা ছিনে জোঁক সব!

ফাদার ইয়োসিফ বললেন,—না, এতো আর সহ্য করা যায় না।

গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন ফাদার পাইসি। কালুগানোভকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন মিউসভ।

কী হোলো? মিউসভ ভায়া সরে পড়ল? আচ্ছা, আমিও এবার চললাম তাহলে। সাধুবাবারা, আর এখানে আসছি না, হাজার ডাকলেও না। একবার হাজার রুবল দিয়েছি, আর একটি পয়সাও না।

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বক্তৃতার ঢঙে ফিয়োডোর বলে চলল,—এইবার আমার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। এই মঠ,—এই মঠের জন্যে সারা জীবন আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, অনেক কান্না কেঁদেছি। আমার সেই ছেলেমানুষ পাগল বৌটা,—তার মন তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছিলে। এমন দুর্নাম নেই যা তোমরা দেশে বিদেশে আমার নামে ছড়াওনি। চৈতন্য হয়েছে আমার! হাজার রুবল! একটা আধলাও তোমরা আমার কাছ থেকে আর পাবে না।

প্রকৃতপক্ষে ফিয়োডোরের জীবনের সঙ্গে আমাদের মঠের কোনো সম্পর্কই ছিল না, তার জীবনযাত্রা নিয়ে কোনো কথাই কখনো কোনো মঠবাসী বলেনি। কিন্তু ভাঁড়ামির মধ্যেও আন্তরিকতার ভাব আনতে ফিয়োডোরের মতো ওস্তাদ আর দ্বিতীয় ছিল না। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল।

ফিয়োডোরের মুখের এই জঘন্য অভিযোগ ফাদার সুপিরিয়র মাথা হেঁট করে শুনছিলেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন,—একথাও ধর্মগ্রন্থে আছে, যতো মিথ্যা নিন্দাই আসুক, প্রসন্ন মনে সে নিন্দার ভার বহন করো, ক্ষমা করো নিন্দুককে। তাই আমরা করলাম।

থাক্ থাক্, অনেক ভড়ং দেখেছি, আর দেখিয়ো না বাবা। আমি চললাম, কিন্তু আমার ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাব। এই যে আইভান, লক্ষ্মী ছেলে, সাদা ঘোড়া আমার, চলো আমার সঙ্গে। ওহে ভন সোন্, তুমি ভায়া আর মায়া বাড়িয়ে কী করবে এখানে? চলো আমার সঙ্গে শহরে। সেখানে আচ্ছা খানাপিনা চলবে, সব ব্যবস্থা আছে আমার। দুশো ফুর্তির বন্দোবস্ত আমার আছে। এমন সুযোগ আর দুবার পাবে না, তা বলে দিয়ে গেলাম।

দু-হাত সজোরে নাড়তে নাড়তে ফাদার সুপিরিয়রের গৃহ থেকে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হোলো ফিয়োডোর।

ঠিক এই মুহূর্তেই রাকিতিন দূর থেকে তাকে দেখল, আলিওশাকেও দেখাল।

ছেলের ওপর চোখ পড়তেই দূর থেকে হাঁক দিল ফিয়োডোর,—আলেক্সি! আজই

তুই এখান থেকে ফিরে যাবি আমার কাছে। একেবারে বিছানা-পত্তর সব বেঁধে নিয়ে যাবি, কোনো দিন আর এখানে ফিরে আসবিনে, বুঝলি ?

আলিওশা অদূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। গাড়িতে উঠল ফিয়োডোর। হেঁট মুখে তাকে অনুসরণ করল আইভান। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই ঘটল ভাঁড়ামির চূড়ান্ত দৃশ্য। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির পাশে ছুটে এল মাক্সিমভ। ভয় তার, এই বুঝি দেরি হয়ে গেল, গাড়ি দিল ছেড়ে। মুখে তার বোকাবোকা খোসামুদে হাসি।

এই যে দাদা, আমি এসে গেছি। বাদ দেবেন না, আমাকেও নিয়ে চলুন সঙ্গে!

অ্যাই দ্যাখো! মহাফুর্তিতে চিৎকার করে উঠল ফিয়োডোর,—বলিনি, এ ব্যাটা ঠিক ভন সোন, কবর থেকে উঠে এসেচে! কী হোলো বাবা? চলে এলে যে? ওখানকার ডিনারে মন উঠল না বুঝি? নাও, উঠে পড়ো। কী মজাই না হবে! ওরে আইভান, একে একটু জায়গা দে তো!

আইভান ততোক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছিল। সে কোনো কথা না বলে প্রচন্ড একটা ধাক্কা দিল মাক্সিমভের বুকে। বুড়ো একেবারে ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িওয়ালাকে এক ধমক দিল সে,—চালাও গাড়ি!

ফিয়োডোর বললে,—আরে, আরে! এ কী হোলো? এটা কী করলি?

ততোক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। কোনো উত্তর দিল না আইভান।

ফিয়োডোর শুধু বললে,—বাঃ! ভ্যালা আমার ছেলে রে!

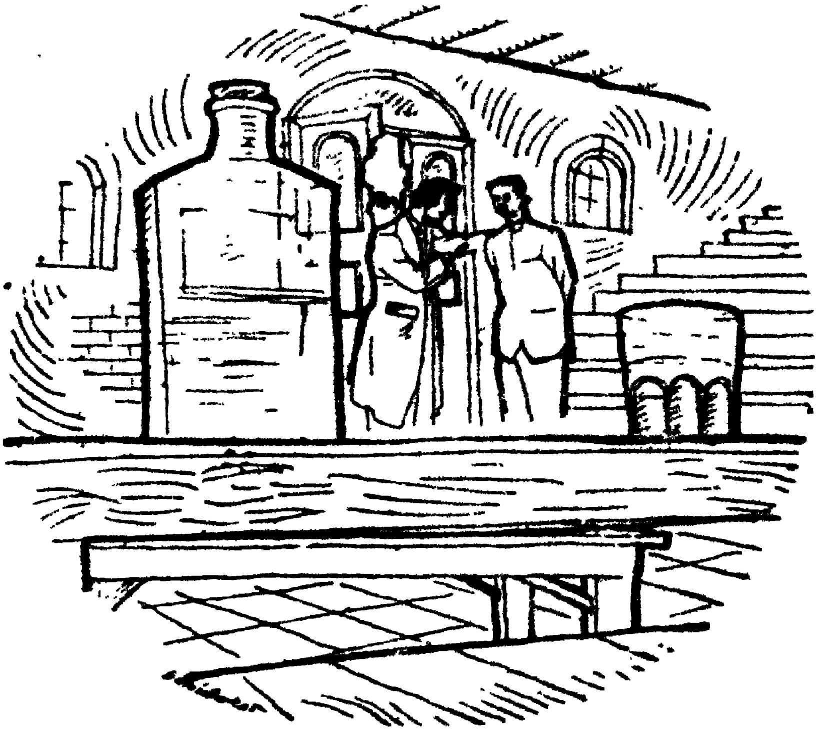
মিনিট দুই গাড়ি চলবার পর ছেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার বললে ফিয়োডোর,—বাঃ, বেশ! এই মঠে আসার প্রস্তাব তো তুমিই করেছিলে, তাগিদ তো দিয়েছিলে তুমিই। এখন আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন?

রাগতস্বরে আইভান উত্তর দিল,—থাম, অনেক বাজে বকবক করেছ। এবার একটু বিশ্রাম করো।

আবার দু-মিনিট কাটল। উসখুস করে ফিয়োডোর বললে,—খানিকটা ব্র্যান্ডি খেলে কিন্তু বেড়ে লাগত এখন। তা বাড়ি গিয়েই খাব। কি বলিস? তুইও একটু পাবি।

আইভান নীরব। মিনিট দুই পরে আবার ফিয়োডোর বললে,—তা তোমরা রাগই করো, আর যাই করো, আলিওশাকে আমি মঠ থেকে বাড়ি নিয়ে আসব। সাধুর চেলাগিরি ওর অনেক হয়েছে, দরকার নেই আর।

এবারও আইভান কোনো মন্তব্য করল না। একবার মাত্র কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল রাস্তার দিকে। বাকি পথটা নির্বাকভাবেই কাটল পিতাপুত্রের।



তৃতীয় অধ্যায় : বাসনা বিলাস

এক

কারামাজভদের বাড়ি শহরের ঠিক মাঝখানে নয়, একেবারে শহরতলীতেও নয়। দোতালা বাড়িটি পুরোনো হলেও সুদৃশ্য। ছাইরঙের দেওয়াল, লালরঙের লোহার ছাদ। পরিসরে বেশ বড়ো, বসবাসের সকল সুবিধাযুক্ত। মজবুতও, টিকবে আরো অনেক বছর। সিঁড়ির দেওয়ালে ছোট ছোট নানা খুপরি, তার মধ্যে একপাল ইঁদুরের বাসা, ওরা ফিয়োডোর পাভলোভিচের পেয়ারের। সে বলে,—ইঁদুরগুলো তার নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় সঙ্গী। ভৃত্যদের জন্যে আলাদা একটা বাড়ি ছিল। সন্ধ্যার পর ফিয়োডোর ভৃত্যদের বার করে দিয়ে নিজের বাড়ির খিল এঁটে দিত। রান্নাবান্না ভৃত্যদের বাড়িতে হোতো, সেখান থেকে উঠান পার হয়ে সকাল বিকেল প্রভুর খাবার বহন করে আনা হোতো। মূল বাড়িতে ভৃত্য সমেত পাঁচশ লোকের স্থান ছিল,—কিন্তু সেখানে এখন বাসিন্দা বলতে ফিয়োডোর আর তার ছেলে আইভান। ভৃত্যদের বাড়িতে থাকত মাত্র তিনজন,—বুড়ো গ্রিগরি, তার বৃদ্ধা স্ত্রী মারফা, আর স্মারডিয়াকভ বলে একটি ছোকরা। বুড়ো গ্রিগরির কথা আগেই বলেছি, অত্যন্ত সৎলোক সে, শত অত্যাচারেও অবিচল তার প্রভুভক্তি। তার স্ত্রী মারফা ইগনাটিয়েভ্‌না সারা জীবন অচলা শ্রদ্ধায় স্বামীর কথা মেনে এসেছে, যদিও সারা জীবন সে বিদ্রোহ করেছে এই দাসত্বের বিরুদ্ধে। স্বামীকে বলেছে, চাকরি ছেড়ে পুঁজিপাটা নিয়ে মস্কোতে গিয়ে ছোটখাটো একটা দোকান খুলে বসতে। গ্রিগরি মেয়েমানুষের কথায় কান দেয়নি, বৃদ্ধ প্রভুকে পরিত্যাগ করাকে সে নিদারুণ কর্তব্যহীনতা বলেই জ্ঞান করেছে। স্ত্রীকে সে ধমকে বলেছে,—কর্তব্যজ্ঞান কাকে বলে বোঝো ?

বুঝি, বুঝি, উত্তরে বলেছে স্ত্রী,—কিন্তু সারাটা জীবন এখানে পড়ে থাকা কোন্ কর্তব্যজ্ঞান তা বুঝিনে।

থামো তুমি, অনেক বুঝেছ, আর বুঝে কাজ নেই।

সারা জীবন তারা থেকেই গেল ফিয়োডোর পাভলোভিচের সংসারে। ফিয়োডোরের কাছ থেকে নিয়মিত একটা মাহিনাও তারা পেত, তা যতো কমই হোক। গ্রিগরি জানত, তার প্রভুর ওপর তার একটা সুনিশ্চিত প্রভাব আছে। ফিয়োডোর যেমন ধূর্ত ভাঁড় ছিল, তেমনি ছিল গোঁয়ার ; কিন্তু জীবনের নানা ব্যাপারে ধূর্ততা বা গোঁয়ার্তুমি সব সময় তার কাজে আসত না,—তখন নিতান্ত অসহায় মনে হোতো নিজেকে। নিজের দুর্বলতা সে জানত,—ভয় করত এই দুর্বলতাকে। এই সমস্ত দুর্বল ক্ষণে গ্রিগরির মতো পরম বিশ্বাসী একজন অনুচরের বড়ো প্রয়োজন ছিল তার। জীবনে অনেকবার ঘটেছে, যখন গ্রিগরি না বাঁচালে ফিয়োডোরকে লোকের হাতে মার খেয়ে মরতে হোতো। গ্রিগরিই তাকে রক্ষা করেছে, আবার বকুনিও দিয়েছে সে-ই। কিন্তু মারের ভয়ই বড়ো ভয় নয়। অনেক গভীরতর আতঙ্কের মুহূর্তে তার জীবনে এসেছে বিচিত্র সমস্যা।

আর অনুভূতি নিয়ে, যখন ফিয়োডোর এই একান্ত সর্বসমর্পিত পরম বিশ্বাসী লোকটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে পারেনি। মত্ততার এক এক মুহূর্তে হঠাৎ নৈতিক দুর্বলতা আর কুসংস্কার-জনিত আতঙ্কে আকুল হয়েছে সে, সেই আকুলতা শারীরিক যন্ত্রণার মতো তাকে বেজেছে। বলেছে সে,—এ রকম সময় আমার মনে হয় প্রাণটা যেন ঠিক গলার কাছে এসে আটকে আছে। এমনি ভয়ংকর মুহূর্তে ভৃত্যদের ঘরে ঐ গ্রিগরির উপস্থিতিই সাহস দিয়ে বাঁচিয়েছে তাকে। গ্রিগরি—যে শক্ত সমর্থ লোক, প্রভুভক্তিতে যে অচঞ্চল, যে তার সমস্ত লাম্পট্যের সাক্ষী, যে তাকে অনুযোগ করে না, ভয় দেখায় না, বাধা দেয় না—সেই তাকে রক্ষা করবে। রক্ষা করবে কার হাত থেকে? জানে না সে। মনে হয়, ভীষণ কিছু, ভয়ংকর কিছু, তার হাত থেকে। এমনি অনেকবার হয়েছে যে, গভীর রাত্রে ফিয়োডোরের ঘুম নেই, মাথার মধ্যে জটপাকানো কতো দুশ্চিন্তা,—সে ভৃত্যদের ঘরে গিয়ে গ্রিগরিকে ডেকে তুলেছে,—ডেকে এনেছে নিজের শোবার ঘরে। পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে আজে-বাজে কিছুটা কথাবার্তার পর শান্ত হয়েছে তার মন, ঘুম এসেছে চোখে। এই রকমই আর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ফিয়োডোরের হয়েছিল আলিওশা যখন এল। আলিওশা সব কিছু দেখে, দেখে তার দিনরাত্রের জঘন্য জীবনযাত্রা, অথচ অনুযোগ করে না কোনো, একটি কথা বলে না মুখ ফুটে। বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষ নেই,—লম্পট বুড়ো বাপটার জন্যে আছে শুধু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। বহুদিনের আত্মীয়তা-সম্পর্কবিহীন সত্যিকারের নির্বান্ধব ফিয়োডোর আলিওশাকে কাছে পেয়ে নতুন এক অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হোলো,—ভালোবাসা পাবার, ভালোবাসবার অনুভূতি। আলিওশা যখন তাকে ছেড়ে গেল, তখন মনে মনে সে স্বীকার করল,--সারা জীবন যা শেখেনি বা শিখতে চায়ওনি এমনি এক বিচিত্র শিক্ষা সে পেয়েছে এতোদিনে।

পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে ফিয়োডোর পাভলোভিচের প্রথমা স্ত্রী আডেলাইডা আইভানোভ্‌নাকে গ্রিগরি ঘৃণা করত। ফিয়োডোরের দ্বিতীয়া স্ত্রী আধপাগল সোফিয়া আইভানোভ্‌নাকে কিন্তু খুবই স্নেহ করত সে, প্রভুর নানা অত্যাচার আর প্রতিবেশিদের নানা দুর্নাম থেকে রক্ষা করত তাকে সযত্নে। এই ভাগ্যহতা বধূটিকে সে যে ভালোবাসত তা যেন পুণ্যকর্ম,—বধূটির মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও কারো মুখে তার নামে সামান্যতম কটুকথাও সে শুনতে পারত না। গ্রিগরির বাহ্যিক রূপটা ছিল রুক্ষ গম্ভীর সংযতবাক্। বাইরে থেকে তার ব্যবহার দেখে এটুকুও বোঝা যেত না সে তার সারা জীবনের সঙ্গিনী মৃদুস্বভাবা স্ত্রীকে ভালোবাসে কিনা,—যদিও স্ত্রী জানতো, সত্যই সে স্বামীর কতোটা প্রেমের পাত্রী।

গ্রিগরির স্ত্রী মার্থা ইগ্‌নাটিয়েভ্‌নার বুদ্ধির অভাব ছিল না, বরং সাংসারিক বিষয়ে তার বুদ্ধি বা বিজ্ঞতা ছিল স্বামীর চেয়ে বেশি। কিন্তু জীবনে সে স্বামীর কথার অন্যথা করেনি, বারেকের জন্যেও বিচলিত হয়নি স্বামীভক্তিতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া কদাচিৎ অন্য কোনো কথাবার্তা হোতো। গম্ভীর প্রকৃতির স্বামী নিজের মনে কর্তব্য করত, নিজের মনে ভাবনা ভাবত। স্বামী

সে কখনো তার চিন্তার মধ্যে স্ত্রীকে ডাকবে না,—এ কথা জানতে অত্যন্ত ছিল মারফা ইভানোভনা। তার স্বামী যে তার নীরবতাকেই পছন্দ করে একথা বুঝে সেও সংযতবাক্‌ হতে শিখেছিল। জীবনে মাত্র একবার স্বামী তাকে প্রহার করেছিল,—সে প্রহারও খুব মৃদু। সে অনেক বছর আগেকার কথা। ফিয়োডোর পাভলোভিচের প্রথম বিবাহের উৎসবে গ্রামের কৃষাণ বৌ-ঝিরা এসেছিল নাচের উৎসবে। মারফাও ছিল সে দলে। তখন সে যুবতী। দলের অন্যান্য মেয়েদের মতো সে নাচেনি। মিউসভ পরিবারে কাজ করার সময় থিয়েটারে যেমন দেখেছিল সেই থিয়েটারি ঢং-এর নাচ নেচে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গ্রিগরিরও চোখে পড়েছিল সেই নাচ। বাড়ি ফেরার পর সে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরেছিল চেপে। কিন্তু সেই শেষ। মারফাও আর নাচেনি, ভবিষ্যতে আর কখনো স্বামীর হাতের তাড়নাও সে খায়নি।

ঈশ্বর তাদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। একটি সন্তান হয়েছিল শৈশবেই মারা যায়। শিশু অন্ত প্রাণ ছিল গ্রিগরির,—এই অনুভূতির প্রকাশে তার কোনো লজ্জা ছিল না। আডেলাইডা আইভানোভনা গৃহত্যাগ করার পর তিন বছরের শিশু ডিমিট্রির ভার সে নেয়, প্রায় এক বছর সে নিজে হাতে তাকে পালন করে। এরপর সে পালন করে আইভান আর আলিওশাকে, যার পুরস্কার স্বরূপ সে সোফিয়া আইভানোভনার আশ্রয়দাত্রীর হাতের চড় খায়। নিজের ঔরসের সন্তানকে নিয়ে যেটুকু আনন্দ সে পায় তা তার আসন্ন আবির্ভাবের ঔৎসুক্যে। ছেলে যখন ভূমিষ্ঠ হোলো, তখন দুঃখে আতঙ্কে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিশুটির হাতে ছটি আঙুল। এমনভাবে তার অন্তর ভেঙে পড়ে যে সে সন্তানের জন্মোৎসবের আগে পর্যন্ত একটি কথা উচ্চারণ করেনি। এই ধর্মানুষ্ঠানের দিন তার কুটীরে পুরোহিত ও অন্যান্য অভ্যাগতদের ভিড়। গৃহকর্তা ফিয়োডোর পাভলোভিচও উপস্থিত। এতোদিন পরে প্রথম সে মুখ খুলল সে-সভায়। বললে,—ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হবে না ওকে। ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ থাক।

পুরোহিত হেসে বললেন,—কেন?

কারণ ওটা একটা ড্রাগন।

ড্রাগন!

হ্যাঁ, ওটা একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টি। মানুষ নয়।

সবাই হেসে উঠল। অনুষ্ঠানও যথারীতি সম্পন্ন হোলো। গ্রিগরি সকলেরই মতো প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু নবজাতকের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে তার সংস্কার বদলালো না। জন্ম থেকেই শিশুটি অসুস্থ। যে কয়দিন বেঁচেছিল গ্রিগরি ওটার দিকে তাকায়নি, এমন কি যতোটা সম্ভব বাড়ির বাইরে বাইরেই কাটিয়েছে। দিন পনেরো পরেই শিশুটি মারা গেল। গ্রিগরি ছোট্ট কফিনের মধ্যে তার একমাত্র সন্তানের দেহটি বন্ধ করে নিজের হাতে তাকে সমাধিস্থ করল, তারপর মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করল একমনে। তারপর কখনো সে তার এই সন্তানের কথা বলেনি, মারফাও স্বামীর সামনে উচ্চারণ করেনি তার নাম। সন্তানের মৃত্যুর পর থেকেই

ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হোলো গ্রিগরি। নানা ধর্মগ্রন্থ ও সাধুসন্তদের জীবনী সংগ্রহ করে পড়াশুনো শুরু করে দিল, অনেক লেখা না বুঝলেও মনে মনে সদ্‌গ্রন্থ পাঠের নেশা তার বাড়তেই লাগল। নীরব গাম্ভীর্যের ছাপ তার মুখে পড়তে লাগল দিনে দিনে।

অলৌকিকত্বও আকৃষ্ট করেছিল গ্রিগরিকে। ছয় আঙুলওয়ালা অস্বাভাবিকদর্শন সন্তানের জন্ম আর মৃত্যুকে সে মনে করেছিল ঈশ্বরের কোন্ এক অদৃশ্য নির্দেশরূপে। ঠিক এই সময়েই আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। নিজ মুখেই পরে গ্রিগরি বলেছিল যে এই ঘটনা তার আত্মার এক বিচিত্র স্পর্শ রেখে গেছে।

যেদিন তার সন্তানের দেহ কবরের অন্ধকারে ঢাকা পড়ল, সেদিন রাত্রেই এক নবজাত শিশুর কান্না শুনে ঘুম ভাঙল মারফার। ত্রস্ত হয়ে সে স্বামীকে ডেকে তুলল। কান পেতে শব্দটা শুনল গ্রিগরি। তার মনে হল, শব্দটা যেন কোনো নারী কণ্ঠের চাপা আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি সে উঠে পোষাক পরে বাড়ি থেকে বার হোলো। মে মাসের উষ্ণ রাত্রি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্পষ্ট তার মনে হোলো বাগানের কাছ থেকে শব্দটা আসছে। বাগানের চারদিকে উঁচু বেড়া, উঠান থেকে বাগানে যাবার গেটটা তালা দেওয়া। আবার ঘরে ফিরে সে বাগানের গেটের চাবিটা নিল। মারফা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। সে শুনেছে শিশুর কণ্ঠস্বর, তার নিজের শিশুই বুঝি কবরের অন্ধকার থেকে উঠে এসে কাঁদছে কোথাও। গেট খুলে বাগানে ঢুকল গ্রিগরি। চাপা গোঙানিটা আসছে বাগানের গেটের কাছে স্নানের ঘরটা থেকে। দরজা ঠেলে স্নানের ঘরে ঢুকে সে যে দৃশ্য দেখল স্তম্ভিত হয়ে গেল তাতে। আধপাগল একটা হাবা মেয়ে, আশ্রয়হীনা পথচারিনী, নাম তার লিজাভেটা,—সেই মেয়েটা পড়ে রয়েছে সংকীর্ণ ঘরটার মধ্যে, পাশে তার সদ্যোজাত শিশু। মৃত্যু-পথযাত্রিনী সে, মুখে তার ভাষাহারা অস্ফুট আকুতি।

দুই

চকিত আঘাতের মতো দৃশ্যটা বাজল গ্রিগরির বুকে, নিতান্ত অপ্রীতিকর একটা সন্দেহ অবাঞ্ছিত সত্য হয়ে প্রকাশ হোলো তার মনে।

লিজাভেটা মেয়েটা বাটুল, লম্বায় পাঁচ ফুটের কম। আঁটো-সাঁটো চেহারায় উপচে পড়া স্বাস্থ্য; চোখে কিন্তু একেবারে বাতুল সে। গোলগাল লাল মুখের ভাবে আর অর্থহীন ভাঁড় চাহনিতে প্রকাশ করত কতো বড়ো সে হাবা। জিভও তার অচল, কয়েকটা কথা মুখে ফুটত, তাছাড়া অর্থহীন হাউ হাউ শব্দমাত্র ছিল তার সম্বল। কী শীত কী গ্রীষ্ম সে খালি পায়ে মোটা চটের একটা শেমিজ মাত্র গায়ে পরে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। মাঠে ঘাটে ধুলোয় পড়ে সে ঘুমোতো,—কর্কশ পশমের মতো তার কালো কোঁকড়া চুলের জটে জড়িয়ে থাকত ঘাস পাতা কাঠকুটো। তার বাপ ছিল

একটা সর্বস্ব-খোয়ানো লক্ষ্মীছাড়া মাতাল, সে একটি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পরিবারে শ্রমিকের কাজ করত। তার মা গত হয়েছিল বহুদিন। যদি কখনো বাপের কাছে সে আসত, মাতাল হয়ে বাপ নির্দয়ভাবে তাকে মারত। তাই ঘরের আশ্রয় ছেড়ে পথের আশ্রয়ই সে বেছে নিয়েছিল। হাবা মেয়ে বলে সকলেই বেচারীকে স্নেহ-যত্ন করত। তার বাপের প্রভু ও অন্যান্য দোকানদাররা বিশেষ ভালোবাসত তাকে। নতুন জুতো, দামী গরম জামা বানিয়ে দিয়েছিল শীতকালের জন্যে। শান্ত হয়ে সে এসব পোষাক পরত, তারপর গির্জার প্রাঙ্গণে গিয়ে সেখানে সব দামী জামা জুতো খুলে রেখে আবার তার মোটা শেমিজটি মাত্র গায়ে রেখে খালি পায়ে চলে আসত। কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে, বাটুলই হোক আর বাতুলই হোক, খালি একটা শেমিজ পরে ঘুরে বেড়ায়,—দেখতে খারাপ লাগে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু করার ছিল না পাগলী মেয়েটাকে নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত বাপ তার মরল। অনাথিনী বলে শহরের ধার্মিক লোকেদের মায়া মমতা আরো বাড়ল মেয়েটার ওপর। পথের বাচ্চা ছেলেগুলোও তাকে ভালোবাসত, পাগলী বলে জ্বালাত না। অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়লে কেউ তাকে তাড়িয়ে দিত না, বরং কিছু না কিছু দিত তার হাতে। কেউ যদি একটা পয়সা তাকে দিত, পয়সাটি নিয়ে গিয়ে সে গির্জায় ভিক্ষার বাক্সে ফেলে দিয়ে আসত। বাজারের যদি কোনো দোকানদার একটা মিষ্টি বা এক টুকরো রুটি দিত তার হাতে, সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে শিশুটি তার চোখে পড়ত তার হাতে সে খাবার বিলিয়ে দিত। এমনি উপহার কখনো কখনো ধনী ভদ্রমহিলাদের হাতেও সে তুলে দিত, তাঁরা এই পাগল মেয়ের উপহার নিয়ে খুশীই হতেন। নিজে সে কালো রুটি আর জল ছাড়া কিছুই খেত না। বড়ো বড়ো দোকানে কখনো সে ঢুকত। সেখানে দামী জিনিষপত্র আর টাকা পয়সার ছড়াছড়ি। কিন্তু তার ওপর নজর দেওয়া কারো প্রয়োজন হতো না। সবাই জানত, চোখের সামনে খুচরো হাজার টাকা ছড়ানো থাকলেও একটা ফুটো পয়সাও সে হাতে তুলবে না। কদাচিৎ সে গির্জায় যেত। কিন্তু তার রাত্রিবাসের স্থান ছিল হয় গির্জার বারান্দায়, না হয় কারো বাড়ির পিছন দিকের তরিতরকারির বাগানে। সপ্তাহে একদিন করে সে তার বাবার পুরোনো মনিবদের বাড়ি যেত। শীতকালটা অবশ্য প্রতি রাত্রে সেখানেই সে আশ্রয় নিত, হয় উঠানে না হয় গোয়ালে শুয়ে নিদ্রা যেত। চেহারায় বাটুল হলে কী হয়, মেয়েটার স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। এমনি বাউণ্ডুলে জীবনযাত্রা সহ্য করবার শক্তিও ছিল তার।

অনেকদিন আগেকার কথা। সেপ্টেম্বর মাসের এক গভীর চাঁদনী রাত্রে কয়েকজন মদ্যপ কন্দ্‌ ক্লাব থেকে হইচই করতে করতে ফিরছিল। পথে যেতে নোংরা একটা খাল, নড়বড়ে কাঠের পুল তার ওপর। মদ্যপদের চোখে পড়ল, পুলটার ওপর একলা লিজাভেটা ঘুমিয়ে। ওকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে হাসি ঠাট্টা আর অশ্লীল আলোচনা জুড়ে দিল। একজন বললে,—এতো একটা জন্তু, ওকে কি মেয়েমানুষ বলে ধরে

নেওয়া সম্ভব ? সবাই বললে,—না, অসম্ভব। দলে ছিল ফিয়োডোর পাভলোভিচ। সে বললে,—বাঃ, অসম্ভব কেন ? মেয়েমানুষ যে সে মেয়েমানুষই, বরং ওকে যদি ভোগ করা যায় তার মধ্যে একটা নতুন রকমের মজার স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। এই সময়ে ফিয়োডোরের প্রথমা স্ত্রী মারা গিয়েছিল পিটারসবুর্গে, আর সে দিন কাটাচ্ছিল বীভৎসতম লাম্পট্যে। ইয়ার বন্ধুরা ফিয়োডোরের কথায় হো-হো করে হেসে উঠল। একজন বাজি ধরল, কতোদূর সে করতে পারে। অপর একজন বলল,—কী ঘেন্না, কী ঘেন্না! শেষ পর্যন্ত হৈচৈ করতে করতে সবাই চলে গেল। ফিয়োডোর শপথ করে বলেছিল যে সেও দলের অন্য সকলের সঙ্গেই গিয়েছিল,—যদিও সে কথা সত্য কি মিথ্যা তা কারো জানা নেই। কিন্তু মেয়েটার পাঁচ ছ'মাস যেতে না যেতেই শরীরের অবস্থা দেখে সারা শহরের লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলাবলি করতে লাগল,—অবোলা প্রাণীটার এমনি সর্বনাশ করল কোন্ জানোয়ার ? কদিন পরেই সাংঘাতিক এক গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে এই জানোয়ার ফিয়োডোর পাভলোভিচ ছাড়া আর কেউ নয়। ফিয়োডোর অবশ্য এই দুর্নামে গ্রাহ্যই করল না ; অবিচলিত রইল তার দম্ভ. নিজের দলের ইয়ারবক্সির সঙ্গে সুরা আর লাম্পট্য নিয়ে দিন কাটাতে লাগল সে নিরুদ্বেগে।

এই ঘটনা নিয়ে গ্রিগরি কিন্তু তার প্রভুর পক্ষ নিয়ে ঝগড়াঝাটি কম করল না। সেই সময়ে কার্প নামে এক জেল-পালানো কয়েদী শহরের নানা পল্লীতে কয়েকটা লুটতরাজ করে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। গ্রিগরি প্রচার করল,—এ নিশ্চয় ঐ কার্পেরই কাজ। কেউ কেউ স্বীকার করল, কথাটা অসম্ভব নয়। যাই হোক, বেচারী লিজাভেটার প্রতি লোকের সহানুভূতি কমল না, বরং সকলেই তার প্রতি আরো বেশি করে স্নেহ-যত্ন দেখাতে লাগল। এপ্রিল মাসে কণ্ডাটিয়েভ নামে একজন ধনী ব্যবসায়ীর বিধবা তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন, তার প্রসবের ব্যবস্থাও করলেন। সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখা হোতো, কিন্তু শেষ দিনে সকলের চোখ এড়িয়ে অন্ধকার রাত্রে সে গেল ফিয়োডোর পাভলোভিচের বাগানে। যাত্রা যখন সে করে, তখন নিশ্চয় তার প্রসব-বেদনা উঠেছিল। ঐ অবস্থায় কী করে সে উঁচু বেড়া টপকে বাগানের মধ্যে ঢুকেছিল সেটাই আশ্চর্য।

লিজাভেটাকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই গ্রিগরি দৌড়ে ফিরে গিয়ে মারফাকে পাঠিয়ে দিল তার কাছে, নিজে ছুটল ধাত্রী ডাকতে। সন্তান বাঁচল, কিন্তু লিজাভেটা চোখ বুজল রাত্রি শেষ হতে না হতেই। সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে গ্রিগরি ফিরে এল তার ঘরে। মেঝের ওপর স্ত্রীকে বসিয়ে শিশুকে দিল তার কোলে। বললে সে,—পাপ আর পুণ্য দুইয়ে মিলে এ শিশুর জন্ম দিয়েছে, আমি জানি। কিন্তু যে শিশুর বাপ-মা নেই সে ঈশ্বরের দান। তোমার মরা ছেলে স্বর্গ থেকে একে পাঠিয়েছে। শোক কোরো না আর, একে মানুষ করে তোলো।

মানুষ করল, বড়ো করে তুলল ওকে মারফা। নাম দিল স্মার্ডিয়াকভ। লোকে বলল,

মিত্যাই ফিয়োদোর ওর বাপ, ডাকনামের সঙ্গে যোগ হোলো—ফিয়োদোরোভিচ। ফিয়োদোর মুখে পিতৃত্ব স্বীকার না করলেও এ নামকরণে বেশ একটা কৌতুক অনুভব করল মনে। সে শিশুকে দিল এক পদবী—স্মারডিয়াকভ।

এই স্মারডিয়াকভ বড়ো হয়ে ফিয়োদোরের বাড়িতে ভৃত্যরূপে বহাল রইল। এই কাহিনীর যখন শুরু, তখন সে ভৃত্যগৃহে গ্রিগরি আর মারফার সঙ্গেই বসবাস করে। রান্না করা তার কাজ। স্মারডিয়াকভ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। তবে ভৃত্যচর্চা আর বিলম্বিত করলে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। মূল কাহিনীতেই ফিরে যাওয়া যাক।

তিন

গাড়িতে উঠবার সময় পিতৃদেব যে হুকুম দিয়ে গেলেন তা শুনে আলিওশা কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর সুপিরিয়রের রান্নাঘরে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুনল। আবার সে বার হোলো রাস্তায়। বাপের হুকুমকে খুব জরুরী বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। সে জানে, সে যদি বাড়ি ফিরে নাও যায়, বা একদিনের জন্যে গিয়ে পরদিনই আবার মঠে ফিরে আসে, বাবা কিছু মনে করবে না। বাবার নির্দেশ তার দম্ভের সাময়িক প্রকাশ মাত্র, তার বেশি নয়।

তার দুশ্চিন্তা অন্য, এবং সে দুশ্চিন্তার কোনো নির্দিষ্ট রূপ সে দিতে পারছে না। মাদাম খোখলাকভ যে চিঠিটা তাকে দিয়েছেন, সে চিঠি নিয়েই তার ভাবনা। কাতেরিনা আইভানোভ্না সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে তার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে। চিঠিটা পাওয়া মাত্র আলিওশার মনে অদ্ভুত এক অস্বস্তি শুরু হয়েছে। এই অস্বস্তি বেড়েই চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে, ফাদার সুপিরিয়রের ভোজসভার ঐ ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও। সেখানে গেলে কাতেরিনা আইভানোভ্না কী তাকে বলবে, আর সেও উত্তরে কী বলবে তা তার অজানা নেই। তবু তার অস্বস্তির শেষ নেই।

এই মেয়েটিকে সে ভয় পায়। মঠে প্রবেশ করবার আগে পর্যন্ত মেয়েদের সাহচর্যেই তার জীবন কেটেছে, অতএব সাধারণভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তার কোনো আড়ষ্টতা নেই। মাত্র দু-তিন বার আলিওশা কাতেরিনা আইভানোভ্নাকে দেখেছে, সামান্য মাত্র কথাবার্তা বলেছে তার সঙ্গে। কিন্তু পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই সে মেয়েটিকে ভয় করতে শুরু করেছে। কিসের ভয় তার একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই বলেই ভয় আরো বেশি। সে লক্ষ্য করেছে, মেয়েটি যেমনি সুন্দরী তেমনি গর্বিতা। সে জানে মেয়েটির উদ্দেশ্য মহৎ। দিমিত্রি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলেও সে অকপট উদারতায় দিমিত্রিকে বাঁচাতে চায়। মেয়েটির রূপে আলিওশা বিচলিত হয়নি, প্রশংসনীয় তার গুণাবলী, তবু তার কথা ভাবলেই কোন্ এক অজানা অস্বস্তিতে আলিওশার মন ভরে যায়, আতঙ্ক হয় তার সম্মুখীন হতে।

কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। মৃদু হেসে পা বাড়াল আলিওশা। বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলে বাজার পার হয়ে কাতেরিনা আইভানোভ্‌নার বাড়ি পৌঁছতে অনেকটা পথ। এদিকে বাড়িতে বাবা তার জন্যে অপেক্ষা করছে, বাড়ি একবার যেতেই হবে যতো শীঘ্র সম্ভব। আলিওশা ঠিক করল, একটা সরু গলিপথ দিয়েই সে যাবে, এ পথটা অনেক কম। তবে লোকের বাড়ির পিছন দিয়ে দিয়ে, মাঝে মাঝে বাগানের বেড়া টপকে টপকে যেতে হয়। পথে তার নিজের বাড়ির বাগান আর পাশের বাড়ির বাগানও পড়ে। এই পাশের বাড়িটিতে থাকেন এক অসুস্থা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়ে। মেয়েটি পিটারসবুর্গে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পরিচারিকার কাজ করত,—মাকে দেখা-শুনো করবার জন্যে বছর খানেক হোলো ফিরে এসেছে। চরম দারিদ্র্য তাদের, অন্ন জোটে না। ফিয়োডোরের পরিচারিকা মারফার কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করে দিন কাটে। মেয়েটি কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে খুব পরিপাটি। রাকিতিন সমস্ত বাড়ির সব খবর রাখে। তার কাছে আলিওশা শুনেছে যে আহার না জুটলেও মেয়েটি তার পিটারসবুর্গ থেকে আনা দামী পোষাকগুলির একটিও বিক্রি করতে নারাজ। সেই বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আলিওশার ঐ পোষাক-গর্বিতা মেয়েটির কথা মনে পড়ল, চোখ তুলে সে তাকাল।

চোখে পড়ল আশ্চর্য এক দৃশ্য। প্রতিবেশিনীর বাগানের বেড়ার ওপর চড়ে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ডিমিট্রি প্রবল বেগে দু-হাত নেড়ে তাকে ইঙ্গিত করছে,—গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ডাকছে না কেন বোঝা দায়,—হয়তো যদি আর কেউ তার গলা শোনে এই ভয়।

আলিওশা দৌড়ে বেড়ার ধারে এল,—কী ব্যাপার?

ভাগ্যি তোমার চোখ পড়েছিল! আমি তো চিৎকার করে তোমায় ডেকে ফেলেছিলাম আর কি? উৎফুল্ল কণ্ঠে ফিসফিস করে বললে মিটিয়া,—নাও, এবার চট করে বেড়াটা টপকে ভেতরে এসো দেখি। ঠিক তোমার কথাই আমি এতোক্ষণ ভাবছিলাম!

ডিমিট্রিকে দেখে আলিওশাও খুশী হোলো, তবে ব্রতচারীর ঝোলা জোব্বা পরে তার পক্ষে বেড়া টপকানো একটু শক্ত ব্যাপার।

মিটিয়া চুপিচুপি বললে,—কই, নাও? এই তো পেরেছ! হ্যাঁ, এবার চলো আমার সঙ্গে।

পোড়ো বাগানটা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দেখা নেই। অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে বাড়ি।

আলিওশা নিচু গলায় বললে আবার,—কী হয়েছে? কেউ তো কোথাও নেই। এতো চুপিচুপি কথা বলছ কেন তাহলে?

গাঁকগাঁক করে চেঁচিয়ে বলল এবার ডিমিট্রি,—চুপিচুপি কথা বলছিলাম কেন? কেন আবার? আমি একটি বোকা বলে! সকলকে লুকিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিসের পাহারা সেটা একটা গোপন ব্যাপার, এখন বলব না। কিন্তু যেহেতু গোপন কাজ করছি, গলাটাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে খাটো হয়ে গিয়েছিল। চলো, ওদিকে যাই। তোমাকে বড্ডো ভালো লাগছে আমার।

বাগানটা আয়তনে প্রায় তিন একর। চারিদিকে বেড়ায় ধারে ধারে লাইম, ম্যাপ্‌ল্, বার্চ আর আপেল গাছ। বাগানের মাঝখানটায় কেবল ঘাসের চাষ। এছাড়া ফলের গাছও কিছু এদিকে ওদিকে আছে। সম্প্রতি কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে তরি-তরকারির চাষ আরম্ভ হয়েছে।

ডিমিট্রি ভাইএর হাত ধরে তাকে বাগানের সব থেকে নিভৃত কোণায় নিয়ে গেল। সেখানে নানারকমের ঝোপঝাড়ের ফাঁকে প্রাচীন একটি উদ্যানগৃহ, সংস্কারের অভাবে চুনকাম খসা কালো তার দেয়াল। ছাদটা টিকে আছে, তবে ঘরের মেঝেটা ভাঙা, পোকায় খাওয়া দরজা জানলার কাঠ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাগানটির তখনকার মালিক জন স্মিত বলে একজন এ ঘরটা বানিয়েছিল। ভাঙা ঘরটার মাঝখানে সবুজ রঙের একটা কাঠের টেবিল। টেবিলের দুপাশে ঐ রঙের দুটি বেঞ্চি। আলিওশা আগেই দাদার মনের স্ফূর্তিটা লক্ষ্য করেছিল, এখন প্রত্যক্ষ করল তার উপাদান। টেবিলের ওপর ব্র্যান্ডির আধভর্তি একটি বোতল আর একটি গেলাস।

হো-হো করে হেসে মিটিয়া বললে,—দেখছ কী? হ্যাঁ, ব্র্যান্ডি। এইবার বলবে তো, দাদা আমার মদ খাচ্ছে? পাগল? খাচ্ছি কে বললে? তোমার বন্ধু ঐ শুয়োর রাকিতিনটার ভাষায় বলব,—সেবা করছি। দেখো বলে দিলাম, একদিন ও বেটা কাউন্সিলার হবে, কিন্তু ঐ সেবা করা বলাটা সেদিনও ওর ঘুচবে না। বোসো, বোসো আলিওশা, সত্যি তোমাকে এতো ভালো লাগছে যে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। জানো তো, তোমার মতো আর কাউকে আমি ভালোবাসিনে।

হাসিমুখটা গম্ভীর করে ডিমিট্রি বলে চলল,—হ্যাঁ, আর একজনকে! ঐ চলানী মেয়েটাকে—যার প্রেমে পড়ে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! তবু যাই বলো, প্রেমে পড়া মানে তো আর ভালোবাসা নয়। যার প্রেমে তুমি পড়ে আছ, তাকে ঘৃণা করাও তোমার অসম্ভব নয়। ঠিক কি না? আমার পাশে তুমি বোসো আলিওশা। চুপ করে তুমি শোনো, আমার কতো কথা তোমায় বলবার আছে। কতো তোমাকে খুঁজেছি, আজ সুযোগ পেয়েছি,—প্রাণ খুলে আমাকে বলতে দাও। আজকের এই দিনটি আর আসবে না। কাল কে আছে, কে নেই। আমি তো যেন পাহাড়ের চুড়োর ওপর দাঁড়িয়ে আছি একেবারে খাদের কিনারে। কখন অতলে তলিয়ে যাবো কে বলতে পারে—ভয় পাই, এ আনন্দ উন্মাদের উল্লাস! এই মুহূর্তের এই নীল আকাশ আর জ্বলজ্বলে রোদের নিচে পড়ন্ত বিকেলের শান্তি! এ বিকেল হয়তো ঐ কালো অতলে ডুবে যাবে। হ্যাঁ, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে বলো তো?

বাবার কাছেই যাচ্ছিলাম, তবে ভাবছিলাম প্রথমে একবার যাব কাতেরিনা আইভানোভ্‌নার বাড়ি।

কাতেরিনার কাছে? তারপর বাবার কাছে? চমৎকার! ঠিক আমি যা

চাইছিলাম ! আমার সমস্ত বুক,—একেবারে হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত—তোমার জন্য তৃষিত হয়ে ছিল ভায়া। তুমি যাবে স্বর্গীয় দূতের মতো আমার শেষ বার্তা নিয়ে, তুমি তাদের শোনাবে ! তোমার জন্যেই আমি বসেছিলাম।

সত্যিই তুমি আমাকে ওদের কাছে পাঠাতে চাইছিলে ?

নিশ্চয় ! তুমি বোঝোনি ? তুমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারোনি আমার বাসনা ?

বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে কপালে হাত দিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল ডিমিট্রি। তারপর বললে,—তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভায়া, তুমি হঠাৎ কাটেরিনা আইভানোভনার বাড়িতে চলেছিলে কেন ? খবর পাঠিয়েছিল ? চিঠি দিয়েছিল ? নইলে তুমি তো নিজে থেকে ওর কাছে যাবার পাত্র নও।

এই তার চিঠি। আলেক্স পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ডিমিট্রিকে দেখাল।

বাঃ ! কী ভাগ্য দ্যাখো আমার। বড়ো রাস্তা দিয়েও তো যেতে পারতে ! হে ভগবান, আমার এই আলিওশা ভায়াকে এই গলির রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে কতো উপকারই আমার করেছ ! ধন্য, ধন্য তুমি ! আহা-হা, এ যেন গল্পের সেই বোকা জেলেটার কাছে সোনার মাছ তুমি পাঠালে ! আলিওশা, প্রাণের ভাই আমার, আমার জীবনের সব দুঃখের কথা তোমাকে বলব, সব স্বীকার করব। ঈশ্বরের দূতের কাছে আমি সব মনে মনে স্বীকার করেছি, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যে দেবদূতের মতো পবিত্র, সে হচ্ছ তুমি ! তোমার কাছে সব না জানালে বুকের ভার হালকা হয় না যে ভাই ! তুমি শুনবে, তুমি বিচার করবে, তুমি ক্ষমা করবে ! এই ক্ষমার যে আমার বড়ো প্রয়োজন। যে সব কিছু বন্ধন ঘুচিয়ে ফেলে সর্বনাশের পথে চলেছে, সে যদি সেই চরম যাত্রার মুহূর্তে তোমাকে বলে,—আমার হয়ে একটা কাজ করবে ভাই,—বলো, বলো সে কাজ তুমি করবে না ? মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ অনুরোধ তুমি রাখবে না ?

রাখব, রাখব, নিশ্চয় রাখব। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো, তাড়াতাড়ি করো।

তাড়াতাড়ি ! কিসের তাড়াতাড়ি ভাই ? তুমি বোঝো না, আমার পৃথিবী এক নতুন কক্ষপথে চলেছে,—বোঝো না, আমার প্রাণের কী উন্মত্ত উল্লাস। বোঝো, বোঝো, নিশ্চয়ই তুমি বোঝো, তবে কেন তোমার এতো তাড়াতাড়ি ?

আলিওশা ভাইএর অবস্থা দেখে স্থির করল, আরো কিছুক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতেই হবে,—এখানেই তার এখন থাকা দরকার। মিটিয়া গুম্ হয়ে কি ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ, টেবিলের ওপর দু-কনুই আর হাতের তালুতে মাথা রেখে মুখ নিচু করে। তারপর বললে,—আমি মাতাল হয়ে আজে-বাজে বকছি মনে কোরো না। ব্র্যান্ডি খুব ভালো জিনিষ, কিন্তু অন্তত দু-বোতল না খেলে আমার নেশা হয় না। দ্যাখো, সিকি বোতল মালও আমার পেটে পড়েনি। একটু ধৈর্য ধরো, যা বলবার এখুনি বলছি। বেশীক্ষণ তোমাকে ধরে রাখব না।

আরো কিছুক্ষণ হাতের তালুর ওপর কপাল রেখে স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললে,—মানুষ দেবতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কোথায় নামছে সে দেখেছ, চলেছে সে কোন্ রসাতলে ? মানবজন্ম শুধু বেদনায়, শুধু

যন্ত্রণায়। মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে ঘুরে বেড়াই, করি শুধু মাতলামি আর যতো নোংরা কাজ,—তাই বলে আমি জন্তু নই। মানুষের কথা ভাবি, কেননা আমিও মানুষ। কবি বলেছেন, মনের মালিন্য যদি দূর করতে চাও তাহলে সব আভিজাত্য ছেড়ে শুধু মাটি—মা-কে আঁকড়ে ধরো। খুব ভালো কথা, কিন্তু কি করে তা করব? মাঠের কৃষাণ হব, দিন কাটাব পশু চরিয়ে? জানিনে। নিজের পথে চলেছি, জানিনে এ পথের শেষে লজ্জা আছে, না আনন্দ আছে! রসাতলে যখন তলিয়ে যাই, মনে পড়ে কবির বাণী, সাধকের কথা। কিন্তু ভুলতে তো পারিনে নিজেকে। কেন পারিনে জানো? আমি যে কারামাজভ!

বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করল ডিমিট্রি। ভাঙা গলায় বলতে লাগল,—কাঁদছি। কাঁদতে দাও আমাকে। লোকে টিটকারি দ্যায়, দিক তারা,—তুমি দিয়ো না, তুমি হেসো না ভাই। আমি জানি, আমি কীট—কামকীট, তার কারণ আমি কারামাজভ। তুমি তো দেবদূতের মতো পবিত্র ভায়া, কিন্তু তোমারও বুকের মধ্যে ঐ বাসনা-কীটের বাসা। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির এই যে লালসা, এ ঝড়ের মতো—ঝড়ের চেয়েও সর্বনেশে। রূপ,—রূপ নিয়ে আমরা পাগল। রূপের মতো ভয়ংকর জিনিষ আর কিছু আছে? মানুষের মনে ধাঁধা লাগাবার জন্যে ঈশ্বর কতো রহস্যই না সৃষ্টি করেছেন? সব চেয়ে বড়ো রহস্য রূপের রহস্য। ভাবতে পারো, ম্যাডোনার মাতৃমূর্তিতে যে রূপ, সেই রূপ নরকের বেশ্যার মধ্যে! স্বর্গের রূপে যতো মানুষ না পাগল, তার চেয়ে অনেক মানুষ পাগল নরকের রূপে? রূপ যেমনি রহস্যময় তেমনি ভয়ংকর! এই রূপ নিয়েই বিধাতা আর শয়তানের মধ্যে লড়াই, আর সেই লড়াইএর ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের মন। অনেক সময় নষ্ট করছি তোমায় তত্ত্বকথা বলে। এসো, তাহলে নিজের কথাই বলি এবার, শোনো।

চার

অত্যন্ত বেপরোয়া জীবনযাত্রা ছিল আমার তখন। একটু আগে বাবা অনুযোগ করছিল যে আমি অল্পবয়সী মেয়েদের নষ্ট করবার জন্যে হাজার হাজার টাকা উড়িয়েছি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তাছাড়া শুধু ঐ অপকর্মের জন্যে টাকার দরকার হয় না আমার। যদি আমার দিল চায় তাহলে আমি টাকা ওড়াই, কারো দিল জয় করার জন্যে টাকা খরচের দরকার আমার কোনোদিন হয়নি। হ্যাঁ, অনেক নারী আমার জীবনে এসেছে—আজ কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলা, কাল কোনো পথের মেয়ে। দুজনেরই প্রাণে আমি সমান আনন্দ দিয়েছি, সমানভাবে খুশী করেছি দুজনকেই। জিপসিদের নাচ-গানের জন্যে মুঠো মুঠো টাকা আমি খরচ করেছি, ভদ্রঘরের মহিলাদের টাকার লোভ দেখাতেও আমি কার্পণ্য করিনি। ভদ্রঘরের মেয়েরাও আমাকে ভালোবেসেছে—সবাই নয়, তবে অনেকেই। বড়ো রাস্তা আমি বিশেষ পছন্দ করিনে, আমি ভালোবাসি

আঁকাবাঁকা গলিঘুঁজি,—বুঝেছ আমি কী বলতে চাই ? ঐ সব গলির আবছায়া অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে বিস্ময় আর রোমান্স,—ওখানকার মাটি থেকেই অজানা মানিক কুড়িয়ে পাওয়া যায়। আমি যে শহরে থাকতাম সেখানকার পথঘাট সব চওড়া-চওড়া, কিন্তু নীতি-দুর্নীতির গলিঘুঁজির অভাব ছিল না। পাপকে আমি ভালোবাসতাম,—পাপের অপযশের প্রতি ছিল আমার আকর্ষণ, অপরকে কষ্ট দিয়েই ছিল আমার উল্লাস। তার কারণ, আমি অতি নোংরা একটা জীব, কামকীট,—আমি কারামাজভ। একটা কাহিনী বলি শোনো। একদিন আমরা একদল মিলে সাতটা স্লেজে করে বেরিয়েছিলাম বনভোজনে। ফিরতে সন্ধ্যা, শীতের অন্ধকার। আমার পাশে ছিল একটি কুমারী মেয়ে,—শান্ত নম্র কিশোরী, এক অফিসারের মেয়ে। আমি তার হাত টিপতে লাগলাম, আমাকে চুমু খেতে বাধ্য করলাম তাকে। দিল সে, অনেক কিছুই সে আমাকে না দিয়ে পারল না সেই অন্ধকারের অগোচরে। বেচারা ভেবেছিল, তার পরদিন নিশ্চয়ই আমি তার বাড়ি গিয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব করব। পাত্র হিসেবে আমার দামও কম ছিল না। বয়েই গেল আমার, মাস পাঁচেক কথাই বললাম না তার সঙ্গে। নাচের আসরে তার সঙ্গে আমার দেখা হোতো। দূর থেকে জ্বলন্ত বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে থাকত। তার এই চাহনিতে আমার মনের মধ্যেকার কাম-কলুষ অমানুষটা শুধু ল্যাজ নাড়ত আনন্দে। পাঁচ মাস পরে এক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে হোলো তার। আমার ওপর তেমনি রাগ আর হয়তো তেমনি গোপন ভালোবাসা বুকে চেপে সে শহর ছেড়ে চলে গেল তার স্বামীর সঙ্গে। এ সব কাহিনী লোকের কাছে দম্ভ করে কখনো আমি বলিনে। এমনি যে কতো অভিজ্ঞতা আমার জমা আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতার কথা পাঁচ কানে তুলে কাউকে আমি লজ্জা দিইনি, কারুর আমি ক্ষতি করিনি। কী হোলো ভাই, লাল হয়ে উঠলে কেন ? লজ্জা করছে ? ঘেন্না করছে আমার ওপর ?

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল আলিওশার। সে বললে,—না, তোমার জন্যে লজ্জা করব কেন ? লজ্জা করছিলাম অন্য একটা কথা ভেবে। ভাবছিলাম, তোমাতে আমাতে তফাত কোথায় ? তুমি যে পথে চলেছ সে পথে আমিও যাব।

অ্যা, বলো কী ? এটা যে বড়ো বাড়াবাড়ির কথা বলছ ?

কে বলেছে বাড়াবাড়ি ? একই সিঁড়ি, তুমি কয়েক ধাপ ওপরে উঠেছ, আর আমি সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছি। এটুকু মাত্র তফাত, আর কোনো তফাত নেই। সিঁড়ির তলার ধাপে যে দাঁড়িয়েছে, ওপরের ধাপে শেষ পর্যন্ত তাকে উঠতে হবেই।

তাহলে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ না করাই ভালো, তাই নয় ?

যে না উঠে পারে তার পক্ষে ভালো বই কি !

তুমি পারবে না ?

মনে তো হয় না।

চুপ ভাই চুপ, আর বোলো না। তোমার কথা শুনে এখুনি আমার তোমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। ঐ গুণেগাঁথা ছুঁড়ীটা ঠিক পুরুষ চেনে।

একবার আমার ও বলেছিল, তোমাকে একবার পেলে ছিঁড়ে খাবে। থাক্, এসব মাথি-ভন্-ভন্-করা নোংরামির কথা থাক্। আমার জীবনের ট্র্যাজেডির কথা তোমাকে বলব। বুড়ো বাপ বলে, আমি সাধ্বী মেয়েদের কুসলিয়ে বেড়াই। কথাটা সত্যি নয়। জীবনে একবার অবশ্য সেই রকম একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটেনি,—আমার জীবনের ট্র্যাজেডির মধ্যেই এই ঘটনাটা রয়েছে। তোমার কাছে আমি বলব, আর কাউকে আমি বলিনি, এক আইভানকে ছাড়া। আইভান গোড়া থেকেই সব জানত। তবে কিনা আইভানের কবর-চাপা মুখ।

সৈন্যবাহিনীতে লেফ্‌টেন্যান্ট তখন আমি, ছোট্ট এক শহরে আমার রেজিমেন্টের আস্তানা। নিতান্ত নজরবন্দী জীবন, কিন্তু তারই মধ্যে আমার রাস্তা আমি দেখে নিয়েছি। দু-হাতে টাকা ছড়াই, শহরের লোকেরা আমার জীবনযাত্রা দেখে মাথা নাড়ে, আবার পছন্দও করে সবাই আমাকে। আমার কর্নেল একজন বৃদ্ধ অফিসার, —হঠাৎ তাঁর বিষ-নজরে আমি পড়ে গেলাম। আমার ক্ষতি করবার তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগলেন। তবে আমার অনেক প্রভাবশালী বন্ধু ছিল, স্থানীয় অন্যান্য লোকেরাও আমার দিকে ছিল, তাই তাঁর উদ্দেশ্য তিনি চরিতার্থ করতে পারলেন না। আমার নিজের যে দোষ ছিল না তা নয়, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী হিসেবে আমার কাছ থেকে যে সম্মান তাঁর প্রাপ্য, সে সম্মান মোটেও তাঁকে আমি দিইনি। আসলে ভদ্রলোক ভালোই ছিলেন। সহৃদয় ও অতিথিবৎসল, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বনল না। কর্নেল দুবার বিয়ে করেছিলেন, দুই স্ত্রীই মৃত। প্রথমা স্ত্রী ছিলেন নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে,—একটি মেয়ে রেখে তিনি মারা যান,—মেয়েটিও মা'রই মতো সাদামাটা। আমি যখন সে শহরে যাই তখন মেয়েটি চব্বিশ বছরের যুবতী, বাবার সঙ্গেই থাকে,—সঙ্গে থাকে এক মাসি। মাসি ছিল খুব সরল ও অশিক্ষিতা। বোনঝি সরল কিন্তু স্বভাবে ভারি স্ফূর্তিভরা। মেয়েটির নাম আগাফিয়া আইভানোভ্‌না। এমনি হাসিখুশি প্রাণোজ্জ্বল মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। দেখতেও মন্দ না, আমাদের দেশী মতে সুন্দরীই বলা চলতে পারে। লম্বা ছড়ানো চেহারা, সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর দুটি চোখ,—মুখের ভাবে যদিও কিছুটা কোমলতার অভাব। একজোড়া পাণিপ্রার্থী তখন মেয়েটির পাশে ঘুরঘুর করছিল। তাদের কাউকেও সে তখনো কথা দেয়নি,—তাতেই আনন্দ।

মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতা বলতে আর কিছু যেন ভেবো না—নিষ্কাম বন্ধুত্ব নিয়েও অনেক মেয়ের সঙ্গে আমি মিশেছি। তার সঙ্গে কথাবার্তায় আমি এমনি স্বাধীনতা নিতাম যে অন্যে শুনলে আঁত্‌কে উঠত,—সে কিন্তু খুব মজা পেত আর হাসত। খুব সাধারণ জীবনযাত্রা ছিল তার আর তার মাসির, —কোনো দেমাক ছিল না উঁচু ঘরের মেয়ে বলে। সকলেই এই সহজ সারল্যের জন্যে তাকে ভালোবাসত। খুব ভালো সেলাইয়ের কাজ জানত, অনেকেরই জামা কাপড় সে তৈরী করে দিত,—কোনো দাম চাইত না কারোর, তবে কেউ পারিশ্রমিক দিলে নিতেও করত না নিতে।

কর্নেল অবশ্য অন্য জাতের মানুষ। তিনি সারা এলাকার শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের একজন। উৎসবে নিমন্ত্রণে সারা শহর তাঁর বাড়িতে ভেঙে পড়েছে,—আজ নাচ, কাল ডিনার, পরশু পার্টি। আমি যখন ওখানে পৌঁছিলাম, তখন শহরের উঁচু মহলের প্রধান আলোচনা কর্নেলের দ্বিতীয় কন্যাকে নিয়ে—সে নাকি অপরূপ সুন্দরী, রাজধানীর খুব এক অভিজাত ইস্কুলের পড়া শেষ করে শীঘ্রই সে বাবার কাছে আসছে। এই দ্বিতীয় কন্যাই কার্টেরিনা আইভানোভ্না, কর্নেলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান। কার্টেরিনার মা ছিলেন এক নামকরা জেনারেলের বংশের মেয়ে। তবে এ বিয়েতেও কর্নেল এমন কিছু যৌতুক পাননি, যদিও বৈবাহিক সূত্রে নামকরা আত্মীয়-স্বজন পেয়েছিলেন।

কার্টেরিনা যখন স্কুল থেকে এল, তখন সারা শহর যেন জেগে উঠল। শহরের সবচেয়ে খানদানী মহিলারা কার্টেরিনাকে উপলক্ষ করে পার্টির পর পার্টি দিতে লাগলেন। নাচে পিক্‌নিকে নানা উৎসবে কার্টেরিনা হোলো সকলের মধ্যমণি। আমি অবশ্য প্রথমটা গ্রাহ্যই করিনি। আমার বেপরোয়া জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলেছে, বরং কী একটা ঘটনায় লোকের মুখে আমার দুর্নামই ছড়াচ্ছে। এক সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাটারি কমান্ডারের বাড়িতে প্রথম আমি তাকে দেখলাম। কাছে গেলাম না, যেন গ্রাহ্যই করলাম না তার উপস্থিতি, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, দূরে থেকে সে আমাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। কদিন পরে আর একটি পার্টিতে আমি তার সামনে গিয়ে আলাপ করবার চেষ্টা করলাম তার সঙ্গে। কিন্তু সে কথাই বলল না আমার সঙ্গে, ঠোঁট বেঁকাল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। মনে মনে আমি বললাম,—দাঁড়াও, এর প্রতিশোধ আমি নেব। উদ্দাম তখন চলেছে আমার দিনরাত। যতো উচ্ছৃংখলতা বাড়ছে, ততো ভাবছি, কতো বড়ো বীরপুরুষ আমি। এমন বীরকে অপমান? তার ফল ভোগ করতে হবে না একদিন?

কদিন পরেই কর্নেল আমাকে বন্দী করলেন। মাতলামির আর মারামারির অপরাধে আমার শাস্তি হোলো তিন দিন কারাবাস। ঠিক এই সময়েই বাবা আমাকে পাঠাল ছ-হাজার রুবল, তার সম্পত্তিতে আমার আর কোনো দাবি নেই এমনি একটা স্বীকৃতি-পত্রের বিনিময়ে। সেই দলিলে কী যে লেখা ছিল, তার বিন্দু-বিসর্গও তখন আমি বুঝিনি সত্যি কথা বলতে কি আলিওশা, বৈষয়িক ব্যাপারে বাবা যে কী উপায়ে আমাকে ঠকিয়েছে, আজ পর্যন্ত আমি তা ধরে উঠতে পারিনি। থাক, সে কথা পরে হবে।

ঠিক এই সময়েই আমার এক বন্ধুর চিঠিতে ভারি জুতসই একটা খবর পেলাম। জানলাম, ওপরওয়ালারা আমাদের কর্নেলের ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নন, সরকারি কাজে নানা রকম গোলমালের খবর তাঁদের কানে এসেছে। আসলে কর্নেলের শত্রুর অভাব ছিল না, শত্রুরা সুযোগের অপব্যবহার করেনি। কদিন পরেই আমাদের ডিভিশনের খোদ কমান্ডার এসে উপস্থিত হলেন, প্রচুর হইচই করলেন তিনি,—কর্নেলের অবসর গ্রহণের হুকুম এল। সারা শহরে তাঁর সুসময়ের যতো বন্ধু ছিল, সবাই তারা মুখ ফেরাল।

এই সুযোগেরই আমি অপেক্ষা করছিলাম। প্রথম চালটা আমিই চাললাম। আগাফিয়া আইভানোভ্‌নার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট ছিল। একদিন তাকে ডেকে বললাম,—তুমি জানো তোমার বাবার কাছে সরকারি যা তহবিল ছিল, তা থেকে সাড়ে চার হাজার রুবেল ঘাটতি পড়েছে ?

চমকে উঠল আগাফিয়া।

কী বলছ তুমি! তুমি এসব কোথা থেকে জানলে ? এই তো সেদিন জেনারেল এসেছিলেন, তারপর সব তো মিটেই গেছে!

মেটেনি ভাই, মেটেনি।

খুব ভয় পেল আগাফিয়া। বললে,—আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি। কে তোমাকে বললে এ সব ?

যেই বলুক, আমি উত্তরে বললাম,—কথাটা সত্যি তা তুমি জানো। আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিনে, তবে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে সেইটুকুই তোমাকে বলি। সাড়ে চার হাজার রুবেল যখন গভর্নমেন্ট দাবি করবে, আর তোমার বাবা তা দিতে পারবেন না, তখন তোমার বাবার সব সম্মান খসিয়ে, এই বুড়ো বয়সে সাধারণ একটা সৈন্যের মতো তাকে ওরা আদালতে দাঁড় করাবে।

কী হবে তখন ?

কী হবে তা নাই শুনলে, তবে একটা উপায় আছে। আমি সম্প্রতি কিছু টাকা পেয়েছি। চার হাজার রুবেল আমি দিতে পারি, তবে একটি শর্তে।

কী শর্ত ?

তোমার ঐ সুন্দরী বোনটিকে গোপনে একলা আমার কাছে পাঠাবে। তার হাতে টাকাটা আমি দেব।

রাগে দপ করে জ্বলে উঠল আগাফিয়া। বদমাস কোথাকার! শয়তান কোথাকার! এতো বড়ো তোমার সাহস ?

রাগে গরগর করতে করতে আগাফিয়া চলে গেল, কিন্তু আতঙ্ক তার ঘুচল না। আমার সঙ্গে এই আলোচনার কথা সে মাসিকে বললে। কাটেরিনাকেও শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না।

হঠাৎ এক নতুন মেজর এলেন আমাদের সৈন্যবাহিনীর ভার নিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৃদ্ধ কর্নেল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুদিন বিছানা ছেড়ে তিনি উঠলেন না, নতুন অফিসারকে সরকারি হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেওয়াও স্থগিত রইল। ডাক্তার ক্রাভসেংকো বলেছিলেন, সত্যিই তিনি অসুস্থ। আমি কিন্তু আসল খবর জানতাম যে কেবল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময়টুকু ছাড়া গত চার বছরের মধ্যে সরকারি তহবিল কখনোই কর্নেলের হাতে থাকত না। ট্রিফোনভ নামে এক দাড়িওয়ালা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে টাকাটা তিনি খাটাতেন। লোকটা বিশ্বাসী ছিল, এই টাকা দিয়ে প্রতি হাটে সে কেনা-বেচা করত, আসলটার সঙ্গে সুদও সে ফেরত দিত কর্নেলকে। কিন্তু এেবার ট্রিফোনভ হাট থেকে ফিরে এসে দেখাই করলে না কর্নেলের সঙ্গে।

কর্নেল দৌড়লেন তার কাছে। সে বললে,—কে বললে আপনার কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি ? তাছাড়া নেবই বা কেমন করে ?

টাকা নেই। কর্নেল শয্যাগত, তাঁর মাথায় বরফ দিচ্ছে দুই মেয়ে আর এক শ্যালিকা। হুকুমনামা এল দু-ঘণ্টার মধ্যে সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে। কর্নেল নিজে হাতে সই করে সেই হুকুমনামা নিয়ে পড়লেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পোষাক পরবার জন্যে পাশের ঘরে গেলেন। দোনালা বন্দুকটায় গুলি ভরে চেয়ারে বসে নলটা বুকের সামনে রেখে ডান পায়ের আঙুল দিয়ে তিনি বন্দুকের ঘোড়াটা টিপবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমার কথা আগাফিয়ার মনে ছিল। সন্দেহ হোলো তার মনে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা সে দেখল। দৌড়ে ঘরে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বাপকে। বন্দুকের ঘোড়াটা ছুটে গেল, গুলি গিয়ে লাগল ঘরের ছাদে।

এই ঘটনার কথা আমি পরে শুনেছিলাম। আমি তখন আমার বাড়িতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমি বাড়ি থেকে বার হব বলে প্রস্তুত হচ্ছি। ধোপদুরস্ত পোষাক পরেছি, চুলে বুরুশ চালিয়েছি, রুমালে গন্ধ ঢেলেছি, মাথায় চড়িয়েছি সান্ধ্য ভ্রমণের টুপি। এমন সময় হঠাৎ ভেজানো দরজাটা খুলল। দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাটেরিনা আইভানোভ্না।

এক একটি ঘটনা কী রকম আশ্চর্যভাবেই ঘটে যায়। পথে সেদিন কেউ তাকে দেখেনি। আমার বাড়িতে তার এই আসা শহরের কারুর চোখে পড়েনি। ঘরে ঢুকে সোজা আমার দিকে তাকাল কাটেরিনা। চোখে তার সে কি দৃঢ় দৃপ্ত চাহনি ! ওষ্ঠদুটিতে কেবল অনিশ্চয়তার মৃদু কম্পন।

বললে সে,—আমার বোন আমাকে বলেছে, আমি নিজে যদি আপনার কাছে আসি, আপনি আমাদের চার হাজার রুবল দেবেন। এই আমি এসেছি, দিন !

দৃপ্ত ভাবটা সে বজায় রাখতে পারল না আর। নিশ্বাস তার যেন আটকে আসছে, ভয়ে কাঁপছে বুক, কেঁপে উঠল ঠোঁট, মৃদু হয়ে এল কণ্ঠ।

কী হে আলিওশা, শুনছ ! ঘুমুলে নাকি !

উত্তেজিত আগ্রহে স্তব্ধ হয়ে আলিওশা শুনছিল, বললে,—শুনছি, বইকি ! কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারবে না, লুকোতে পারবে না কিছু।

বলব বইকি। কিছু লুকোবো না। সব সত্যি কথা বলব। তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হোলো, হ্যাঁ, সোজা কথায় বলতে মুহূর্তের মধ্যে কারামাজভ-বৃত্তি জেগে উঠল আমার মনে। আমি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে দেখলাম,—লোভী একটা সাপ ফণা তুলল আমার বুকের মধ্যে। তুমি তো কাটেরিনাকে দেখেছ—সুন্দরী নয় ? কিন্তু তার তখনকারের সৌন্দর্য অন্য ধরনের। আমার চোখে সে তখন অনুপমা সুন্দরী, তার আশ্চর্য মহত্ত্বের জন্যে, আর আমি সরীসৃপের মতো নীচ বলে। জন্মদাতার মঙ্গলের জন্যে চরম ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, তার সামনে আমি একটা কীট—আমার চোখে সে-মুহূর্তে তার রূপের তুলনা নেই। আমার বুকের ভেতরকার ঘৃণিত শয়তানটা উল্লাসে নেচে উঠতে লাগল,—

মেয়েটা একেবারে তার সেহজন সমর্পিত, যা খুশী আমি করতে পারি। এতোগুলো টাকা দেব, তার বিনিময়ে কিছুই নেব না? এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? জিভে জল এল আমার, লালসার আবেগে মুহূর্তে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। মনে ভাবলাম,—যা পাবার আদায় করে নিই, কাল ওর বাড়ি গিয়ে ভদ্রভাবে ওকে বিবাহের প্রস্তাব করব, তাহলে তো ওর আর বলবার থাকবে না কিছু। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ফিসফিস করে উঠল কানে,—কাল যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বাড়ি যাবে, দেখাই করবে না তোমার সঙ্গে, চাকর দিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। সারা শহরে যদি ওর নামে কলঙ্ক ছড়াও, তবু ও ভয় পাবে না। কাটেরিনার মুখের দিকে তাকালাম, বুঝতে ভুল হোলো না আমার। সত্যি আজ যতো নিগ্রহই আমার হাতে সহ্য করুক, কাল ওর বাড়ি গেলে আমাকে তাড়িয়ে দেবেই। সে সাহস ও মেয়ের আছে। জিঘাংসায় জ্বলে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। ভাবলাম, ঘৃণ্যতম চাতুরী ওর সঙ্গে করি। হো-হো করে হেসে উঠি, দোকানদারী গলায় হেঁকে উঠি,—চার হাজার! বলেন কি? ঠাট্টা করে আপনার বোনকে একটা কথা বললাম, আর অমনি আপনি টাকা গুণতে শুরু করলেন? মাথা খারাপ? এতোগুলো টাকা উড়িয়ে দিলেই হোলো! শ-দুই রুবেল যদি চান, তা হলে না হয়—

কু-মতলব তাতে হাসিল হোতো না, ও চলে যেত তক্ষুনি। কিন্তু চাতুরীটা চমৎকার হোতো, দারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হোতো। তবে এও হোতো যে ঐ চাতুরীর জন্য পরে সারাটা জীবন আমি অনুতাপ করতাম। বিতৃষ্ণা হয় তো এসেছে অনেক মেয়েরই ওপর, কিন্তু ঘৃণা আমি কোনো মেয়েকে করিনি। বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, মাত্র কয়েক মুহূর্ত ঐ মেয়ের মুখের দিকে আমি তাকালাম, আমার সমস্ত অন্তর পুড়তে লাগল অসহ্য জ্বলন্ত ঘৃণায়,—সে ঘৃণা অসহ্য উন্মত্ত ভালোবাসারই রূপান্তর।

জানলার কাছে গেলাম। বরফ জমা ঠাণ্ডা শার্সির গায়ে উত্তপ্ত কপালটা রাখলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপর টেবিলেরধারে এসে ড্রয়ারটি খুললাম। ড্রয়ারের মধ্যে এক বইএর খাঁজে পাঁচ হাজার রুবলের একখানা নোট ছিল। নোটটি ওকে দেখিয়ে ভাঁজ করে ওর হাতে দিলাম, তারপর ওর যাবার জন্যে দরজাটি খুলে দিয়ে এক পা পিছিয়ে নীরব নমস্কার করলাম ওকে। থরথর করে কেঁপে উঠল কাটেরিনা, সমস্ত মুখটা কাগজের মতো সাদা পাংশু হয়ে গেল। পূর্ণদৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে আমাকে প্রণাম করল। তারপর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল নিঃশব্দে। তলোয়ারটা আমার কোমরে বাঁধা ছিল। মনে হোলো, খাপ থেকে অস্ত্রটা বার করে নিয়ে সোজা বুকের মধ্যে বসিয়ে দিই। অনাস্বাদিত বিচিত্র একটা আনন্দে আমি মরতেও চেয়েছিলাম সেই মুহূর্তে। মরা অবশ্য হয়নি। সে কথা থাক। অপরের কাছে নিজের অকর্মণ্যের কথা বলতে গেলে নিজের গর্বটাই ফুটে ওঠে। এই হোলো কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার সঙ্গে আমার প্রথম অ্যাডভেঞ্চার! ভিখিরি ছাড়া কেউ একথা জানত না, এইবার তুমি জানলে।

ডিমিত্রি উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিতভাবে করেক পা হেঁটে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছলে। তারপর অন্য বেঞ্চটাতে গিয়ে আবার বসল। আলিওশা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ভাইএর দিকে।

পাঁচ

আলিওশা বললে, —তোমার কাহিনীর প্রথম পর্বটা জানলাম।

হ্যাঁ, প্রথম পর্বটা নাটক, ডিমিত্রি বললে,—সেটা ঘটেছিল সেখানে। দ্বিতীয় পর্বটা ট্র্যাজেডি, এটা অভিনীত হচ্ছে এখানে।

এখনো পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্বের কিছুই আমি বুঝিনি।

মৃদু হেসে ডিমিত্রি বললে,—আমি? আমিই কি বুঝেছি?

থামো ডিমিত্রি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

তোমার আর কাতেরিনার মধ্যে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ছিল, সেই প্রতিশ্রুতি কি এখনো আছে না ভেঙেছে?

ঐ অ্যাডভেঞ্চারের প্রায় তিন মাসের মধ্যে কোনো কথাবার্তাই ওঠেনি আমাদের মধ্যে। পরদিনই আমি মনে মনে বললাম, কালকের ঘটনা কালকেই চুকে গেছে, এর আর কোনো উপসংহার নেই। আমার দিক থেকে তার কাছে কোনো প্রস্তাব পাঠানো নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার হবে বলে মনে হোলো আমার। তার কাছ থেকেও কোনো ইঙ্গিতই পাইনি পরবর্তী দেড়মাসের মধ্যে। পরদিন তার বাড়ির পরিচারিকা কেবল একটি বন্ধ-খাম দিয়ে গেল আমাকে। খুলে দেখলাম, খুচরো নোটে প্রায় তিনশো রুবল। আমি যে নোটটা দিয়েছিলাম সেটা ভাঙিয়ে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যে যা প্রয়োজন তা রেখে বাকিটা ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে। ব্যস, শুধু টাকা কটা,—চিঠি নয় এক লাইনও। উল্টেপাল্টে দেখলাম খামটা, তার হাতে লেখা একটি অক্ষর, একটি পেনসিলের আঁচড়ও নেই কোথাও। এক রাত্রের স্ফূর্তিতে টাকা কটা উড়িয়ে দিলাম,—এমন স্ফূর্তি করলাম যে নতুন মেজরের হাত থেকে শাস্তি পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

এদিকে বুড়ো লেফট্ন্যান্ট-কর্নেল সরকারী টাকা চুকিয়ে দিলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, কেননা সকলেই ভেবেছিল, সরকারী তহবিল তিনি ভেঙেছেন। এই টাকা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চরম অসুখে শয্যা নিলেন, মাথার রোগ ধরল তাঁর, মারা গেলেন মাস খানেকের মধ্যে। সামরিক বিভাগ থেকে সরকারীভাবে বরখাস্ত তাকে করা হয়নি, অতএব যথোচিত সম্মান ও ধুমধামের সঙ্গে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হোলো। বাবার শেষকৃত্যের দশ দিন পরে কাতেরিনা আইভানোভ্না দিদি আর মাসির সঙ্গে শহর ছেড়ে মস্কো চলে গেল। আশ্চর্যের কথা, ঠিক সেদিনই ঘরে বসে একটি চিঠি পেলাম আমি। পাতলা নীল কাগজে সরু পেনসিলে লেখা কটি কথা: 'আমি তোমাকে লিখব। অপেক্ষা কোরো। —কে।' এইটুকু মাত্র, তার বেশি নয়।

বাকি কাহিনীটা কয়েক কথায় মাত্র আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো অবিশ্বাস্যভাবে আর বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে তাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হোলো মস্কোতে যাবার পরেই। তাদের নিকটতম প্রতিবেশিনী জেনারেলের বিধবা তার দুই ভাইঝিকে এক সপ্তাহের মধ্যে হারালেন। বসন্ত হয়ে দুই কন্যা মারা গেল। ভদ্রমহিলা ছিলেন অতুল সম্পত্তির মালিক। তিনি কাটিয়াকে কন্যা বলে গ্রহণ করলেন। নতুন করে উইল করে তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন কাটিয়ার নামে। এছাড়া সরাসরি তার হাতে দিলেন আশী হাজার রুবল। ভদ্রমহিলা কেমন একটু পাগল-পাগল ছিলেন। পরে মস্কোতে আমি তাঁকে দেখেছি।

ডাকযোগে সাড়ে চার হাজার রুবল পেয়ে আমার চক্ষুস্থির। তিন দিন পরে এল প্রতিশ্রুত চিঠি। সে চিঠি আমার কাছে আছে। বুকের মধ্যে রেখেছি, এমনি রাখব মৃত্যুকাল পর্যন্ত। দেখবে পড়ে? কাটিয়া নিজেকে সমর্পণ করছে আমার কাছে,—আমি তাকে বিয়ে করলে সে ধন্য হবে। লিখছে সে,—আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি, তুমি যদিবা নাও ভালোবাসো আমাকে তাতে দুঃখ নেই। আমায় বিয়ে করে ধন্য করো, তার বেশি কিছু চাইনে। ভয় পেয়ো না, আমি বাধা দেব না তোমায়, শুধু পায়ের নিচে থাকব তোমার, এইটুকু প্রার্থনা।

আমার নোংরা মুখ, কুৎসিত আমার ভাষা, কাটেরিনার সে চিঠির ভাষা নিজে মুখে উচ্চারণ করতে আমি পারিনে। তার চিঠির প্রতিটি শব্দ আমার প্রাণে ছুরির এক একটি ঘায়ের মতো। তার বেদনার ক্ষত সারা জীবনে আমার ঘুচবে না। আমি একটুও দেরি না করে উত্তর দিলাম। আমার চোখের জল মিশল সে উত্তরের ভাষায়। তখন মস্কো যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, নইলে নিজেই যেতাম তার কাছে। একটা বড়ো লজ্জার কথা লিখেছিলাম। লেখা উচিত হয়নি, তবু কলম থেকে বার হয়ে গিয়েছিল। লিখেছিলাম,—সে কতো বিরাট সম্পত্তির অধিকারিণী, আর আমি সাজগোজ করা ভিখারী মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আইভানকে একটা ছ-পাতা লম্বা চিঠি লিখে সব কথা জানালাম, অনুরোধ করলাম তাকে কাটেরিনার সঙ্গে দেখা করতে। কী হেলো? অমন করে তাকিয়ে দেখছ কেন আমার দিকে। ফল কী হোলো তাই ভাবছ? ঠিক, যা হবার তাই হোলো। আইভান সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়ে গেল। আমি জানি, বোকামি করেছি। এমন কাজ যে করে, সারা পৃথিবীর চোখে সে ডাহা নির্বোধ; কিন্তু ভাই, এই নির্বুদ্ধিতাই হয়তো এখন আমাদের সবাইকে বাঁচাবে। বুঝতে পারছ না? আইভানকে বড়ো সম্মান করে কাটেরিনা, সে তার মস্ত সম্মানের পাত্র। আমাদের দুই ভাইকে সে তুলনার চোখে দেখবেই। বলো, এর পরে সে কি আর আমার মতো লোককে ভালোবাসতে পারবে?

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলিওশা বললে,—কাটেরিনা তোমার মতো লোককেই ভালোবাসে, আইভানের মতো লোককে নয়!

জানো না তুমি, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কঠোর কথা বার হয়ে এল ডিমিট্রির মুখ থেকে,—আমাকে? ও ভালোবাসে শুধু ওর ধর্মকে।

কথাটা বলে হেসে উঠল সে, কিন্তু একটু পরেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল। চকচক করে উঠল চোখ, টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল সে।

তিক্ত আত্মবিশ্বেষে সে উঁচু গলায় বলতে লাগল,—আমি শপথ করে বলছি আলিওশা, তুমি আমাকে বিশ্বাস না করতে পারো, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, বিশুর দোহাই, যদিও আমি কাটেরিনার অনুভূতিকে ঠাট্টা করেছিলাম, তবুও এ আমি জানি, আমার মতো হীনাত্মার লোক দুটি নেই, কাটেরিনা আমার চেয়ে লক্ষ কোটিগুণ মহৎ, স্বর্গের দেবীর মতো সে, তার হৃদয়ের তুলনা নেই। আমার মতো লোকের কাছে কাটেরিনার মতো মেয়ে যে আত্মনিবেদন করে বসে আছে, এইটেই হোলো ট্রাজেডি। আইভানের কথা ভেবে দ্যাখো, সেও কি প্রতি মুহূর্তে এই দুর্ঘটনাকে অভিশাপ দিচ্ছে না? কার কাছে আত্মনিবেদন করেছে কাটেরিনা? মানুষ নয়, একটা ঘৃণ্যতম নরপিশাচের কাছে,—যে বিবাহের জন্যে বাক্‌দান করা সত্ত্বেও সমস্ত লোকের চোখের সামনে—তার নিজের বাগ্‌দত্তার চোখের সামনে জঘন্য লাম্পট্য করে চলেছে দিনের পর দিন। এই লোক,—আমি,—আমাকেই কিনা সে পছন্দ করল, আর প্রত্যাখ্যান করল আইভানের মতো শিক্ষিত ভদ্র ছেলেকে। কেন করল জানো? তার কারণ, ও মেয়ে পণ করেছে কৃতজ্ঞতার মূল্য দেবেই দেবে—আত্মবলি দিয়েও দেবে, সারা ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেবে তাও স্বীকার। কোনো মানে হয় না! আমি অবশ্য এ ব্যাপারে আইভানের সঙ্গে কোনো আলোচনা করিনি, আইভান যদিও দু-একটা ইঙ্গিত করেছে আমাকে। আমি তাই ঠিক করেছি যা হওয়া উচিত তা হবেই; আমাদের দুজনের মধ্যে সত্যি যে ভালো সেই জিতবে, যে অনুপযুক্ত সে ফিরে যাবে চোরা-গলির পথে, যেখানে পাঁক আর নোংরা। পঙ্কিলতাকেই যে ভালোবাসে, পঙ্কিলতাতেই সে তার সাধের জীবন কাটাক। দেখো, আইভানকে কাটেরিনা বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত, আর আমি ডুবে যাব আমার চোরা-গলির অন্ধকারে।

বেদনার্ত কণ্ঠে আলিওশা বললে,—থামো ডিমিট্রি, আর বোলো না। একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করি। তোমরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়েছিলে। সে প্রতিজ্ঞা এখন ভাঙবে কী করে, তোমার বাগ্‌দত্তা যদি রাজি না হয়?

আনুষ্ঠানিক বলে আনুষ্ঠানিক। মস্কোতে যাবার পরেই পাকাপাকি ধর্মানুষ্ঠান করে আমরা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়েছিলাম। জোর ধুম হয়েছিল। জেনারেলের বিধবা কেবল যে আশীর্বাদ করেছিলেন তাই নয়, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে,—কাটিয়াকে তিনি জোর তারিফ করেছিলেন আমার মতো স্বামী নির্বাচন করতে পেরেছে বলে। আইভানও ছিল সেখানে। আর এও তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, আইভানকে তাঁর একটুও ভালো লাগেনি, কথাই বলতে চাননি তার সঙ্গে। মস্কোতে কাটিয়ার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ আলোচনা হয়েছিল। পরিপূর্ণ সাধুতার সঙ্গে অকপটে আমি আমার সম্বন্ধে সব কথা তার কাছে খুলে বলেছিলাম। গোপন করিনি এক বিন্দু। মিষ্টি কথাও বলেছি, শক্তভাবে স্বীকারও করেছি সব। চুপ করে সে

শ্বনেছিল। শেষ পর্যন্ত আমার কাছে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছিল যে আমি ভালো হব। সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি। তাই আজ—

আজ কী?

আজ তোমাকে আমার কেন এতো দরকার, কেন তোমাকে আমার হয়ে কাটিয়ার কাছে পাঠাতে চাই, বোঝো না।

না বুঝিনি। কেন?

তুমি যাবে তার কাছে। বলবে তাকে যে আমি আর কখনো তার কাছে যাব না। বলবে, ডিমিট্রি তোমাকে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে।

সে কি সম্ভব?

আমি নিজে যদি যেতাম তাহলে সম্ভব হোতো না। তাই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি।

আর তুমি কোথায় যাবে?

আমি ফিরে যাবো আমার চোরা-গলিতে।

আলিওশা ক্ষোভে দুঃখে দু'হাত কচলালো। বললে,—তার মানে ঐ গ্রুশেংকার কাছে, তাই তো? রাকিতিন সত্যি কথাই বলেছিল তাহলে? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ও মেয়েটার কাছে এমনি আলাপ করতে যাও, তার বেশি কিছু নয়।

কী বলো তুমি! বিয়ের প্রতিজ্ঞাসূত্রে যে লোক আবদ্ধ, বাগ্‌দত্তার চোখের সামনে দিয়ে, সারা সমাজের চোখের সামনে দিয়ে অন্য মেয়ের কাছে এমনি যাওয়া আসা করা কি সম্ভব? আমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই, যেদিন থেকে আমি গ্রুশেংকার কাছে যেতে শুরু করেছি, সেদিনই কাটিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতি আমার গেছে, আমার সাধুতাও গেছে। আমি কি তা জানিনে? তাকিয়ে দেখছ কি আমার মুখের দিকে চেয়ে? এখন কী করে গ্রুশেংকার সঙ্গে আমার আলাপ হোলো বলি শোনো! সেদিন আমি তার বাড়ি গিয়েছিলাম তাকে মারব বলে। জানতাম আমি, টাকার লোভ তার বড়ো লোভ। টাকা ধার দেওয়া তার ব্যবসা, সুদের নাম করে সে অধমর্ণের গলা কাটে, নিষ্ঠুরভাবে ঠকায়। একটা বুড়ো পক্ষাঘাতরুগী ব্যবসায়ীর সে রক্ষিতা। সে তার নামে বেশ কিছু টাকা রেখে দিয়েছে এও জানতাম। তারপর যখন জানলাম, বাবা এক বুড়ো ক্যাপ্টেন দালালের মারফত তার কাছে আমার হ্যাণ্ডনোটগুলো বেচেছে আর আমার নামে মামলা করার জন্যে তাকে প্ররোচিত করেছে, তখন ঠিক করলাম, যাব, মারব মেয়েটাকে। গেলাম, কিন্তু মারা হোলো না, মরলাম আমি। ঝড় উঠল প্রচণ্ড, সেই ঝড়ে উড়িয়ে গেল আমার দেহমন। ওর ছোঁয়াচ যেন প্লেগের জীবাণুর ছোঁয়াচ। সে জীবাণু আমার রক্তে বাসা বেঁধেছে, আর আমার উপায় নেই। আজ আমি কপর্দকশূন্য ভিখিরী, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেদিন তিন হাজার রুবল ছিল আমার পকেটে। এখান থেকে পঁচিশ ভার্স্ট দূরে মক্রো বলে একটা জায়গা আছে। আমার সঙ্গে গ্রুশেংকাকে টেনে নিয়ে গেলাম সেখানে। সেখানে আমাদের সাথী হোলো এক পাল জিপ্‌সি আর চাষীভুষী। ছুটল শ্যাম্পেনের ফোয়ারা। চলল গান আর নাচ, পান আর ভোজন;

তিন দিনে তিন হাজার রুবল উড়ে গেল। কিন্তু আমি তখন বীর! ভাবছ এতো বীরত্ব দেখিয়ে যা পাবার তা পেয়েছিলাম। মোটেও না, ইঙ্গিতটুকুও পাইনি তার কাছ থেকে। গ্রুশেংকার সারা দেহের প্রতিটি অঙ্গে উন্মাদ আকর্ষণ। এ আকর্ষণ তার পায়ের আঙুলগুলিতে পর্যন্ত। ঐ পায়ের আঙুলগুলি স্পর্শ করতে চুমু খেতে আমি পেরেছিলাম। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত! হেসে হেসে সে বলেছিল,—তুমি তো ভিখিরী, এক পয়সা নেই তোমার, তাই না? তাহলে দ্যাখো, তোমাকে বিয়ে করে আমার কী সুবিধে? মারতে পারবে না আমাকে, যা খুশী আমি করি একটি কথা বলতে পারবে না আমাকে। ভেবে দেখি, বিয়েই করব কিনা তোমাকে। সেই হাসি এখনো সে হাসছে।

রাগতস্বরে শেষ কথাগুলো বলে ডিমিট্রি আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখদুটো আবার লাল হয়ে উঠল।

আলিওশা শুধোলো,—সত্যিই কি তুমি গ্রুশেংকাকে বিয়ে করতে চাও?

এখনি চাই, প্রতি মুহূর্তে চাই। যদি সে আমাকে বিয়ে না করে তবু তার কাছে এমনি ভিখিরী হয়েই থাকতে চাই। সারা জীবন বসে থাকতে চাই তার দোর গোড়ায়।

আলেক্সির কাঁধে দুহাত রেখে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে ডিমিট্রি বলে চলল,—তুমি এমন সরল নিষ্পাপ ছেলে, তুমি আমার অবস্থা বুঝবে! আমার অবস্থা ভুল-বকা বিকার-রোগীর অবস্থা। শোনো আলেক্সি, আমি নীচমনা হতে পারি, লালসাসক্ত হতে পারি, কিন্তু আমি ডিমিট্রি কারামাজভ ঠক হব, চোর হব, তা কি কখনো ভাবতে পারো? হ্যাঁ তাও আমি হয়েছি। যেদিন গ্রুশেংকাকে আমি মারতে যাই, সেইদিনই সকালে কাটেরিনা আমাকে ডাকে, গোপনে আমার হাতে তিন হাজার রুবল দেয়। বলে, টাকাটা মনিঅর্ডার করে মস্কোতে আগাফিয়া আইভানোভ্‌নার কাছে পাঠিয়ে দিতে। গ্রুশেংকার কাছে যখন যাই তখন ঐ টাকাটা আমার পকেটে ছিল, ঐ টাকাটা আমি মক্রোতে গিয়ে ওড়াই। পরে আমি ভান করেছিলাম যে টাকাটা আমি পাঠিয়েছি, তবে ডাকঘরের রসিদটা আনতে ভুলে গেছি। সেই ডাকঘরের রসিদ আজও আমার কাটেরিনাকে দেওয়া হয়নি। আজ তুমি তার কাছে গিয়ে কী বলবে মনে আছে তো? বলবে, ডিমিট্রি তোমাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, পাঠিয়েছে তার শেষ নমস্কার। কিন্তু যদি সে জিজ্ঞাসা করে,—আমার টাকা? কী উত্তর দেবে সে প্রশ্নের? বলতে পারো, না, সে তোমার টাকা পাঠায়নি। সে একটা নীচ প্রাণী। কামকীট সে, তোমার টাকা সে খরচ করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে একথাও যদি বলতে পারতে, কিন্তু তা বলে সে চোর নয়, এই নাও তোমার তিন হাজার রুবল ফেরত! আমি জানি, এ প্রশ্ন সে করবেই,—আমার টাকা?

মিটিয়া, মন তোমার খারাপ, কিন্তু যতোটা অসুখী তুমি নিজেকে ভাবছ, সত্যি সত্যি ততোটা অসুখী তুমি নও। দুর্ভাবনা ভেবে ভেবে নিজেকে শেষ কোরো না।

কী ভাবছ তুমি? এই তিন হাজার রুবল না পেলে আমি আত্মহত্যা করব?

হায় রে! আত্মহত্যা করার ক্ষমতাটুকুও এখন আমার নেই। এ ক্ষমতা যেদিন ফিরে পাব সেদিন হয়তো বাঁচব। এখন আমি চললাম গ্রুশেংকার কাছে। তারপর যা হবার হবে।

যাবে তো, তারপর?

যদি সে আমাকে বিয়ে করে, আমি তার স্বামী হব। তারপর যখন তার কাছে প্রেমিক আসবে, তখন আমি পাশের ঘরে গিয়ে লুকোবো। বন্ধুরা এলে তাদের পান পাত্র আমি এগিয়ে দেব, তাদের জুতো আমি পরিষ্কার করব, সব হুকুম তামিল করব তাদের।

না, না, আলিওশা বললে,—কার্তেরিনা আইভানোভনা অবুঝ নয়। সে তোমার বিপদের কথা বুঝবে, ক্ষমা করবে তোমাকে। তোমার চেয়ে দুঃখী কেউ নেই, তোমার দুঃখকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো উদার মন তার আছে। তার চোখে তোমার সব অপরাধের মার্জনা হবে।

ম্লান হাসি হেসে ডিমিত্রি বললে,—না, সব কিছুর মার্জনা হয় না। এর মধ্যে এমন কিছু আছে ভাই, যা কোনো নারী ক্ষমা করতে পারে না। সব চেয়ে ভালো কী করলে হয় জানো?

কী করলে?

শুধু ঐ তিন হাজার রুবল ফেরত দিয়ে দিতে পারলে।

এতো টাকা কোথায় পাবে? হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার দু-হাজার রুবল আছে, আইভান নিশ্চয় তোমাকে আর এক হাজার দেবে। এই তো তিন হাজার হোলো। দিয়ে দিয়ো।

তোমার টাকা! কবে তুমি পাবে? সাবালক হলে, তার আগে নয়। সে হয় না ভাই। আজই তোমাকে কার্তেরিনার কাছে যেতে হবে। টাকা যোগাড় হোক বা না হোক, আজই তুমি ওর কাছ থেকে আমার হয়ে শেষ বিদায় নিয়ে আসবে। এমনি করে আর চলে না, আর একদিনও দেরি নয়। হ্যাঁ, তার আগে তোমায় যেতে হবে বাবার কাছে।

বাবার কাছে?

হ্যাঁ, বাবার কাছে আমার হয়ে তুমি তিন হাজার রুবল চাইবে।

তা চাইব মিটিয়া, কিন্তু পাবার আশা বৃথা।

তা জানি। তবু হতাশ্বাসের শেষ চেষ্টা।

বুঝলাম।

শোনো, আইনত বাবার কাছে একটি কপর্দকও আমার পাওনা নেই। কিন্তু না পাওনা থাকলেও নীতিগতভাবে কিছু আমার প্রাপ্য থাকে বইকি। তুমি হয়তো জানো, আমার মা'র অটাশ হাজার রুবল দিয়ে ব্যবসা শুরু করে সে লাখ খানেকের বেশি উপায় করে। ঐ আটাশ হাজার থেকে মাত্র তিন হাজার আমাকে দিক,—আমিও নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই, তারও অনেক পাপের স্খালন হোক। এই তিন হাজার

টাকা পেলে আমি শপথ করব যে আমি তার কাছে আর একটা কানাকড়িও চাইব না কোনোদিন। আমাকে এই টাকা দিলে সত্যি সে আমার বাবার কাজ করবে। বোঝো তাকে, ভগবান তাকে এই পিতৃত্বের সম্মানের সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

মিটিয়া, যতো কিছুই আমি বলি, আর একটা পয়সাও বাবা তোমাকে দেবে না।

তা জানি, খুব ভালো করেই জানি। বিশেষ করে এখন। কেন জানো? আমার ধারণা, খুব সম্প্রতি, বোধহয় কালই বাবা জানতে পেরেছে যে গ্রুশেংকা হয়তো আমাকে নিয়ে খেলা করছে না, হয়তো সে আমাকে বিয়ে করতেও পারে। গ্রুশেংকার প্রকৃতি বাবা জানে। গ্রুশেংকার জন্যে বাবা নিজে পাগল,—এমনি অবস্থায় তার কাছ থেকে কী সাহায্য আমি আশা করতে পারি! তবে আরো একটা গোপন খবর আমি জানি। গত পাঁচ দিন আগে সে ব্যাঙ্ক থেকে তিন হাজার রুবলই তুলে এনেছে সবগুলোই একশো রুবলের নোট। নোটগুলো একটা খামে বন্ধ করে খামটার উপর সে লিখে রেখেছে, আমার প্রিয় গ্রুশেংকার জন্যে, যখনই সে আমার কাছে ধরা দেবে। খামটার গায়ে পাঁচটা শিলমোহর,—লাল ফিতে জড়ানো তার ওপর। তার চাকর স্মারডিয়াকভ ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না। গ্রুশেংকাকে বাবা খবর পাঠিয়েছে। গত চারদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছে, টাকার লোভে হয়তো মেয়েটা আসবে। গ্রুশেংকাও উত্তরে জানিয়েছে, এখনো মনস্থির করিনি। বলো, গ্রুশেংকা যদি আমার জন্মদাতার কাছে একবার যায়, তারপর কি আমি আর তাকে বিয়ে করতে পারি? এবার বুঝলে, কেন আমি এখানে লুকিয়ে বসে আছি, কিসের প্রতীক্ষায়?

গ্রুশেংকার জন্যে? ·

হ্যাঁ, গ্রুশেংকার জন্যে। এ বাড়িতে মা আর মেয়ে দুজন থাকে তা তুমি জানো। আর থাকে তাদের চাকর ফোমা। ফোমা আগে সৈন্যদলে ছিল, আমার পরিচিত। এই ফোমার ঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছি আর পাহারা দিচ্ছি—গ্রুশেংকা এ পথে আসে কিনা। কী উদ্দেশ্যে আমি এখানে আছি, তা আমি এদের কাছেও ভাঙিনি।

কিন্তু স্মারডিয়াকভ তো জানে?

হ্যাঁ, সে কেবল জানে। গ্রুশেংকা যদি বুড়োর কাছে যায়, তখুনি সে আমাকে খবর দেবে।

তাহলে স্মারডিয়াকভই তোমাকে বাবার ঐ তিন হাজার রুবলের কথা বলেছে?

হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা একান্ত গোপনীয়। আইভানও জানে না। বাবা দু-তিন দিনের জন্যে আইভানকে চারমাশনিয়াতে পাঠাচ্ছে, সেখানকার জঙ্গল কিনবার একজন খদ্দের জুটেছে, কাঠের দাম দেবে আট হাজার। বাবা রোজ আইভানকে বলছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল বিলি করে আসতে। আইভান যদি দু-তিন দিন বাইরে থাকে বাবার তাতে সুবিধে, খালি বাড়িতে গ্রুশেংকা আসতে পারবে।

আজই আসবে নাকি গ্রুশেংকা?

না, আজ নয়। আমার সংকেত আছে, সে সংকেত স্মারডিয়াকভ জানে,—সেই

বলেছে আজ আসবে না। বাবা এখন আইভানের সঙ্গে টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে। এই সময় যাও আলিওশা। বাবার কাছে গিয়ে তিন হাজার রুবল চাও আমার জন্যে।

ডিমিত্রির চোখে মুখে কেমন একটা উন্মত্ততার ছাপ। তার মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আলিওশা। ও বুঝি প্রকৃতিস্থ নয়।

ডিমিত্রিও তার দিকে তাকাল অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে। বললে,—দেখছ কী? ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি? ভয় নেই, মাথা আমার ঠিক আছে। তবু আমি তোমাকে বাবার কাছে পাঠাচ্ছি, কেননা অলৌকিক সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাস করি। ঈশ্বর জানেন, কতো হতাশা আমার। তাঁর চোখে কোনো কিছু ঢাকা নেই। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে, ভগবানের তা কাম্য নয়। অলৌকিক সুফল একটা ঘটতেও পারে। যাও, আর দেরি কোরো না।

যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে?

নিশ্চয়ই করব, যতোক্ষণ না তুমি ফিরে আসো। জানি আমি, গিয়েই তুমি কথাটা পাড়তে পারবে না। বাবা তো এখন মাতাল। ঘণ্টা তিনেক, নয়তো চার, পাঁচ, ছয়, সাত ঘণ্টা আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তবে মনে রেখো, টাকা পাও বা না পাও, আজই তোমাকে কার্টেরিনার কাছে যেতে হবে, তা সে মাঝরাত্রি হলেও। তাকে বলবে আমার শেষ কথা যে তাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বিদায় নিয়ে গেছি।

মিটিয়া, আজ যদি গ্রুশেংকা আসে? কাল নয়, পরশু নয়, আজই যদি আসে?

গ্রুশেংকা? আমি পাহারা দিচ্ছি। যদি আসে, আমি ছুটে গিয়ে দাঁড়াব তার সামনে, তার পথ বন্ধ করে…

কিন্তু যদি—

এর পরেও কিন্তু যদি থাকে তার উত্তর হচ্ছে খুন।

খুন? কে কাকে খুন করবে?

আমি করব। গ্রুশেংকাকে নয়, বাবাকে।

কী বলছ তুমি ভাই?

জানিনে। জানিনে কি বলছি, জানিনে কী করব? হয়তো খুন করব, হয়তো করতে পারব না। আমার নিজের বাবা, তাকে দেখলে একটা শারীরিক ঘৃণায় আমি কুঁকড়ে যাই। ঐ ঘৃণাটাকে ভয় করি। ঐ ঘৃণার জন্যেই হাত আমার উঠবে না।

আমি চললাম মিটিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠে আলিওশা বললে,—তুমি শান্ত হয়ে থাকো। ভগবান করুন, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে না যায়।

কিছু ভেবো না তুমি। আমি শান্ত হয়ে চুপ করেই বসে থাকব। বসে বসে সেই অলৌকিক ঘটনার প্রতীক্ষা করব। তুমি যাও।

আলিওশা তার বাবার বাড়ির দিকে চিন্তাকুল মনে পা বাড়াল।

বাড়ি পৌঁছে আলিওশা দেখল, বাবা তখনো খাবারের টেবিলের সামনে বসে। বাড়িতে পৃথক ভোজন-কক্ষ থাকলেও যথারীতি খাবার টেবিলটা পাতা রয়েছে বাড়ির বসবার ঘরে। এই ঘরটা অন্য সব ঘরের চেয়ে বড়ো, প্রাচীন ধরনের এর সাজগোজ। রং-ওঠা আসবাবপত্র। চেয়ারের গদিগুলো বহুকালের পুরোনো লাল সিল্কের কাপড় মোড়া। জানলাগুলোর মাঝে মাঝে দেয়ালে টাঙানো গিল্টির কারুকার্য করা ফ্রেমে বাঁধানো বড়ো বড়ো আয়না। দেয়ালে সাদা কাগজ আঁটা, কোথাও কোথাও সে কাগজ ছিঁড়ে এসেছে—দুটি মস্ত বড়ো ছবি, একটি ত্রিশ বছর আগেকার এ অঞ্চলের এক গভর্নরের, আর একটি সেই যুগেরই এক বিশপের। দরজার উল্টোদিকের দেয়ালের এক কোণে ঝোলানো রয়েছে কয়েকটি আইকন, তাদের সামনে ছোট টেবিলে বসানো একটি তেলের বাতি। ফিয়োডোর পাভলোভিচ রাত্রে সাধারণত ঘুমতে যেত অনেক রাত্রে—কোনো কোনো দিন শেষ রাতে তিনটে চারটের সময়। ঘুমের আগে এই বড়ো হলঘরটায় হয়তো সে পায়চারি করে বেড়াত, না হয় আরাম কেদারায় বসে বসে ভাবত। রাত্রে বাড়িতে আর কেউ থাকত না, সাধারণত স্মারডিয়াকভ ছাড়া। সে ঘুমত হলঘরের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে।

আলিওশা ঘরে ঢুকে দেখে ডিনার সবে শেষ হয়েছে,—এবার কফি আর মিষ্টান্নের পালা। ফিয়োডোর ব্র্যান্ডির সঙ্গে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। আইভানও টেবিলে, সে চুমুক দিচ্ছে কফির পেয়ালায়। গ্রিগরি আর স্মারডিয়াকভ, দুই ভৃত্য অদূরে দাঁড়িয়ে। প্রভু-ভৃত্য সকলেরই খোশমেজাজ। সশব্দে হাসছে ফিয়োডোর পাভলোভিচ। বাইরে থেকে সেই উচ্চহাসির কর্কশ আওয়াজ শুনেই আলিওশা বুঝল বাবার পেটে বেশ কিছু ইতিমধ্যে পড়েছে, এখন তার রসালো অবস্থা, পূর্ণ মত্তাবস্থা আসতে দেরি আছে।

হো-হো করে হেসে চিৎকার করে উঠল ফিয়োডোর ছোট ছেলেকে দেখে,—অ্যাই দ্যাখো! ঠিক যাকে চাইছিলাম, সেই হাজির। এসো, এসো, বাবা এসো। বোসো আমাদের সঙ্গে। একটু ব্র্যান্ডি চলবে নাকি? চলবে না? তাহলে দামী পুরোনো মদ অন্তত একটু? এই স্মারডিয়াকভ, যা তো, কাবার্ডের মাঝের শেলফটার ওপর বোতলটা পাবি। চট্ করে নিয়ে আয়। অ্যাঁ, কী বললে বাবা আলিওশা? মদেও অরুচি? ব্যস ব্যস, তুমি সাধুমানুষ, তুমি না টানলেও আমরা আছি। ভালো কথা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

ফাদার সুপিরিয়রের রান্নাঘরে এক টুকরো রুটি মাত্র চিবিয়েছিল আলিওশা, তবু সে বললে,—হ্যাঁ, খাওয়া হয়েছে, তবে কফি একটু খেতে পারি!

বহুৎ আচ্ছা বেটা। কফি দে স্মারডিয়াকভ, বেশ গরম আছে তো? ঠান্ডা যেন দিসনে। কফি আর মাছের কালিয়া এ দুটি জিনিষ বানাতে স্মারডিয়াকভ ওস্তাদ। একদিন এসে স্মারডিয়াকভের রান্না মাছের কালিয়া খেয়ে দেখো, কেমন? ও হ্যাঁ, মনে

পড়ল। হ্যাঁরে ছোঁড়া, তোকে বলিনি, ঐ মঠ থেকে তোর বালিশ বিছানা সব আজ নিয়ে আসতে? এনেছিস?

ফিয়োডোরের গলায় রাগের কোনো চিহ্ন নেই।

আলিওশাও হাসিমুখে উত্তর দিল,—না, আনিনি।

এখন বলছিস্ আনিনি। কিন্তু তখন? তখন আমার কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি কিনা বল্? ওরে, তোর মনে দুঃখ লাগে, এমন হুকুম কি আমি সত্যি দিতে পারি? তুমি জানো বাবা আইভান, এই আলিওশা যখন হাসিমুখে আমার দিকে মুখ তুলে চায়, আমার সারা বুক জুড়িয়ে যায়। আয় বাবা, তোকে একটু আশীর্বাদ করি।

উঠে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল আলিওশা।

না, না, বোস্। উঠতে হবে না তোকে। কী যে মজা হয়েছে এইবার শোন্—এ আবার তোর লাইনেরই কথা! কথা শুনলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে।

কথাটা বলছে কে? স্মিতমুখে আলিওশা প্রশ্ন করল।

আরে, বালামের গাধার মুখে কথা ফুটেছে যে! এখুনি শুনবি সব।

বালামের গাধা বলে যাকে উল্লেখ করা হোলো সে হচ্ছে তরুণ ভৃত্য স্মারডিয়াকভ। লোকটির বয়স বছর চব্বিশ, অত্যন্ত অসামাজিক প্রকৃতির স্বল্পভাষী লোক। এ নয় যে লোকটা খুব লাজুক প্রকৃতির; আসলে সে অত্যন্ত দাম্ভিক, সকলের প্রতি তার বিতৃষ্ণা।

এই স্মারডিয়াকভ সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। জন্মের মুহূর্ত থেকে গ্রিগরি আর মারফা তাকে মানুষ করে তোলে, কিন্তু এজন্যে তার মনে সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। ছেলেবেলা থেকেই সে নির্বান্ধব, সারা দুনিয়ার প্রতি তার অবিশ্বাসের দৃষ্টি। বাল্যকালে তার একটা খুব প্রিয় খেলা ছিল বিড়াল ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া, ও মরা বিড়ালকে মাটি খুঁড়ে সমাধিস্থ করা। এমনি নিষ্ঠুর খেলার মাঝখানে একদিন গ্রিগরির চোখে সে পড়ে যায়, গ্রিগরি তাকে বেদম মার মারে। মার খেয়ে সাত দিন সে এক কোণে বসে ফোঁস ফোঁস করে। গ্রিগরি মারফাকে বলত,—ওটা মানুষ নয়, একটা দানব। তুমি আমি বাঁচি কি মরি, ওর বয়েই গেল। মুখোমুখি গ্রিগরি ওকে বলত,—তুই মানুষ নোস, বেজন্মা! বাগানের ব্যাঙের ছাতা থেকে তোর জন্ম!

বড়ো হোলো স্মারডিয়াকভ। এসব তিরস্কার সে ভুলল না, গ্রিগরির প্রতি জমানো-ক্রোধ তার ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল।

গ্রিগরি তাকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করল। বারো বছর বয়স হতে তাকে ধর্মগ্রন্থ পড়াতে আরম্ভ করল। কিন্তু এ শিক্ষকতায় কোনো ফল হোলো না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন বাইবেল পাঠের সময় খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল ছেলেটা।

চশমার মধ্যে দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে গ্রিগরি ধমকাল,—হাসছিস কেন অমন করে?

হি-হি, হাসি পাচ্ছে যে! ভগবান প্রথম দিন আলোর সৃষ্টি করলেন, আর চারদিনের দিন সৃষ্টি করলেন সূর্য চন্দ্র তারা। তাহলে প্রথম দিন আলো এল কোথা থেকে?

চোখের সামনে বজ্রপাত হলেও এতোটা স্তম্ভিত হোতো না গ্রিগরি। ধর্মগ্রন্থের এমনি হেনস্থা? ছেলেটার চোখে কেমন দুর্বিনীত তাচ্ছিল্যতার ভাব দ্যাখো! নিজেকে সামলাতে পারল না গ্রিগরি।

দ্যাখাচ্ছি কোথা থেকে এল,—এই বলে প্রচণ্ড একটা চড় হাঁকাল ছাত্রের গালে। নীরবে চড়টা হজম করে আবার কদিন গুম হয়ে রইল স্মারডিয়াকভ। সাত দিন না যেতেই তার সেই রোগ দেখা দিল, যে রোগ এখন তার সারা জীবনের সাথী। রোগটা মৃগীরোগ। এই রোগের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার প্রতি ফিয়োডোর পাভলোভিচের নজর বদলে গেল। এতোদিন পর্যন্ত ছেলেটাকে সে চিনতই না যেন, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে দু-একটা পয়সা ছুঁড়ে দিত মাত্র। কখনো মেজাজ ভালো থাকলে নিজের টেবিল থেকে দু-একটা মিষ্টিও দিত তার হাতে। এখন সে ডাক্তার বদ্যি এনে ধুম করে ছেলেটার চিকিৎসা শুরু করে দিল। রোগ কিন্তু কিছুতেই আর সারলো না। এখনো প্রায়ই স্মারডিয়াকভের মৃগীর মূর্ছা হয়, মাসে অন্তত একবার। কখনো আক্রমণ হয় মৃদু, কখনো খুব জোর। ফিয়োডোর পাভলোভিচ প্রথম থেকেই বারণ করে দিয়েছিল, গ্রিগরি যেন আর কখনো তার গায়ে হাত না তোলে, নিজের ঘরেও তাকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে আসতে আরম্ভ করে, পড়াশুনো বন্ধ করে দেয় একেবারে। বছর পনেরো যখন স্মারডিয়াকভের বয়স, একদিন ফিয়োডোর দেখে, সে তার কাচ-ঢাকা বইএর আলমারির দিকে তাকিয়ে বইএর নামগুলো পড়ছে। ফিয়োডোরকে কেউ কখনো পড়তে দেখেনি, কিন্তু বই তার ঘরে ছিল একশোর বেশি। ফিয়োডোর আলমারির চাবিটা স্মারডিয়াকভকে দিয়ে দিল। বললে,—নে, তুই-ই আমার লাইব্রেরিয়ান হবি। উঠোনে ঘুরে না বেড়িয়ে এখানে বসে বই পড়া অনেক ভালো। এই নে, এই বইটা পড় তো প্রথম।

ফিয়োডোর তাকে দিল নিষিদ্ধ প্রেমের এক চটকদার রোমান্টিক কাহিনী।

কয়েক পাতার বেশি বইটা পড়ল না স্মারডিয়াকভ। গম্ভীর করে রইল মুখ।

কি রে, মজা লাগছে না পড়তে? শুধোলো ফিয়োডোর।

স্মারডিয়াকভ উত্তর দিল না।

ফিয়োডোর ধমকিয়ে উঠল,—কথা বলছিস্ নে কেন, হাঁদারাম?

একটু মুচকি হেসে ছেলেটা বললে,—এতে সব মিথ্যে কথা লিখেছে যে!

মিথ্যে কথা? চাকরের বুদ্ধি তো, কতো আর হবে! রাখ্ ওটা। এই নে, স্মারাগ্ডভের লেখা পৃথিবীর ইতিহাস। সব সত্যি কথা এতে লেখা আছে।

দশ পাতার বেশি সেই বই নিয়ে এগোতে ক্লান্তি লাগল স্মারডিয়াকভের। বইএর আলমারিতে চাবি পড়ল।

এর কিছুদিন পরেই গ্রিগরি আর মারফা ফিয়োডোরের কাছে অনুযোগ করল, স্মারডিয়াকভের ব্যবহারে এক অদ্ভুত খুঁতখুঁতে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। খেতে বসে

কোলের বাটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর এক চামচ ঝোল তুলে আলোর কাছে চামচটা তুলে ধরে চোখ পাকিয়ে দেখে।

গ্রিগরি বলে,—কি রে! ঝোলে কিছু পড়েছে নাকি?

মারফা মুখ ফিরিয়ে বলে,—মাছি হবে একটা।

স্মারডিয়াকভ কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু কী রুটি, কী মাংস, যা খায় তাই সে অমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, তবে মুখে তোলে।

গ্রিগরি বকবক করে,—ইঃ, কী ফুলবাবুটি আমার! ঢং দ্যাখো না!

ফিয়োডোর স্মারডিয়াকভের এই নতুন বাতিকের খবর শোনা মাত্র স্থির করল তাকে সে তার রাঁধুনি বানাবে,—রান্নার কাজ ভালোভাবে শেখাবার জন্যে পাঠিয়ে দিল মস্কোতে। কয়েক বৎসর মস্কোতে কাটাবার পর স্মারডিয়াকভ যখন ফিরে এল, তখন তার চেহারার আশ্চর্য পরিবর্তন। শীর্ণ রক্তশূন্য মুখ, তাতে অসংখ্য বলিরেখা,—বয়সের চাইতে অনেক বড়ো দেখায় এমনি মুখের জন্যে। মেজাজের অবশ্য কোনো পরিবর্তন নেই,—আগেকার মতোই অমিশুক, অসামাজিক। এমনি অমিশুক নিঃসঙ্গ জীবন সে মস্কোতেও কাটিয়েছিল। মস্কো শহরের সে কিছুই দেখেনি. সেখানকার জীবনযাত্রার কোনো কিছুতেই তার উৎসাহ ছিল না। একদিন মাত্র থিয়েটারে গিয়েছিল,—ফিরে এসেছিল বীতশ্রদ্ধ ভাব নিয়ে। মস্কো থেকে অবশ্য পোষাক পরিচ্ছদে খুব বাবু হয়ে সে ফিরে এল। জামা-কাপড়ে খুব ফিটফাট, জুতোটি প্রাত্যহিক কালি-বুরুশে আরশির মতো চকচকে। পাচক হিসেবেও সে হোলো একেবারে পয়লা নম্বরের। ফিয়োডোর তার একটা মাস-মাহিনার বন্দোবস্ত করে দিল। মাহিনার প্রায় সমস্ত টাকাটাই স্মারডিয়াকভ খরচ করতে লাগল পোষাকে আর প্রসাধনে। ব্যক্তিগত বাবুয়ানি মাত্রা ছাড়ালেও যেমন পুরুষ তেমনি নারীর প্রতিও স্মারডিয়াকভের সীমাহীন বিতৃষ্ণা। মেয়েরা তার নাগালই পায় না। তার মূর্ছাও আগের চেয়ে বেশি ঘন ঘন হতে লাগল। রোগের তাড়সের সময় সে উঠতে পারে না, বুড়ী মারফা রাঁধে,—সে রান্না ফিয়োডোরের মুখে রোচে না।

একদিন ফিয়োডোর তাকে ডেকে বললে,—কি হে, তোমার মৃগীরোগ তো দেখি বেড়েই চলেছে? একটা বিয়ে-থা করলে সারবে? পাত্রী দেখব?

রাগে স্মারডিয়াকভের মুখ কালো হয়ে উঠল, উত্তর দিল না। ফিয়োডোর হালকা হেসে চলে গেল।

ভৃত্য হিসেবে প্রধান গুণটির অধিকারী ছিল সে—তার মতো বিশ্বাসী লোক পাওয়া ভার। প্রভুর পয়সা পথে পড়ে থাকলেও সে স্পর্শ করত না। চোখে তার সর্বদা রাগতভাব, মুখে কথা নেই,—তবু ফিয়োডোর তাকে ভালোবাসত সে এতোটা বিশ্বাসী বলেই। এতো কম কথা সে বলত যে, সে কেমনধারা লোক, কী তার ভাবনা-কামনা তা কারো পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। শুধু মূর্ছা যাওয়া নয়, মাঝে মাঝে মাঠে বা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সে। দাঁড়িয়ে থাকত নিঃশব্দে দশ পনেরো মিনিট, কী যে ভাবত তা সেই জানে।

সেই বালামের গাথা আজ হঠাৎ কথা কয়েছে। কথার বিষয়বস্তুটিও বিচিত্র।

গ্রিগরি সকাল বেলা জিনিষপত্র কিনতে বার হয়েছিল, দোকানদারের কাছ থেকে একটা খবর শুনে এসেছে। খবরটা এই যে, এশিয়ার কোন্ সুদূর প্রান্তে মুসলমানদের হাতে এক রুশ সৈনিক ধরা পড়ে। বিধর্মীরা তাকে বলে, সে যদি অবিলম্বে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হয় তাহলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে। সৈনিকটি অস্বীকার করে ও খৃষ্টের নাম-কীর্তন করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। খাবার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটু আগে গ্রিগরি এই কাহিনীটি বলছিল। খাবার সময় খোশগল্প করতে ফিয়োডোর ভালোই বাসে. আজ আবার বিশেষ করে তার মেজাজ দিলখোলা। মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনে সে বললে,—এখনি ঐ সৈনিককে খৃষ্টীয় সাধু বলে ঘোষণা করা উচিত ও তার দেহের অংশাবিশেষ সংগ্রহ করে মঠে মঠে রাখা উচিত,—পয়সা উঠবে তাতে প্রচুর।

ভ্রূকুঞ্চন করল গ্রিগরি। সে বুঝল, এই কাহিনী ফিয়োডোরের মনে একটুও রেখাপাত করেনি, ঠাট্টা করছে সে। দরজার কাছে স্মারডিয়াকভ দাঁড়িয়েছিল, মৃদু মৃদু হাসছিল সে।

ফিয়োডোর দেখল, গ্রিগরিকে চটাবার আরো সুযোগ,—সে হেঁকে উঠল স্মারডিয়াকভকে উদ্দেশ করে,—তুই আবার দাঁত বার করছিস কেন, হতভাগা ?

হঠাৎ স্মারডিয়াকভ বেশ কড়া গলায় বলতে শুরু করল,—আমার মত যদি এক্ষেত্রে প্রকাশ করতেই হয় তাহলে বলব, এই বিখ্যাত লোকটি সত্যি সত্যিই যদি প্রকৃত কর্মী হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে এমনি অবস্থায় পড়ে সাময়িকভাবে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করাটা কিছুমাত্র অবিবেচনার কাজ হোতো না। অমূল্য জীবনটা তাতে নষ্ট হোতো না এবং পরে সারা জীবন ধরে নানা সৎকাজ করে তিনি এই সাময়িক কাপুরুষতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারতেন।

ধুয়ে মুছে ফেললেই হোলো ? খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইস্‌লামকে বরণ করা। ইঃ, সে পাপের আর শেষ আছে ? চিৎকার করে উঠল গ্রিগরি,—ছি ছি ছি! এই কথা বলার জন্যেই তুই নরকে যাবি, সেখানে ওরা ভেড়ার মাংসের মতো তোর মাংস আগুনে সেদ্ধ করবে।

ঠিক এই সময়ে আলিওশা ঘরে এসে ঢুকল। ফিয়োডোর বললে,—অ্যাই যে! আয়, বোস্। ঠিক তোর লাইনেরই আলোচনা হচ্ছে, তুই বুঝবি ভালো।

আলিওশা চুপ করে বসল। স্মারডিয়াকভ পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল,—ঐ সব ভেড়ার মাংস-টাংস রাখো, আমি যা বলেছি তা খাঁটি কথা, সম্পূর্ণ ন্যায় সম্মত কথা।

খুব কৌতুক হোলো ফিয়োডোর পাভলোভিচের। আলিওশার হাঁটুতে আঙুলের এক খোঁচা দিয়ে বললে সে,—ন্যায় সম্মত কথা ? বললেই হোলো।

রাগে জনলে উঠেছিল গ্রিগরি। তার মুখ দিয়ে বার হোলো,—বদমাইস কোথাকার!

দাঁড়াও, দাঁড়াও গ্রিগরি ভার্সিলিয়েভিচ, ও সব বদমাইস-টদমাইস পরে বোলো। মন দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করো। ধরো, খৃষ্টানদের যারা শত্রু, বিদেশে গিয়ে তাদের হাতে যদি আমি পড়ি. আর তারা যদি দাবি করে যে খৃষ্টের আর ঈশ্বরের নাম আমাকে ত্যাগ করতে হবে,—আমি স্বচ্ছন্দে তা করতে পারি, কিছুমাত্র পাপ হবে না আমার তা করলে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি, হাসতে হাসতে ফিয়োডোর বললে,—একথা তুমি আগেও বলেছ। শুধু বললে তো হবে না, প্রমাণ করো তো বাপু!

রুদ্ধ কণ্ঠে গ্রিগরি আবার বললে,—রাঁধুনী ব্যাটা, কতো বুদ্ধি আর হবে!

ওসব রাঁধুনী-টাঁধুনী রাখো, গ্রিগরি ভার্সিলিয়েভিচ, অনুত্তেজিত গলায় প্রতিবাদ করলে স্মারডিয়াকভ, যা বলি মন দিয়ে শোনো, আর বুঝবার চেষ্টা করো। যে মুহূর্তে শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম যে খৃষ্টধর্ম আমি মানিনে, ঠিক সেই মুহূর্তে খৃষ্টীয় সমাজের চরম অভিশাপ আমার মাথায় পড়ল, আমি আর সমাজের মধ্যে রইলাম না. অখৃষ্টান হয়ে গেলাম। ঠিক কিনা! এমন কি, মুখে বলবার আগেই বলব বলে মনে মনে যেইমাত্র ভেবেছি, সেই এক লহমার মধ্যেই আমার খৃষ্টানত্ব ঘুচল, ঠিক কি না?

যদিও ফিয়োডোরের প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল স্মারডিয়াকভ, তবুও সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলল গ্রিগরিকে উদ্দেশ্য করেই।

হ্যাঁ ঘুচল, গ্রিগরি বললে,—তুমি ধর্মত্যাগী অখৃষ্টান হলে, তাতে হয়েছে কী?

আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শেষ পর্যন্ত শোনো মন দিয়ে। তাহলে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি আর খৃষ্টান রইলাম না, বিধর্মী হয়ে গেলাম, ঠিক তো!

ঠিক বাবা ঠিক, ফিয়োডোর বললে,—এবার আর কি বলবে চট্‌পট্ বলে নাও!

শুনুন তাহলে, যে মুহূর্তের মনস্কামনার ফলে আমার খৃষ্টানত্ব ঘুচল, তারপর যদি শত্রু আমায় জিজ্ঞাসা করে খৃষ্টান কিনা, তখন আমি যদি নিজেকে অখৃষ্টান বলি, তাহলে আমার মিথ্যা কথা বলা হোলো কোথায়? আমি তো আর খৃষ্টান নই! তখন খৃষ্টান নই একথাটা ঘোষণা করে খৃষ্টান সমাজের দৃষ্টিতে পাপই বা হোলো কোথায়? তার আগের মুহূর্তেই তো আমি বিধর্মী হয়ে গেছি। যে খৃষ্টান হয়ে জন্মায়নি, যে বিধর্মী, সে খৃষ্টান নয় বলে খৃষ্টানদের স্বর্গ থেকে সে নরকে বদলি হয় না, যিশুও তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙান না। সে আদপে খৃষ্টান নয়, তাকে কি খৃষ্টান বলে ঈশ্বর শাস্তি দেবেন? তাতে যে ঈশ্বরেরই মিথ্যা কথা বলা হবে!

বজ্রাহতের মতো থ হয়ে গেল গ্রিগরি স্মারডিয়াকভের কথাগুলো শুনে। চোখ দুটো তার কোটর থেকে ঠিকরে বার হয়ে আসতে চায়,—হাঁ করে সে তাকিয়ে রইল বক্তার মুখের দিকে। তার পালিত সন্তানের মুখ থেকে এমনি ধর্মহীন অসার বাগাড়ম্বর সে আশা করেনি কখনো,—কথাগুলো আঘাতের মতো বাজল তার মাথার মধ্যে।

শুন্যা মদের গেলাসটা সশব্দে টেবিলের ওপর নামিয়ে তীক্ষ্ম কর্কশস্বরে হেসে উঠল ফিয়োডোর।

অ্যালিওশা, শুনেছিস অ্যালিওশা! কী জবাব দিবি এ কথার, দে! চমৎকার বলেছ তর্কচূড়ামণি আমার! কিন্তু যা বলেছ সব ঝুটো, সব ফাঁকিকারি। চেঁচিয়ো না গ্রিগরি, এখুনি ওর জারিজুরি আমি ভাঙছি। শোন্ গাধা, শত্রুদের কাছে তোর হয়তো মিথ্যে কথা বলা হোলো না, কিন্তু পাপ তো হোলো তোর নিজের মনের কাছে! যে মুহূর্তে মনে মনে তুই ধর্মত্যাগ করলি, সেই মুহূর্তে ধর্মের অভিশাপ পড়ল তোর মাথায়! সেই মাথা নিয়েই তুই নরকে যাবি, সেই মাথা ওরা পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙবে! ভাঙবে না? পাপের শাস্তি পাবিনে? দে, উত্তর দে, হতভাগা!

হ্যাঁ, মনে মনে ধর্মত্যাগ করলেই পাপ করা হবে বটে, তবে সেটা একটা খুব বড়ো পাপ হবে না।

বড়ো পাপ হবে না? মিথ্যুক কোথাকার!

না, এতো খুব সাধারণ পাপ!

সাধারণ পাপ? বললে গ্রিগরি।

নিশ্চয়ই।

স্মারডিয়াকভ বলে চলল, তার কন্ঠস্বরে জয়ের গৌরব, বিজয়ীর প্রতি তাচ্ছিল্যভরা করুণা,—অতো বিচলিত হোয়ো না গ্রিগরি ভাসিলিয়েভিচ,—আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। বাইবেলে লেখা আছে যে তোমার যদি একটা সরষের দানার মতো বিশ্বাস থাকে তাহলে তুমি যদি পাহাড়কে হুকুম করো সমুদ্রে গিয়ে ডুব দিতে, পাহাড় তোমার কথা শুনবে। তাই নয়? আচ্ছা ধরো, আমার তো ধর্মবিশ্বাস-টিশ্বাস নেই, আর তুমি এতো বড়ো ধর্মাত্মা যে তার গর্বে দুবেলা আমাকে গালাগাল দিচ্ছ। বলো না তুমি ঐ পাহাড়টাকে, সমুদ্রে গিয়ে—না, সমুদ্র অনেক দূর,—ঐ বাগানের ধারে খালটার কাছেও দু-পা এগিয়ে যেতে। পাহাড় যাবে? বয়েই গেছে। যতোই ধমক মারো, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে যেমন আছে। এতেই প্রমাণ গ্রিগরি ভাসিলিয়েভিচ যে লোকের কাছে যতোই তুমি কপচাও, সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাস তোমার নেই। অবশ্য একলা তুমি নও, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো পাকা দাড়িওয়ালা সাধু থেকে মাঠের একটা চাষা পর্যন্ত কারুর সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাস নেই যা দিয়ে সে পাহাড় নড়াতে পারে। তাই বলে কি ঈশ্বর সবাইকেই অভিশাপ দেবেন? সবাইকে নরকে পাঠাবেন? না, ক্ষমা করবেন তিনি সবাইকেই, ছোট বড়ো সব অবিশ্বাসীকেই। তাহলে ভেবে দ্যাখো, আমি যদি চরম বিপদে পড়ে একবার নিজেকে অবিশ্বাসী বলে পার পাই, আর তারপর সারা জীবন অনুতাপ করি তাহলে প্রভুর ক্ষমা থেকে আমিই কেবল বঞ্চিত থাকব?

বাঃ, বাঃ, তর্কচঞ্চু, বেশ বলেছিস! একটা সোনার মোহর দেব তোকে! ফিয়োডোর বললে,—তবু একটা কথা বলি, বোকা শোন্! আমাদের ধর্মবিশ্বাসে এই যে ঘাটতি তার কারণ জানিস? তার কারণ এই নয় যে আমাদের ভক্তি নেই, কারণ আমাদের

সময় নেই। ভগবান দিন দিয়েছেন চব্বিশটি ঘণ্টা মাত্র, এদিকে দুনিয়াদারীর কাজকর্মের এতো তাড়া যে রাত্রে ঘুমেরই সময় মেলে না, তা কখন ধর্মকর্ম করব, পাপের জন্য অনুতাপ করব? কিন্তু শত্রুরা যখন তোকে ঘিরবে, তখন তোর কাজটা কিসের, তাড়াটা কি? তখনই তো তোর চূড়ান্ত ধর্মবিশ্বাস দেখানোর অবসর! আর ঠিক সেই সময়টিতেই তুই যদি অবিশ্বাসী হোস্ তাহলে সে যে মহাপাপ হবে হতভাগা!

মহাপাপ হবে? হলেই হোলো? যদি হয় তো সে পাপ সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিয়েও যাবে! যদি সে মুহূর্তে আমি পরিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসই রাখতে পারি তাহলে কোন্ মুসলমানের অত্যাচারকে আমি ডরাই। এক হাঁক দিয়ে তখন পাহাড়টাকে ডাকি, আর পাহাড় ছুটে এসে শত্রুদের গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেয়। আমি যেন কিছু হয়নি এমনি ভাব করে ভগবানের নাম গাইতে গাইতে চলে যাই। কিন্তু বলুন কর্তা, ডাকলে পাহাড় আসবে? মাঝখান থেকে শত্রুরা মহানন্দে আমার ছাল ছাড়াবে। ছালটা পিঠ থেকে অর্ধেক ছাড়িয়ে ফেললেও পাহাড় এক পাও নড়বে না। তাহলে? এমনি অবস্থায় সন্দেহ তো হবেই, আপনিই তো ধর্মবিশ্বাস ঘুচবে, আর নতুন করে কিছু ভাববারও অবসর থাকবে না। তার চাইতে বলুন কর্তা, পিঠের ছাল বাচানোটাই কি বুদ্ধিমানের কথা নয়। আর তাছাড়া পিঠের ছাল, এতো ভগবানের দান! বুদ্ধি করে ছালটা বাঁচালে ভগবান চটবেন, এমনি কথা কোন্ বুদ্ধিমান বলে?

আট

তর্ক শেষ হোলো। এতোক্ষণ খুব মৌজে ছিল ফিয়োডোর পাভলোভিচ,—হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। ব্র্যান্ডির গেলাসে এক চুমুক দিয়ে ভ্রূকুটি করল। ইতিমধ্যেই তার বরাদ্দের বেশি পুরো এক গেলাস সে চড়িয়েছে। ভৃত্যদের বললে,—যাও যাও, অনেক হয়েছে, সরে পড়ো সব এখন। উঃ, এই ব্যাটাদের জ্বালায় খাবার পরে দু-মিনিট শান্তিতে থাকার জো নেই!

আইভানকে উদ্দেশ্য করে ফিয়োডোর আবার বললে,—ডিনারের পর স্মারডিয়াকভ রোজ এসে উপস্থিত হয়। হাঁ করে তোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কী চোখে ও তোকে দেখেছে বল্ তো?

কিছুই না। আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা হয়তো খুব উঁচু, তাই। অতি নীচমন লোকটার। এরা সব বিপ্লবের কাঁচামাল।

অ্যাঁ, বিপ্লবের?

হ্যাঁ, বিপ্লব যখন হবে, তখন এইসব মালই এগিয়ে আসবে প্রথম। ভালো লোকও বার হবে, তবে পরে।

তা কখন বিপ্লব হবে?

কে জানে? হয়তো হবেই না। আতসবাজি হাওয়ায় নিভে যাবে। চাষীরা সাধারণত এইসব রাঁধুনির কথায় না নাচতেও পারে।

যাই বলো দাদা, আলিওশা বললে,—আমাদের বালামের মাথা কিন্তু খুব চিন্তাশীল লোক।

হ্যাঁ, মৃদু হেসে আইভান বললে,—ও আইডিয়া জমাচ্ছে মাথার মধ্যে।

আশ্চর্য লোক! ফিয়োডোর বললে,—আমাকে তোমাকে কাউকে দু-চোখে দেখতে পারে না ও। আলিওশার ওপর বিতৃষ্ণার তো শেষ নেই। তবে হ্যাঁ, গুণ আছে। চোর নয়, এ-কথা ও-কথার লাগানি ভাঙানি নেই, পরচর্চা করে না কখনো। তা ছাড়া রাঁধে চমৎকার,—মাছের প্যাটি যা বানায়! যাক, চাকর নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কী বল আইভান?

ঠিক বলেছ।

হ্যাঁ, ওর আইডিয়া জমানোর কথায় মনে পড়ল, মারই হচ্ছে আমাদের রুশ চাষীভূষীর দাওয়াই, চাবুক খেলেই ওরা সোজা থাকে। আমরা বুদ্ধিমান হচ্ছি, ওদের চাবুক মারা বন্ধ করছি। ফলে দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে একেবারে। যাকগে, মরুকগে রাশিয়া আর তার চাষী! আমি বাবা খোশ মেজাজটা খালি বুঝি।

আমিও তা বুঝছি। আর এক গ্লাসও খেলে দেখলাম, আর না।

থামো, থামো বাবা। আর এক গেলাস খাব, তারপর আর এক গেলাস,—হ্যাঁ, তারপর খতম। কথা বলছি, বাধা দিয়ো না। আজ সকালে মস্কোর কথা বলছিলাম না? মস্কোর এক বুড়ো বলেছিল, ছুকরি মেয়েদের চাবুক পেটা করার মতো মজা আর নেই। আমরা সাধারণত এই চাবুক পেটানোর ভারটা ছেলে-ছোকরাদের হাতেই দিই। অসুবিধে নেই তাতে। যে ছোঁড়া যে মেয়েকে চাবুক পেটে, সে তো আর শুধু—বুঝতেই পারছ। পরদিন সে আবার সেই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দ্যায়। সুবিধে মেয়েদেরই। কি রে আলিওশা, লাল হয়ে উঠলি যে! সাডিজ্‌ম্‌-এর গন্ধ পাচ্ছিস বুঝি? সত্যি বড়ো ভুল হয়ে গেছে। তোদের ফাদার সুপিরিয়রের ঘরে এই মস্কোর মেয়েদের গল্পটা ফাঁদলে বেশ হোতো। তোদের সুপিরিয়রকে আজ আমি অপমান করে ফেলেছি, মনে করিসনে কিছু। কি করি বাবা! রাগ সামলাতে পারিনি। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে অপরাধের শাস্তি পাব। আর যদি না থাকেন, তাহলে সব ব্যাটা সাধুর মাথা কাটব আমি, দেখিস। ওই ব্যাটাদের কথা ভেবে আমার বুকের মধ্যেটা খচখচ করে সর্বক্ষণ। যতো সব কুসংস্কারের ভূত। দেশটাকে ওরাই তো পিছিয়ে রেখেছে! কি রে, বিশ্বাস হচ্ছে না! লোকে যা ভাবে তুইও তাই ভাবিস বুঝি যে, আমি একটা ভাঁড়।

মৃদু গলায় আলিওশা বললে,—না, আমি তা ভাবব কেন?

ঠিক বলছিস? তা ঠিক তুই বলবি, তুই সাধু, তুই সরল। কিন্তু আইভানের কথা আলাদা। আইভানের বড়ো কড়া মেজাজ। আমি কিন্তু ঠিক বলছি, তোদের এই সব সাধুদের আমি সাবাড় করবই করব। ধর্মের নামে বুজরুকি আমি সারা রাশিয়া থেকে বের করে তবে ছাড়ব। সব বোকাদের ঘটে আমি বুদ্ধি যোগাব। তখন বাবাজীদের ভাঁড়ে আর টাকা পড়বে না, সব সোনাদানা জমা হবে ব্যাঙ্কে।

কী লাভ হবে তাতে? আইভান জিজ্ঞাসা করল।

লাভ? লাভ কম? ওরে, ভণ্ডামির মেঘ না সরালে সত্য কি প্রকাশ পায়?

বটে! আইভান হেসে উত্তর দিল,—সত্য যদি প্রকাশ পায় তবে সবার আগে সাবাড় হবে তুমি, ধনেপ্রাণে মরবে একেবারে।

কপাল চাপড়ে ফিয়োডোর বললে,—তা কথাটা ঠিক বলেছিস। খাঁটি সত্যি কথা, আমি একটা গাধা। আচ্ছা আলিওশা, থাক তবে। বোকাদের জন্যে তোর মঠ থাক, আর আমাদের মতো বুদ্ধিমানের জন্যে থাক ব্র্যান্ডির বোতল। এই বোধহয় বিধাতার বিধান। আচ্ছা আইভান, সত্যি কথা বলতো, তোর কি মনে হয়, ভগবান বলে কিছু আছে? ঠিক করে বলবি কিন্তু।

না নেই,—আইভান বললে।

আলিওশা, তুই কী বলিস?

ঈশ্বর আছেন বই কি।

আর ঐ যে অমরত্বের কথা হচ্ছিল। অমরত্ব নেই?

আইভান বললে,—না।

একেবারে নেই, ছিটে-ফোঁটাও না?

না, একেবারেই নেই।

তাহলে তুই বলছিস কিছুই নেই? সব ফাঁকা?

ঠিক তাই। কিছুই নেই।

আলিওশা, তোর মত কী?

অমরত্ব আছে।

দুই-ই আছে? অমরত্বও আছে, ভগবানও আছে?

দুই আছে। ঈশ্বরও আছেন, অমরত্বও আছে। ঈশ্বরের মধ্যেই অমরত্ব আছে।

হুঁ! আমার মনে হয় আইভানের কথাই ঠিক। কী আশ্চর্য! কী ভয়ানক কাণ্ড! যা নেই, যা শুধু একটা ফুটো স্বপ্ন, তাকে নিয়ে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে কী কাণ্ডই না করেছে,—কী বিরাট অপব্যয়। আইভান, সত্যি তোর বিশ্বাস, ভগবান নেই? এই শেষবার তোকে জিজ্ঞাসা করছি।

আমিও শেষবারই তোমাকে বলছি, নেই।

তাহলে? এই তামাম দুনিয়ার মানুষ-জাতটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে কে?

আইভান হেসে বললে,—শয়তান হবে।

শয়তান! ভগবান নেই তো শয়তান আছে নাকি?

না, শয়তানও নেই।

হায়, হায়! কী দুঃখের কথা! প্রথম যে-ব্যাটা মানুষ ভগবানকে আবিষ্কার করেছিল তাকে যদি একবার হাতের কাছে পেতাম! বাবলা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলেও ক্ষোভ মিটত না।

এটা কিন্তু মনে রেখো, মানুষে যদি ঈশ্বরকে না বানাত তাহলে এই সভ্যতাও

বানাতে পারত না। তাহলে তোমার এই ব্র্যাণ্ডি পেতে কোথায় ? দাও, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা, সরিয়ে রাখার সময় হয়েছে।

আরে না, না, দাঁড়া আর একগেলাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিই ! নাঃ, এসব কথা বলে আলিওশার মনে বড়ো দুঃখ দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, লক্ষ্মী ছেলে আলেক্সি, রাগ করছিস খুব ?

না, রাগ করিনি। আমি তোমাকে চিনি। তোমার মাথাটা খারাপ, কিন্তু মনটা ভালো।

অ্যাঁ ! শুনলি, ছেলে কী বলছে ? আমার মাথাটা খারাপ, কিন্তু মনটা ভালো। বেশ বলেছিস বাবা। এইজন্যেই তোকে এতো ভালোবাসি। হ্যাঁ বাপ আইভান, তুই তোর ছোট ভাইটাকে ভালোবাসিস তো ?

বাসি বই কি।

হ্যাঁ বাসবি, খুব ভালোবাসবি আলেক্সিকে।

নেশা জমে এসেছে ফিয়োডোরের। সে বলতে লাগল,—তোর সাধুবাবার কাছে আমি বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম সকালবেলা। বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু কী করি বল্, মেজাজটা ঠিক রাখতে পারিনি। কিন্তু যাই বল্, তোর সাধুবাবার প্রাণে বেশ রস আছে, তাই না রে আইভান ?

খুব সম্ভব,—আইভান বললে।

বুড়ো আসলে রুশিয়ান জেসুইট। সাধুতা আর ধর্মবোধ, সব বুড়োর ভান। ভণ্ডামি করে বলে মনে দুঃখও যে নেই তা নয়।

কে বললে তোমাকে একথা ? ঈশ্বরে জোসিমার একনিষ্ঠ বিশ্বাস।

রাখ্ রাখ্, সব বাজে কথা। নিজেও তা স্বীকার করে,—সকলের কাছে নয়, তবে সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোকের কাছে। এই তো কদিন আগেকার কথা, জেনারেল শুলজকে বুড়ো বলেছিল,—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু কিসে যে বিশ্বাস করি তা জানিনে।

সত্যি ? আইভান প্রশ্ন করল।

সত্যি বলে সত্যি। তবু বিচক্ষণ লোক, সবাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, আমিও করি। সাধুবাবা হলে কি হয়, বাসনা-কামনা একেবারে টনটনে। আমার মেয়ে-বৌ থাকলে পাপস্বীকারের নামে তাদের একলা ছেড়ে দিতে পারতাম না ওর কাছে। গত বছরের আগের বছর, আমাদের কজনকে নেমন্তন্ন করেছিল, চা আর সেই সঙ্গে দামী মদ, দুইই ছিল। মদ দিয়েছিল বড়ঘরের মেয়ে ভক্তরা। সে আসরে বুড়ো এমন সব পুরোনো অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুরু করল যা শুনে আমাদের পেটে খিল ধরে যায় আর কি। এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মেয়ে-লোককে সারিয়েছিল মন্ত্র পড়ে। তাকে বলেছিল,—ম্যাদাম, বুড়ো হয়েছি, হাঁটুতে জোর নেই, নইলে নতুন একটা নাচ জানতাম,—সেই নাচ আপনার সঙ্গে নাচলে আমার অসুখ একেবারে সেরে যেত। বুড়ো যৌবনকালে অনেক লীলাখেলাই করেছে। ভোঁদভের বাট হাজার রুবল তো হাতিয়েই নিল।

তার মানে ? চুরি করেছিলেন ?

আহা, চুরি কেন ? লোকটা ছিল ব্যবসাদার। টাকাটা হাতে এনে দিয়ে বললে,—কাল বাড়িতে পুলিস আসবে, রেখে দাও। তারপর যখন ফেরত চাইতে এল, উত্তর শুনল,—কিসের টাকা ? ও তো গির্জেকে দান করেছ ? গির্জে খেয়েছে, আমি কী জানি ? এই সব ব্যাপার আর কি। কিন্তু ডেমিডভ—না ডেমিডভ নয়, অন্য কে একজন যেন। ভুল বলছিলাম আমি। মিথ্যে কথা বলছিলাম ! হ্যাঁরে আইভান, মিথ্যে কথা বলছি, তা আমাকে থামিয়ে দিসনি কেন ?

জানতাম তুমি নিজেই একসময় থামবে।

থামব ? তাই ভেবেছিলে ? না, মিথ্যে বলছিলাম, আর তুমি আমাকে ঘেন্না করো বলে মজা করে তাই শুনছিলে। অ্যাঁ, আমারই বাড়িতে বসে আমারই খাও, আর আমাকেই ঘেন্না। ইয়ারকি পেয়েছ ?

দাঁড়িয়ে উঠল আইভান।

বেশ তো, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার পেটে বড্ড বেশি মদ পড়েছে আজ।

হ্যাঁ, তুমি যাবে না আবার। রোজ আমি হাতে-পায়ে ধরে বলছি দুটো দিনের জন্যে চারমাশনিয়া যেতে !

বেশ তো ! এতোই যখন তোমার ইচ্ছে কালই আমি যাব।

যাবিনে। আমি জানি তুই যাবিনে। আমার হিংসেয় তুই জ্বলে যাচ্ছিস, তাই নজরে নজরে রেখেছিস আমাকে। গেলেই হোলো তোর ?

নেশা ততোক্ষণে ফিয়োডোরের মাথায় চড়েছে। রুক্ষ মাতাল মেজাজ উঁচিয়ে উঠেছে লড়াইএর জন্যে। স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে,—দেখছিস কী ? অমন চোখ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে আছিস কেন আমার দিকে ? বুড়ো মাতাল হয়েছে। ঘেন্নাতে আর বাঁচিনে, তাই না ? কী মতলবে তুই এখানে এসেছিস আমি জানিনে ?

দাঁড়া, ঘেন্না বার করছি, ফাঁসিয়ে দিচ্ছি তোর মতলব ! এই যে আলিওশা, আমার মুখের দিকে চায়, সোজা সরল চোখে তাকায়,—কোনো কুটবুদ্ধি নেই ওর মাথায়। শোন্ আলেক্সি, একদম বিশ্বাস করবিনে তোর এই দাদাটাকে, বুঝলি !

আলিওশা প্রবোধ দিল তার বাপকে। বললে,—চুপ করো না বাবা ! কেন মিছিমিছি তুমি দাদার ওপর রাগ করছ ? ছেড়ে দাও ওকে।

ছেড়ে দেব ? তুই বলছিস ? বেশ, ছেড়ে দিলাম এবারের মতো তোর কথায়। ওরে আইভান, কতোবার আর বলব, সরিয়ে নিয়ে যা না বোতলটা। উঃ, মাথাটা একেবারে ফেটে যাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ফিয়োডোর। তারপর আস্তে আস্তে তার মুখে আধ-বোকা ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠল।

আমি তোর শক্তি-সামর্থ্যহীন বুড়ো বাপ, বলতে লাগল সে,—আমার ওপর রাগ করিসনে বাপ আইভান। আমি তো জানি, আমার ওপর তোর বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা

নেই,—তা না থাক, তাই বলে রাগ করবি আমার ওপর? আমার কথা শোন্‌। চারমাশনিয়াতে যা, আমি দু'দিন পরে যাব, তোর জন্যে একটা ভালো উপহার নিয়ে যাব সঙ্গে করে। ওখানে খাসা একটা মেয়ে আছে,—চাষীর মেয়ে, খালি পায়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়—মেয়েটাকে তোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব। চাষীর মেয়ে বলে ঘেন্না করিসনে,—মুক্তো, মুক্তো, তারা সব মুক্তো!

আলোচনার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়বস্তু পেয়ে ফিয়োডোরের ঝিমিয়ে পড়া মেজাজটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। জড়িত মত্ত গলায় বলতে লাগল সে,—বড়ো হয়েছিস বলে খুব তো বড়াই করিস তোরা, আমার চেয়ে তোরা কী জানিস? এক একটা শুয়োরছানা,—মাইয়ের দুধ এখনো যারা ছাড়েনি। কতো দেখেছি, কতো চেখেছি, অভিজ্ঞতার কিছুটি বাকি রাখিনি বাবা। এই ধর্‌ মেয়েমানুষ,—কাউকে তোরা বলিস সুন্দরী, কাউকে বলিস কুচ্ছিৎ। ভুল, সব ভুল। আরে, মেয়েমানুষ হোলো মেয়েমানুষ, তার আবার সুন্দর কুচ্ছিৎ কী? মাল কেমন তাই নিয়ে কথা? এ ধারণা তোদের আসবে কোথা থেকে? তোরা কী আর পুরুষ? তোদের গায়ে রক্ত নেই, আছে খালি জল। প্রত্যেকটা মেয়েমানুষ,—তা দেখতে ভালো হোক আর না হোক, ডাগর হলেই হোলো। নেড়েচেড়ে দ্যাখ, প্রত্যেকটার মধ্যেই মজা আছে। হ্যাঁ, চাই শুধু ঐ নাড়াচাড়া করবার কায়দা, লুটবার হিম্মত। এই ধর্‌, গাঁয়ের মেয়ে, জুতো পায়ে দেয় না, সাজগোজের চটকদারি নেই, নজরকে টানেই না যেন, এদের পটাতে গেলে একেবারে চমকে দিতে হয়। অ্যাঁ, শহরের এমনি ভদ্রলোক হয়ে কিনা আমার মতো এমনি বোকা কুচ্ছিৎ মেয়েকে ভালোবেসেছে—কী ভাগ্যি আমার। ব্যস্‌, এই কথা একবার ভাবল তো সে মেয়ে তোমার গোলাম হয়ে রইল, যা খুশী করো তাকে নিয়ে। তুমি প্রভু, সে তোমার দাসী, সুখের আর শেষ নেই তোমার। আরে শোন, শোন আলিওশা, উঠিসনে। তোর যে মা ছিল—তোর মাকে অমনি আমি চমকে দিতাম সমানে,—অবশ্য সে অবাক করার কায়দা ছিল আলাদা। তাকে আমি আমলই দিতাম না, গ্রাহ্যই করতাম না আদপে, কিন্তু আবার ঠিক সময়টি যখন আসত তখন একেবারে হাঁটুগেড়ে তার কাছে বসতাম, তার পায়ে চুমু খেতাম, বন্যা বইয়ে দিতাম ভালোবাসার, যতোক্ষণ না তার মুখে কেমন অদ্ভুত একটা পাগলে-পাগলে হাসি ফুটে উঠত। এই হাসিটা ছিল তার আশ্চর্য। রাত্রি কাটতে না কাটতেই এই হাসি হিস্টিরিয়ার চিৎকারে গিয়ে পৌঁছত। বেলিয়াভ্‌স্কি বলে আমার এক বন্ধু ছিল—পয়সাওয়ালা, দেখতেও সুন্দর—সে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত আর তোর মা'র পেছনে ঘুরঘুর করত। একদিন সে তোর মা'র সামনে আমার মুখে একটা চড় মারে। আমার সেই চড় খাওয়া দেখে বৌএর আমার সে কী পাগলামি! হাত-পা ছোঁড়ে আর চেঁচায়,—মারল, অ্যাঁ, আমার সামনে মারল তোমাকে? তোমাকে টাকা খাইয়ে ও আমার সর্বনাশ করুক, এই তোমার মতলব, আবার এখন মারও খেলে ওর হাতে? যাও, যাও, ও মুখ আর দেখিয়ো না আমাকে,—মান থাকে তো ডুয়েল লড়ো গিয়ে। শেষ পর্যন্ত মঠের সাধুদের কাছে নিয়ে গিয়ে আমি তোর মা'র হিস্টিরিয়া ভাঙাই। তবে আমি শপথ করছি আলিওশা, জীবনে কখনো আমি তোর মাকে অপমান

কারনি। হ্যাঁ, একবার কেবল! মেরীমাতা বলতে তোর মা তখন পাগল। আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি ওর ধর্মের পাগলামি ঘোচাচ্ছি। তার সামনে মূর্তিটা মাটিতে ফেলে আমি বললাম,—এই নাও, এই তোমার ঠাকুর। এটাকে আমি মাটিতে ফেলছি, লাথি মারছি, থুথু দিচ্ছি,—কীসের ভয়? কী করবে তোমার মেরী আমাকে? আমি ভেবেছিলাম, আমার কাণ্ড দেখে আমাকে মারতে উঠবে সে। কিন্তু করল কি জানিস, হাঁ করে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ধড়াস করে পড়ল মাটিতে—মূর্ছায় একেবারে কাঠ। আলিওশা, আলিওশা, অমন কাঁদছিস কেন? কী হোলো রে তোর?

হঠাৎ চমকে উঠে কথা বন্ধ করে লাফিয়ে উঠল বুড়ো। বাপ যখন তার দুঃখিনী মা'র কথা বলতে শুরু করে, তখনই আলিওশার মুখে ভাবান্তর প্রকাশ পায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখ দুটো জ্বলতে থাকে, কাঁপতে থাকে দুই ঠোঁট। ছেলের এই ভাবান্তর মাতাল বুড়োর চোখে পড়ে না, সে বকেই চলে। হঠাৎ আলিওশা ব্যবহার করল ঠিক তার মায়েরই মতো। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে আবার চেয়ারে লুটিয়ে পড়ল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে যেতে লাগল মূর্ছার তাড়সে, সারা বুক যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল প্রচণ্ড অস্ফুট কান্নায়।

চিৎকার করে উঠল বুড়ো,—আইভান, আইভান! দ্যাখ্ কাণ্ড! ঠিক ওর মা'র মতো! ওর মা'র কথা শুনে ঘাবড়ে গেছে ছেলেটা! মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দে শিগগির!

রাগ আর ঘৃণায় ফেটে পড়ছিল আইভানও। ভাইএর পরিচর্যা করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে,—ওর মা! তিনি কি আমারও মা ছিলেন না?

চমকে উঠল বুড়ো। আলিওশার গর্ভধারিণী যে আইভানেরও জননী, তা হঠাৎ উপলব্ধি হোলো তার। আইভানের অগ্নিগর্ভ দৃষ্টির সামনে যেন কুঁকড়ে গেল সে। আধ-বোকা মাতালের ঘৃণ্য কাপুরুষ হাসি টেনে টেনে বললে,—হি হি হি। তা সে সম্বন্ধটা আমার মাথাতেই আসেনি। তোরও মা? হবে! না হবে কেন? হবেই তো। আলিওশার মা, সে তো তোরও মা। হ্যাঁ, কেমন যেন সব গুলিয়ে গিয়েছিল আমার। আমি, বুঝলি বাবা, ভাবছিলাম কিনা—

ঠিক এই মুহূর্তে হলঘরে বিরাট এক হইচই শোনা গেল। দড়াম করে খুলল দরজাটা, ঢুকল ডিমিত্রি। তাকে দেখে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল ফিয়োডোর, ছুটে গিয়ে আত্মগোপন করল আইভানের পিছনে।

দু-হাতে আইভানের জামাটা শক্ত করে চেপে ধরে আতঙ্কে আকুল হয়ে চিৎকার করতে লাগল বুড়ো,—খুন করবে! ও আমাকে খুন করতে এসেছে। ধর্ ওকে, চেপে ধর্, বাঁচা আমাকে!

ডিমিত্রির পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল গ্রিগরি আর স্মারডিয়াকভ। প্রভুর পূর্বনির্দেশ মতো তারা ডিমিত্রিকে ঘরের বাইরে আটকাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই ডিমিত্রির কয়েক মুহূর্ত কাটল চারদিক তাকিয়ে দেখতে। সেই মুহূর্তে গ্রিগরি ভিতরের দিকের দরজাটার সামনে দু-হাত ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। তাকে সেইভাবে দাঁড়াতে দেখে ডিমিত্রির মুখ থেকে আর্তনাদের মতো চিৎকার বার হয়ে এল। এক লাফে সে দাঁড়াল গ্রিগরির সামনে।

ওর মধ্যেই আছে! ওই ঘরের মধ্যেই সে লুকিয়ে আছে। সরে যা হতভাগা।

গ্রিগরির হাত ধরে তাকে টানতে চেষ্টা করল ডিমিত্রি, গ্রিগরি তাকে সরিয়ে দিল এক ধাক্কায়। ডিমিত্রি সামলাতে পারল না নিজেকে, ডানহাতের প্রচণ্ড এক ঘুষিতে বৃদ্ধ ভৃত্যকে লুটিয়ে দিল মাটিতে। তারপর এক ধাক্কায় বন্ধ দরজাটা ভেঙে সে ঢুকে গেল ভিতরের ঘরে।

ফিয়োডোর এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, কাঁপছিল স্মারডিয়াকভও। ফিয়োডোরের কানে এল পাশের ঘর থেকে ডিমিত্রির চিৎকার,—আমি রাস্তায় দেখেছি ওকে আসতে, ধরতে পারিনি! এ বাড়িতেই ও এসেছে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। দাঁড়াও, ঠিক বার করব আমি।

ডিমিত্রির কথা শুনে লাফিয়ে উঠল বুড়ো ফিয়োডোর, মুহূর্তে অন্তর্হিত হোলো তার ভয়ডর।

ধর্, ধর্ ওটাকে, এই বলে সে দৌড়ল পাশের ঘরে। ততোক্ষণে গ্রিগরি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাথা তখনো তার ঘুরছে। বাপের পিছনে পাশের ঘরে দৌড়ল আইভান আর আলেক্‌সি। তৃতীয় ঘরে প্রচন্ড একটা শব্দ হোলো, ডিমিত্রির পায়ের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে ভাঙল কাঁচের মস্ত একটা পাত্র।

ডাকাত, গুন্ডা! ধর্, ধর্ শিগগির! ফিয়োডোর আবার ছুটল তৃতীয় ঘরে। আইভান আর আলিওশা দুদিক থেকে চেপে ধরল বাপকে। আইভান গর্জে উঠল,—কেন দৌড়চ্ছ ওর পেছনে? কাছে গেলে তোমাকে খুন করবে যে একেবারে!

আইভান! আলিওশা! শোন্ তোরা। ও এখানে আছে! গ্রুশেংকা এসেছে এখানে! নিজের কানে শুনলিনে ডিমিত্রি কী বলল।

এমনি সময় গ্রুশেংকা যে আসবে তা কল্পনা করেনি ফিয়োডোর। ডিমিত্রির কথা শুনে ফেটে পড়ছে সে উত্তেজনায়। যেন পাগল হয়ে গেছে সে, বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস করছে।

ধমকে উঠল আইভান,—হ্যাঁ, এসেছে! যতসব বাজে কথা! এলে তোমার চোখে পড়ত না?

না রে, হয়তো অন্য গেট দিয়ে এসেছে?

আবার বাজে কথা বলো। পাশের গেটটায় তালাবন্ধ, আর তার চাবিও তোমার কাছেই। চলো, বসার ঘরে চলো।

ডিমিট্রিও বসার ঘরে ফিরে এল একটু পরেই। সারা বাড়ি সে খুঁজেছে, দেখেছে পিছনের তালাবন্ধ দরজাটা, পায়নি তার বাঞ্ছিতাকে কোথাও।

তাকে দেখেই আবার চিৎকার করে উঠল ফিয়োডোর,—ধর্, ধর্ ওকে, নিশ্চয়ই ও আমার শোবার ঘর থেকে টাকা চুরি করেছে।

আইভানের হাত ছাড়িয়ে ফিয়োডোর বড় ছেলেকে আক্রমণ করল। ডিমিট্রি প্রস্তুত হয়েই ছিল, সে দু-হাতে বাপের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে এক ধাক্কায় মাটিতে শুইয়ে ফেলল, তারপর তার মাথায় মুখে মারল কয়েকটা লাথি। তীক্ষ্নস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল বৃদ্ধ। শক্তিতে আইভান ডিমিট্রির সমকক্ষ নয়, তবু সে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় সরিয়ে আনল বাপের কাছ থেকে। আলিওশাও চেপে ধরল তাকে।

আইভান চিৎকার করে উঠল,—পাগল হয়ে গেলে নাকি? বাপকে খুন করলে যে একেবারে!

বেশ করেছি। হাঁফাতে হাঁফাতে ডিমিট্রি বললে,—কোথায়, একেবারে খুন তো হয়নি। আবার আমি আসব, তখন সত্যি সত্যি খুন করে যাব। দেখব, কেমন করে তোরা ওকে বাঁচাস!

ডিমিট্রি, ডিমিট্রি! চড়া গলায় হুকুম করল আলিওশা,—খুব হয়েছে, যাও, এক্ষুনি তুমি যাও এখান থেকে।

আলেক্সি! হ্যাঁ, তুই সত্যি কথা বলবি। তোর কথা আমি বিশ্বাস করব। বল্ তুই, ও এখানে আসেনি? আমি নিজে চোখে দেখলাম বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে গুটি গুটি সে আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই দৌড়ে পালিয়ে গেল।

না আসেনি, আসবার কথাও ছিল না এখন, আমি শপথ করে বলছি।

কিন্তু, কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখলাম। তাহলে কোথায় গেল? কোথায় লুকোল? যাক, সে আমি দেখছি। তুই কিন্তু যা বলেছি তা ভুলবিনে। এখুনি যাবি কাটেরিনা আইভানোভ্নার কাছে। জানাবি আমার শ্রদ্ধা, জানাবি আমার বিদায়। হ্যাঁ, এখানকার এই ঘটনাও তাকে বলতে পারিস। আপত্তি নেই আমার।

ইতিমধ্যে আইভান আর গ্রিগরি ফিয়োডোরকে আরাম কেদারায় তুলে বসিয়েছে। তার সারা মুখে রক্ত। কিন্তু তারও মনে ধারণা, এতো প্রতীক্ষার পর গ্রুশেংকা নিশ্চয়ই এসেছে, বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে কোথাও।

বাবার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বিদায় নিল ডিমিট্রি। যাবার সময় বলে গেল,—তুমি আমার বাপ! তবু তোমার রক্তপাত করেছি বলে আমার এতোটুকু দুঃখ নেই। যে স্বপ্ন তুমি দেখছ, বলে গেলাম, সে স্বপ্ন নিয়ে সাবধান। কেননা আমারও একটা স্বপ্ন আছে। আবার বলছি, সাবধান।

কর্ণ, ফ্রিটকাদনে গলায় বুড়ো বলতে লাগল,—এসেছে, নিশ্চয়ই এখানে এসেছে, আমাদের চোখেই পড়েনি। স্মারডিয়াকভ, ও বাবা স্মারডিয়াকভ, একবার ভালো করে দ্যাখ্ না বাবা!

আবার ধমক দিয়ে উঠল আইভান,—হ্যাঁ, এসেছে! কোথায় এসেছে? থামো, থামো, পাগলামির একটা সীমা আছে। আরে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে দেখছি! স্মারডিয়াকভ, দৌড়ে জল আন্, আর একটা তোয়ালে!

স্মারডিয়াকভ দৌড়ল। সকলে মিলে অনেক চেষ্টা করে ফিয়োডোরের সম্বিত ফিরিয়ে আনল। জামা-কাপড় ছাড়িয়ে মাথায় একটা ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। কম যায়নি বুড়োর,—চিত্তবিকার তো আছেই, তার ওপর প্রথমে মদ্যপান ও পরে প্রহার ভোগ,—বিছানায় শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল নিঃসাড় হয়ে। স্মারডিয়াকভ কাচের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল, আইভান আর আলিওশা বসবার ঘরে ফিরে এল। সেখানে টেবিলের ধারে মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল গ্রিগরি।

আলিওশা বললে,—গ্রিগরি তুমিও যাও। মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়োগে। তোমার মাথায়ও দাদা এক ঘা বসিয়েছে। ইঃ! যাও, যাও, আমরা বাবাকে দেখব'খন!

তেমনি মুখ নিচু করে বিষন্ন গম্ভীর গলায় গ্রিগরি বললে,—ডিমিট্রি আমাকে এমনি অপমান করল!

জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে আইভান উত্তর দিল,—তোমাকে আর কি, নিজের বাবাকেই যা অপমানটা করল ও!

গ্রিগরি আবার বললে,—ও যখন এতোটুকু ছিল, আমি নিজে হাতে ওকে নাইয়ে খাইয়ে দিয়েছি, আর আজ এমনি দুর্ব্যবহার করল কিনা আমার সঙ্গে?

আইভান আলেক্সিকে বললে,—আমি যদি চেপে না ধরতাম তাহলে হয়তো আজ বাবাকে ও খুনই করে ফেলত, তাই না?

ঠিক। উঃ, ভগবান করুন, এমনি কাণ্ড আর কোনোদিন যেন না হয়!

তিক্ত হাসি হেসে আইভান বললে,—একটা সাপ আর একটা সাপকে খাবে। এতে ভগবানের আর কি করবার আছে ভায়া!

কেঁপে উঠল আলিওশা!

আইভান শেষ করল,—অবশ্য আমি থাকলে একটা খুনোখুনি আমি কিছুতেই হতে দেব না। নাও, তুমি থাকো, আমি একটু বাগানে ঘুরে আসি, মাথাটা ধরে উঠেছে।

আলিওশা শোবার ঘরে গেল। ঘুমন্ত বাপের শয্যার পাশে জানলার ধারে চুপ করে বসে রইল প্রায় এক ঘণ্টা। ফিয়োডোরের ঘুম যখন ভাঙল তখন সে আলিওশার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। কি যেন সে ভাবছে

বা মনে আনবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ তার মুখে উত্তেজিত ভাব ফুটে উঠল। ফিস ফিস করে বললে,—আলিওশা, আইভান কোথায় রে?

বাইরে, বাগানে। তার মাথা ধরেছে।

ঐ যে, ঐ আয়নাটা। ওটাকে আমার হাতে এনে দে তো!

ছোট্ট গোল একটা আয়না আলিওশা এনে দিল বাবার হাতে। ফিয়োডোর নিজের মুখটা ভালো করে দেখল। নাকটা তার এখনো ফুলে রয়েছে। কপালের বাঁ ধারে মস্ত একটা লাল ঘায়ের দাগ।

হ্যাঁরে, আইভান কী বলল রে? তুই জানিস, ঐ ডাকাত ছেলেটার চেয়ে আইভানকে আমার ভয় বেশি। তুই কেবল আমার আদরের। তোকে আমার ভয় নেই।

আইভানকেও তোমার ভয় নেই, আলিওশা বললে,—ও খুব রাগ করেছে বটে, কিন্তু বিপদের সময় ও তোমাকে বাঁচাবে।

আর সেই ডাকাতটা? সে নিশ্চয়ই গ্রুশেংকার বাড়ি ছুটেছে, তাই না? শোন্, লক্ষ্মী ছেলে, সত্যি বল তো, গ্রুশেংকা এসেছিল?

না, আসেনি। দাদার ভুল ওটা, কেউ তাকে দেখেনি।

তুই জানিস, মিটিয়া ওকে বিয়ে করতে চায়—একেবারে বিয়ে করতেই চায়?

জানি, কিন্তু ও তাই বলে মিটিয়াকে বিয়ে করবে না।

অ্যাঁ! ঠিক বলেছিস্। করবে না, করবে না, কিছুতেই করবে না।

ভারি খুশী হোলো বুড়ো। আলিওশার কথায় মস্ত আশ্বাস পেল মনে। সে তার ডান হাতটা বুকে চেপে ধরল আনন্দে। চোখে তার আনন্দাশ্রু চিকচিক করে উঠল।

বলতে লাগল সে,—সেই যে মেরীমাতার মূর্তিটার কথা বলছিলাম না, ওটা তোকে আমি দিয়ে দেব। আর মঠেই তুই ফিরে যাবি। মনের সুখে থাকবি সেখানে। আমি সেদিন মিছিমিছি রাগ করেছিলাম, তুই বুঝিসনি? আমার বুকে বড়ো ব্যথা। তুই আমায় একটু সান্ত্বনা দে—সত্যি কথা বল।

আবার কি হোলো তোমার? ক্লান্ত কণ্ঠে আলিওশা বললে,—বললামই তো, ও এখানে আসেনি। তবু তোমার সন্দেহ যায় না?

না, না, সে কথা নয়। বলছি, বলছি আমি। শোন্, আমার একটা কাজ তোকে করতে হবে। তুই যাবি গ্রুশেংকার কাছে। যেমন করে পারিস্ তার সঙ্গে দেখা করবি। তাকে জিগ্যেস করবি, আর নিজে বিচার করে দেখবি, কাকে সে চায়? আমাকে, না ঐ ডাকাতটাকে? বল্, যাবি তো? না বলিসনে বাবা!

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাবো, নিজেই জিজ্ঞাসা করব,—একটু ইতস্তত করে আলিওশা উত্তর দিল।

না, না, যাবিনে, যাবিনে, কিছুতেই যাবিনে,—ভুল বলেছি আমি। তোকে একবার যদি পায়, তোর প্রশ্নের জবাব তো দেবেই না, বরং উল্টে তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে আরম্ভ করবে। একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, খেয়ে ফেলবে তোকে একেবারে।

ঠিক বলেছ বাবা। ওর কাছে আমার যাওয়া উচিত নয়, আমি যাব না।

তাহলে কোথায় তুই যাবি? ডিমিত্রি তোকে যেতে বলছিল কোথায়?

কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার কাছে।

কেন? তার কাছে কেন? ডিমিত্রির জন্যে টাকা ধার চাইতে?

না, সে জন্যে নয়।

হুঃ, একটা পয়সা আর হতভাগার নেই, ভিখিরী কোথাকার! আচ্ছা, তুই যা! আজ সারাদিন আমি ভাবব, কাল তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। কাল সকালবেলাই আসবি কিন্তু।

হ্যাঁ, আসব।

যদি কেউ জিগ্যেস করে, বলিসনে যেন আমি তোকে ডেকেছি। এমনি যেন আমাকে দেখতে এসেছিস, এমনি ভাব করে আসবি। বিশেষ করে আইভানকে বলবিনে। মনে থাকবে তো?

থাকবে।

যা তবে এখন। তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে আজ তুই দাঁড়িয়েছিলি, সে কথা আমি ভুলব না। আজ ভেবে নিই, কাল তোকে বলব—

বেশ, তাই বোলো। কিন্তু শরীরটা এখন কেমন লাগছে তোমার?

ও কিছু না, কিছু না। আজ রাতটা ঘুমলেই ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠব, দেখিস্! আর একটু বিশ্রাম করি। যা, আর দেরি করিসনে তুই।

বাড়ি থেকে বার হয়ে আলিওশা দেখল, আইভান গেটের কাছে বেঞ্চিতে বসে পেনসিল দিয়ে কী যেন নোটবইতে লিখছে। আলিওশা তাকে বলল, বাবা ঘুম ভেঙে উঠেছে, আবার তাকে মঠে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছে।

আইভান দাঁড়িয়ে উঠল, একটু অতিরিক্ত সহৃদয়তার সঙ্গে যেন তাকে বললে,—কাল সকালবেলা ঠিক এসো কিন্তু, খুব খুশী হব এলে।

আলিওশা হেসে বললে,—কাল আমি যাব হোলাকভদের বাড়ি। কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার কাছেও যেতে পারি, যদি আজ তার সঙ্গে দেখা না হয়।

ওঃ, এখন তো সেখানে একবার যাচ্ছ ডিমিত্রির হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন আর বিদায় প্রার্থনা করতে, তাই না?

একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল আলিওশা। কথা ঘুরিয়ে বললে,—কিন্তু বাবার আর ডিমিত্রির মধ্যে এই যে সাংঘাতিক ঝগড়া, কী করে এর শেষ হবে বল তো?

কে জানে? হয়তো আস্তে আস্তে দু-পক্ষ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা হলেই মঙ্গল। মেয়েটা তো একটা আস্ত জন্তু। তবে কিনা কিছুদিন লক্ষ্য রাখতে হবে বাবা যাতে বাড়ির বার না হয়, আর ডিমিত্রি যাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে।

আচ্ছা ভাই, আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। কোন্ লোক পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযুক্ত, আর কোন্ লোক নয়, এ বিচার করবার অধিকার কি কারুর আছে?

অধিকারের কথা বাদ দাও। কে বাঁচুক আর কে মরুক, এ কামনা হৃদয়ের ব্যাপার,—এর অধিকার নিয়ে বিচার কেউ করে না। তবে হ্যাঁ, ভালোমন্দ কামনা করবার অধিকার কার নেই ?

এমন কি মৃত্যুকামনার অধিকার ?

নিশ্চয়ই। তবে একথা তোমার মনে এল কেন ? ঐযে আমি বলেছিলাম, এক সাপ আর এক সাপকে খাবে, সেইজন্যে ? তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করি, তোমার কি মনে হয় না, ডিমিট্রি বাবাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে ?

এসব কী বলছ তুমি আইভান ? ডিমিট্রি খুন করবে বাবাকে ? এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে !

বাঃ, এই তো আমি শুনতে চেয়েছিলাম তোমার মুখ থেকে। আমি অবশ্য কোনো মন্তব্যই করতে চাইনে। আচ্ছা, যাও তুমি, আজকের মতো বিদায়।

গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে আইভান আলিওশার করমর্দন করল। আইভানের কাছ থেকে এতোটা আন্তরিকতার আস্বাদ আলিওশার পক্ষে নতুন। তার মনে হোলো, এর পিছনে যেন কোনো উদ্দেশ্য আছে।

দশ

ক্লান্ত বিষণ্ণ মন নিয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করল আলিওশা। যে দৃশ্যাবলী এখানে সে দেখেছে তাতে তার চিত্তের স্থিতিস্থাপকতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে,—চিন্তার ক্ষমতা পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে গেছে তার। ভাবনার প্রান্ত জুড়ে তার হতাশার পুঞ্জমেঘ আর দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মতো একটিমাত্র ভয়ঙ্কর প্রশ্ন,—ঐ সাংঘাতিক স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তার বাবার আর তার দাদার সম্পর্কের জটিলতা ঘুচবে কবে, কী ভাবে ? এতোদিন যা মাত্র আভাসে শুনেছে,—আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজে চোখে সে দেখল তা, দাদা আর বাবার মাঝখানের প্রচণ্ড জিঘাংসার স্বরূপটার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হোলো তার। কেবলই তার মনে হচ্ছে, কোথা থেকে একটা চরম বিপদ ঘনিয়ে আসছে ডিমিট্রির মাথায়, এ বিপদের পরিত্রাণ কই ?

আর এই মেয়েটি ? কাটেরিনা আইভানোভ্নার বাড়ি যেতে হবে ভেবে তার মনে অস্বস্তির শেষ নেই। ডিমিট্রির হয়ে বিদায়-বাণীটুকুই সে কাটেরিনাকে শোনাতে পারবে, কিন্তু তিন হাজার রুবল তার হাতে তুলে দিতে পারবে না। ডিমিট্রির পক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করবার কোনো উপায়ই আর রইল না। এই ঋণের গ্লানি ডিমিট্রিকে আরো নিচে নামাবে। এই অপমানের বেদনা ভুলতে ডিমিট্রি আরো ছন্নছাড়া রাস্তায় পা বাড়াবে। গ্রুশেংকাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মারামারির ঘটনা কাটেরিনার কাছে উল্লেখ করতে সেই তো আলিওশাকে বলেছে।

বড় রাস্তার উপর কাটেরিনা আইভানোভ্নার মস্ত বাড়ি। আলিওশা যখন পৌঁছল, তখন সাতটা বাজে, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আলিওশা জানত, কাটেরিনা

আইভানোভ্‌না বাড়িতে তার দূরসম্পর্কের দুই মাসির সঙ্গে থাকে,—তাঁরা তার অভিভাবিকা নন, শুধু দেখাশুনো করেন মাত্র। কাটেরিনার একমাত্র অভিভাবিকা সেই জেনারেলের বিধবা, তিনি আছেন মস্কোতে। সপ্তাহে দুবার করে তাঁকে চিঠি লিখে সব খবর জানাতে হয়।

আলিওশা যখন বাড়ির সামনের হলঘরে ঢুকে পরিচারিকাকে তার নিজের নাম বলল, তখন তার মনে হোলো, বাড়ির অধিবাসিনীরা আগে থাকতেই তার আগমনের খবর পেয়েছে। জানলা দিয়ে কেউ হয়তো তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। হলে প্রবেশ করতে না করতে তার কানে এসেছিল কয়েকটি ত্বরিত পদধ্বনি, মেয়েদের পোষাকের খানিকটা খসখস শব্দ। কয়েকটি মেয়ে বুঝি দৌড়ে পালিয়েছে এ ঘর থেকে।

আশ্চর্য হোলো আলিওশা! সে এসেছে বলে এতো উত্তেজনা কেন? পরিচারিকা তাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি মস্ত বড়। চমৎকারভাবে সাজানো, নাগরিক রুচির পরিচয়। বড়ো বড়ো নরম সোফা, এখানে ওখানে ছোট ছোট টেবিল, ফুলদানী আর বাতি, দেওয়ালে সুন্দর কয়েকটি ছবি,—জানলার ধারে স্বচ্ছ কাঁচের একটি মৎস্যাধার। ঘরের মধ্যে ঝাপসা অন্ধকার। আলিওশার চোখে পড়ল একটা সোফার ওপর সিল্কের একটি ওড়না। সোফার সামনের টেবিলটাতে কেক আর মিষ্টান্ন ভর্তি দুটি ডিশ, দুটি কাপে চকোলেট পানীয়। আলিওশা বুঝল, এ ঘরে অন্য অতিথি ছিল, অন্তর্ধান করেছে সে আসাতে। সেই মুহূর্তেই ভারি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল কাটেরিনা আইভানোভ্‌না, দু-হাত তার সামনে প্রসারিত, মুখে উজ্জ্বল হাসি। সেই সঙ্গে একটি ভৃত্যও ঢুকল ঘরে, দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে গেল কোণের টেবিলে।

ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, কাটেরিনা উচ্ছল কণ্ঠে বললে,—শেষ পর্যন্ত তুমি এলে! বসো, বসো, আমি আজ সারাদিন তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম।

কাটেরিনার সঙ্গে আলিওশার পরিচয় হয়েছিল তিন সপ্তাহ আগে। কাটেরিনারই আগ্রহে ডিমিট্রি তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। কাটেরিনার রূপ দেখে মুগ্ধ হয় সে। তখন তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো আলাপ হয়নি। সে খুব লাজুক, এই ভেবে কাটেরিনা তাকে বাদ দিয়ে ডিমিট্রির সঙ্গেই শুধু কথাবার্তা বলে। আলিওশা চুপটি করে বসে থাকলেও ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকে এই নবপরিচিতাকে। মেয়েটির আত্মবিশ্বাস ও সাবলীল গর্ববোধ তাকে আকৃষ্ট করে। তার শ্বেতপাণ্ডুর মুখে দুটি বড়ো বড়ো কালো চোখের ঝলকিত দৃষ্টি! ঐ দুটি গভীর কৃষ্ণ চোখ আর সুন্দর দুটি ওষ্ঠের তীক্ষ্ন রেখায় কী যেন একটা ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে যাকে তার ভাই ডিমিট্রির পক্ষে ভালোবাসা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে ভালোবাসা চিরস্থায়ী করে রাখা শক্ত। তার এই ধারণা সে স্পষ্ট ভাষাতেই ডিমিট্রিকে বলেছিল, ডিমিট্রি যখন এই আলাপের পরে একলা তাকে জিজ্ঞাসা করে তার বাগ্‌দত্তাকে কেমন লাগল।

বলেছিল সে,—এ মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে নিশ্চয়ই, তবে অবিমিশ্র সুখ তা হবে না।

ডিমিট্রি বলেছিল,—ঠিক বলেছ তারা! কতকগুলো লোকের স্বভাবই এমনি যে ভাগ্যের হাতে তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে না, সে ভাগ্য সৌভাগ্য হলেও। তাহলে তোমার ধারণা, সারা জীবন ধরে আমি একে ভালোবাসতে পারব না?

না, হয়তো সারা জীবনই বাসবে। তবে সারা জীবনই যে সমান সুখী থাকবে, তা নয়।

কথাগুলো বলেই লজ্জা পেয়েছিল সে। নিরর্থক বোকার মতো কথা! কোনো মেয়ের আর হার ভালোবাসার সম্বন্ধে এমনি সুনির্দিষ্ট মতামত দেবার কী তার অধিকার? আজ কাটেরিনাকে প্রথম দর্শনেই মনে হোলো, আগে ভুল হয়েছিল তার। কে বলেছে মেয়েটি দম্ভপরায়ণা, গর্বোদ্ধতা? স্বচ্ছ সরল ও,—আত্মবিশ্বাসে আর জীবনের উন্মাদনায় ভরপুর। এই মাত্র। আর এই প্রথম দর্শনেই আলিওশার বুঝতে দেরি হোলো না যে কাটেরিনা জানে সবই,—তার প্রেমের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সে সচেতন, তার প্রেমাস্পদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার কোনো কাহিনীই তার অগোচর নয়। কিন্তু এতে ম্লান হয়নি তার চোখের ঝলক, ম্রিয়মান হয়নি তার ভবিষ্যতের আশা। আলিওশা মুহূর্তে উপলব্ধি করল, কাটেরিনাকে ভুল বুঝেছিল সে। মুহূর্তে মেয়েটি তার মন জয় করে নিল।

কাটেরিনার ব্যবহারে উত্তেজিত আত্মপ্রকাশ, কণ্ঠে তার উজ্জ্বল ঔৎসুক্য,—তোমার দেখা পেতে আমি এতো উদ্‌গ্রীব ছিলাম কেন জানো? কেননা তোমার কাছেই আমি সব কিছু জানতে পারব। যা সত্যি, তা তুমিই অকপটে আমাকে বলবে।

অস্ফুটস্বরে আলিওশা বললে,—আমি এসেছি, মানে, ডিমিট্রিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

ডিমিট্রি পাঠিয়েছে তোমাকে? ঠিক, আমি তাই-ই ভেবেছিলাম। আমি এবার সব বুঝতে পেরেছি। কাটেরিনা বলতে লাগল,—একটু অপেক্ষা করো আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, এতো প্রতীক্ষা কেন করছিলাম তোমার জন্যে, তা বলব। তুমি ভাবছ, আমি কিছু জানিনে, তাই না? সব আমি জানি, কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। ও নিজে এল না, তোমাকে পাঠাল। কী বলে পাঠাল?

আড়ষ্ট কণ্ঠে আলিওশা বললে,—ডিমিট্রি বলেছে, তুমি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ কোরো, সে তোমার কাছে আর আসবে না।

শ্রদ্ধা? এইমাত্র? ঠিক এই কথাই তোমাকে বলতে বলেছে ও?

হ্যাঁ, এইমাত্র।

ও নিজে বলতে ভুল করেনি তো?

না, স্পষ্ট করে বারে বারে আমাকে বলে দিয়েছে। বরং আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, আমি যেন তোমার কাছে এসে ভুল না বলি।

সমস্ত মুখে রক্ত ছড়িয়ে গেল কাটেরিনার। সে বললে,—এ সত্যি নয়, আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ। তুমিই বলো, এ কি সত্যি? ভেবে চিন্তে ও একথা বলেনি, এ ওর প্রলাপ। জোর করে ও ডুবতে চায়।

আলিওশা বললে,—হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।

আমি ওকে এমনি করে ডুবতে দেব না, দৃপ্তকণ্ঠে কাটেরিনা বললে,—ওর জেদ আমি ভাঙব, ওকে আমি বাঁচাব। হ্যাঁ, তিন হাজার রুবলের কথা ও তোমাকে বলেনি?

বলেছে। এতেই সবচেয়ে ভেঙে পড়েছে সে। আমাকে বললে, এই টাকাটার ব্যাপারে শেষ সম্মানটুকু সে খুইয়েছে, আর তার কোনো বন্ধন নেই। এ ব্যাপারে তুমিও জানো নাকি কিছু?

জানি অনেকদিন আগে থেকেই। মস্কোতে টেলিগ্রাম করে অনেকদিন আগেই খবর পেয়েছিলাম যে টাকাটা ও পাঠায়নি। তবে আমি ওকে কিছু বলিনি। গত সপ্তাহে জেনেছি যে ওর আবার টাকার টানাটানি চলেছে। আমি শুধু চেয়েছি ওর প্রয়োজনে ও আমার কাছে ফিরুক, আমাকে ও জানুক ওর পরম বন্ধু বলে। ও বোঝে না যে আমার চেয়ে বড়ো বন্ধু ওর আর কেউ নেই। ও ভাবে, আমি শুধু একটা মেয়েমানুষ, তার বেশি নয়। ক-টা টাকা ও খুইয়েছে, তাই নিয়ে ওর লজ্জার শেষ নেই। যার কাছে খুশী লজ্জা করুক, আমার কাছে ওর লজ্জা কিসের? ও কি বোঝে না, সব কিছু ওর জন্যে বিলিয়ে দিতে পারি! এত কিছুর পরেও ও আমাকে চিনতে পারেনি? বোঝেনি যে ওর ভালো ছাড়া আর কিছু আমি চাইনে? আমি ওর বাগ্‌দত্তা—সে কথা ও ভুলে যাক। কিন্তু আমি ওর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু সে কথা যেন না ভোলে। এই ধরো, এই টাকাটার ব্যাপার। তোমার কাছে যে কথা প্রকাশ করতে ও ভয় পায় না, সে কথা আমার কাছে ও গোপন রাখে কেন?

বলতে বলতে জলে ভরে গেল কাটেরিনার দু-চোখ, অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে।

আলিওশার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, সে বললে,—আজই একটু আগে ডিমিট্রি আর বাবার মধ্যে কী ঘটে গিয়েছে শোনো।

সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করে সে শেষপর্যন্ত আস্তে আস্তে বললে,—এখন ডিমিট্রি নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটার কাছেই গিয়েছে।

তাতে কী এসে যায়! ঐ মেয়েটা যাকে বলছ, তাকেও কি আমি স্বীকার করে নিতে পারিনে ভাবছ? তাছাড়া, বিচিত্র এক হাসি হাসল কাটেরিনা,—এর নাম ভালোবাসা নয়, এ কারামাজভ বংশের বাসনা-বিকার। এ ক্ষণিকের পাগলামি। আমি জানি, মেয়েটি বিয়ে ওকে কিছুতেই করবে না।

ডিমিট্রি তো তাকে বিয়ে করতেই চায়।

তা চাইলেও। আমি মেয়েটিকে নিজে জানি। তার দুর্নাম আছে মনভোলানী বলে। কিন্তু আসলে মেয়েটি সৎ, চরিত্রবতী, প্রাণ তার দয়ামায়ায় ভরা। কী হোলো? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? ভাবছ এ সব আমি কী বলছি?

দরজার কাছে উঠে গিয়ে কাটেরিনা ডাক দিল,—আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌না, এখানে এসো। আলিওশা এসেছে। ও আমাদের সব কিছু জানে, ওর সঙ্গে আলাপ করে যাও।

উত্তর এল মাখন-গলানো মিষ্টি গলায়,—আসছি, তুমি ডাকবে বলেই তো অপেক্ষা করছিলাম ভাই !

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে আলিওশার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রুশেংকা নিজে। হঠাৎ একটা তীব্র বিতৃষ্ণা বুকে ঠেলে উঠল আলিওশার, তবু সে গ্রুশেংকার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। এই সেই সাংঘাতিক স্ত্রীলোকে, মনভোলানী শয়তানী, আধঘণ্টা আগে আইভান যাকে বলেছে—জন্তু একটা! কিন্তু মেয়েটির চেহারা দেখে তার কিছুই তো মনে হয় না। যে কোনো সাধারণ গৃহস্থ যুবতীর মতোই তো দেখতে! সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘদেহী, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। শরীরের রেখায় রেখায় একটু অতিরিক্ত মিষ্টতার নিদর্শন, যেমন গলার স্বরে,—এইটুকু মাত্র। হাঁটা-চলায় কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার মতো বলিষ্ঠতার প্রকাশ নেই,—তার পরিবর্তে অঙ্গে অঙ্গে কেমন একটা নিঃশব্দ আন্দোলন। আলিওশার সামনে এসে গ্রুশেংকা দাঁড়াল, দুগ্ধশুভ্র গ্রীবাদেশে জড়িয়ে নিল কালো কাশ্মীরী দামী একটি শাল। গ্রুশেংকার বয়স বাইশের বেশি নয়, পূর্ণযৌবনা যুবতী। ফরসা মুখের দুটি গালে স্বাভাবিক লালিমা। ছড়ানো কপাল, চিবুকটি একটু অতিরিক্ত স্পষ্ট। মুখের ওপরের ঠোঁটটি খুব পাতলা, সেই তুলনায় নিম্নোষ্ঠটি এতো পুষ্ট যে মনে হয় সর্বদা যেন সে ঠোঁট ফুলিয়েই আছে। তার মাথায় অজস্র ঘন বাদামী চুল, দীর্ঘপল্লব ঘেরা ঘননীল গভীর দুটি চোখ। ঐ চুল আর চোখের জন্যে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ তার মুখ চোখে পড়লে সে মুখ সহজে ভোলা যায় না। আলিওশার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে সে মুখে নিতান্ত শিশুসুলভ সারল্য। দুটি চোখ শিশুরই মতো সহজ আনন্দ। আলিওশার মনে হোলো, ও দুটি চোখের দিকে তাকালে সহজ আনন্দে অমনি মন ভরপুর হয়ে ওঠে। আলিওশার আরো মনে হোলো, এক কথায় প্রকাশ করা যায় না, এমনি এক নিগূঢ় আকর্ষণ আছে মেয়েটির—সেই আকর্ষণ তার গ্রীবা আর বাহুমূলের শুভ্রতায়, সুগোল স্তনযুগল আর সুপুষ্ট উরুদ্বয়ের আভাসে, প্রতি অঙ্গের নিঃশব্দ নিবিড় আন্দোলনে। অপূর্ব সুন্দর তার দেহের গঠন, মিলোর ভিনাসের মূর্তির মতো, সেই ভিনাসের চেয়েও পুষ্টতর। হাঁ করে দেখতে লাগল আলিওশা, মনটা একটু খারাপ হোলো এই ভেবে, মেয়েটি অমন টেনে টেনে কথা বলে, কেন স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করে না। এমনি ইচ্ছাকৃত ন্যাকামিভরা উচ্চারণ কুশিক্ষা আর বিকৃত রুচির পরিচায়ক—অমন সারল্যভরা মুখের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান।

গ্রুশেংকার দু-হাত ধরে কাটেরিনা তাকে আলিওশার ঠিক সামনের চেয়ারে বসাল, আদর করে কয়েকবার তার মুখচুম্বন করল।

আনন্দ গদগদ কণ্ঠে বললে সে,—জীবনে এই প্রথম আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে, বুঝলে আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ। আমিই ওর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম, ওকে বুঝতে চেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম, নিজেই যাব গ্রুশেংকার কাছে, কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা জানা মাত্র ও আমার কাছে ছুটে এসেছে। জানো, গ্রুশেংকা এসেছে দেবদূতের মতো, আমার সব দুঃখ, সব অশান্তি ঘুচেছে ওর কথায়।

ন্যাকামিভরা আদুরে গলায় গ্রুশেংকা বললে,—এতো বড়ো সম্মানী ঘরের মেয়ে আপনি, আমি ভয় পেয়েছিলাম, কতো ঘেন্নাই না আপনি আমাকে করবেন।

ওরে দুষ্টু মেয়ে, রাক্ষুসী কোথাকার! আমি তোকে ঘেন্না করব? গ্রুশেংকাকে জড়িয়ে ধরে সবেগে তার অধরোষ্ঠে চুম্বন করল কাটেরিনা। বললে,—দেখেছ আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, আমাদের গ্রুশেংকার কী মিষ্টি হাসি দেখেছ!

এ দৃশ্যের দর্শক হয়ে একটু লাল হয়ে উঠল আলিওশা, নিজের অজান্তে কেমন একটু কেঁপে উঠল সে। তেমনি উৎফুল্লকণ্ঠে কাটেরিনা বলে চলল,—জানো আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, সবাই জানে গ্রুশেংকা খেয়ালী, গ্রুশেংকা আত্মম্ভরী, কিন্তু ওর আসল মনটির পরিচয় অন্য। সে মন পরের দুঃখ বোঝে, পরের সহানুভূতিতে গলে। দুঃখ না পেলে তা হয় না, গ্রুশেংকা অনেক দুঃখ পেয়েছে যে। সামরিক বিভাগের এক অফিসার,—গ্রুশেংকা ভালোবেসে ছিল তাকে, ভালোবেসে নিজের সর্বস্ব তুলে দিয়েছিল তার হাতে। সে কিন্তু ওকে ভুলে গিয়েছিল, বিয়ে করেছিল অন্যাকে। সে পাঁচ বছর আগেকার কথা। তার স্ত্রী মারা গেছে, আবার সে ফিরে আসছে গ্রুশেংকার কাছে। গ্রুশেংকা কিন্তু আর কাউকে ভালোবাসেনি। ওর বাপের বয়সী শয্যাশায়ী বণিকটি ছাড়া কোনো প্রেমিকই ওর কাছে কিছু পায়নি। পাঁচ বছর পরে গ্রুশেংকার বিরহরাত্রির অবসান হোলো বলে। যাকে সে একনিষ্ঠ হয়ে ভালোবেসেছে, এবার তার সঙ্গে ওর মিলন হবে।

গ্রুশেংকা আবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে,—আপনারই যেন আর দেরি সয় না। যে ভাবে আপনি আমার দোষ ঢাকছেন—

দোষ ঢাকব? তোমার মতো মেয়ের দোষ ঢাকব আমি? কী যে বলো, এতো বড়ো আমার অধিকার? দাও, দাও, তোমার ডান হাতটি আমার হাতে দাও! জানো, এই হাতে করে আমার সমস্ত সুখ তুমি এনেছ!

গ্রুশেংকার ডান হাতে বারে বারে চুম্বন করল কাটেরিনা। খুক্ খুক্ শব্দ করে মিষ্টি হাসি হাসল গ্রুশেংকা, গর্বভরা আত্মপ্রসাদের হাসি।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছিল আলিওশার। গ্রুশেংকা এবার বললে,—মানী ঘরের মেয়ে আপনি, আমার মনে হয়, আপনি ভুল করেছেন, বড্ড বেশি বাড়াচ্ছেন আমাকে। আসলে আমি খারাপ মেয়ে, স্বার্থপর আমার মন। এই দেখুন না, সেদিন যে ডিমিট্রিকে আমি পাঠিয়েছিলাম সে তো শুধু মজা দেখবার জন্যেই।

বেশ তো ভাই, সেই ডিমিট্রিকে আবার তুমিই বাঁচাবে। তুমি তাকে স্পষ্ট করে বলবে সত্যিকারের যাকে তুমি ভালোবাসো সে লোক তোমার কাছে ফিরে আসছে,—তাকেই তুমি বিয়ে করবে। এই বলে তুমি মুক্তি দেবে ডিমিট্রিকে। আমাকে কথা দিয়েছ, তাই না?

না, না, কোনো কথা আপনাকে আমি দিইনি। তবে হ্যাঁ, এই নিয়েই আপনার আমার কথাবার্তা এতোক্ষণ হচ্ছিল, তা বলতে পারেন।

একটু পাণ্ডুর হয়ে গেল কাটেরিনার মুখ। সে বললে,—আমি তাহলে হয়তো ভুল বুঝেছি। আমার ধারণা, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে।

তেমনি হাসিখুশি সরলভাবে, তেমনি খুকি-খুকি আদুরে গলায় গ্রুশেংকা বললে, না, প্রতিজ্ঞা আমি কিছু করিনি। আমার বিপদ কী জানেন? আপনার মতো মনের জোর আমার নেই। এই মনে ভাবি—চাইনে, আবার এই মনেই ভাবি—চাই। এই মিটিয়াকে আমি পুরো একটি ঘণ্টা ভালোবেসে ছিলাম। হয়তো কী খেয়াল হবে, আবার ওকে কাছে ডাকব, বলব, সারাজীবন আমার কাছেই থাকো।

কথা বার হয় না আর কাটেরিনার মুখে। কোনো রকমে আমতা আমতা করে বললে, কিন্তু একটু আগে তুমি যে অন্য কথা বলছিলে ভাই।

সেই তো আমার মরণ। কখন যে কী বলি তার ঠিক নেই। এই আপনাকে দেখে আমার মন ভিজল, এক কথা বললাম। বাড়ি ফিরে হয়তো মনে মনে ভাবব, মিটিয়া বেচারি আমার জন্যে কতো দুঃখ পেল। আবার মন ভিজবে তার জন্যে। তখন? এই জন্যেই তো লোকে বলে, আমি মেয়েটা খারাপ, আমার কোনো মতিস্থির নেই। দিন্ ভাই, আপনার ডান হাতটি আমার হাতে দিন্।

পরম শ্রদ্ধাভরে কাটেরিনার ডান হাতটি দু-হাতে তুলে নিল গ্রুশেংকা। বললে,—আমার মতো খারাপ মেয়ের হাতে আপনি তিনবার চুমু খেয়েছিলেন। তার বদলে আপনার হাতে আমার তিনশোবার চুমু খাওয়ার কথা। তাই না? কী সুন্দর আপনার হাত! আহা! কী অপরূপ আপনার রূপ!

কাটেরিনা হাত টেনে নিল না। উদ্‌গ্রীব আগ্রহে সে তাকিয়ে রইল গ্রুশেংকার মুখের দিকে। সে মুখে সারল্যভরা খুশীর হাসি। কাটেরিনা ভাবল,—মেয়েটা ভালো, তবে একটু বোকা, একটু খেয়ালী কিন্তু অসৎ নয়। আশা হারাল না কাটেরিনা।

তার হাতটি আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে তুলল গ্রুশেংকা। কয়েক মুহূর্ত ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে কী যেন ভাবতে লাগল একমনে। তারপর হঠাৎ আরো মিষ্টি-মাখানো গলায় আরো টানা-টানা উচ্চারণে বলে উঠল,—কী আমি ভাবলাম বলুন দেখি? আহা, কী সুন্দর হাত! আহা, কী মানী ঘরের মেয়ে! তাহোক, তবু আমি আপনার এই হাতে চুমু খাবো না! হি-হি!

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল গ্রুশেংকা।

কাটেরিনা চমকে উঠল। বললে,—তা না খেলে, তোমার ইচ্ছে।

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ ঝলসে গেল গ্রুশেংকার চোখে। বললে,—ঠিক খাবো না। কেন জানেন? এ কথা আপনার মনে থাকবে চিরদিন যে আপনি আমার হাতে চুমু খেয়েছেন, আমি কিন্তু আপনার হাতে চুমু খাইনি।

চকিতে হাত টেনে নিল কাটেরিনা। রক্ত ঝলকে উঠল মুখে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—কী বল্‌লে? এতো বড়ো গর্ব তোমার?

গ্রুশেংকাও উঠে দাঁড়াল, তবে আস্তে আস্তে, অলস মন্থরভাবে। বললে,—ছি-

ছি ! আপনি আমার হাতে চুমু খেলেন, কিন্তু আপনার হাতে চুমু খেতে আমার বড়ো বয়েই গেল ! এ গল্প আমি মিটিয়াকে বলব। খুব হাসবে মিটিয়া !

যাও, যাও, চলে যাও আমার বাড়ি থেকে। নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার !

ছি ছি ছি ! আপনার মতো বড়ো ঘরের মেয়ের মুখে এমনি নোংরা কথা ? মরে যাই, কী লজ্জা !

আবার কথা ! দূর হয়ে যা ! বাজারের বেশ্যা, শয়তানী মাগী !

বটে ! আমি বেশ্যা ? অতো গর্ব ভালো নয় গো ! ভর সন্ধ্যেবেলা টাকা রোজগারের জন্যে ভদ্রলোকদের বাড়ি কে যেত, সে আমার জানা আছে !

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে গ্রুশেংকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাটেরিনা। আলিওশা তাকে বাধা দিল, দু-হাতে তাকে চেপে ধরে বললে,—না, থামো তুমি। আর এক পাও এগিয়ো না, একটি কথাও বোলো না। ও এখুনি চলে যাবে।

ইতিমধ্যে কাটেরিনা আইভানোভ্নার আর্তনাদ শুনে তার দুই মাসি আর একটি পরিচারিকা ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে।

গ্রুশেংকা সোফা থেকে ওড়নাটি তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। বললে,—চলি এবার ! আলিওশা, লক্ষ্মীটি, একটু পৌঁছে দেবে আমাকে ?

দু-হাত জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে আলিওশা বললে,—না, আর দেরি কোরো না, তুমি এক্ষুনি যাও।

চলো না লক্ষ্মীটি আমার বাড়ি। খুব মজার একটা গল্প বলব তোমাকে। দেখো, আমার বাড়ি গেলে লোকসান হবে না, শেষ পর্যন্ত ভালোই লাগবে তোমার।

আলিওশা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল। খিলখিল হাসি হেসে ছুটে বার হয়ে গেল গ্রুশেংকা।

কাটেরিনার তখন প্রায় মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থা। ফোঁস্ ফোঁস্ করে সে কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক, কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সর্বাঙ্গ।

বড়মাসি বললেন,—আমি বলিনি তোকে, এমন কাজ করিসনে ? এসব মেয়েমানুষ যে কী সাংঘাতিক তা বলার নয়। এদের সঙ্গে তুই পারবি ? তা, আমার কথা তো শুনলিনে। নিজে যা একবার গোঁ ধরবি সেটি করা চাই-ই চাই।

কাটেরিনা ডুকরে উঠল,—মেয়েমানুষ নয়, ওটা একটা বাঘিনী। কেন তুমি আমাকে ধরলে আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ ? নইলে ওটাকে এমন মার আমি মারতাম !

সামনে আলিওশার উপস্থিতিতেও নিজেকে সে সামলাতে পারছিল না। আবার বললে,—কাঠে বেঁধে ওকে সবার সামনে বেত মারা উচিত !

আলিওশা দু-পা পিছিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আবার চেঁচিয়ে উঠল কাটেরিনা,—ছি ছি ছি ! সবচেয়ে লজ্জা আমার কাকে নিয়ে জানো ? ঐ ডিমিট্রিকে নিয়ে ! মেয়েটা বলে কিনা, আমি রূপ বিক্রী করতে সন্ধ্যেবেলা লোকের বাড়ি গিয়েছিলাম ! এ কাহিনীও ডিমিট্রি ওকে বলেছে ! তোমার ভাইটা একটা অমানুষ।

আলিওশা উত্তর দেবার মতো কথা খুঁজে পেল না।

যাও তুমি এবার আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ ! ইস্, কী লজ্জা, কী কলঙ্ক ! এ কলঙ্ক নিয়ে আমি কী করব ? যাও তুমি । রাগ কোরো না আমার ওপর । পারো তো দয়া করে কাল একবার এসো ।

আলিওশা আচ্ছন্ন মনে রাস্তায় বার হোলো । ভাবল সে, ঐ কাটেরিনার মতো সেও যদি চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারত ।

হঠাৎ বাড়ির পরিচারিকাটি ছুটে এল তার কাছে । বললে,—মাদাম হোলাকভের বাড়ির একটা চিঠি আপনার নামে আছে । আপনাকে দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল ।

লাল রঙের ছোট্ট একটি খাম । অন্যমনস্কভাবে খামটি পকেটে পুরল আলিওশা ।

এগারো

শহর থেকে মঠ এক মাইলের মধ্যে । কিন্তু রাত্রি নেমে এসেছে তখন, চারিদিকে ঘন অন্ধকার । আলিওশা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে পা চালাল । রাস্তার এক নির্জন মোড়ে একলা একটা উইলো গাছের তলায় আবছায়া একটা মানুষ । আলিওশাকে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা,—শিগগির দাও যা আছে, নইলে এখুনি খুন করব ।

ভীষণ চমকে উঠল আলিওশা । পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বললে, —মিটিয়া, তুমি !

হা-হা-হা ! আমাকে এখানে দেখবি আশা করিসনি, না ? ভাবলি, সত্যিই ডাকাত । আমি জানতাম, এই রাস্তায় তুই ফিরবি, ঠিক দেখা হোলো । বল্ এবার, কী বলল কাটেরিনা । ও কি ! কী হোলো তোর আবার ?

আলিওশার বুকের মধ্যে কী যেন একটা ছিঁড়ে গেল এইবার । কান্নায় ডুবে গেল তার গলা । ঢোক গিলে বললে,—না, কিছু হয়নি আমার । খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কিনা । ডিমিট্রি, আজ বাবাকে তুমি প্রায় খুনই করেছিলে, বাবার রক্ত তোমার হাতে, আর এখন কিনা তুমি দিব্যি ডাকাত-ডাকাত খেলছ ।

কেন ? কী হয়েছে তাতে ? খারাপ দেখাচ্ছে ? সুপুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না এটা ?

না । এ নিয়ে আমার কিছু বলবার নেই । আমার শুধু মনে হোলো—

শোন্ আলিওশা । তাকিয়ে দ্যাখ্ চারদিক । দ্যাখ্, কী নির্জন, কী অন্ধকার ! আকাশে কী মেঘ, আর কী হাওয়া ! ঈশ্বরের দোহাই, এক মুহূর্ত আগে আমার কী মনে হচ্ছিল জানিস্ ? এই তো উপযুক্ত সময়, এই তো উপযুক্ত পরিবেশ । মাথার ওপর ঝাঁকড়া গাছের ডাল আছে, কোমরে আছে বেল্ট । গলায় বেঁধে ঝুলে পড়িনে কেন, চুকিয়ে দিইনে কেন এই জঘন্য জীবনযাত্রার গ্লানি । মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলাম, দেখলাম তুই আসছিস্ । আর আমার সমস্ত বুকে ভরে গেল ভালোবাসায়—যে ছোট্ট ভাইটিকে এতো ভালোবাসি, সে আমাকে

ফিরিয়ে আনল মৃত্যুর পথ থেকে। কেমন খুশীতে ভরে উঠল মন। কেন জানিনে, ভাবলাম একটু ঠাট্টা করি, আমার আদরের ভাইকে একটু মজা করে ভয় দেখাই।

থামো ডিমিত্রি, আর বোলো না।

বেশ, বলব না। তুই বল্, কী দেখলি কাটেরিনার বাড়ি গিয়ে। কোনো কথা গোপন করিস্নে। বুক আমার তাতে ভাঙে ভাঙুক। খুব রাগ করেছে সে?

না, করেনি। ওদের দুজনকেই সে বাড়িতে দেখলাম।

দুজন! দুজন আবার কে?

গ্রুশেংকা গিয়েছিল কাটেরিনার কাছে।

অসম্ভব! গ্রুশেংকা আর কাটেরিনা? প্রলাপ বকছিস্নি তো?

সব কথা ডিমিত্রিকে আলিওশা বলল। একটি কথাও বাদ দিল না। পুরো দশ মিনিট লাগল তার সব গুছিয়ে বলতে। আলিওশার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুনতে লাগল ডিমিত্রি। আস্তে আস্তে ভীষণ-দর্শন হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড ভ্রুকুটি করে রইল সে। সমস্ত কাহিনী শোনার পর হঠাৎ তার মুখের ভাব পরিবর্তন হোলো, ফেটে পড়ল কঠোর অট্টহাসিতে। হাসির দমকে বেশ কিছুক্ষণ কথা পর্যন্ত বলতে পারল না।

উন্মাদ উল্লাসে বলল,—চমৎকার, চমৎকার! তাহলে কাটেরিনার হাতে শেষ পর্যন্ত চুমু খেল না গ্রুশেংকা? অমনি চলে গেল? আর কাটেরিনা বললে,—ও বাঘিনী? ঠিক বলেছে, বাঘিনী বলে বাঘিনী। ঠিক বলেছে, ও মেয়েকে বেঁধে মারাই উচিত। অনেক আগেই মারা উচিত ছিল। কিন্তু যাই বলো. দেমাকটা দেখেছ? দেমাকের শয়তানী! অমন খাসা শয়তানী দুটি পাবে না! শয়তানীদের রাণী একেবারে। তাহলে রাণী শয়তানী এতোক্ষণে তার বাড়ি পৌঁচেছে, কী বলিস্? আমিও যাই, ধরিগে ওকে।

কিন্তু কাটেরিনা আইভানোভ্না? ক্লিষ্ট কণ্ঠে আলিওশা শুধোলো।

তাকেও দেখলাম, তাকেও বুঝলাম। এতো ভালো করে তার স্বরূপকে আগে আর চিনিনি। গম্ভীর হয়ে গেল ডিমিত্রির কণ্ঠস্বর,—এমনি কাজ কাটেরিনা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। সেই যে এক অন্ধকার সন্ধ্যায় বাপকে বাঁচাবার জন্যে অচেনা অমানুষ মিলিটারি অফিসারের ঘরে একলা গিয়েছিল,—তা সে-ই পেরেছিল, আর কোনো মেয়ের পক্ষে তা অসম্ভব। এবারেও ভেবেছিল পারবে। কী দম্ভ দ্যাখো, কী আত্মপ্রত্যয়! মাসি বারণ করেছিল, শোনেনি। পণ করেছিল, সেবার ওর বাপকে যেমন বাঁচিয়েছিল, তেমনি এবার বাঁচাবে আমাকে। সেই জোরে ভেবেছিল বাঘিনীকে বশ করবে। গ্রুশেংকাকে দেখে ও ভুলেছিল, ভুলেছিল নিজেরই স্বপ্নের মোহে। কিন্তু যাই বলো, বাঘিনীর কাছে স্বপ্ন টেকে না। যাহোক, তারপর তুমি ভায়া ওদের মাঝখান থেকে পালালে কী করে? জোব্বা কাঁধে নিয়ে দৌড় লাগালে?

শোনো দাদা, কাটেরিনার সেই তোমার বাড়িতে একলা টাকা ভিক্ষে করতে যাওয়ার কাহিনী গ্রুশেংকাকে তুমি বলেছ। এতে কাটেরিনাকে কী সাংঘাতিক অপমান যে তুমি করেছ তা কি বোঝো না?

গ্রুশেংকার কাছে কাটেরিনা অপমানিত হয়েছে, এতে ডিমিত্রি যেন খুশীই হয়েছে, তা দেখে থারাপ লাগল আলিওশার। ডিমিত্রি বীভৎস ভ্রুকুটি করে কপালে করাঘাত করল একবার। কাটেরিনা আলিওশাকে বলেছে, তোমার দাদা একটা অমানুষ,—সেই কথাটা পূর্ণ হয়রকম হোলো তার। বললে,—হ্যাঁ, বলেছি। মক্রোতে যখন গিয়েছিলাম, তখন বলে ফেলেছিলাম মদের নেশায়। ঠাট্টা করে বলিনি, প্রশংসা করেই বলেছিলাম, গ্রুশেংকাও শুনে চোখের জল ফেলেছিল। আজ সেই চোখের জলের কাহিনীকে গন্ত ছোরার মতো কাটিয়ার বুকে বসাতে গ্রুশেংকার বাধল না। হুঃ, মেয়েরা এমনি।

মাথা নিচু করে ডিমিত্রি ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বললে,—হ্যাঁ, সত্যিই আমি অমানুষ, নরপিশাচ একটা। দেখা হলে তাকে বোলো, তার এই সম্বোধন মেনে নিয়েই আমি চলে গেছি। কথা বাড়াব না আর। খুব প্রয়োজন না পড়লে তোমার সঙ্গেও আর দেখা করব না কখনো।

দু'পা এগিয়ে ফিরে এসে আবার সে বললে,—দ্যাখো আলিওশা, ভালো করে আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো। জীবনে ভালোমন্দ অনেক কিছু করেছি, শেষ পর্যন্ত অসম্মানের চরমতম গভীরে নেমে এসেছি আজ। আকণ্ঠ আজ আমার বুক ঠেলে উঠেছে শুধু অপমান আর গ্লানি। হ্যাঁ পারি, এক লহমার চেষ্টায় আমি আবার মহৎ হবার পথে পা বাড়াতে পারি, ফিরে পেতে পারি মনুষ্যত্ব। কিন্তু তা আমি করব না। অমানুষ আমি, এক অমানুষিক পরিকল্পনা আমি করেছি। এখন বলব না, সে পরিকল্পনার চরিতার্থতা নিজে চোখেই তুমি দেখবে। ইতিমধ্যে আমি চললাম আমার পথে। সে পথ নোংরা চোরা-গলি। শয়তান মেয়েমানুষই সে পথের উপযুক্ত সঙ্গিনী। আর নয়, এবার বিদায়।

হঠাৎ পিছন ফিরে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়ে গেল ডিমিত্রি। আলিওশা আস্তে আস্তে পা বাড়াল মঠের উদ্দেশ্যে।

কোথায় গেল ডিমিত্রি? কোন্ পরিকল্পনার কথা সে বলে গেল? কী করবে সে সত্যি সত্যি? ভাবতে ভাবতে চলল আলিওশা। বিদায়? বললেই হোলো? আলিওশা ঠিক করল, কালই সে আবার ডিমিত্রির সঙ্গে দেখা করবে, আলোচনা করবে খোলাখুলি।

মঠে পৌঁছে আলিওশা পাইন বনের রাস্তা দিয়ে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছল। ফাদার জোসিমার ঘরে যেতে তার বুক কেঁপে উঠল।

কেন প্রভু তাকে সংসারে পাঠাচ্ছেন, কেন তাকে নির্বাসন দিচ্ছেন মঠের আশ্রয় থেকে? সংসার বড়ো সমস্যাসঙ্কুল, বড়ো প্রহেলিকাময়। সংসারের পথ বড়ো অন্ধকার, বিপদের আহ্বান সেখানে পদে পদে। আশ্রম-জীবন নিভৃত আশ্রয়,—এখানে শান্তি, এখানে নিরুদ্বেগ তৃপ্তি।

জোসিমার ঘরের সামনে দেখা হোলো ব্রহ্মচারী পরফিরি আর ফাদার পাইসির

সঙ্গে। তাঁরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় জোসিমার অবস্থা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। আলিওশা কোভের সঙ্গে শুনল যে মঠবৃন্দের অবস্থা আরো খারাপের দিকে গিয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে সাধুদের প্রার্থনা সভা বসত, সেখানে প্রত্যেকে দৈনন্দিনের পাপস্বীকার করতেন, মঠবৃন্দের উপদেশ শুনতেন আর আশীর্বাদ নিতেন। আজ সেই সান্ধ্য-প্রার্থনা সভাও বন্ধ ছিল।

ফাদার পাইসি আলিওশার কানে কানে বললেন,—আরো দুর্বল হয়ে আছেন সর্বক্ষণ। পাঁচ মিনিটের জন্যে জেগে উঠেছিলেন সন্ধ্যেবেলা। তখন তিনি সবাইকে আশীর্বাদ করেছেন। তুমি ছিলে না, জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায়? শহরে গেছ শুনে বললেন, আশীর্বাদ করি ওর মঙ্গল হোক। ওর স্থান এখানে নয়, ও ফিরে যাবে সংসারে। তোমাকে প্রভু কতো স্নেহ করেন তা আমরা জানি। তুমি সংসারে ফিরে যাও, এ বাসনা কেন তিনি করেন জানিনে। তোমার উত্তর-জীবনের কী চিত্র তিনি দেখেছেন তা তিনিই জানেন। তবে হ্যাঁ, সংসারে যদি ফিরেই যাও, তবু এই মঠের শিক্ষা আর গুরুর উপদেশ—তা তুমি ভুলে যাবে না আশা করি। আত্মাভিমান আর সুখসন্ধান—সংসারের সব লোকেরই এই ধারা,—এই ধারা তোমার জীবনকে স্পর্শ না করুক।

ফাদার পাইসি চলে গেলেন। আলিওশা বুঝল, ফাদার জোসিমার আয়ু ফুরিয়েছে, বড়ো জোর দু-একদিন আর তিনি বাঁচবেন। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, বাবা কিংবা কাটেরিনা আইভানোভ্না, বা হোলাকভদের কথা দিলেও আগামী কাল সে মঠ থেকে নড়বে না, বা কোথাও যাবে না জোসিমার শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে। অচলা গুরুভক্তিতে পরিপূর্ণ তার অন্তর—কেমন করে তাঁকে ভুলে বাইরে বাইরে কাটাল সে এতোক্ষণ? জোসিমার ঘরে গিয়ে শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। তিনি তখনো নিদ্রাভিভূত,—মৃদু ধীর নিশ্বাস, শান্ত তাঁর মুখমণ্ডল।

পাশের ঘরে গেল আলিওশা। এই ঘরে অতিথিরা উপবেশন করেছিলেন সকালবেলা। জুতো আর জোব্বা খুলে সে প্রার্থনা করতে বসল। এ প্রার্থনায় কোনো কামনা নেই, কোনো দুঃখ-নিবেদন নেই, আছে শুধু তার প্রসন্ন তরুণ অন্তরের আনন্দিত প্রকাশ। প্রার্থনার সময়ে হঠাৎ পকেটে হাত দিতে হাত পড়ল সেই গোলাপী চিঠিটায়, যেটা কাটেরিনার বাড়ি থেকে আসার সময় ভৃত্য তাকে দিয়েছিল। প্রার্থনা শেষ করে সে চিঠিটা পকেট থেকে বার করল। কিছুটা ইতস্তত করার পর খুলল খামটা। চিঠি লিখেছে লিজা, মাদাম হোলাকভের মেয়ে—সে আজ সকালে গুরুর সামনেই তার মুখের ওপর ঠাট্টার হাসি হেসেছিল।

লিজা লিখেছে:

আলেক্সিস ফিয়োডোরোভিচ, এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি, তা কেউ জানে না, মা-ও না,—ভীষণ অন্যায় কাজ করছি এটা। কিন্তু আমার মনের গভীরে যে অনুভূতি জেগে উঠেছে, তা তোমাকে না জানিয়ে আমার উপায় কই! কিন্তু আলেক্সিস, কি

ভাষায় প্রকাশ করি তা ! সাদা কাগজের রঙ বদলায় না—তাই আমার মুখ যতো লালই হোক, কাগজ তো সাদাই থাকবে। তাই চিঠিই ভালো। প্রিয় আলিওশা, আমি ভালোবাসি তোমাকে। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেই যখন আমরা মস্কোতে থাকতাম, সেই থেকেই তোমাকে ভালোবাসি। এর মধ্যে অনেক বদলে গেছ তুমি, কিন্তু আমার প্রেমের পরিবর্তন নেই,—সারাজীবন তোমাকে এমনি ভালোবাসব। তুমি কি আমাকে নেবে না সারাজীবনের মতো? হ্যাঁ, কয়েক বছর তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবেই, নইলে আইনের বাধা, তাই না ! দেখো, ততদিনে আমি ভালো হয়ে যাব, হাঁটতে পারব, নাচতে পারব। কিন্তু তুমি ! তোমার সন্ন্যাসীর বেশ আমার জন্যে তুমি কি ছাড়বে না আলিওশা ?

দ্যাখো, কতো আমি ভেবেছি। সব আমি ভেবে রেখেছি। একটা জিনিষ কেবল ভেবে পাইনে, আমার এই চিঠি যখন তুমি পড়বে তখন তুমি কী ভাববে? আমি কতো দুষ্টুমি করেছি, কতো জ্বালিয়েছি তোমাকে। আজ সকালেও তুমি রাগ করেছ আমার ওপর। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার অনুতাপের শেষ নেই,—আমার চোখে জল। তবু তোমার রাগ যাবে না ?

আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটি তোমার হাতে দিলাম। কাল তুমি যখন আসবে, তোমার মুখের দিকে আমি হয়তো চাইতে পারব না। তবে কি জানো, না পারাই ভালো। তুমি আমার দিকে তাকিয়ো না। তোমার চোখে চোখ পড়লেই হাসি আসে আমার। তোমার গায়ের ঐ জোব্বা দেখে রাগ ধরে আর হাসিও পায়। হেসে যদি ফেলি, তুমি রাগ করে গাল ফোলাবে, তখন কী দুর্দশা হবে আমার ভালোবাসাটির ?

আলিওশা, এরই নাম কি প্রেমপত্র ? ছিঃ ছিঃ, কী করলাম ! ঘেন্না কোরো না আমাকে আলিওশা। এ চিঠি পড়ে যদি রাগ করো, ক্ষমা কোরো আমাকে। আমার ভবিষ্যৎ, আমার সম্ভ্রম,—সব তোমার হাতের মুঠোয়,—সেই ভেবে দয়া কোরো আমাকে।

এবার শেষ করি, আর একলা বসে কাঁদি। বিদায়, কাল আবার দেখা হবে। সেই দেখা বড়ো ভয়ের দেখা। তার আগে পর্যন্ত—বিদায় !

—লিজা

পুনশ্চ : কাল আসবে, আসবে, নিশ্চয় আসবে।

—লিজা

অবাক বিস্ময়ে চিঠিটা পড়ল আলিওশা, পড়ল দুবার করে। হাসি এল, পরক্ষণে ভাবল, হাসিটা বোধহয় অন্যায়। একটু ভাবল আবার। আবার হাসল, আনন্দের নির্মল হাসি। চামড়া-বাঁধানো সোফাটায় গিয়ে সে শুল। এমনি রুক্ষ শয্যাতে অভ্যস্তই সে অভ্যাস্ত। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে নিদ্রা নেমে এল তার চোখে।



চতুর্থ অধ্যায় : দুঃখ বেদন

অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল আলিওশার,—সূর্যোদয়ের আগে। ফাদার জোসিমাও উঠলেন,—দেহ অত্যন্ত দুর্বল, তা সত্ত্বেও শয্যা পরিত্যাগ করে চেয়ারে এসে বসলেন। রোগশীর্ণ মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য, ব্যাধির জড়িমার কোনো আভাস পড়েনি মনে। চিরাচরিত স্নেহসৌজন্য আর স্ফূর্তিতে উদ্ভাসিত ব্যবহার। আলিওশাকে তিনি বললেন,— কাল হয়তো বাঁচব না, শেষ প্রায়শ্চিত্ত আমি এখনই করতে চাই।

পাপস্বীকার তিনি করলেন ফাদার পাইসির কাছে। অন্য সাধুরাও সমবেত হলেন। ধর্মানুষ্ঠান শেষ হতে না হতে সূর্য আকাশে দেখা দিল।

ক্ষুদ্র ঘরটি সাধুসজ্জনে পরিপূর্ণ। আলিওশা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রভুর কেদারার পাশে। প্রভু কথা বলতে শুরু করলেন। মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু সুস্পষ্ট উচ্চারণ। অনেক কথা তিনি বললেন, শুধু শিক্ষাদানের জন্যে নয়, জীবনের এই অন্তিম প্রভাতে আপন অন্তরকে ভক্তগণমধ্যে উন্মোচনের প্রেরণায়। মাঝখানে নিজেকে ব্যঙ্গ করে এও বললেন,—কতো বছর ধরে তোমাদের আমি শিক্ষা দিয়ে আসছি, কথা বলে বলে অভ্যাসটা এমনই খারাপ হয়ে গেছে যে এখন চুপ করব ভাবলেও চুপ করতে পারিনে।

প্রভুর এই কথাগুলি আলিওশার মনে গভীর স্পর্শ রেখেছিল,—

ভক্তগণ, বন্ধুগণ, পরস্পরকে ভালোবেসো, ভালোবেসো ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানকে। এই মঠের চারদিক ঘেরা দেয়ালের অভ্যন্তরে বাস করি বলেই আমরা মহা পুণ্যবান—এ অহমিকা যেন আমাদের মনে না থাকে। আসলে সারা পৃথিবীর যতো পাপ, সেই পাপের ভার বহনের দায়িত্ব নিয়েই আমরা মঠবাসী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেছি। সংসারের সর্বকলুষ মোচনের ভার আমরা যদি গ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের প্রয়োজন কী? আমার ভালোমন্দটুকু নিয়ে থাকলে তো চলবে না,—প্রত্যেকের ভালোমন্দ, সারা সংসারের পাপপুণ্যের জন্যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে দায়ী,—এই ধ্যান যেন চিত্তে সর্বদা স্পষ্ট হয়ে থাকে। তবেই জাগবে করুণা, তবেই আত্ম-বিস্মৃত অনন্ত প্রেমে মানব-কল্যাণে নিবেদিত হবে অন্তর—যে প্রেমের কোনো পার নেই, কোনো তল নেই,—যে প্রেমে সারা জগৎ বশীভূত হবে, যে প্রেমের অশ্রুতে সর্বগ্লানি ধুয়ে সারা বিশ্ব নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠবে। সাধুগণ, মনে রেখো, ধর্মের স্বার্থপরতা আর কূপমণ্ডূকতা—এর চেয়ে বড়ো পাপ সন্ন্যাসীর পক্ষে আর কিছু নেই। তাই আত্ম-জিজ্ঞাসা আর পাপস্বীকার সাধুর প্রাত্যহিকের কর্তব্য, এই কর্তব্যের মধ্য দিয়েই তার প্রত্যহের আত্মপ্রস্তুতি। পাপকে ভয় কোরো না। মনে রেখো, অনুতাপের অশ্রুজলে পাপের কলুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার বলি, গর্ব কোরো না, দম্ভ রেখো না

মনে,—নিজেকে সাধু বলে, নিজেকে সকলের থেকে পৃথক বলে। যারা তোমাদের দুর্নাম করে, ঘৃণা করে,—তাদেরও ভালোবেসো। যারা অবিশ্বাসী, বস্তুতান্ত্রিক, অধার্মিক, তাদেরও ঘৃণা কোরো না। তাদের দায়িত্ব তোমাদেরই দায়িত্ব। বরং তাদের নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বোলো,—প্রভু, আমার কণ্ঠে তাদেরই প্রার্থনা। যারা নিজেরা প্রার্থনা করে না, যাদের হয়ে প্রার্থনা করার কেউ নেই,—তাদের প্রার্থনা আমার মুখ থেকে তুমি গ্রহণ করো। আরো বোলো,—এ প্রার্থনার পিছনে আমার নিজের কোনো গর্ব নেই প্রভু, কেননা যারা সর্বহারা, তাদেরও নিচে আমার স্থান। ঈশ্বরের পতাকার তলে সমবেত অগণিত জনতা, কিন্তু ভক্তগণ, সেই পতাকা বহনের ভার তোমাদের। এই কথাটি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলো না।

জোসিমার গৃহ থেকে একবারের জন্যে আলিওশা বাইরে এসেছিল। গৃহের বাহিরে বহু সাধু ও ভক্তের ভিড়। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা। প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কী এক অলৌকিক ঘটনা ঘটবে,—এই ধারণায় অন্তর উদ্বেলিত। ফাদার পাইসির গম্ভীর মুখেও সেই উত্তেজনার স্পর্শ।

এক সাধু গোপনে ডাক দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল আলিওশাকে। অপেক্ষা করছিল রাকিতিন, হাতে মাদাম হোলাকভের লেখা একখানি চিঠি। চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা তিনি আলিওশাকে জানিয়েছেন। গতদিন জোসিমার কাছে এক বিধবা দর্শনার্থিনী এসেছিল হারানো সন্তানের ব্যথা বুকে নিয়ে,—যাকে জোসিমা বলেছিলেন যে তার ছেলে নিশ্চয়ই জীবিত আছে এবং শীঘ্রই মা'র কাছে ফিরে আসবে। মাদাম হোলাকভ লিখেছেন,—প্রভুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী দেখে ছেলের চিঠি। শুধু চিঠি বললেই কম বলা হোলো,—ছেলে এও লিখেছে যে সে তার উধর্বতন অফিসারের সঙ্গে দেশে ফিরছে, তিন সপ্তাহ পরেই মা'র কাছে এসে পৌঁছবে।

মাদাম হোলাকভ লিখেছেন,—প্রভুর এ কী সত্য দৃষ্টি, এ কী ভবিষ্যৎ বাণী! তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা তুমি সমস্ত মঠবাসীদের জানাবে, এ কাহিনী চতুর্দিকে প্রচার হওয়া উচিত।

আলিওশা মাদাম হোলাকভের চিঠিটি ফাদার পাইসির হাতে দিল। রাকিতিনের মুখে এ কাহিনী ইতিমধ্যেই কিছু না কিছু ছড়িয়ে পড়েছিল, এখন চিঠি পড়ে ফাদার পাইসির গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল, জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। তাঁর মুখ দিয়ে বার হোলো,—এর চেয়ে আরো মহত্তর ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

তাঁর চারদিকে অন্য সাধুরা বললেন,—হ্যাঁ, আরো অলৌকিক।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মঠবৃদ্ধের এই অনন্যসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর কাহিনী সারা মঠে ছড়িয়ে গেল। এই কাহিনী শুনে সব চেয়ে চমৎকৃত হোলো বহুদূরের উত্তর দেশের সেন্ট সিলভেস্টার মঠ থেকে আগত সাধুটি। গতকাল সাধুটি মাদাম হোলাকভের সামনে উপস্থিত ছিল, বিস্মিত হয়েছিল জোসিমার কৃপায় তাঁর মেয়ের

অলৌকিকত্বের খবর শুনে। বিশ্বাস আর সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল তার মন। গতকাল সন্ধ্যাবেলা সে ফাদার ফেরাপন্টের কুটীরে গিয়েছিল, তাঁকে দেখে বড়ো আশ্চর্য হয়েছিল, অভিভূত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি।

এই বৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী সাধু উপবাস ও মৌনব্রতকে সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্মকৃতি বলে গ্রহণ করেছিলেন, মঠবৃদ্ধদের ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের নির্দেশ মান্য করার প্রথায় তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। জোসিমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি, যদিও মুখে কদাচ কারো সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। মৌনভাবেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত, তবু অনেক সাধুরা তাঁর মতাবলম্বী ছিলেন। তীর্থযাত্রীদের অনেকেরই ধারণা ছিল, তিনি মস্ত যোগীপুরুষ, যদিও কিছুটা হয়তো অপ্রকৃতিস্থ। এই অপ্রকৃতিস্থতাই ছিল যাত্রীদের কাছে তাঁর প্রধান আকর্ষণ।

ফাদার ফেরাপন্ট কখনো মঠবৃদ্ধ জোসিমার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না। আশ্রমবাসী হলেও অপ্রকৃতিস্থ বলে আশ্রমের নিয়মকানুন তাঁর পক্ষে শিথিল ছিল। বয়স তাঁর পঁচাত্তর, কাঠের একটি ভগ্নপ্রায় কুটীরে তিনি বাস করতেন। এই কুটীরটি প্রথমে নির্মিত হয়েছিল ফাদার আইয়োনা নামে আর এক মহাপুরুষের জন্যে, যিনি একশো-পাঁচ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছিলেন ও যাঁর অলৌকিক সাধনা সম্বন্ধে নানা কাহিনী তখন লোকমুখে প্রচারিত ছিল।

সাত বছর আগে ফাদার ফেরাপন্ট ফাদার আইয়োনার এই পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করেন। কুটীরটির গঠন অনেকটা ছোট একটি গির্জার মতো। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন মূর্তি, তাদের সামনে প্রদীপের আলো। যাত্রীরা প্রদীপ রেখে যায়। এই সব প্রদীপকে নিত্যপ্রজ্বলিত রাখা ফাদার ফেরাপন্টের কাজ। আহার তাঁর সারা সপ্তাহে চার পাউন্ড রুটি, আর আশ্রমের বরাদ্দ একটু প্রসাদ, পানীয় শুধু জল। কদাচিৎ তিনি উপাসনা সভায় যোগ দেন। মাঝে মাঝে সারা দিন তিনি যোগাসনে বসে প্রার্থনা করেন, কোনোদিকে না তাকিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ না করে। যদি বা কোনো যাত্রীর সঙ্গে কখনো তিনি কথা বলেন, তাও দু-চারটি দুর্বোধ্য অসংলগ্ন রূঢ় কথা মাত্র। ধর্মযাজক তিনি নন, ধর্মের বাণী তিনি লোকমধ্যে প্রচার করেন না। অনেক লোকের বিশ্বাস, তিনি কথা বলেন স্বর্গীয় আত্মাদের সঙ্গে,—তাই মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর বিরাগ।

নবাগত সাধুটি খুব ভয়ে-ভয়েই গতকাল সন্ধ্যায় ফাদার ফেরাপন্টের কুটীরে গিয়েছিল। সবাই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ফেরাপন্ট হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলবেন না বা যা বলবেন তা বিন্দুবিসর্গও তার বোধগম্য হবে না। ফাদার ফেরাপন্ট তাঁর কুটীরের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন। মাথার ওপর ঝাঁকড়া এলম্ গাছের ডাল সান্ধ্য-বাতাসে দুলছিল। যাত্রী সাধুটি ফেরাপন্টের সামনে গিয়ে খুব নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করল।

আশীর্বাদ চাও? ফাদার ফেরাপন্ট গম্ভীর গলায় বললেন,—বেশ আশীর্বাদ করলাম। নাও ওঠো, পাশে এসে বোসো। কোথা থেকে আসছ?

এতো বয়স আর এতো উপবাস সত্ত্বেও ফাদার ফেরাপন্টের চমৎকার স্বাস্থ্য দেখে সাধুটি আশ্চর্য হয়ে গেল। মাংসপেশীবহুল সমর্থ সুদীর্ঘ দেহ, লাল টকটকে মুখ। মাথায় মুখে ঘন চুল-দাড়ি, পক্বতার লেশ তাতে খুবই কম। বড়ো বড়ো চোখ, তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি। গায়ে তাঁর তামাটে রঙের মোটা করেদীদের কাপড়ের একটি কোট, কোমরে মোটা দড়ি বাঁধা। কোটের নিচেকার শার্টটি এতো নোংরা যে দেখলেই মনে হয়, মাসের পর মাস সেটি কাচা হয়নি। লোকে বলে, পোশাকের নিচে গুরুভার লোহার শিকল তিনি পরে থাকেন। পায়ে মোজা নেই। শুধু একজোড়া শতচ্ছিন্ন চটি।

ত্রস্ত কৌতূহলী চোখে ফেরাপন্টের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে সাধু বললে,—আসছি প্রভু অনেক দূরের সিল্‌ভেস্টার মঠ থেকে।

বটে! তোমার সিল্‌ভেস্টার মঠ আমি জানি। কিছুদিন আমি ওখানে ছিলাম। হুঃ, ওখানে সব মূর্খ লোকেদের আড্ডা।

থতমত খেয়ে গেল সাধুটি, কোনো প্রতিবাদ করল না।

ফেরাপন্ট শুধোলেন,—খাওয়া-দাওয়ার বিধিনিষেধ ওখানে এখন কেমন?

সাধুটি ভয়ে-ভয়ে বিবরণ দিল,—প্রাচীন শাস্ত্রীয় নির্দেশ যা আছে তা সবই ওখানে পালন করা হয়। লেন্টের সময় সোমবার, বুধবার, আর শুক্রবার, এই তিনদিন একেবারে উপবাস। মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবারের ব্যবস্থা সাদা রুটি, মধুতে সিদ্ধ করা ফল বা আটার হালুয়া, আর নোনতা বাঁধাকপি। শনিবার দিন মটরশুঁটি-বাঁধাকপির ঝোল, আর তিসির তেলে ভাজা ময়দার চাপাটি। পুণ্য সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই রান্না হয় না, সামান্য রুটি আর জল, তারও মধ্যে সম্ভব হলে লেন্টের সপ্তাহের মতো তিনদিন উপবাস। গুড ফ্রাইডের দিন উপবাস। সেই উপবাস ভাঙে একেবারে শনিবার দিন বিকেল তিনটেয়, তখন বরাদ্দ একটু জল রুটি আর এক পাত্র মদ। এ সব বিধিনিষেধ আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করি। সাহসের সঙ্গে সাধুটি আরো বললে,—তবে কিনা প্রভু, আপনার সংযম আর আত্মনিগ্রহের সঙ্গে কার তুলনা! সারা বছরের প্রতিটি দিন আপনি সামান্য রুটি আর খালি জল খেয়ে কাটান! কী অপূর্ব! কী মহান!

হুঁ। আর, ব্যাঙের ছাতা?

ব্যাঙের ছাতা! বিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করল সাধু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই যে রুটিটুকু এরা দ্যায়, এও আমি ছেড়ে দিতে পারি, জানো? বনের মধ্যে গিয়ে শুধু কাঁচা ফলমূল আর ব্যাঙের ছাতা খেয়ে জীবন কাটাতে পারি। রুটির অভ্যাস হচ্ছে শয়তানের দাসত্ব। উপবাস,—উপবাসই হোলো আত্মমুক্তির পথ। এ যারা মানে না, মন তাদের কলঙ্কে ভর্তি, শয়তানের চেলা তারা সব।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাধু বললে,—ঠিক, ঠিক। ঠিক বলেছেন প্রভু!

ফেরাপন্ট আবার হাঁকলেন,—কেন, ওদের মধ্যে শয়তানের চেলাদের তুমি দেখোনি?

অ্যাঁ! কাদের মধ্যে প্রভু?

গত বছর ট্রিনিটির রবিবারে আমি আমাদের ফাদার সুপিরিয়রের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেই শেষ, আর যাইনি। গিয়ে দেখি, সাধুবাবারা উপস্থিত। তাদের মধ্যে একজনের বুকের উপর ঠিক জোব্বার নিচে শয়তানের একটা চেলা বসে আছে। জামার তলা থেকে দেখা যাচ্ছে শিং দুটো। আর একজনের পকেটে বসে আর একটা চেলা কুতকুতে চোখ মেলে চাইছে। একটা বসে আছে একজনের ভুঁড়ির ওপর, একটা ঝুলছে একজনের গলায়। কারুর চোখে পড়ছে না, খালি আমিই সব দেখছি।

আপনি এদের চর্মচক্ষে দেখতে পান?

পাইনে আবার? শোনো তাহলে। ফাদার সুপিরিয়রের বাড়ি থেকে বার হয়ে আসছি, দেখি, খাবার ঘরের দোরগোড়ায় এক ব্যাটা বসে। বেশ বড়োসড়ো, হাত তিনেক লম্বা হবে,—ইয়া মোটা রোঁয়াওয়ালা ল্যাজ। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, আর বাবাজির ল্যাজটি আটকে গেল দরজার ফাঁকে। আর পালাবার উপায় নেই। আমি তখন তিনবার মন্ত্র পড়লাম, আর ব্যাটা ছটফটিয়ে মরে গেল। কতোদিন মড়াটা পড়েছিল কে জানে? ওরা তো ওদের দেখতেও পায় না, নাকে বদ গন্ধও আসে না। এ প্রায় বছরখানেক আগেকার কথা। কাউকে বলিনি, তুমি বিদেশী বলেই তোমাকে বললাম।

সাধু শুধোলো,—তাহলে পরমপ্রেত পরমাত্মার সাক্ষাৎও আপনি পান?

নিশ্চয়ই পাই, সে আবার বলতে।

কী আশ্চর্য, কী ভীষণ। আমি · আমি হ্যাঁ, কী রূপে তিনি দেখা দেন?

পাখির রূপে।

পাখির রূপে!

আলবৎ। কখনো পায়রা বা চড়াই, কখনো বা ঘুঘু পাখি। তোমরা যখন ঘুঘু দ্যাখো, আমি তখন দেখি তাঁকে।

কোন্ ভাষায় তিনি কথা বলেন?

মানুষের ভাষায় গো, মানুষের ভাষায়। যার কান থাকে সেই শুনতে পায়, অপরে পায় না।

তিনি কী বলেন?

আজই তো বললেন, একটা মূর্খ তোমার কাছে আসবে আর আজেবাজে প্রশ্ন করবে। সত্যিই সাধু হে, তোমার জিজ্ঞাসার আর শেষ নেই।

সাধুটি ভীষণ ভড়কে গেল। আর কী বলবে ভেবেই পেল না।

ফেরাপন্ট আবার বললেন,—এই গাছটা দেখছ?

হ্যাঁ প্রভু, দেখছি।

তোমার চোখে এটা গাছ, আসলে কিন্তু এটা গাছ নয়।

গাছ নয়! তবে কী প্রভু?

গভীর রাত যখন হবে তখন,—হ্যাঁ, ঐ যে ডাল দুটো দেখছ না, ঐ দুটো মস্ত মস্ত হাত হয়ে যাবে। এই গাছ হয়ে যাবে যীশুখৃষ্ট,—বড়ো বড়ো হাত মেলে তিনি আমাকে ডাকবেন। ভীষণ সে আহ্বান।

ও বাবাঃ! জ্যান্ত যীশুকে ?

নিশ্চয়ই। ঐ হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে তুলে একেবারে স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

ওরে বাবা! একেবারে জ্যান্ত আপনাকে ?

হ্যাঁগো হীরারাম হ্যাঁ। একেই বলে সশরীরে স্বর্গলাভ, বুঝেছ ?

সাধু গুটিগুটি সরে পড়েছিল ফেরাপন্টের কুটীর থেকে। ফেরাপন্টের এলোমেলো কথায় যতোই সে তাজ্জব হোক, তার মনে হয়েছিল সত্যিই তার এক মহাপুরুষ দর্শন হয়েছে,—এ মহাপুরুষের তুলনায় মঠবৃদ্ধ জোসিমা অনেক ছোট। ঈশ্বরের নামে অমন সাংঘাতিক আত্মনিগ্রহ যিনি করেন, ঈশ্বর তাঁকে দেখা না দিয়ে যাবেন কোথায় ? কথাবার্তা তাঁর দুর্বোধ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাপুরুষের সব কথা কি সাধারণ মানুষে বুঝতে পারে ? ফাদার জোসিমা এক নতুন অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেবেন শুনে তার সংশয় আর কৌতূহলের সীমা রইল না। মঠবাসী অন্যান্য সাধুদের পিছনে ছুটোছুটি করে তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সে নিজেও পাগল হোলো, অপরকেও পাগল করে তুলল। যাত্রী সাধুটির এই ব্যবহার অ্যালিওশারও চোখে পড়ল,—তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার তখন নেই।

ইতিমধ্যে ফাদার জোসিমা ক্লান্ত হয়ে আবার শোবার ঘরে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ও কাছে আহ্বান করেছিলেন অ্যালিওশাকে। অ্যালিওশা শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখল, প্রভু দুই চোখ মুদ্রিত করে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন,—শয্যাপার্শ্বে ফাদার পাইসি, ফাদার ইয়োসিফ আর ব্রতচারী পর্ফিরি। ক্লান্ত চোখ খুলে অ্যালিওশার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ জোসিমা শুধোলেন,—তোমার আত্মীয়রা কি কেউ তোমাকে আজ আশা করে আছে বাবা ?

অ্যালিওশা উত্তর দিতে ইতস্তত করল।

জোসিমা আবার বললেন,—কাল তুমি কি তাদের কাউকে কথা দাওনি যে আজ গিয়ে দেখা করবে ?

অ্যালিওশা আস্তে আস্তে বললে,—হ্যাঁ বলেছি। বাবাকে, দাদাদের,—আরো অন্য কয়েকজনকে।

তাহলে ? কথা কেন রাখবে না বাবা ? আর দেরি করা তো উচিত নয়। যাও তুমি। ভয় নেই, তুমি ফিরে আসার আগে আমি মরব না। তুমি আমার প্রিয়তম সন্তান। আমার জীবনের শেষ কথা আমি তোমাকেই বলে যাব, তোমাকেই দিয়ে যাব আমার শেষ দান।

এ অবস্থায় প্রভুকে ছেড়ে যেতে অ্যালিওশার মন বিন্দুমাত্র সরছিল না, তবু সে তাঁর কথার অবাধ্য হোলো না। প্রভুর শেষ কথা সে-ই শুনবে, তাঁর শেষ দানের অধিকারী সে-ই হবে—এই আশ্বাসে তাঁর সমস্ত অন্তর শিহরিত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে ঘর থেকে বার হয়ে এলেন ফাদার পাইসি। তাঁর কথাতেও সে চমৎকৃত হোলো কম নয়।

পাইসি কোনোরূপ ভণিতা না করে বললেন,—শোনো বৎস, বিজ্ঞান,—যা গত শতাব্দীতে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করেছে,—এই বিজ্ঞান যা কিছু স্বর্গীয় তাকেই বিশ্লেষণ করেছে, সূতীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছে যুগ-যুগান্তের ধর্মপ্রেরণাকে, ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেকটি বাণীকে। বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর ধর্মের কোনো রহস্যই আর অনুদ্ঘাটিত নেই, কোনো মূল্যই নেই প্রাচীন পবিত্রতার। কিন্তু সত্যকে খণ্ডিত করে দেখার মধ্যেই এই বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ ;—যা অখণ্ড, বিজ্ঞান তাকে উপলব্ধি করতে পারে না, এই অক্ষমতার মধ্যেই বিজ্ঞানের চরম মূর্খতা। কিন্তু অখণ্ড সত্যের নিত্য স্বরূপ কারো চোখের অন্তরালে তো থাকে না! এই অখণ্ড সত্য গত ঊনিশ শতাব্দী ধরে বর্তমান,—ব্যক্তিবিশেষের আর জনসাধারণের মনে এই শক্তি চির-জীবন্ত, নিত্য-চঞ্চল। যাঁরা অবিশ্বাসী, যাঁরা ধ্বংসকামী তাদেরও অন্তরে এই সত্যের শক্তি অব্যাহত, কেননা যাঁরা খৃষ্টধর্মকে আঘাত করে তারাও অন্তরে অন্তরে এই ধর্মের আদর্শকে পালন করে। শত তর্কজালের সাহায্য নিয়েও প্রাচীন খৃষ্টীয় বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোনো বাণী, মহত্তর কোনো আদর্শ আজও তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। বৎস, তোমার গুরু আজ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, আর তুমি চলেছ মঠ ছেড়ে সংসারে প্রবেশ করতে। সংসারের পথে বহু প্রলোভন আছে। অমিত শক্তির বলে সেই সব প্রলোভনকে জয় করে তোমায় চলতে হবে, তাই তোমাকে বলছি,—ভুলো না, নিষ্ঠার পবিত্রতার আর মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শের শক্তি ধর্মের শক্তির মধ্যে সঞ্চিত। যাও বৎস, আমার এ কথাগুলি মনে রেখো।

মাথা নত করল আলিওশা, ফাদার পাইসি তাকে আশীর্বাদ করলেন। মঠ ছেড়ে পথে যেতে যেতে মনে হোলো ফাদার পাইসির মধ্যে একজন মহৎ বন্ধু ও শিক্ষককে সে লাভ করেছে। এ পাওয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, কেননা এতোদিন পাইসি এমনি ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে কথা বলেননি। হয়তো মৃত্যুকালে তার গুরুই ফাদার পাইসিকে নির্দেশ দিয়েছেন, সংসারের পথে পা দেবার প্রাক্‌কালে তাকে উপযুক্ত সদুপদেশ দেবার জন্যে। বিস্মিত প্রসন্নতায় আলিওশা এ সৌভাগ্যকে গ্রহণ করল।

দুই

আলিওশা প্রথমেই গেল তার বাবার কাছে। পথে মনে পড়ল, বাবা যে তাকে যেতে বলেছিল এ কথা আইভান যেন জানতে না পারে, এ নির্দেশ বাবাই তাঁকে দিয়েছিল। কেন? কী গোপন কথা বাবা তাকে বলবে? এমনি লুকোচুরি তার ভালো লাগে না। তবু বাড়ি পৌঁছতে দরজা খুলে মারফা যখন খবর দিল যে আইভান ঘণ্টা দুই আগে বাইরে গেছে, তখন মোটামুটি আশ্বস্ত হোলো সে। জিজ্ঞাসা করল,—আর বাবা কোথায়?

শুষ্ককণ্ঠে মারফা বললে,—উঠেছেন। কফি খাচ্ছেন।

ঘরে গেল আলিওশা। ফিয়োডোর একটা টেবিলের ধারে বসে,—পায়ে চটি, গায়ে পুরোনো একটা ওভারকোট। বসে বসে পুরোনো হিসাবপত্র দেখে সময় কাটাচ্ছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। গ্রিগরি শয্যাগত, অসুস্থ। স্মারডিয়াকভ গেছে বাজারে। খুব ভোরবেলা ফিয়োডোর বিছানা ছেড়ে উঠেছে, কিন্তু খুবই শ্রান্ত ক্লান্ত তার অবস্থা। ভোর থেকে অন্তত চল্লিশবার সে আরশিতে নিজের মুখ দেখেছে, খিঁচিয়ে আছে তার মেজাজ। কপালে দাগড়া দাগড়া আঘাতের দাগ, লাল একটা রুমাল দিয়ে সেগুলো ঢাকা। নাকটা এখনো ফুলে রয়েছে। নাকের ডগাতেও অনেকগুলো লাল-লাল কাটা-ছেঁড়া। বীভৎস দেখাচ্ছে মুখখানা। আলিওশার দিকে বিরক্ত চোখে বুড়ো তাকাল। তিক্ত কণ্ঠে বললে,—কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাছাড়া শুধু নিজের মতো খানা বানাবার হুকুম দিয়েছি। সে খানার ভাগ কাউকে দিতে আমি রাজী নই। এবার বলো, কী উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

আলিওশা বললে,—তুমি আজ কেমন আছ দেখতে এলাম।

বটে! হুঁ। তাছাড়া কাল তোমাকে বলেও ছিলাম বটে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাই না? এমন কিছু দরকার ছিল না, না এলেও কিছু এসে যেত না। হ্যাঁ, তবে জানতাম, একবার সুযোগ যখন পেয়েছ তখন নাক গলাবেই।

বিরস মুখে কথাগুলো বলে চেয়ার থেকে উঠে ফিয়োডোর আরশির সামনে গিয়ে একচল্লিশবারের বার নিজের নাকটা নিরীক্ষণ করল। লাল রুমালকে বেশ কায়দা করে আর একবার মাথায় বেঁধে তারিফের ভঙ্গিতে বললে,—হুঁ, লালই ভালো। সাদা রুমাল হলে কেমন যেন হাসপাতাল-হাসপাতাল লাগে। তারপর, তোমাদের আড্ডার খবর কী? তোমার সাধুবাবা কেমন আছে?

খুব খারাপ অবস্থা। আজই মারা যেতে পারেন।

প্রশ্নের উত্তরের দিকে ফিয়োডোরের কান ছিল না। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে বলে উঠল,—আইভান বেরিয়েছে। মিটিয়ার বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে সরে পড়বার জন্যে ছটফট করছে। সেই তালেই রয়েছে এইখানে।

কী করে তুমি জানলে? তোমাকে নিজ মুখে বলেছে?

বাধা পেয়ে ধমকে উঠল ফিয়োডোর,—বলেছে বইকি, আলবৎ বলেছে। কোনো একটা মতলব না হলে আসে? তুই ভেবেছিস কি ও-ও এসেছে আমাকে খুন করবার মতলবে?

আলিওশা ক্ষুব্ধ হয়ে বললে,—কী যে তুমি ভাবো বসে বসে? এসব কথা কেন তুমি বলছ?

হুঁঃ! পয়সার লোভে ও এখানে আসেনি আমি জানি। আর সে লোভ করলেও একটা কানাকড়িও আমার কাছ থেকে পাবে না। বাবা আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, একটি কথা মনে রেখো, আমি এখনো অনেক, অনেক দিন বাঁচব; আর যতো বুড়ো হব টাকার দরকার আমার হবে ততো বেশি। রং-চটা ঢোলা ওভারকোটের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে করতে ফিয়োডোর বলতে লাগল,—পঞ্চান্ন বছর বয়সে

আমাকে দেখলে তবু মানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু আরো কুড়িটা বছর আমাকে মনুষ্যোচিত ধর্ম পালন করতে হবে তো! বয়স যতো বাড়বে, চেহারার খোলতাইও যে কতো হবে তা তো বুঝতেই পারছ। মাগীরা তখন তো আর রূপ দেখে পটবে না, কাঁচা পয়সা কোঁচড়ে বাঁধবে তবে আসবে। সেইজন্যে গুণে গুণে টাকা জমাচ্ছি,—সব নিজের দরকারে লাগবে বলে। পাপ! আরে বাবা, পাপের মতো সুখের জিনিষ দুটি আছে? মুখে জেরা করলে কী হয়, পাপের নেশা সবাইকার। কেউ লুকিয়ে করে, আর কেউ করে আমার মতো খোলাখুলি। এই যা তফাত। পাপ কোরো না, পাপ কোরো না—আরে বাবা, কেন? না, স্বর্গে যাবে। মাপ করো, আমি স্বর্গে যেতে চাইনে, ভদ্দরলোকে স্বর্গে যায়? স্বর্গ-নরকে আমি বিশ্বাসই করিনে! যখন মরব তখন একেবারে ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর, সব ফর্সা। ব্যস্!

আলিওশা চুপ করে বাবার বাগাড়ম্বর শুনতে লাগল।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম,—আমার মেজ পুত্তুরটি গম্ভীর হয়ে থাকলে কী হয়, আসলে বদমাইসের ধাড়ী। গ্রুশেংকাকে আমি সত্যি যদি বিয়ে করতে চাই, একদিনও আমার দেরি হবে না। টাকা থাকলে ঐ গ্রুশেংকার মতো মেয়েকে বাগানো শক্ত নয়। সেইটেই আইভানের অপছন্দ। তাই সে আমাকে পাহারা দিচ্ছে আর ডিমিট্রিকে উস্কাচ্ছে গ্রুশেংকাকে বিয়ে করবার জন্যে। মিটিয়া যদি গ্রুশেংকাকে বিয়ে করে তাহলে সে তার বাগ্‌দত্তাকে লটকাতে পারবে, এই হোলো মতলব। ব্যাটা শয়তানের জাসু!

আলিওশা এতোক্ষণে বললে,—কালকের ব্যাপারের পর তোমার মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে আছে। শরীরটাও দেখছি ভালো নেই। যাও শুয়ে পড়োগে. তোমার বিশ্রাম দরকার।

বুড়ো কী যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ বললে,—এ্যাই, দ্যাখ্ আলিওশা! তোকে খুব ভালোবাসি কি না? আইভান যদি ঐ কথা বলত, রেগে আগুন হয়ে উঠতাম তার ওপর, কিন্তু তোর কথায় আমার একটুও রাগ হোলো না। আমার মতো বদ্‌মেজাজী লোক আর দুটি নেই, কেবল তুই কাছে থাকলেই আমার মনটা ঠান্ডা থাকে।

না, না, তুমি বদ্‌মেজাজী কে বললে? মৃদু হেসে উত্তর দিল আলিওশা.—তবে কিনা মেজাজটা এখন তোমার খুব খারাপ হয়ে আছে।

শোন্ তবে বলি। আজ সকালে ভেবেছিলাম ঐ গুন্ডা মিটিয়াটাকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করব। তুইই বল্, আজকাল হয়তো অনেক ফ্যাশন বদলেছে,—তবু যে লোক ছেলে হয়ে বাপের বাড়িতে ঢুকে বুড়ো বাপকে চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে ফেলে মুখে লাথি মারে আর সর্বসমক্ষে খুন করবে বলে ভয় দেখায়, তার নামে নালিশ করা উচিত কি না? আইভান আমায় বারণ করল, নইলে আজই আমি ব্যাটাচ্ছেলেকে গারদে পুরতাম, বাছাধনকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতাম।

যাক্, মত বদলেছে তাহলে!

আলিওশার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—তা বদলেছি, তবে

আইভানের কথায় নয়। নিজেই ভেবে দেখলাম, কাজটা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা কি জানিস, গ্রুশেংকা যদি খবর পায় যে আমি ব্যাটাকে কাটকে পুরেছি অমনি ব্যাটার জন্যে তার দরদ উথলে উঠবে, দেখা করবার জন্যে জেলে ছুটবে। অন্যদিকে এ খবর যদি পায় যে, আমার মতো বুড়ো-হাবড়া শান্তশিষ্ট গো-বেচারা বাপকে সে ধরে পিটিয়েছে তাহলে তার দরদটা হবে আমার ওপর, হয়তো ব্যাটাকে ভুলে আমার কাছেই আসবে সে। বল্ ঠিক কি না? দাঁড়া, একটু ব্র্যান্ডি আনি। টানবি নাকি ঠাণ্ডা কফির সঙ্গে এক ফোঁটা?

না, তবে আমি বরং তোমার এই কেকগুলিটি একটা নিই, পরে খাব।

কেকের টুকরোটা জোব্বার পকেটে পুরে আলিওশা বললে,—তোমার পক্ষেও এখন ব্র্যান্ডি খাওয়াটা ভালো নয়।

ঠিক বলেছিস্। ব্র্যান্ডি খেলে আমার মেজাজটা ঠাণ্ডা হয় না, উল্টে আরো গরম হয়ে ওঠে। তবে বেশি খাব না, একটি গেলাস মাত্র। এক গেলাস খেলে কী আর হবে?

আলমারি থেকে বোতল বার করে গেলাস ভর্তি করে ফিয়োডোর ব্র্যান্ডি পান করল, বোতলটা আবার সাবধানে আলমারিতে রাখল।

আলিওশা হেসে বললে,—খেলে তো? দেখো, এইবার তোমার মেজাজটা বেশ খুশী-খুশী লাগবে।

হে-হে, কী যে তুই বলিস! তুই কাছে থাকলে সব সময় আমি খুশ-মেজাজে থাকি—মদ খাই আর না খাই! শুধু তোকে আমি ভালোবাসি, আর কাউকে না। বুঝলি, আসলে লোকটা আমি ভালো—তবে হ্যাঁ, যে বদমাস, তার কাছে আমিও বদমাস। এই ধর্ আইভান। এতো করে ওকে বলছি চারমাশনিয়া যেতে, কিন্তু সে কিছুতেই নড়বে না এখান থেকে। কেন জানিস? নজর রাখছে আমার ওপর। গ্রুশেংকা যদি আসে, যদি তাকে আমি কিছু দিয়ে দিই! আইভানটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। একটা পয়সা আমি ওকে দিয়ে যাব না। আর ঐ মিটিয়া,—কালো গুবরে পোকাকে যেমন করে মারে, তেমনি করে ওটাকে আমি পায়ের তলায় টিপে মারব। হ্যাঁ শোন্, তোকে কাল আসতে বলেছিলাম কেন জানিস্? তুই একবার মিটিয়াকে জিজ্ঞেস করতে পারবি, আমি যদি তাকে হাজার খানেক কি ধর্ হাজার দুই রুবল দিই, তাহলে সে গ্রুশেংকাকে ছেড়ে এখান থেকে সরে পড়তে রাজী আছে কিনা?

বেশ, আমি আজই জিজ্ঞাসা করব, সঙ্গে সঙ্গে আলিওশা বললে,—আমার তো মনে হয় যদি তাকে হাজার তিনেক তুমি দাও…

থাক, থাক, তোকে আর দালালী করতে হবে না। মত বদলেছি। পোকার মতো যাকে পিষে মারব, তাকে আবার টাকা দিতে যাব কোন্ দুঃখে! সব টাকা আমার নিজের কাজেই লাগবে। কাল তুই তো গিয়েছিলি ওর বাগ্‌দত্তা ঐ কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার বাড়ি; তাই না? মেয়েটাকে ছোঁড়া খুব সন্তর্পণে আমার নজরের আড়ালে রেখেছে। সে মেয়েটা কী বলে? মিটিয়াকে বিয়ে করবে, না করবে না?

কাটেরিনা কিছুতেই ডিমিট্রিকে ত্যাগ করবে না।

অ্যাই! দেখলি? ভদ্রঘরের মেয়েরা কী রকম মনপ্রাণ দিয়ে এই সব বদির শয়তানদের ভালোবাসে। হবে কিনা এসব বনেদী ঘরের মেয়ে,—চিমসে চেহারা, ফ্যাকাশে গাল,—কিছু না এরা! আমি চাই বাবা ঠাসা মাল! আজ যদি আমার বয়েস থাকত, তাহলে দেখাতাম কাপ্তেনী কাকে বলে! হ্যাঁ, আজও দেখাব ঐ বুড়ো কাপ্তেন মিটিয়া ছোঁড়া গ্রুশেংকাকে কী করে বাগায়! পিষে মারব ওকে।

গ্রুশেংকার কথা বলতেই মেজাজটা দারুণ খাপ্পা হয়ে উঠল ফিয়োডোরের! কর্কশ গলায় আলিওশাকে বললে,—যা এবার তুই, তোর এখানে আর কোনো দরকার নেই।

আলিওশা উঠে দাঁড়াল। বিদায়ের জন্যে বাবার কাঁধে চুম্বন করল।

চমকে উঠল বুড়ো! বললে,—অ্যাই, এটা আবার কী হোলো? আরে, তুইও কোথাও যাচ্ছিসনে, আমিও কোথাও যাচ্ছিনে। আমাদের আর দেখা হবে না নাকি?

আলিওশা বললে,—না, না, সে কথা আমার মনে হয়নি।

হ্যাঁ বাবা, ও রকম মনে কোরো না, আমিও মনে করতে চাইনে। একটু নরম হয়ে বললে ফিয়োডোর,—এখন যাচ্ছিস যা, কালই কিন্তু আসবি। ঠিক তো, কথা দিয়ে যা। কাল তোর জন্যে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

আলিওশা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োডোর আবার আলমারি থেকে বোতল বার করে আধ গ্লাস মদ ঢালল। চুমুক শেষ করে মনে মনে বললে,—না, আজ এই, আর খাব না এখন।

আলমারিটা ভালো করে চাবি বন্ধ করে চাবিটা পকেটে পুরে সে শোবার ঘরে গেল। টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, ঘুমিয়ে পড়তে এক মিনিটও দেরি হোলো না।

তিন

আলিওশা যাত্রা করল মাদাম হোলাকভের বাড়ির উদ্দেশ্যে। মনে মনে সে বললে,—ভাগ্যিস বাবা আমাকে গ্রুশেংকা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করেনি, তাহলে হয়তো তার সঙ্গে আমার কালকের সাক্ষাতের খবর আবার বলতে হোতো।

বাবার সঙ্গে দেখা করে আলিওশার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে দেখল, কালকের ঘটনার পর তার বাবার মেজাজ মোটেই শান্ত হয়নি, বরং আরো রুক্ষ হয়েছে ডিমিট্রির বিরুদ্ধে। ডিমিট্রির ক্ষতি করতে সে বদ্ধপরিকর। ডিমিট্রিও নিশ্চয়ই বসে নেই। সে-ই বা বাপের বিরুদ্ধে কোন্ নিষ্ঠুর মতলব আঁটছে কে বলতে পারে? আলিওশা ভাবতে ভাবতে চলল, আজ যখনই হোক, যেমন করেই হোক, ডিমিট্রির সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

পথের একটা ঘটনায় ভাবনায় ছেদ পড়ল। পার্ক ছাড়িয়ে বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে চলেছিল মিহাইলোভস্কি স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে। রাস্তার মোড়েই একটি সরু খাল,

তার ওপর পাকা সাঁকো, সাঁকোর ওপর একদল স্কুলের ছেলে—বয়স কারো নয় থেকে বারো বছরের বেশি নয়। স্কুল থেকে তারা ফিরছে, অনেকেরই কাঁধে ঝোলানো চামড়ার স্কুল-ব্যাগ। উত্তেজিতভাবে সবাই কী যেন আলোচনা করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আলিওশার অত্যন্ত প্রিয়,—সে এগিয়ে গেল তাদের সঙ্গে কথা বলতে। কাছে গিয়ে দেখল, প্রত্যেকটা বাচ্চার লাল টকটকে উত্তেজিত মুখ, প্রত্যেকের হাতে ঢিল। সাঁকোর ওধারে প্রায় ত্রিশ পা দূরে আর-একটি ছেলে দাঁড়িয়ে, তারও বয়স দশের বেশি নয়, তারও কাঁধে স্কুল-ব্যাগ। রোগা চেহারা, ফুরফুরে চুল, কালো চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। দলের অন্য ছেলেদের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে,—ক্রুদ্ধ সন্তর্পিত চোখে তাদের সে দেখছে।

দলের কাছে এগিয়ে গেল আলিওশা। কালো জ্যাকেট-পরা কোঁকড়া চুল একটি ছেলেকে বললে,—ব্যাগটা ডান কাঁধ দিয়ে ঝুলিয়েছ কেন খোকা? তাতে ডান হাতটা আড়ষ্ট হয়ে থাকে যে? বাঁ কাঁধে ঝোলাতে হয়!

এমনি কাজের কথা বলে আলাপ শুরু করলে ছোটদের সঙ্গে ভাব জমাতে বড়োদের দেরি হয় না।

বছর বারো বয়সের খুব স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—ও যে ল্যাটা, বাঁ হাতই যে ওর চলে!

আলিওশার দিকে নজর পড়ল সব কটি ছেলের। তৃতীয় একটি ছেলে বললে,—বাঃ, ও ঢিল পর্যন্ত বাঁ হাতে ছোঁড়ে!

ঠিক এই মুহূর্তেই খালের ও-পার থেকে একটা ঢিল সাঁ করে ছুটে এল, কারো গায়ে অবশ্য লাগল না, ল্যাটা ছেলেটির কাঁধ ঘেঁষে সবেগে চলে গেল।

লাগা, লাগা, তুইও লাগা স্মারভ!

স্মারভের একমুহূর্ত দেরি হোলো না প্রতিশোধ নিতে। তার ঢিলটাও অবশ্য লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারল না। ও-পারের একলা ছেলেটির পকেট-ভর্তি ঢিল। এবার সে ছুঁড়ল, ঢিলটা সজোরে এসে লাগল আলিওশার কাঁধে।

আঃ! লেগেছে তো? ছেলেরা চিৎকার করে উঠল,—ও ঠিক আপনাকে টিপ করেই মেরেছে! আপনি কারামাজভ কি না! নে, নে, লাগা সবাই একসঙ্গে!

সারা দল একসঙ্গে ঢিল ছুঁড়তে লাগল ঐ একলা ছেলেটার দিকে। একদিকে মাত্র একজন, ছ-সাতজন অন্যদিকে। দলের ঢিল খেয়ে কিন্তু কাবু হবার পাত্র একলা ছেলেটা নয়। একটা ঢিল সোজা তার বুকে গিয়ে লাগল। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। কিন্তু আবার খাড়া হয়ে শুরু করল লড়াই।

ছুটে মাঝখানে এগিয়ে এল আলিওশা!

অ্যাঁ! করছ কী তোমরা? একজনের পেছনে ছ-জনে লেগেছ? লজ্জা করছে না? মেরে ফেলবে যে ছেলেটাকে!

ছেলেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আলিওশা তাদের উদ্যত আক্রমণ আটকাল।

লাল শার্ট পরা একটা বাচ্চা রাগতস্বরে বললে,—ইঃ! আমরা বুঝি ··ওই তো

আগে ফেলেছিল। ও আবার ছেলে নাকি? একটা জানোয়ার! জানেন, সেদিন ক্লাসে ক্লাসফ্রেন্ডিনের গায়ে পেন্সিল-কাটা ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল!

দেখলেন, দেখলেন, আর-একটি ছেলে বলে উঠল,—ঢিলটা লাগল তো আপনার? আপনাকেই টিপ করে মারছে এবার! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি! লাগাও, লাগাও আবার সব!

ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট ছুটল আবার। সেই আক্রমণের সামনে একলা ছেলেটা দাঁড়াতে পারল না। কয়েকটা আঘাত সহ্য করার পর মিহাইলোভ্স্কি স্ট্রীট ধরে পিছু হটল।

পালাচ্ছে, বোকারাম পালাচ্ছে এবার!

দলের সবচেয়ে বড়ো ছেলেটি আলিওশাকে বললে,—কী শয়তান ও, আপনি জানেন না। ওকে খুন করলে আমার রাগ যায়! ওই দেখুন, আবার দাঁড়িয়েছে। আপনার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আপনি তো ঐ রাস্তাতেই যাচ্ছেন, তাই না? ধরুন গিয়ে ওকে!

না, না, অমন কর্মটি করবেন না, আর-একটি ছেলে হেঁকে উঠল,—পেলে আপনারও গায়ে ছুরি বসাবে, সাবধান!

আচ্ছা যাও তোমরা, আমিই ধরছি ওকে। আলিওশা পুল পার হয়ে এগোল।

ছেলেটা খাড়া দাঁড়িয়েছিল। একটুও নড়ল না আলিওশাকে কাছে আসতে দেখে। বয়সে বছর নয়েক হবে। বেঁটে রোগা চেহারা, রক্তহীন শীর্ণ মুখ,—বড়ো বড়ো কালো দুটি চোখে ঘৃণার আগুন। গায়ে পুরোনো একটা ওভারকোট, মাপের চাইতে দু-সাইজ ছোট। প্যান্টের হাঁটুতে মস্ত তালি, জুতোর ডান-পাটিটা হাঁ-করা। কোটের দুটো পকেটই বড়ো বড়ো ঢিলের ভারে ঝুলে পড়েছে। আলিওশা ছেলেটার ঠিক দু-পা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটা চোখ নামাল না, রিনরিনে গলায় উদ্ধত মেজাজে বললে,—আমি একা আর ওরা ছ-জন। তবু ওদের সবাইকে আমি ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

আলিওশা বললে,—কিন্তু বুকে যে ইঁটটা এসে লেগেছিল? খুব ব্যথা পেয়েছ, না?

ছাই! আমিও তো স্মারভের মাথায় একটা লাগিয়েছি!

আলিওশা কথা ঘুরিয়ে বললে,—ওরা বলছিল, তুমি নাকি আমাকে চেনো, তাই ইচ্ছে করে আমাকেই মারছিলে। কথাটা সত্যি?

মুখ গোঁজ করে রইল ছেলেটা. তাকাতে লাগল তিক্ত চোখে।

আলিওশা আবার শুধোলে,—সত্যিই তুমি আমাকে চেনো নাকি? আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছিনে।

বিদ্বেষে জ্বলজ্বল করে উঠল ছেলেটার চোখ দুটো। এক-পা নড়ল না, শুধু বললে,—জ্বালাবেন না আমাকে, সরে পড়ুন।

বেশ, চলে যাচ্ছি আমি। তোমার বন্ধুরা হয়তো জ্বালায়। আমি তোমাকে চিনিইনে তা আবার জ্বালাব কি?

আলিওশা চলল। কয়েক পা যেতেই শুনল, ছেলেটা চিৎকার করে বলছে,—ইঃ, সিল্কের জামা-পরা সাঁসিসি! সঙ্গে সঙ্গে একটা ইঁট এসে লাগল আলিওশার পিঠে। পিছন ফিরে সে দাঁড়াল।

ওঃ, তুমি পেছন থেকে লোককে মারো! তোমার বন্ধুরা তোমার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছে দেখছি।

সাঁ করে আর-একটা ইঁট ছুটে এল। ঝাঁ করে মাথাটা সরিয়ে না নিলে ইঁটটা আলিওশার ঠিক মুখে এসে লাগত। মুখের বদলে সজোরে হাতের কনুইএ এসে লাগল ইঁটটা।

চিৎকার করে উঠল আলিওশা,—উঃ, লজ্জা করে না তোমার? শুধু শুধু আমাকে মারছ কেন? আমি তোমার কী করেছি?

রুখে দাঁড়াল ছেলেটা। মুখে তার কথা নেই। ভাবল সে, এইবার আলিওশা নিশ্চয়ই তাকে উল্টে মারবে। আলিওশা কিন্তু হাত তুলল না, তাতে ছেলেটা একেবারে ক্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল আলিওশার ওপর। তার বাঁ হাতটা চেপে ধরে মোক্ষম জোরে একটা আঙুল কামড়ে ধরল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল আলিওশা, প্রাণপণ শক্তিতে ছেলেটার চোয়ালের ফাঁক থেকে টেনে ছাড়িয়ে আনল আঙুলটা। ঠিক নখের তলায় মাংস কেটে একেবারে হাড় পর্যন্ত বসেছে কামড়টা। রক্ত ঝরতে লাগল ঝরঝর করে। তাড়াতাড়ি পকেটের রুমালটা নিয়ে আলিওশা আঙুলটায় শক্ত করে জড়াল। মিনিটখানেক লাগল আঙুলটা বাঁধতে। সমস্তক্ষণ নীরবে দেখতে লাগল ছেলেটা। তারপর শান্ত চোখ তুলে আলিওশা বললে,—দেখলে তো খোকা! কী ভীষণ আমাকে কামড়েছ, কী দারুণ আমার লেগেছে! আমি কিন্তু তোমার কিছু করিনি। তবু তুমি আমাকে কেন এমনিভাবে মারলে বলো তো?

এবারও কোনো উত্তর দিল না ছেলেটা। হঠাৎ একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। দু-হাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দৌড় লাগাল তারপরেই। আলিওশা তার পিছু পিছু আস্তে হাঁটা শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে তার চোখে পড়তে লাগল—ছেলেটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, একবারও পিছু ফিরে তাকাচ্ছে না, তেমনি কাঁদছে নিশ্চয়ই। কেন এমন ব্যবহার করল ছেলেটা? সত্যি সে তাকে চেনে নাকি? এ এক প্রহেলিকা। এ প্রহেলিকার সমাধানের চেষ্টা করবার এখন সময় নেই।

চার

মাদাম হোলাকভের বাড়ি পৌঁছতে দেরি হোলো না আলিওশার। ভারি সুদৃশ্য দোতলা বাড়িটি, আগাগোড়া পাথর দিয়ে তৈরি,—এমন চমৎকার বাড়ি এ শহরে খুব কমই আছে। এ বাড়িটি মাদাম হোলাকভ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। এই অঞ্চলেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো জমিদারি। অন্যত্রও তাঁর জমিদারি আছে। সে সব অঞ্চলে খু

মস্কো শহরে তিনি অধিকাংশ সময় থাকেন। এ বাড়িতে তিনি খুব সম্প্রতিই বসবাস করছেন। আলিওশার আগমনের খবর পেয়েই তিনি অভ্যর্থনা করবার জন্যে হল-ঘরে ছুটে এলেন।

আগ্রহভরে তিনি শুধোলেন,—আমার চিঠি পেয়েছিলে, প্রভুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা যাতে লিখেছিলাম?

হ্যাঁ পেয়েছি।

সবাইকে দেখিয়েছ তো? কী আশ্চর্য ক্ষমতা! হারানো সন্তান তাঁর কামনায় মা'র কাছে ফিরে এল!

রুদ্ধকণ্ঠে আলিওশা বললে,—প্রভুর আর সময় নেই। সম্ভবত আজই তিনি দেহ রাখবেন!

শুনেছি। সারা শহরে তো এই নিয়ে উত্তেজনা। তাঁকে শেষ দেখা দেখব সে উপায় তো নেই। তোমার মতো কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে সারাটা মন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। ভালো কথা, কাটেরিনা আইভানোভ্না এখানে, জানো?

তাই নাকি? ভালোই হোলো। কাল সে আমাকে বলেছিল, আজ নিশ্চয়ই যেন তার সঙ্গে দেখা করি। এখানেই তাহলে দেখা হবে।

আমি জানি, মাদাম হোলাকভ বললেন,—গতকাল যা ঘটেছিল সবই আমি শুনেছি, ঐ সাংঘাতিক মেয়েমানুষটার জঘন্য ব্যবহারের কথা জানতে আমার বাকি নেই। কাটেরিনার মতো মেয়ে বলে তাই, আমি হলে কী যে করতাম তা বলতে পারিনে। আর তোমার ভাই ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ—ছি ছি! সেই বা কেমন মানুষ? এই নাও, বলতে ভুলে গেছি। তোমার ভাই, মানে, আর এক ভাই, আইভান ফিয়োডোরোভিচ, সেও এখানে এসেছে—কাটেরিনার সঙ্গে গভীর আলোচনা করছে। ঐ দুজন—কাটেরিনা আর আইভান—ওদের দুজনের মনে কী সাংঘাতিক ঝড় যে উঠেছে তা যদি বুঝতে! কী যে সর্বনাশা যন্ত্রণা ওদের দুজনকে একসঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটছে! নিজে হাতে নিজের নিজের ভাগ্যকে ওরা ছিনিমিনি খেলছে, চলেছে রসাতলে,—কেন যে, তার কোনো কারণ নেই। নিজেরা বোঝে, অথচ স্বীকার করতে চায় না। আমি চুপ করে দেখি। সহ্য করতে পারিনে, অথচ বলতেও পারিনে কিছু। তোমাকে সব বলব। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! আমার লিজার কী হয়েছে বলো তো? তুমি এসেছ যেই শুনল, অমনি যেন পাগল হয়ে উঠল,—মেয়ে মূর্ছা যায় আর কি?

দরজার ফাঁক দিয়ে লিজার আদুরে গলা ভেসে এল,—বাজে কথা বোলো না মা, আমি পাগল হব কেন? পাগলের মতো কথা বলছ তুমি?

লিজার গলা শুনে মনে হোলো, অনেক কষ্টে সে হাসি চাপছে। আলিওশা দরজার ফাঁকটার দিকে তাকাল, কিন্তু লিজাকে দেখতে পেল না।

থাম্ বাছা থাম্, তোর যন্ত্রণাতে সত্যি এবার আমি পাগল হব, বললেন মাদাম হোলাকভ,—জানো বাবা আলেক্সিস, কাল সারারাত লিজার শরীরটা এতো খারাপ

গেছে বলবার নয়। এক-গা জ্বর, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ভোর না হতেই আমি ডাক্তার আনলাম। ডাক্তার তো দেখে-শুনে কিছুই বুঝতে পারল না, কোন্ কালেই বা পারে ? সারাদিন বেশ ছিল, যেই খবর পেল তুমি এসেছ, অমনি মেয়ের চিৎকার—বিছানায় থাকবে না, চেয়ারে বসিয়ে এ ঘরে তাকে নিয়ে আসতেই হবে।

মিথ্যে কথা বোলো না মা। উনি এসেছেন তা আমি জানতামই না। আমি এমনি এ ঘরে আসতে চাইছিলাম।

তাই বটে। আমি কিছু জানিনে ? ইউলিয়াকে তুই বলে রাখিসনি ? আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ আসতেই সে তোকে দৌড়ে খবর দিল না ?

ইঃ, মা ! ভারি বুদ্ধিমতী তুমি। আচ্ছা, সত্যি সত্যি একটু বুদ্ধির কাজ করবে ? তাহলে বোকা বলো তোমার ঐ অতিথিকে—কালকের ঘটনার পরও যিনি আজ আবার আমাদের বাড়ি এসেছেন, আর সবাই তাঁকে দেখে হাসছে।

লিজা, চুপ কর। বড়ো বাড় বেড়েছে, ধমক না খেলে তোর চলছে না, না ? কে হাসছে ? আমি বরং আলেক্সি আসায় কৃতার্থ হয়েছি। আমি ওকে আমার নিজের দরকারে আসতে বলেছি। উঃ, জানো বাবা আলেক্সি, আমার দুঃখের আর শেষ নেই।

কী হোলো মা-মণি ? এতো মন খারাপ করলে কেন তুমি ?

তোমার জন্যে। তোমার মেজাজ, তোমার ছেলেমানুষি, তোমার অসুখ। তার ওপর দিনরাত ডাক্তার-বদ্যি। কী নয় ? এমন কি আজ সকালের ঐ অলৌকিক ব্যাপার—তা জেনে কোথায় প্রাণটা জুড়োবে, তা নয়। এর ওপর বাবা, বসবার ঘরে গিয়ে দ্যাখো, কী দুঃখের নাটকের অভিনয় চলেছে ! সত্যি বলছি বাবা, এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না, আর পারিনে আমি। প্রভু জোসিমা আর একটি দিনও কি বাঁচবেন না ! কাল কি তাঁর দেখা পাব না ? হা ভগবান্ ! চোখ বুঝলেই আমি সব অন্ধকার দেখি। মনে হয়, সব ফাঁকি !

মাদাম হোলাকভের উচ্ছ্বাসে হঠাৎ বাধা দিয়ে আলিওশা বললে,—এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় আমাকে দয়া করে দিতে পারেন ? আঙুলটা বাঁধব,—জোর কেটে গেছে, ব্যথা করছে।

কামড়-খাওয়া আঙুলটা বার করল আলিওশা। রক্তে ভেসে গেছে রুমালটা। মাদাম হোলাকভ চোখ বুজে আর্তনাদ করে উঠলেন,—ইস্, কী হয়েছে দ্যাখো আঙুলটার ? কী ভীষণ রক্ত !

আলিওশার কাটা-আঙুল চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল লিজা।

অ্যা ! কী সর্বনাশ ! আর আপনি কিনা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন এতোক্ষণ,—একবারও বলেননি ? আসুন, আসুন, শিগ্গির সামনে আসুন।

আঙুলের গভীর ক্ষতটা দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল লিজার,—মা, যাও যাও, চট্ করে ঠাণ্ডা জল আর সাবান নিয়ে এসো, দেরি কোরো না।

মাদাম হোলাকভ ফুকরে উঠলেন,—ডাক্তারকে একবার খবর দিলে হোতো না ?

ডাক্তার ? না, না, সত্যি তুমি আমাকে জ্বালালে ! তোমার ডাক্তার এসে কী ছাই করবে ? যা বলছি করো, জল নিয়ে এসো একপাত্র, না হয় ইউলিয়াকে বলো। নাঃ, ইউলিয়াটা আবার যেমনি কুঁড়ে !

এদের এতো ভয় দেখে আলিওশা নিজেই ভয় পেয়ে গেল। সে বললে,—না, এতো বিচলিত হবেন না আপনারা। বেশি এমন কিছু লাগেনি।

ইউলিয়া নাম্নী পরিচারিকাটি জলের পাত্র নিয়ে এল, আলিওশা জলের মধ্যে আঙুলটা ডুবিয়ে দিল।

ওমা, মাগো ! এবার তুমি নিজে যাও, একটু তুলো আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসো জলদি। আর ঐ মলমটা, ছাই-ছাই রঙের, কী যেন নাম ? তোমার ঘরের ডান দিকের দেরাজের মধ্যে আছে। নাঃ, আনো না এক্ষুনি, কথা শোনো না কেন আমার ?

যাচ্ছি, যাচ্ছি, অমন বকবক করে পাগল করিসনে আমায় ! দ্যাখ্ দিকিন্, আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচের কেমন সহ্য ! ইস্ ! সত্যি, কী করে এমন লাগল ?

মাদাম তাড়াতাড়ি গেলেন। এরই জন্যে লিজা অপেক্ষা করছিল। প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, প্রথমে বলো তো, এমন করে আঙুলটায় লাগালে কী করে ? তারপর খুব দরকারী একটা কথা আমিও তোমাকে বলব।

আলিওশাও বুঝল সময় বড়ো সংক্ষিপ্ত। সে যতো সংক্ষেপে সম্ভব ছেলেদের ঘটনাটা বর্ণনা করল।

শুনে লিজার রাগের অন্ত নেই। তার ধারণা, এরই মধ্যে আলিওশাকে ধমক দেবার অধিকার তার জন্মেছে। বললে,—তুমি কী বলো তো ? অমনি করে ইস্কুলের ছেলেদের মারামারির মধ্যে মিশতে আছে ? তাও আবার এই পোষাক পরে ? নাঃ, তুমিও দেখছি ওদেরই মতন ছেলেমানুষ ! যাই হোক, ঐ পাজী ছেলেটার খোঁজ নিয়ো। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। আচ্ছা, খুব ব্যথা করছে ? একটা কাজের কথা শুনতে পারবে ? কথা বলতে পারবে বুদ্ধিমানের মতো ?

নিশ্চয়ই পারব। ব্যথা আবার কোথায় ?

বেশ, ঠাণ্ডা জলে আঙুলটা ডুবিয়ে রেখেছ কিনা তাই বুঝতে পারছ না ! ইউলিয়া, যাও তো, একটু বরফ নিয়ে এসো, আর এক বাটী জল। যাক্, ইউলিয়াটাও গেছে, রুদ্ধকণ্ঠে লিজা বললে,—এইবার কাজের কথাটা বলি। আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি মা এসে যাবে, তার আগে আমার চিঠিটা আমাকে ফেরত দাও।

চিঠিটা তো আমার কাছে নেই।

মিথ্যে বলছ, নিশ্চয়ই আছে পকেটের মধ্যে। জানতাম তুমি অমনি বলবে ! আমি ঠাট্টা করে লিখেছিলাম, আর সারাটা রাত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। এক্ষুনি দিয়ে দাও আমার চিঠিটা।

সত্যি বলছি, চিঠিটা বাড়িতে রেখে এসেছি।

কী মুশকিল। কেন যে অমন ঠাট্টা করতে গেলাম! সত্যি নেই? তাহলে কথা দাও, আজই আমার হাতে দিয়ে যাবে।

আজ পারব না। কেননা, এখন আমি মঠে ফিরে যাব। তারপর কাল বা পরশু, ধরো তিন-চারদিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় পাব না। ফাদার জোসিমা—

চারদিন! কী যে বলো? আচ্ছা শোনো, আমার চিঠিটা পড়ে খুব হেসেছিলে তুমি?

না, একটুও তো হাসিনি।

বা রে! হাসোনি কেন?

তার কারণ, তুমি চিঠিতে যা লিখেছ সবই আমি বিশ্বাস করেছি।

তুমি কিন্তু আমাকে ভীষণ অপমান করেছ তা বলে দিচ্ছি।

মোটেই না। তোমার চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, এই তো স্বাভাবিক। প্রভু জোসিমা মারা যাবার পর আমিও মঠ ছাড়ব। চলে যাব এখান থেকে, শেষ করব পড়াশুনো। ততোদিনে তুমিও বড়ো হবে, আমিও বড়ো হব। তখন আমাদের দুজনের বিয়ে হবে। ভবিষ্যতের সব কথা অবশ্য ভালো করে ভেবে দেখতে পারিনি, তবে এটুকু ভেবে দেখেছি, তোমার মতো ভালো বউ কোথাও আর আমি পাব না। প্রভু তো বলেই দিয়েছেন, আমাকে বিয়ে করতে হবে, সংসারী হতে হবে।

লাল হয়ে উঠেছিল লিজার মুখ। সে হাসতে হাসতে বললে,—কিন্তু আমি যে হাঁটতেই পারিনে, চাকা-ওয়ালা চেয়ারে চেপে ঘুরে বেড়াই।

বেশ তো, আমিই তোমার চেয়ার ঠেলে বেড়াব। তাছাড়া ততোদিনে তুমি একেবারে সেরে উঠবে।

আলিওশার শান্ত গলার এমন স্থির প্রস্তাব শুনে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল লিজা। বললে,—নাঃ, নিতান্ত পাগল তুমি। আমি একটু ঠাট্টা করলাম, আর তাই নিয়ে তুমি কিনা এতো সব ভেবে ফেললে। এই যে মা এসে গেছে! মা, এতো দেরি করলে কেন? ইউলিয়া, বরফ কই?

আবার চ্যাচাতে শুরু করলি লিজা? আর সব সহ্য হয়, তোর এই চিৎকার সহ্য হয় না বাপু। কি করে তাড়াতাড়ি আসব? জুলো, ব্যাণ্ডেজ তুই অন্য জায়গায় রেখেছিলি, না! আমি খুঁজে খুঁজে মরি, কোথাও পাইনে! তুই নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে অমন জায়গায় রেখেছিলি!

বেশ বলেছ মা, ভারি মজার কথা বলেছ। আমি ঠিক বুঝেছিলাম যে আজ ভদ্রলোক কাটা আঙুল নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উদয় হবেন। আমি হাত গুণতে পারি কিনা! নাও, আর দেরি কোরো না। মলমটা ভালো করে লাগিয়ে দাও দিকি! লিজার খুশীর হাসি ঝরণার মতো শোনাল,—আঙুলটা কী করে কাটল জানো মা? ভদ্রলোক রাস্তায় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করছিলেন, তাতে একটি ছেলে কামড় বসিয়েছে আঙুলে! কচি খোকা একেবারে! আবার খোকার আবদার ধরেছেন বিয়ে করবেন! ইস্, ভাবতেও হাসি পায়!

বিয়ে করবে ? কে ? আলিওশা ? বিয়ের কথাটা আবার উঠল কী করে ? যে ছেলেটা কামড়াল সে পাগল ছিল না তো ?

তার মানে ?

পাগলা কুকুর থাকে, আর পাগলা ছেলে থাকতে পারে না। পাগলা কুকুরে যদি কামড়াত, তাহলে তো ও নিজেই পাগল হয়ে যেত। বাঃ, সুন্দর ব্যাণ্ডেজটা বেঁধেছিস্ তো। হ্যাঁ বাবা আলেক্সি, ব্যথাটা একটু কম লাগছে কি ?

একটুও লাগছে না আর।

দেখুন আবার, জল দেখে ভয় করছে না তো ?

থাম্ তুই ! আমার একটা কথায় সুযোগ নিয়েই আবার ছেলেটাকে জ্বালাতে শুরু করলি। হ্যাঁ বাবা আলেক্সি, কার্টেরিনা আইভানোভ্না শুনেছে তুমি এসেছ, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল সে।

আঃ ! মা, তুমি একলা যাও ওদের কাছে। আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ এখন যাবেন না। ও'র হাতে বড়ো ব্যথা।

আলিওশা তাড়াতাড়ি বললে,—না, না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এখন।

তার মানে ? আপনি যাচ্ছেন নাকি ? লিজা শুধোল।

ওদের সঙ্গে দেখা করে আবার এখানে ফিরে আসব, যতোক্ষণ খুশী গল্প করব, কেমন ? কার্টেরিনা আইভানোভ্নার সঙ্গে এখানে দেখা হচ্ছে খুব ভালো। আজই আমাকে মঠে ফিরে যেতে হবে কিনা।

বুঝেছি, যান। নিয়ে যাও মা ও'কে। আর ফিরে আসতে হবে না আমার কাছে। বেশ হোলো, কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, এখন আমি ঘুমুব।

জানি তুই ঠাট্টা করে বলছিস, মাদাম হোলাকভ বললেন,—কিন্তু সত্যি যদি তুই একটু ঘুমুতিস।

মৃদুস্বরে আলেক্সি বললে,—রাগ করলে নাকি ? আমি তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি—বড়ো জোর পাঁচ মিনিট। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—

পাঁচ মিনিট ! চাইনে, চাইনে আমি। মা, এখুনি তুমি ও'কে নিয়ে যাও।

তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে লিজা। চলো আলেক্সি, আমার খেয়ালী মেয়ের কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা। নার্ভাস মেয়ে, কিসে যে কখন চটে ওঠে তার কোনো ঠিক নেই। বলছে, তোমাকে দেখার পর এতোক্ষণে ঘুম এসেছে। সত্যিই যদি খানিকটা ঘুমোয় সব চেয়ে ভালো হয়।

লিজাকে চুম্বন করে আলেক্সিকে নিয়ে মাদাম হোলাকভ এগোলেন। ভাঙা গলায় চুপিচুপি বললেন,—আমি কিছু আগে থেকে বলতে চাইনে। তুমি নিজে চোখে দেখেই বুঝবে, কী এক সর্বনাশা তামাশার অভিনয় হচ্ছে। কার্টেরিনা আসলে ভালোবাসে তোমার ভাই আইভানকে, আর নিজের মনকে আপ্রাণ বোঝাতে চায়, সে ভালোবাসে তোমার বড়ো ভাই ডিমিট্রিকে। এ এক মর্মান্তিক ব্যাপার ! চলো, ওরা যদি আপত্তি না করে তাহলে আমিও শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গেই থাকব।

পাঁচ

কথাবার্তা অবশ্য শেষ হয়েই গিয়েছিল। কার্টেরিনার মুখ উত্তেজিত হলেও তাতে দৃঢ় সংকল্পের আভাস। মাদাম হোলাকভের সঙ্গে বসবার ঘরে ঢুকে আলিওশা দেখল, বিদায় নেবার জন্যে আইভান উঠে দাঁড়িয়েছে,—তার মুখ নীরক্ত পাণ্ডুর। তীক্ষ্ণ চোখে আলিওশা তার মুখের দিকে তাকাল—সেই মুখের ভাবে এক মুহূর্তে সে তার সমস্যার উত্তর কি পাবে,—যে সমস্যা গত মাসখানেক ধরে তার মনকে পীড়িত করছে? এই এক মাসের মধ্যে কয়েকবারই তার কানে এসেছে যে আইভান কার্টেরিনা আইভানোভ্‌নাকে ভালোবাসে,—এমন কি তাকে ডিমিট্রির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিছুদিন পর্যন্ত আলিওশার মনে হয়েছে, এ অসম্ভব। তবু দুই দাদাকেই সে ভালোবাসে—তাই দুজনের মধ্যে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনে সে মনে মনে দুশ্চিন্তা করেছে প্রচুর। এদিকে গতকাল ডিমিট্রি নিজেই বলেছে যে আইভান তার প্রতিদ্বন্দ্বী—এতে শুধু সে খুশীই নয়, এতে তার সুবিধাও যথেষ্ট। সুবিধা কিসের? গ্রুশেংকাকে বিয়ে করার? এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগে আলিওশার। তাছাড়া অন্তত গতকাল পর্যন্ত তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কার্টেরিনা একান্তভাবে ভালোবাসে ডিমিট্রিকেই,—লোকচক্ষে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে সে ভালোবাসা, কিন্তু তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। ডিমিট্রি ছাড়া আর কোনো পুরুষকে ভালোবাসা কার্টেরিনার পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু মাদাম হোলাকভের কথা শুনে আজ সে চমকে উঠেছে। মাদামের কথার মধ্যে কোনো আবছায়া নেই। তিনি যা বললেন তার সুস্পষ্ট অর্থ যে আইভানকেই ভালোবাসে কার্টেরিনা,—ডিমিট্রির প্রতি একটা বিকৃত কৃতজ্ঞতাবোধকে সে জোর করে ভালোবাসার বেদীতে বসিয়েছে তাই যাকে সে মনে করছে ভালোবাসা তা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা আর আত্মনিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাই যদি সত্যি, তাহলে আইভানের অবস্থা কী? কার্টেরিনা এমনি প্রকৃতির মেয়ে প্রেমাস্পদকে জয় না করলে যার আশ মেটে না। আলিওশার তা বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু প্রেমাস্পদর কাছে আত্মসমর্পণ করে ডিমিট্রি তবু হয়তো সুখী হতে পারে, আইভানের পক্ষে তা অসম্ভব। আইভানের প্রকৃতিতে যে স্বাধীনতা আছে, তা যদি ব্যাহত হয়, তাহলে প্রকৃত আনন্দ কখনো সে পেতে পারে না। চিন্তা-বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে আলিওশা মাদাম হোলাকভের বসবার ঘরে পা দিল। চকিতে একবার তার মনে হোলো, এমনি যদি হয় যে ডিমিট্রি বা আইভান, কাউকেই কার্টেরিনা সত্যি সত্যি না ভালোবাসে?

গত এক মাস ধরে নিজের মনের এইসব চিন্তায় মনে মনে লজ্জাই পেয়েছে আলিওশা, কিন্তু তাই বলে চিন্তাকে এড়াতে পারেনি। কতোবার নিজের মনে বলেছে, দূর ছাই, মেয়ে-পুরুষের ভালোবাসার আমি জানিই বা কী, বুঝিই বা কী?

কিসেরই বা আমার মাথাব্যথা। কিন্তু মাথাব্যথার অবসান হয়নি তাতে। ভাইএ ভাইএ এই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে দুজনের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তা সে ঠিকই উপলব্ধি করেছে।

বাবা আর ভির্মিট্রির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে আইভান বলেছিল কিনা—এক সাপ আর-এক সাপকে খাবে। আইভানের ধারণা তাহলে এই যে ডির্মিট্রি একটা সাপ। কবে থেকে এ ধারণা জন্মাল তার? কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে? কথাটা নিতান্ত অসাবধানে আইভানের মুখ থেকে বার হয়েছিল, কিন্তু তাইতেই কথাটার গুরুত্ব। সত্যিই যদি অমনি ধারণা আইভানের, তাহলে আর শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? ঘৃণার নূতন দ্বার তো খুলে গেছেই। এ অবস্থায় আলিওশা কী করবে? দুই ভাইএর মধ্যে কোন্ ভাইএর পক্ষ সে নেবে, কার প্রতি থাকবে তার সহানুভূতি? দুই ভাইকেই সে সমান ভালোবাসে,—তাছাড়া মুখ বুজে হাত গুটিয়ে মনে মনে ভালোবাসতে সে পারে না। ভালোবাসা মানেই উপকার করা, সেবা করা, কাজে লাগা, এই সে বোঝে,—সেই জন্যে তার ভালোবাসার পাত্র সম্বন্ধে আর নিজের সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া তার দরকার। দুই ভাইএর উভয়ের জন্যেই কীসে মঙ্গলকর. তাই যদি সে না বুঝতে পারে, তাহলে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেই বা সে নিঃসংশয় হবে কেমন করে? এ পর্যন্ত সবই তার কাছে প্রহেলিকা রয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, দুঃখ-বেদনার ঘন মেঘ ঘনতর হয়ে উঠছে শুধু।

বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল আইভান। আলেক্‌সিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে কাটেরিনা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে,—না, না, যেয়ো না, আর এক মিনিট বোসো। যাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি. তার মত আমি তোমার সামনে শুনতে চাই।

মাদাম হোলাকভকে কাটেরিনা বললে,—না, আপনিও যাবেন না, বসুন। আলিওশাকে কাটেরিনা বসাল তার পাশে। বিপরীত দিকে আইভানের পাশে বসলেন মাদাম হোলাকভ।

যারা আমাকে ঘিরে বসে আছে এখন, বিহ্বল কণ্ঠে কাটেরিনা শুরু করল, তারা আমার পরম বন্ধু. তাদের মতো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেউ নেই।

আলিওশা বুঝল. চক্ষু শুষ্ক হলেও কাটেরিনার বুকের মধ্যে অশ্রুধারা ঝরছে, তাই এমন বেদনাসিক্ত মধুরতা তার কণ্ঠে। আলিওশার নিজেরও প্রাণ করুণ হয়ে উঠল এক মুহূর্তে।

কাটেরিনা বলতে লাগল,—আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, কাল তুমি আমার ওখানে গিয়েছিলে, সেখানকার সেই কুৎসিত দৃশ্য তুমি ভোলোনি,—আমি কী ব্যবহার করেছিলাম. তাও তোমার মনে আছে। তুমি দ্যাখোনি আইভান ফিয়োডোরোভিচ, —আলেক্‌সি ছিল, ও দেখেছে। ও কী ভেবেছিল তা আমি জানিনে, কিন্তু কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজ যদি হয়, তাহলে কাল যে ব্যবহার আমি করেছিলাম, ঠিক সেই ব্যবহার আজও আমি করব। কালকের ঐ ব্যাপার আমার মন থেকে কিছুতে

মুছতে পারছিনে। তোমার বাবা ঐ ভিখিরী—মুছতেও পারছিনে ওকে আর আমি ভালোবাসি কি না? করুণা হয় শুধু লোকটার ওপর—এই করুণা তো ভালোবাসার চিহ্ন নয়! ভালো যদি বাসতাম, তাহলে কালকের ঘটনার পর ওর ওপর আমার ঘৃণা হোতো, দয়া নয়।

কেঁপে উঠল কাটেরিনার কণ্ঠ, আঁখিপল্লবে চিকচিক করছে অশ্রুবিন্দু। আলিওশা স্তব্ধ হয়ে মাথা নিচু করে রইল, মাদাম হোলাকভ অস্ফুটস্বরে বললেন—সত্যি কথা, সত্যি কথা।

দাঁড়ান। কাল রাত্রে অনেক ভেবে চিন্তে আমার জীবনের লক্ষ্য আমি স্থির করেছি, সে কথা এখনো আপনাদের বলিনি। লোকে ভাববে এ এক কঠোর ব্রত আমি নিয়েছি, হ্যাঁ সত্যি, এ ব্রতই—কিন্তু এই ব্রতপালন থেকে কিছুতেই আমি ভ্রষ্ট হব না। এ ব্রত আমার সারা জীবনের। আইভান ফিয়োডোরোভিচ আমার উপদেষ্টা, আমার পরম বন্ধু,—ওকে আমার এই সিদ্ধান্তের কথা বলেছি, ও সমর্থন করেছে।

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আইভান বললে,—হ্যাঁ, আমি সমর্থন করেছি।

কিন্তু আমি চাই আলিওশা,—তোমাকে আলিওশা বলে ডাকছি বলে কিছু মনে কোরো না ভাই আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, আমি চাই যে তুমিও শোনো। আলিওশার ঠাণ্ডা হাতটি কাটেরিনা তার তপ্ত হাতের মধ্যে টেনে নিল,—তুমিও বিচার করে বলো, আমি যা করতে চাই তা ঠিক কি না। তুমি যদি সমর্থন করো, তাহলে আমার বেদনার ব্রত সার্থক হবে, আমার দুঃখের ফাঁক শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে।

কী তোমার ব্রত তা আমি জানিনে, রুদ্ধকণ্ঠে আলিওশা বললে,—তবে তোমাকে আমি নিজের চেয়েও ভালোবাসি। প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও, তুমি শান্তি পাও!

আমি অনেক ভেবে দেখেছি আলিওশা, এই প্রেমের ক্ষেত্রেও যা সবচেয়ে মহৎ তা হচ্ছে আত্মসম্ভ্রম আর কর্তব্যবোধ। এই কর্তব্যবোধের ব্রত আমাকে আহ্বান করছে—সে আহ্বানকে শত চেষ্টা করেও আমি এড়াতে পারিনে। আমি স্থির করেছি, ও যদি ঐ ঘৃণিত প্রাণীটাকে বিয়ে করে, তবু আমি ওকে পরিত্যাগ করে যাব না। ঐ মেয়েমানুষটাকে সারা জীবনে কিছুতে ক্ষমা করতে পারব না, এ তুমি জেনে রেখো।

কেমন এক বিশীর্ণ প্রেতকণ্ঠে অসুস্থ উচ্ছ্বাসভরে কাটেরিনা বলতে লাগল,—এ নয় যে আমি ওর সামনে যাব, ওর অনুগ্রহ ভিক্ষা করব। একটি দিনের জন্যেও তা আমি করব না। তবু ঐ দূরে থেকেই আমি সারা জীবন ওর ওপর লক্ষ্য রাখব। একদিন আসবেই যেদিন ও ক্লান্ত হবে,—অমন স্ত্রীলোকের দুঃসহ সঙ্গ কতোদিন আর সহ্য হবে? সেদিন ও ফিরে আসবে ক্ষত-বিক্ষত প্রাণ নিয়ে—ফিরে আসবে সে আমারই কাছে,—যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে ওরই কল্যাণের কামনায়। সেদিন আমার জয় হবে। সেদিন ও একান্ত আর অকুণ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করবে আমার কাছে। আমার আর ওর মাঝখানে কোনো আবরণ সেদিন আর থাকবে না। যাক্ ও আজ ওর মায়াবিনীর কাছে, থাকুক আমাকে ছেড়ে যতোদিন খুশী। ও দেখুক, আমার বুকে ও

তাহলেও আমার অঙ্গীকার আমি ভাঙিনি, জীবনের প্রতিটি প্রহর আমি উৎসর্গ করেছি ওরই সুখের জন্যে। আমি মানুষ নই, নারীও নই, আমি শুধু ওর মঙ্গলবিধানের নীরব যন্ত্র মাত্র। এই আমার ব্রত, এই হোক আমার সারা জীবনের সাধনা। এই সাধনার কথা আমি আইভান ফিয়োডোরোভিচকে বলেছি। সে আমাকে পূর্ণ সমর্থন করেছে।

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল কাটেরিনার, নিশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। কিন্তু তার মুখের ভাবে প্রশান্তির সঙ্গে বিদ্বেষের স্পর্শ! আলিওশা বুঝল, গতকালকার অপমানের গ্লানি তার মন থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কষ্ট হোলো আলিওশার, মন আকুল হোলো সহানুভূতিতে।

এতোক্ষণে ভালো করে কথা বললে আইভান। বললে,—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাকে সমর্থন করেছি বললে কম বলা হবে, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের মনে যা বিশ্বাস করেছি তাই প্রকাশ করছি। অন্য কোনো মেয়ে যদি এমনি প্রতিজ্ঞা করত, তাহলে ভাবতাম, সে হয়তো ভান করছে, না হয় নিজেকে শুধু পীড়নই করছে। কিন্তু তোমার বেলায় তা নয়। অন্য কোনো মেয়ের বেলায় যে ব্যবহার হোতো নিতান্ত বেকোমি, তোমার বেলায় তা খাঁটি সত্য। তুমি কি যে-সে মেয়ে?

মাদাম হোলাকভ ভেবেছিলেন চুপ করেই থাকবেন, কিন্তু আর সামলাতে পারলেন না। থামো থামো, বলে উঠলেন তিনি,—তিলকে তাল করছে মেয়েটা। কী না কী হয়েছে কাল, খুব দুঃখ লেগেছে, খুব অপমান হয়েছে, তাই নিয়ে কিনা সারা জীবনের প্রতিজ্ঞা।

আইভান কথার মধ্যে বাধা পেয়ে ক্ষুন্ন হয়েছিল কিছুটা। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল, ঠিকই তো, সাধারণ লোকে একে তিলকে তালই বলবে। ভাববে, কালকের সামান্য একটা ঘটনা নিয়েই এতো কাণ্ড। সহজভাবে দেখতে গেলে ঠিকই, কিন্তু কাটেরিনা তো সহজ মেয়ে নয়! কালকের ঐ এক মুহূর্তের ব্যাপার কাটেরিনার জীবনে একটা মহামুহূর্ত! কাটেরিনা যা প্রতিজ্ঞা করেছে, অন্য মেয়ের পক্ষে তা হোতো নিতান্ত কথার কথা, কিন্তু কাটেরিনার পক্ষে তা হচ্ছে সারা জীবনের দুর্বিসহ গুরুভার ব্রত। জীবনের সব কিছু যাক,—এই ব্রতপালনের গৌরবই কাটেরিনার পরম ধন। আমি তোমাকে বলছি কাটেরিনা আইভানোভ্না, আজ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার কাটবে এই দুঃসহ ব্রতপালনের বেদনায়, এই চরম আত্মবলিদানের গর্বসুখে। কষ্ট হবে বইকি, কিন্তু ক্রমে কষ্টবোধ আর থাকবে না, নীরব আত্মদানের অহঙ্কার কষ্টকেই আনন্দে রূপান্তরিত করবে। জীবন-জোড়া হতাশা, তাই নিয়েই তো অহঙ্কার। জয় হোক তোমার অহঙ্কারের, সেই জয়ের গৌরবে আর সব কিছু তুমি ভুলে যাও!

যতো বড়ো কথাই আইভান বলুক তার কথার পিছনে তিক্ততা ছিল প্রচুর। নিরুপায় সে, এই গোপন তিক্ততাকে সে এড়াতে পারছিল না।

মাদাম হোলাকভ আবার বলে উঠলেন,—কী ভুল, কী ভুল করছে মেয়েটা।

কাটেরিনার দু-চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। আলিওশার ডান হাত চেপে ধরে সে বললে,—তুমি বলো আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, তোমার মত আমি জানতে চাই।

আলিওশা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অশ্রু সংবরণ করার বৃথা চেষ্টা করে কাটেরিনা আবার বললে,—কাঁদছি আমি? এ কান্না কিছু না। তুমি আর তোমার ভাই আইভান, আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু তোমরা,—তোমরা আমার দুপাশে থাকতে আমার দুঃখ কিসের? ভয়ই বা কী? আমি জানি তোমরা কখনো আমাকে পরিত্যাগ করবে না।

হঠাৎ আইভান বললে,—খুবই দুঃখের কথা অবশ্য যে কালই আমাকে মস্কো যেতে হচ্ছে। আরো দুঃখের কথা যে যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা যে দীর্ঘকাল সেখানে আমাকে থাকতে হবে, বহুদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

কালই? মস্কোতে! হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে ম্লানতর হয়ে গেল কাটেরিনার মুখ, কিন্তু পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আলিওশা কাটেরিনার দিকে তাকিয়েছিল, সে দেখল, হঠাৎ আশ্চর্য পরিবর্তন! চিহ্নমাত্র নেই অশ্রুরেখার আর অবমাননার। চকিতে কী এক চরিতার্থতার গোপন আনন্দে মুখ-চোখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কাটেরিনার।

খুব সাবধানী আর সামাজিক মিষ্টি হাসি হেসে কাটেরিনা বললে,—মস্কো যাচ্ছ এ তো ভাগ্যের কথা! অবশ্য তোমার মতো বন্ধুকে সত্যিই বহুদিনের জন্যে হারাব, এ দুঃখ আমার কম নয়। তবু আইভান ফিয়োডোরোভিচ, আইভানের হাতটি নিজের দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বলে চলল,—মস্কো গেলে আমার মাসিমা আর আগাফিয়ার সঙ্গে নিশ্চয় তোমার দেখা হবে—তাই না? আমার এই অবস্থার কথা সব তুমি তাদের খুলে বলবে, একটুও গোপন করবে না, মনে থাকবে তো? আজই আমি ভাবছিলাম তাদের চিঠি লিখব, কিন্তু কী করে লিখি? এ যে ভয়ানক চিঠি, চিঠি লিখে সব কথা কি বোঝানো যায়? যাক্, এ খুব ভালো হোলো, মস্ত লাভ হোলো আমার। তুমি মুখে ওদের বুঝিয়ে বললে আমার চিঠির কথা বুঝতে ওদের অসুবিধে হবে না। যাই, এখুনি গিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলি।

কয়েক পা এগিয়েছে কাটেরিনা, এমন সময় বাধা পড়ল মাদাম হোলাকভের কথায়। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—কী হোলো! আলিওশার মত শোনবার জন্যে তুমি যে পাগল হয়েছিলে? না শুনেই যে উঠে যাচ্ছ বড়ো!

থমকে দাঁড়াল কাটেরিনা। বললে,—নিশ্চয়ই, শুনব বইকি। ওর মতের কতো দাম যে আমি দিই আপনি তার কী জানেন? হঠাৎ এতো চটেই বা উঠলেন কেন আমার ওপর? বলো আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, তোমার কী মত তা জানবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে আছি?

কাটেরিনার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল আলিওশা। তার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বার হয়ে এল,—আশ্চর্য! এ যে বিশ্বাসই করতে পারিনি!

তার কাতর স্বরে চমকে উঠল কার্টেরিনাও,—কী আশ্চর্য! কী বিশ্বাস করতে পারোনি তুমি?

বলব? শুনতে চাও তুমি? বেশ! আইভান তোমাকে ছেড়ে মস্কো চলে যাচ্ছে, যাকে তুমি তোমার পরম বন্ধু বলো সে চলে যাচ্ছে তোমাকে ছেড়ে, আর তাতে আসলে তোমার মনে মনে খুশীর শেষ নেই। বুঝেছি, গোড়া থেকে তুমি শুধু অভিনয় করছিলে। আশ্চর্য অভিনয় তুমি করতে পারো, ঠিক ঐ থিয়েটারে যেমন করে!

টকটকে লাল হয়ে উঠল কার্টেরিনা।

থিয়েটার? আমি অভিনয় করছি! কী বলছ তুমি?

একবার তুমি বলছ বন্ধুকে হারিয়ে তুমি দুঃখ পাবে, আবার তুমি বলছ যে আইভানের চলে যাওয়াটা ভাগ্যের কথা। ও চলে গেলে তুমি যেন বাঁচো!

কী তুমি বলছ? কিছুই বুঝতে পারছিনে!

বিভ্রান্তভাবে আলিওশা বলে চলল,—আমিও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ এক লহমায় আমার চোখে সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, কখনো তুমি ডিমিট্রিকে ভালোবাসোনি। ডিমিট্রিও হয়তো তোমাকে শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা তোমার জন্যে ওর নেই। এসব কথা কোন্ সাহসে আমি বলছি জানিনে, কিন্তু কেউ যদি সত্যি কথা না বলে তা হলে মিথ্যেই কি থাকা হবে?

কী সত্যি? কী মিথ্যে? উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল কার্টেরিনা।

বলছি, বলছি, বুঝিয়ে বলছি এখুনি, আলিওশার গলায় পরম ব্যস্ততা,—ডাকো ডিমিট্রিকে। না, তোমরা বোসো, আমি তাকে ধরে আনছি। সে আসুক, তোমার আর আইভানের হাত সে নিজে হাতে এক করে দিক। কেননা কার্টেরিনা, আসলে তুমি ভালোবাসো আইভানকে। এই ভালোবাসা দিয়ে তাকে তিলে তিলে তুমি দগ্ধ করছ, আর নিজেকেও তুমি দগ্ধ করছ ডিমিট্রিকে ভালোবাসার মিথ্যা মোহে!

স্তব্ধ হোলো আলিওশা।

তুমি তুমি বোকা সাধুসি কোথাকার! ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কার্টেরিনা আইভানোভ্না। সারা মুখ তার রক্তশূন্য হয়ে গেছে, রাগে ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে।

একটা কঠোর হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল আইভান, টুপিটা তুলে নিল হাতে। বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই তার মুখে, তিক্ততার কণামাত্র আভাস নেই তার গলার স্বরে। স্বচ্ছ তার দৃষ্টি। স্পষ্ট শান্ত গলায় সে বললে,—লক্ষ্মী ভাই আলিওশা, তুমি ভুল করেছ এখানে। কার্টেরিনা কোনোদিনই আমাকে ভালোবাসেনি। আমি মুখে কোনোদিন ওর কাছে প্রকাশ না করলেও, ওর প্রতি আমার কী মনোভাব তা প্রথম দিন থেকেই ও জানে, তাই বলে ও আমাকে একদিনও ভালোবেসেছে তা সত্যি নয়। ও আমাকে বন্ধু বলেও গ্রহণ করেনি একমুহূর্তের জন্যে—ওর মতো আত্মম্ভরি মেয়ের পক্ষে আমার বন্ধুত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু এতোদিন ও আমাকে ওর পাশে পাশে রেখেছে কেন জানো? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে। ডিমিট্রির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে

তার কাছ থেকে বারে বারে যতো হীন অপমানের আঘাত ও পেয়েছে, সেইসব আঘাত ও ফিরিয়ে ফিরিয়ে হেনেছে আমার ওপর। মনে নেই, প্রথম যেদিন ওর ডিমিট্রির সঙ্গে দেখা হয়? সেদিনকার অপমান এখনো ওর বুকে জ্বলছে! আর সেদিন থেকে অপমানের ওর শেষ নেই। আর আমার সঙ্গে যেদিন ওর প্রথম আলাপ সেদিন থেকে ও শুধু একটি কথাই আমাকে শুনিয়ে এসেছে, ও ডিমিট্রিকে কতো ভালোবাসে!

কিশোরসুলভ উত্তেজিত সারল্যে আইভান বলে যেতে লাগল,—আজ আমি বিদায় নেবার আগে বলে যাচ্ছি কাটেরিনা আইভানোভনা,—সত্যিই তুমি ডিমিট্রিকে ভালোবাসো। যতো সে তোমাকে অপমান করবে, ততো তোমার ভালোবাসা তীব্র হবে। যতো সে ডুববে, ততো গভীর হবে তোমার প্রেম। কিন্তু যে মুহূর্তে সে আবার মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই মুহূর্তে তোমার ভালোবাসা উবে যাবে কর্পূরের মতো। সে হীন, সে নীচ বিশ্বাসঘাতক, তবু তুমি তোমার অমূল্য জীবন বিলিয়ে দিচ্ছ তার জন্যে—এতেই তোমার তৃপ্তি, এই তোমার গর্ব। ডিমিট্রির জন্যে নিজেকে যতো ছোট করছ, ততোই বড়ো হচ্ছে তোমার আত্মশ্লাঘা। এই আত্মশ্লাঘাই তোমার অপমানিত প্রেমের রূপান্তর। আমার বয়েস অল্প, প্রথম যৌবনের সব শক্তি দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। কিন্তু আর নয়। ভালোবেসে তুমি শহীদ হতে চাও.—আমি সাধারণ মানুষ, ভালোবাসার মানে বুঝি বাসনা কামনার সফলতা—শহীদের পাশে আর আমি থাকতে রাজী নই। আর কিছু বলার নেই। বিদায় কাটেরিনা! তুমি রাগ কোরো না আমার ওপর। মনে রেখো, তোমার চেয়ে একশো গুণ বেশি শাস্তি তোমাকে ভালোবেসে আমি পেয়েছি। সে শাস্তি নিজে হাতে তুমি আমাকে দিয়েছ! না, না, সরাও তোমার হাত, আমার হাত না রাখলাম তোমার হাতে, দিনে দিনে যে অত্যাচার স্বেচ্ছায় তুমি আমার ওপর করেছ তা ভুলবার সময় আমাকে দাও,—সে ক্ষতের যন্ত্রণা সহজে জুড়বে না।

কথা শেষ করেই সোজা ঘর থেকে বার হয়ে গেল আইভান, গৃহকর্ত্রী মাদাম হোলাকভের কাছে বিদায়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে।

আইভান! ফিরে এসো আইভান! যেয়ো না! চিৎকার করে উঠল আলিওশা, —না, আর ফিরে ও আসবে না, কিছুতে না। আমারই অন্যায়! আমি কেন ওসব কথা বলতে গেলাম? ভুল বলে গেল, মিথ্যে কথা বলে গেল আইভান। ফিরে ওকে আসতেই হবে!

হঠাৎ এক দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল কাটেরিনা।

মাদাম হোলাকভের মুখ খুশীতে ভরে উঠেছিল। তিনি নিচু গলায় বললেন,—তুমি কোনো ক্ষতি করোনি আলিওশা! উচিত ব্যবহার তুমি করেছ। কিছু ভেবো না, আইভানকে আমি ঠিক ফিরিয়ে আনব।

তাঁর মুখের উৎফুল্ল ভাব দেখে আলিওশা আরো বিব্রত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আবার প্রবেশ করল কাটেরিনা। তার হাতে একগুচ্ছ নোট।

কিছুই যেন ঘটেনি এমনি শান্ত সংযত গলায় সে আলিওশাকে বললে,—আমার

একটা বিশেষ উপকার তোমাকে করতে হবে আলেক্সিস কিরোভোরোভিচ। তুমি জানো কিনা জানিনে, সপ্তাহখানেক আগে ডিমিট্রি কিরোভোরোভিচ খুব একটা অন্যায় কাজ করে। এখানে একটা নোংরা মদের দোকান আছে, সেখানে ডিমিট্রির এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি মাঝে মাঝে তোমাদের বাবার ব্যবসায় দু-একটা কাজ করে দেন। ভদ্রলোক আগে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। কী কারণে ডিমিট্রি তাঁর ওপর চটে উঠে তাঁকে আক্রমণ করে, তাঁর দাড়ি ধরে দোকান থেকে তাঁকে রাস্তায় হিড়হিড় করে টেনে বার করে আনে। তাঁর ছোট ছেলেটি সেখানে ছিল, সে বাপের পিছনে পিছনে দৌড়ে আসে, সবাইকে অনুরোধ করে বাপকে বাঁচাবার জন্যে। কেউ তার কথায় কান দেয় না, বরং হিহি করে হাসে। একবিন্দু আত্মসংযম ডিমিট্রির নেই, চণ্ডাল তার রাগ,—এই রাগের মাথায় হেন অন্যায় নেই যা সে করতে পারে না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ভদ্রলোক অতি গরীব, নাম স্নেগিরিয়ভ। মিলিটারি থেকে চাকরি গেছে, একটি পয়সা আর নেই, বাড়িতে অসুস্থ ছেলেপুলে,—স্ত্রীটি নাকি পাগল। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম কি, আমার অনুরোধ তুমি একবার ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করো, যে কোনো অছিলা করেই হোক, ভদ্রলোককে এই দু-শো রুবল দিয়ে এসো। ভদ্রলোক শাসিয়েছেন, ডিমিট্রির বিরুদ্ধে তিনি নালিশ করবেন। ডিমিট্রির অপরাধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপই হোক, আর যাই হোক, এ টাকা কটা তাঁর হাতে তোমায় তুলে দিয়ে আসা চাই-ই চাই। লেক স্ট্রীটে ভদ্রলোক থাকে কাল্‌মিনস্ত বলে একটি স্ত্রীলোকের বাড়িতে। নাও, টাকাটা ধরো, এক্ষুনি আমার কাজটা করবে তো। আচ্ছা, তাহলে বিদায়!

এত আচম্বিতে কাটেরিনা অন্তর্হিত হোলো যে আলিওশা কিছুই করতে পারল না। সে ভেবেছিল, ক্ষমা চাইবে সে কাটেরিনার কাছে, নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করবে, কয়েকটা কথা অন্তত বলবে, কিন্তু সে অবসর কাটেরিনা তাকে দিল কই?

মাদাম হোলাকভ তাকে হাত ধরে হল-ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন,—মেয়েটা সমানে যুদ্ধ করছে নিজের মনের সঙ্গে, তাই অতো কষ্ট! কিন্তু কী দয়া, কী মমতা দেখেছ! বেচারীকে কতো ভালোবাসি যে তা বলার নয়। তোমাকে বলতে বাধা নেই আলেক্সিস, ওর মাসিরা আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কতো যে কামনা করছি ঐ বাউণ্ডুলে ডিমিট্রিটার মোহ কাটিয়ে ও যেন তোমার আইভান ভাইকে বিয়ে করে। তাহলে সত্যিই জীবনে সুখী হবে মেয়েটা। আইভান যে ওকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। দেখো, এ আমি ঘটাবই। সেইজন্যেই তো আমি এখান থেকে যাচ্ছিনে।

আলিওশা বললে,—কতো কাঁদল দেখলেন? সত্যিই ওর দুঃখের শেষ নেই।

রাখো, রাখো! কাঁদুক, বুক ফেটে কাঁদুক! এ সব ক্ষেত্রে আমি মোটেই মেয়েদের দলে নই, আমি ছেলেদের দলে।

তাই নাকি! দরজার ফাঁক দিয়ে লিজা বলে উঠল,—ঐ বলে তুমি কিন্তু লক্ষ্মী ছেলেটির মাথা খাচ্ছ, এ আমি বলে দিলাম।

অনুশোচনার আবেগে আলিওশা বললে,—না, না, তা নয়। আমিই বরং ওকে যা নয় তাই বলে কাঁদিয়েছি।

মোটেই না। কিন্তু অন্যায় কথা তুমি বলোনি। সোনার চাঁদের মতো তুমি ব্যবহার করেছ, এ কথা আমি একশোবার বলব।

লিজার গলা আবার শোনা গেল,—তোমার সোনার চাঁদ ও ঘরে কী বলেছিল মা?

লিজার কথা যেন আলিওশার কানেই যায়নি। সে আপন মনে বললে,—আমারও হঠাৎ মনে হোলো, ও আইভানকে সত্যিই ভালোবাসে, ডিমিট্রিকে নয়। তাই আমি বোকার মতো কথা বললাম!

নেপথ্য থেকে ভেসে এল আবার লিজার আদুরে গলার চিৎকার,—কী বললেন? কাকে বললেন? কই, আমার কথার কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন!

পরিচারিকাটি এই মুহূর্তে ছুটে এল। বললে,—কাটেরিনা আইভানোভ্না কেমন যেন করছেন! খুব কাঁদছেন, মনে হচ্ছে, এক্ষুনি মূর্ছা যাবেন।

এ আবার কী হোলো মা? লিজার গলার উদ্বেগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল,—এবার আমিও মূর্ছা যাব যে!

থাম্ তুই! এমন সময়ে আর জ্বালাসনে বাছা! বড়োদের সব কথা তোর না জানলে বুঝি চলে না? ভালোই হয়েছে বাবা আলেক্সি, কান্না আর মূর্ছা যাওয়া, এ সব সুলক্ষণ, বুঝলে! আর তোমার ভাইটিকেও দেখলে! আমি ভেবেছিলাম, কতো না গম্ভীর পণ্ডিত মানুষ! কিন্তু বিদায় নেবার সময় কী রকম ছেলেমানুষি! বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে! তুমি বাবা যাও, চটপট কাটেরিনার কাজটা সেরেই আবার এখানেই চলে এসো, কেমন? মা লিজা, ওকে এখন আটকাসনে, এক্ষুনি ও আবার তোর কাছে ফিরে আসবে।

দ্রুতপায়ে চলে গেলেন মাদাম হোলাকভ। আলিওশার ইচ্ছা হোলো, মাঝের দরজাটি খুলে লিজাকে একবার চোখে দেখে সে বিদায় নেয়।

আদুরে মেয়ে বললে,—খবরদার! দরজা খুলতে পারবে না। যা বলবে ওখান থেকেই বলো। ও হ্যাঁ, সোনার চাঁদের মতো কী কথা তখন বলেছিলে বলো তো?

মস্ত বোকামির কথা বলেছিলাম লিজা!

তাই নাকি? তা বেশ। ওকি! বোকারাম, চললে? আমার সঙ্গে একটি কথা বললে না যে?

আজ বড়ো দুঃখ পেয়েছি লিজা। সে দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না। চলি এখন, ফিরে আসতে দেরি হবে না।

ছয়

কী করলাম আমি? গণ্ডমূর্খের কাজ! মঠে থাকি, ব্রতচারীর জীবনযাত্রা আমার, প্রেমের কী বুঝি? কষ্ট নিবারণ করার অভীপ্সা নিয়ে আরো কষ্ট কিনা বাড়ালাম!

ভালো মনে যা করতে গেলাম, নিজের বোকামিতে হোলো তার বিপরীত। এই জন্যেই কি কাদার জোসিমা তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে জোর করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন ?

ম্রিয়মাণ মনে ভাবতে ভাবতে চলল আলিওশা। কাটেরিনার অনুরোধ রক্ষা করতে তাকে যেতে হবে লেক স্ট্রীটে। ডিমিট্রিরও আস্তানা কাছাকাছি, লেক স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই। আলিওশা ভাবল, এই সুযোগে ডিমিট্রির সঙ্গেও সে দেখা করে নেবে, আগে ডিমিট্রির বাড়ি গিয়ে তারপর যাবে কাটেরিনা আইভানোভ্‌নার কাজে। সময় নেই, দেরি হয়ে যাচ্ছে,—ওদিকে প্রভু তাঁর শেষশয্যায় শুয়ে—মঠ ছেড়ে আসার পর সর্বদা এ কথাটা তার মনে বাজছে।

কাটেরিনার একটি কথা ভারি কৌতূহলোদ্দীপক লেগেছিল আলিওশার। ডিমিট্রির হাতে ঐ ক্যাপ্টেনের অপমানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাটেরিনা যখন বলেছিল লাঞ্ছিত পিতার পাশে পাশে কেঁদে বেড়ানো তার ছোট ছেলেটির কথা, তখনই তার মনে হয়েছিল, সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই ঐ স্কুল বালকটি, যার দাঁতের কামড় তার আঙুলে। ছেলেটির কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল আলিওশার। কিন্তু তাকে কামড়াল কেন ? তার ওপর রাগ কিসের ?

পকেটে ছিল বাবার টেবিল থেকে আনা কেকরুটিটা। সেটা চিবুতে চিবুতে আলিওশা চলল। ডিমিট্রির ওখানে পৌঁছতে দেরি হোলো না।

ডিমিট্রি বাড়ি নেই। বাড়িওয়ালা এক বুড়ো কাঠের মিস্ত্রী, সঙ্গে তার বুড়ী স্ত্রী আর এক ছেলে। তারা সন্দিগ্ধ চোখে আলিওশার দিকে তাকাল। বুড়ো বললে,—গত তিনদিন ধরে ডিমিট্রি বাড়ি ফিরছে না, হয়তো এখান থেকে চলেই গেছে। আলিওশা বুঝল, বুড়ো সত্য কথা বলছে না, শেখানো কথা বলছে। সে খুশী হোলো এই ভেবে যে বাড়িওয়ালা অন্তত ডিমিট্রির অনুগত বন্ধু।

লেক স্ট্রীটে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে ক্যাপ্টেনের বাড়িটার সন্ধান পেল। জীর্ণগৃহ, একধারে হেলে-পড়া, সামনের দিকে তিনটি ছোট ছোট জানলা,—সামনে কর্দমাক্ত উঠোন, সেখানে খুঁটিতে বাঁধা একটি গরু, উঠোন পার হয়েই একটি সরু দেউড়ি। বাঁ দিকের ঘরে থাকে বাড়ির মালিক, এক কালা বুড়ী আর তার মেয়ে, ডান দিকের ঘরে তাদের ভাড়াটে। দরজা ঠেলে ভাড়াটিয়া ঘরটিতে ঢুকতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল আলিওশা। এতো নিঃশব্দ কেন ? ভিতরে কেউ নেই না কি ? না, তার পায়ের শব্দ টের পেয়ে সবাই চুপ করে আছে ? আলিওশা দরজাটায় কয়েকটা টোকা মারল জোরে।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে ভিতর থেকে এল রুক্ষ আওয়াজ,—কে ? কী চাও ?

আলিওশা দরজাটা খুলল, চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ঠিক যেন চাষীর ঘর। ঘরটি বড়ো, কিন্তু সংসারের যাবতীয় জিনিষে ঠাসা। বাঁ দিকে মস্ত একটা উনুন, ঠিক তার ওপর দিকে সারা ঘর জুড়ে একটা দড়ি টাঙানো, তাতে ছেঁড়া কাপড়ের রাশ ঝুলছে। দুদিকের দুই দেয়াল ঘেঁষে দুটি চৌকি, তাতে মলিন বিছানা। একটি বিছানার ওপর থাক করে চারটি বালিশ সাজানো, অন্যটিতে বালিশ মাত্র একটি।

ঘরের এক কোণে দাঁড়িতে ঝোলানো একটি পর্দা, তার পিছনে একটি বেঞ্চ আর একটি চেয়ার সাজিয়ে তার ওপর আর-একটি বিছানা। শক্ত একটা কাঠের টেবিল মাঝের জানলাটির ধারে,—তার ওপর একটা কড়াইতে ভাজা ডিমের অবশিষ্টাংশ, আধ-খাওয়া একটি রুটি, আর ভোদ্‌কার নিঃশেষিত-প্রায় একটি বোতল। ঘরের তিনটি জানলাই বন্ধ, তাই ভিতরটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

বাঁ দিকের বিছানার ধারে চেয়ারে বসে আছে একটি ভদ্র চেহারার স্ত্রীলোক, পরনে সুতীর গাউন। তার হলুদ-পাণ্ডুর মুখ দেখলেই মনে হয় সে অসুস্থ। মেয়েটির চোখে কিন্তু কেমন একটা সপ্রশ্ন দাম্ভিকতার ভাব। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি অল্পবয়সী মেয়ে, মাথায় তার অল্প লালচে চুল, দীন পোষাক সযত্ন-পরিচ্ছন্ন। অন্য বিছানাটার আর-একটি নারীমূর্তি। কুঁজো পিঠ, পক্ষাঘাত-লাগা পা। সুন্দর দুটি চোখে ভাগ্যহীনা বিষাদিনীর দৃষ্টি। টেবিলের ধারে বসে ডিম-ভাজা খাচ্ছিল যে লোকটি, তার বেঁটেখাটো রোগা চেহারা, বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। মাথায় চুল লালচে রঙের, চিবুকের নিচে ছোট একটু লালচে ছাগলদাড়ি। আলিওশার মনে পড়ল, কোথায় সে ছাগলদাড়ি কথাটা শুনেছিল। সে বুঝল, দরজায় তার ঠকঠক শব্দের উত্তরে হাঁক দিয়েছিল এই লোকটাই।

কোণে দাঁড়ানো মেয়েটি তাকে দেখে সর্বপ্রথম বলে উঠল,—সাধু এসেছে ভিক্ষে নিতে। ভালো বাড়িতেই এসেছে, ভিক্ষে চাইবার আর জায়গা পেলে না!

লোকটি চকিতে তাকাল মেয়ের দিকে, চাপা গলায় বললে,—না ভারভারা, তোর কথা ভুল। দাঁড়া, আমি জিজ্ঞেস করে দেখি!

আলিওশা লোকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। কেমন একটা শঙ্ক অস্বস্তিকর চঞ্চলতা লোকটির চোখে-মুখে। এতোক্ষণ মদ খাচ্ছিল নিশ্চয়ই, তবে একেবারে মাতাল হয়নি। কেমন একটা একরোখা অথচ শঙ্কিত দৃষ্টি। অনেকদিন ধরে মাথা নিচু করে অনেক অপমান সহ্য করার পর হঠাৎ যদি কেউ বেঁকে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি। মারতে চাইছে, অথচ হাত উঠছে না ভয়ে। তার গলার স্বরে আর উচ্চারণের ভঙ্গীতে কখনো বিদ্রুপ, কখনো বা চাটুভাষী দীনতা। গায়ে একটা বহু তালি-মারা বিবর্ণ কোট, আর ফিকে রঙের চৌকুপি-কাটা পাতলা ছিটের পায়জামা। ইস্ত্রি নেই, কোট-প্যান্ট গায়ে চেপে বসেছে যেন। ক-পা এগিয়ে আলিওশার একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল লোকটা,—কী ব্যাপার! আমাদের এই চোরাকুটুরিতে কী উদ্দেশ্যে আগমন?

নোংরা লোকটা এতো মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল যে এক-পা পিছিয়ে যেতে হোলো আলিওশাকে।

আমার নাম আলেক্‌সি কারামাজভ —

তা বলতে হবে না, সে আমি জানি, খেঁকিয়ে উঠল গৃহকর্তা,—আমি হচ্ছি ক্যাপ্টেন স্নেগিরিয়ভ। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, হঠাৎ আমার এখানে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল কেন?

আলিওশা আমতা-আমতা করে বললে,—বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজনে যে আপনার কাছে এসেছি তা নয়, তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

বিলক্ষণ। তাহলে আসুন স্যার, অনুগ্রহ করে এই চেয়ারে উপবেশন করুন।

কাঠের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে পেতে তাতে আলিওশাকে বসাল লোকটি, তারপর আর-একটি চেয়ার টেনে মুখোমুখি আলিওশার হাঁটুতে প্রায় হাঁটু লাগিয়ে সে বসল।

তাহলে আমার পরিচয় দিই। নিকোলাই ইলিচ স্নেগিরিয়ভ—এই হচ্ছে স্যার আমার পুরো নাম। পদাতিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলাম, নিজের দোষে চাকরিটা খুইয়েছি। তবে হ্যাঁ, কাপ্তেন এখনো আমি আছি। বুঝলেন স্যার, দুঃসময়ে পড়েই এই স্যার বলাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

আলিওশা শুধোল,—এ কি আপনি ইচ্ছে করেই বলেন, না অজ্ঞাতসারে বলেন?

ইচ্ছে করে। বলেন কি স্যার? যখন ক্যাপ্টেন ছিলাম, তখন বাধ্য হয়েও কখনো কাউকে বলিনি, কিন্তু যেদিন থেকে ক্যাপ্টেনগিরি ঘুচে কাপ্তেনি শুরু হোলো, সেদিন থেকে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল। অভাবে স্বভাব নষ্ট, কেমন, ঠিক কিনা স্যার? যাই হোক, আমার পরিচয় তো দিলাম, এবার আপনি দয়া করে বলুন, আমার মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করার এই আশ্চর্য বাসনা আপনার কেন হল?

মৃদু কণ্ঠে আলিওশা বললে,—সেই ঘটনার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কটি কথা আমি বলতে চাই।

সেই ঘটনা! কোন্ ঘটনা? সরবে প্রশ্ন করল স্নেগিরিয়ভ।

আলিওশাকে স্পষ্ট করে বলতেই হোলো,—আমার ভাই ডিমিত্রি ফিয়োডোরোভিচের সঙ্গে আপনার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ব্যাপারে।

কার সঙ্গে স্যার? কোন্ সাক্ষাৎ বললেন? ও হো! আপনার ভাইএর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎ! হেঁ-হেঁ, তাই বলুন, সেই ছাগলদাড়ির ব্যাপার? তাই বলুন!

চেয়ারটাকে আরো কাছে টেনে আনল স্নেগিরিয়ভ। দুজনের হাঁটুর মাঝখানে একচুলও ফাঁক রইল না। নিজের ঠোঁট দুটিকে এমন জোরে চেপে ধরল যে সেখানে তীক্ষ্ণ একটি রেখা ছাড়া আর কিছু রইল না।

হঠাৎ পর্দার পিছন থেকে শিশুকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল,—ও লোকটা আমার নামে নালিশ করতে এসেছে বাবা। ওর আঙুলটা আমি জোরে কামড়ে দিয়েছি।

পর্দাটা সরে গেল। আলিওশা দেখল, বেঞ্চির ওপর ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে আছে সেই ছেলেটি। গায়ে একটা পুরোনো কোট, একটা শতচ্ছিন্ন লেপে কোমর পর্যন্ত ঢাকা। মুখ-চোখ লাল, ছলছল দৃষ্টি,—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। পর্দা সরিয়ে নির্ভীক উদ্ধত চোখে সে আলিওশার দিকে তাকাল।

অ্যাঁ! কামড়েছিস তুই? এই ভদ্রলোকের আঙুল! চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন,—সত্যি স্যার?

হ্যাঁ, আপনার ছেলে সাঁতা কথাই বলেছে। একটু আগে দেখি, রাস্তায় দু-সাতজন ছেলের সঙ্গে ইঁট ছুঁড়ে মারামারি করছে। আমি মারামারিটা বন্ধ করতে গেলাম। উল্টে আমাকেই ও ঢিল ছুঁড়ে মারল। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমাকে মারছ কেন? আমার ওপর রাগ কিসের? কোনো জবাব দিল না, বরং আমার হাতের আঙুলে জোরে একটা কামড় বসিয়ে দে দৌড়।

দাঁড়ান স্যার, ঠ্যাঙাচ্ছি আমি ওকে—এখনই, এই মুহূর্তে।

আরে থামুন! আমি কি বাচ্চাটার নামে নালিশ করছি নাকি? একে বেচারার দেখছি জ্বর। আপনি শুনতে চাইলেন তাই ঘটনাটা বললাম, এইমাত্র।

বটে! আর আপনি বুঝি ভেবেছিলেন সাঁতাই ওকে ঠ্যাঙাব? ঐ রোগা ছেলেটাকে বিছানা থেকে তুলে এনে আপনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে আপনার সামনে ওর পিঠের ছাল তুলব, তাই না? এই নিন ছুরিটা, কচকচ করে আমার এই ডান হাতের পাঁচটা আঙুল কেটে নিন, তাতে আপনার ক্ষোভ মিটবে? চরিতার্থ হবে আপনার প্রতিহিংসা!

লোকটা হঠাৎ যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

আলিওশা চেয়ারে বসেই রইল। দুঃখিত কণ্ঠে সে আস্তে আস্তে বললে,—বুঝেছি ব্যাপারটা এতোক্ষণে। আপনার ছেলেটি সাঁতাই বড়ো ভালো ছেলে। তার বাবাকে যে অপমান করেছে, আমি তারই ভাই—তাই আমার ওপর তার রাগ, তাই না? কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি বলতে এসেছি,—আমার ভাই ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচের অনুতাপের শেষ নেই। যেদিন বলেন, যেখানে বলেন, সর্বসমক্ষে সে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে।

বটে! আমার দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে টানবার পর এখন স্রেফ ক্ষমা চাইলেই ব্যাপারটা চুকে-বুকে গেল! অতোই সোজা?

না, শুধু তাই না,—আপনি যা চান তাই সে করবে।

আমি যদি বলি, ঐ শুঁড়ীখানায় গিয়ে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে?

তাই সে বসবে।

ওঃ! আর বলবেন না, বলবেন না স্যার! আপনার কথা আমার মর্মকে বিদ্ধ করল স্যার, দু-চোখ আমার জলে ভরে এল! আপনার ভাই-এর মহানুভবতার তুলনা হয় না! আসুন, আমার পরিবারের অন্য সকলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হোক। আজ যদি মরি, কে এদের দেখবে স্যার? আর বেঁচে যখন আছি তখন আমাকেই বা কে দেখে? কী বলুন? ঠিক বলিনি?

জানলার ধারে দাঁড়ানো মেয়েটি হঠাৎ গৃহকর্তার মুখের দিকে বিদ্বেষ-ভরা চোখে তাকাল। গলার স্বর ঝাঁজিয়ে উঠল তার,—থামো, থামো বাবা, আর ভাঁড়ামি কোরো না। কোথাকার কোন্ একটা গণ্ডমূর্খ বাড়িতে এসে ঢুকল, আর তুমি আমাদের সবাইকে লজ্জা দিতে শুরু করলে!

আরে চুপ কর্, অতো চটিস্নে। মেয়ের আমার মেজাজ দেখলেন স্যার? এর

নাম তারতারা, বড়ো উঁচু নজরের মেয়ে। হ্যাঁ, আর এই আমার স্ত্রী, আরিনা পেত্রোভ্‌না,—বেচারীর বয়েস মাত্র তেতাল্লিশ, কিন্তু হাঁটতে চলতে পারে না, একেবারে পঙ্গু।

হঠাৎ এক ঝটকায় আলিওশাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলল স্নেগিরিয়ভ,—এ কী! ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, তা বসে বসে? উঠে দাঁড়ান শিগ্‌গির? হ্যাঁ, এই তো ঠিক! ওগো শুনছ, ইনি হচ্ছেন কারামাজভ, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। না, না, আমার সঙ্গে যার সেই ইয়ে হয়েছিল, ইনি সে লোক নন, তার ছোট ভাই। ইনি মানুষ খুব ভালো। কই, তোমার ডান হাতটা, আস্তে আস্তে তোলো?

স্ত্রীর অশক্ত হাতের তালুতে স্নেগিরিয়ভ নিজেই প্রথমে সস্নেহে চুম্বন করল। জানলার ধারের মেয়েটির দৃষ্টি যতোই রোষকষায়িত হয়ে উঠুক না কেন, স্নেগিরিয়ভের স্ত্রী গলে গেল আলিওশার সশ্রদ্ধ নমস্কারে।

বললে,—বসুন, বসুন, চার্নোমাজভ ভাই!

চার্নোমাজভ নয়, কারামাজভ,—শুধরে দিল স্বামী।

কারামাজভ! ও বেশ, বেশ! কিন্তু লোকটার কাণ্ড দেখেছেন? আপনাকে টেনে তুলল একেবারে! না, বসুন, ভালো করে বসুন। আমায় বলে কিনা পঙ্গু! সব বাজে কথা। উঠতে হাঁটতে একটু কষ্ট হয়, এই যা। তবে কী জানেন, আগে তো কতো মোটা ছিলাম, এখন সারা শরীরটা শুকোচ্ছে, আর মোটা হচ্ছে পা দুটো।

ওর কথাবার্তা শুনে যেন কিছু মনে করবেন না, ভাঙা গলায় স্নেগিরিয়ভ আলিওশাকে বলল, নিচু ঘরের মেয়ে কিনা।

সকলেরই কানে গেল কথাটা। কুঁজো মেয়েটি এতোক্ষণ নীরব হয়ে বসেছিল এক কোণে। ফুঁপিয়ে উঠল সে,—বাবা, বাবা!

জানলার ধারে দাঁড়ানো দাম্ভিক মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে বলল,—বাবা! ভাঁড় কোথাকার!

ওগো, থাম্ তোরা! মেয়েদের থামিয়ে মহিলাটি আলিওশাকে বলতে লাগল,—এ সব কিছু না। বুঝলেন, আকাশ কখনো মেঘে ঢাকে, কখনো আবার পরিষ্কার হয়ে যায়! এই দেখুন না, কর্তা যখন সৈন্যবিভাগে ছিল তখন আমাদের কতো খাতির, দু-বেলা বাড়ি-ভর্তি কতো অতিথি। আর এখন কিনা চালাঘরে থাকি, দুটো পা পিপের মতো ফুলো, আর সবাই বলে আমার মুখে দুর্গন্ধ, আমার নিশ্বাসে বিষ!

দুঃখে দৈন্যে মহিলার মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল,—কেউ দেখতে পারে না আমাকে,—স্বামী না, মেয়েরা না,—এক ইলিউশা ছাড়া। কাল ইস্কুল থেকে ফিরে আমায় একটা আপেল খেতে দিয়েছিল। ওরে বাছা আমার, আমার মুখে তুইও কি পচা গন্ধ পাস?

অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল পাগলিনীর গাল বেয়ে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল দু-হাতে কুৎসিত মুখ ঢেকে।

ক্যাপ্টেন ছুটে গেল স্ত্রীর কাছে। তার হাতে চুমু খেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ছেঁড়া গামছায় চোখের জল মুছিয়ে আদর করে বলতে লাগল,—এই নাও, কে বলেছে তোমাকে কেউ দেখতে পারে না! আমরা সবাই তোমাকে কতো ভালোবাসি, কতো আদর করি,—করিনে? নাও, লক্ষ্মীটি, আর কাঁদে না, চুপ করো এবার।

আলিওশার দিকে তাকিয়ে সে বললে,—কী আপদ! দেখছেন তো, নিজে চোখে দেখছেন তো পাগলীর কাণ্ড!

দৃশ্য দেখে আলিওশারও চোখে জল এসে গিয়েছিল, সে কোনো উত্তর দেবার আগেই কোণের রোগশয্যায় উঠে বসে ছোট্ট ছেলেটা রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—বাবা, ফের! তার ওপর ঐ বাইরের লোকটার সামনে!

ঠিক বলেছিস্! যথার্থই তুই রাগ করেছিস্। চলুন আপনি, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। সে কথা এখানে নয়, ঘরের বাইরে গিয়ে,—যেখানে আর কেউ নেই, সেই নিভৃতে।

আলিওশার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে রাস্তায় নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন।

সাত

বাইরে কী সুন্দর হাওয়া দেখছেন? দম আটকে আসছিল ঘরের মধ্যে। আসুন, আসুন স্যার, একটু আস্তে আস্তে পায়চারি করি।

হ্যাঁ চলুন, আলিওশা বললে,—আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমারও। তবে কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করব, তা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

নিশ্চয়ই, কথা আছে বইকি। সত্যিই কি আমার ছেলেটার নামে নালিশ করতে আপনি এসেছেন? তবু ঘটনাটা বলি শুনুন, ঘরের মধ্যে ওদের সামনে যা বলতে পারিনি। আমার দাড়ি দেখে ছাগলদাড়ি বলে ঠাট্টা করে সবাই। এই দাড়ি ধরে টেনেছিল আপনার ভাই ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ। আমি কোনো অন্যায় করিনি তার কাছে, কিন্তু তখন সে রাগে আগুন, কাণ্ড-জ্ঞানহীন। আমার এই দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে সে আমাকে রাস্তায় একেবারে বাজারে টেনে আনল। ইস্কুল থেকে তখন ছেলেরা ফিরছিল, আমার ইলিউশাও ছিল তাদের মধ্যে। দৃশ্য দেখে সে ছুটে এল,—'বাবা বাবা' বলে জড়িয়ে ধরল আমাকে, ছাড়াতে চেষ্টা করল অত্যাচারীর হাত থেকে আমাকে। তারপর সে জড়িয়ে ধরল ডিমিট্রির হাত। সেই হাতে বারে বারে চুমু খেয়ে সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—'বাঁচান, ইনি আমার বাবা। মারবেন না, ছেড়ে দিন আমার বাবাকে।' আমার ঐ অবোধ শিশুটার সেই মুহূর্তের মুখের দৃশ্য আমার আজো মনে আছে, জীবনে আমি ও মুখ কখনো ভুলব না।

আবেগকম্পিত গলায় আলিওশা বললে,—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ক্যাপ্টেন, এমনি দুষ্কর্ম করে আমার ভাই সহজে পার পাবে না। আপনার কাছে মাথা হেঁট

করে সে ক্ষমা চাইবে। যদি চান তো ঐ বাজারের মাঝখানে গিয়েই সর্বসমক্ষে সে আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে। যদি সে তা না করে তাহলে সে আমার ভাই নয়!

ভালো কথা। কিন্তু এ আপনার মনের উদারতার পরিচায়ক,—তার মনের কথা নয়। তবে হ্যাঁ, আপনার ভাই সংকীর্ণমনা নয়, মহৎ ব্যক্তি! আমার দাড়িটা ছেড়ে দেবার পর সে কি বললে জানেন? বললে,—তুমিও একজন অফিসার, আমিও একজন অফিসার। অপমানের প্রতিশোধ চাও? তাহলে এক বন্ধু যোগাড় করে তাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ কোরো আমাকে তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ার জন্যে।' বলুন, কী চমৎকার খানদানী মেজাজ! কিন্তু এই মেজাজের সঙ্গে আমার মতো লোক তাল রাখবে কী করে বলুন? আমার সংসার তো দেখলেন। তিনটি মেয়েমানুষ, তাদের একজন পঙ্গু আর নির্বোধ, একজন কুঁজো, আর তৃতীয়টির অতিবুদ্ধি। বাকি আমার ন-বছরের ছেলে ইলিউশা। পৃথিবীতে আমি ছাড়া ওদের আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, আমি যদি ঐ খানদানী মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ডুয়েল লড়ে মরি, বলুন তো, কী হবে ওদের? যদি নাও মরি, শুধু পঙ্গু হয়ে থাকি চিরজীবনের জন্যে, কে রোজগার করে আনবে ওদের মুখের অন্ন? ঐ একরত্তি ছেলে, ও কি তখন আমাদের খাওয়াবে পথে পথে ভিক্ষে করে করে?

না, না, ডুয়েল আপনাকে মোটেও লড়তে হবে না। আমি বলছি, আমার ভাই আপনার কাছে মার্জনা চাইবে। ক্ষোভে জ্বলজ্বল করতে লাগল আলিওশার চোখ।

বাকি অস্ত্র ছিল আপনার ভাইএর নামে মামলা করা। কী লাভ হোতো তাতে? অপমানের বিনিময়ে কটা পয়সা খেসারত পেতাম? তাছাড়া, আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভনা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখাল, 'নালিশ যদি আমি করি তাহলে আমার সমস্ত কুকীর্তির কথা সে প্রকাশ করে দেবে, উল্টে জেলে পাঠাবে আমাকেই।' শুনুন কথা, কুকীর্তি করেছি আমি। ঐ মেয়েটার হুকুম আর আপনার বাবার হুকুম চোখ বুজে তামিল করেছি, কুকীর্তি হোলো আমার। আরো বললে,—'দূর করে তাড়িয়ে দেব তোমাকে, কোনো কাজ দেব না, একটি পয়সাও তাহলে পাবে না আমাদের কাছ থেকে।' আমাকে নিয়ে ফিয়োডোর পাভলোভিচের দরকার অবশ্য এখনো ফুরোয়নি তবু দেখুন, চুপ করে থাকাই কি আমার পক্ষে শ্রেয় নয়? যাক্, আমার কথা অনেক বললাম, আপনার বিষয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনার ঐ আঙুলটা ইলিউশা কি খুব জোরে কামড়েছে?

হ্যাঁ, খুব জোরে, প্রাণপণে। এতোক্ষণে বুঝলাম, আমি কারামাজভ বলেই আপনার অপমানের শোধ ও আমার ওপর নিতে চেয়েছিল। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের ওপর ও যেভাবে ঢিল ছুঁড়ছিল তা যদি দেখতেন? এমনি ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি ভালো নয়। হঠাৎ লেগে গেলে মাথা ফাটতে পারে কারুর।

ঠিক বলেছেন। বিপদ ঘটেছে ওরই। মাথা অবশ্য ফাটেনি, তবে ঢিলটা ঠিক বুকের ওপরই লেগেছে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছে, এখন বাধায় একেবারে শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

কিন্তু ওই আগে মারামারিটা শুরু করেছিল। আপনারই জন্যে বন্ধুদের সকলের ওপর ওর রাগ। তাছাড়া শুনলাম, কদিন আগে ক্লাসট্রিন বলে একটা ছেলের হাতে ছুরিও নাকি বসিয়েছে।

আমিও শুনেছি সে কথা। ছেলেটার বাবা এখানকার একজন সরকারী কর্মকর্তা,—ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।

আমি হলে ওকে কদিন ইস্কুলে পাঠাতাম না, আলিওশা বললে,—যতোদিন না রাগ পড়ে গিয়ে মাথাটা ঠান্ডা হয়।

ঠিক বলেছেন আপনি, মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললে,—এটুকু ছেলে হলে হবে কি, রাগের সীমা পরিসীমা নেই। সব ব্যাপারটা তো আপনি জানেন না, শুনুন তাহলে বলি। স্কুলের ছেলেদের চরিত্র নিশ্চয়ই জানেন, একলা একলা প্রত্যেকে সোনার চাঁদ, কিন্তু দলেতে পড়লে ওদের মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই। সেদিনের ঘটনার পর থেকে ছেলেরা ওকে খ্যাপাতে শুরু করল ছাগলদাড়ির ছেলে বলে। অন্য ছেলে হলে হয়তো সহ্য করত, বাপের অপমান মেনে নিত, কিন্তু ইলিউশা আমার সে ছেলেই নয়। আপনার ভাইএর হাত থেকে আমাকে ছাড়াবার জন্যে সে যখন তার হাতে চুমু খেয়েছিল, তখন কতো বড়ো অপমানের বেদনা সে তার ছোট্ট বুকটিতে সহ্য করেছিল তা ভগবান জানেন আর আমি তার জন্মদাতাই জানি। ন-বছরের শিশু, কতোটুকু তার জ্ঞান! কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝেছিল, যে দুর্বল, যে গরীব, তার জন্যে দুনিয়ার কোথাও ন্যায়বিচার নেই। সেদিন রাত্রেই তার অসুখ করল, সারারাত জ্বরের ঘোরে ভুল বকল। পরদিন আমি হাতে যা কিছু ছিল, সব দিয়ে মদ কিনলাম,—নেশার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম সব অপমান, সব অবসাদ। জানলামই না যে সে স্কুলে গেল সেদিন। পথে ছেলেরা দল বেঁধে ঠাট্টা করতে লাগল ওকে,—'তোর বাবার ছাগলদাড়ি, তোর বাবাকে দাড়ি টেনে টেঁচিয়েছে, আর তুই তাকে ছাড়াবার জন্যে ভিক্ষে করেছিস!'

তৃতীয় দিনের দিন স্কুল থেকে ফিরতে আমার চোখে পড়ল ওর জীর্ণ মলিন চেহারা। বাড়ির মেয়েরা সবাই ঘটনাটা জেনে গেছে, সেখানে কোনো কথা বলার জো নেই। সন্ধ্যেবেলা আমি ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হলাম। হ্যাঁ, এই যে আমরা চলেছি, এই পথেই। ফাঁকা পথ, ওর ছোট্ট হাতটি আমার হাতের মুঠোয়। বুকের অসুখ আছে ছেলেটার, আঙুলগুলো যেমনি সরু তেমনি ঠান্ডা। হঠাৎ ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল,—'বাবা, বাবা!' আমি বললাম,—'কী বাবা?' ও বললে,—'বাবা, লোকটা তোমার ওপর অমনি দুর্ব্যবহার করল?' আমি বললাম,—'তা তো করল বাবা! উপায় কী বল্?' 'না বাবা,' গর্জে উঠল ইলিউশা,—'ও লোকটাকে কখনো তুমি ক্ষমা কোরো না। স্কুলে সবাই আমাকে কী বলে জানো? বলে, ও নাকি তোমাকে পরে দশ রুবল বকশিশ দিয়েছে।' আমি বললাম,—'না বাবা, দ্যায়নি। তাছাড়া, ওর কাছ থেকে কিছুতেই আমি টাকা নিতাম না।' কেঁপে উঠল ছেলেটা, আমার হাত চেপে ধরে বললে,—'বাবা, তুমি ডুয়েল লড়ে যাও না ওর সঙ্গে। স্কুলের ছেলেরা বলে, তুমি নাকি ওর সঙ্গে লড়তে ভয় পাও, তাই দশ রুবল বকশিশ পেয়ে

চুপ করে গিয়েছে।' আমি বললাম,—'না বাবা, ভুয়েল লড়তে আমি পারব না।' কেন তাতো এইমাত্র আপনাকে বললাম স্যার। ওকেও বুঝিয়ে বললাম। রাগে ক্ষোভে ইলিউশার দু-চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। শুনল আমার কথা মন দিয়ে। তারপর বললে,—'তাই বলে বাবা, ওকে তুমি কখনো ক্ষমা কোরো না যেন। আমি যখন বড়ো হব, তখন তোমার হয়ে আমি লড়ব ওর সঙ্গে, খুন করব ওকে।' আমি বললাম,—'না বাবা, খুন করা পাপ।' ও বললে,—বেশ, একেবারে খুন করব না, তবে ডুয়েলে ঠিক হারিয়ে দেব ওকে। ওর তরোয়াল খসে পড়বে হাত থেকে, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ের কাছে। তখন ওর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমার তরোয়াল নেড়ে আমি বলব,—তোকে এখুনি আমি মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু যা, তোকে আমি ক্ষমা করলাম।' ভাবুন, পুরো দুটো দিন ধরে ছোট্ট ছেলেটার মাথার মধ্যে কী রকম সব চিন্তা জট পাকিয়েছে! বাবার অপমানের প্রতিশোধ ও নেবেই। কী করে নেবে সারাদিন তাই ভেবেছে, ঘুমের মধ্যে সারারাত সেই প্রতিশোধের দুঃস্বপ্ন দেখেছে!

তবে ও স্কুল থেকে মার খেয়ে খেয়ে যে ফেরে, তা আমি পরশুদিনই প্রথম জানতে পারলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন, আর আমি ওকে স্কুলে পাঠাব না। ক্লাসের সমস্ত ছেলের বিরুদ্ধে একলা ও দাঁড়ায়, লড়ে, আর মার খায়, এ খবর আর আমার অজানা নেই।

সেদিন ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে,—'আচ্ছা বাবা, পৃথিবীতে যারা বড়োলোক, তাদের সঙ্গে জোরে আর কেউ পারে না, না?'

আমি বললাম, —'ঠিক বলেছিস বাবা, আসল জোর টাকার।'

ও বললে,—'দেখো বাবা, আমি যখন বড়ো হব, তখন কতো বড়োলোক হব আমি। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা হবে আমার,—তখন কেউ আর আমাদের অপমান করতে সাহস করবে না।' এই বলে একটুখানি সময় চুপ করে রইল, কাঁপতে লাগল কচি ঠোঁটদুটি। একটু পরে বললে,—'বাবা, এ শহরটা বড়ো বিচ্ছিরি।' আমি বললাম,—'খুব ভালো যে নয় তাতো ঠিকই।' ও উত্তরে বললে,—'চলো বাবা, আমরা আর কোথাও গিয়ে থাকি,—একটা নতুন জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।' 'ঠিক বলেছিস ইলিউশা,' আমি বললাম,—'নিশ্চয়ই যাব। তবে দাঁড়া, কিছু টাকা জমিয়ে নিই আগে।' দুঃখকর চিন্তা থেকে ওর মনটা সরাতে পেরে আমি বাঁচলাম, স্বপ্ন রচনা করতে লাগলাম দুজনে মিলে। চমৎকার একটা গাড়ি কিনব, আর একটা লাল ঘোড়া। তাতে মাকে আর বোনেদের বসিয়ে আমরা দুজন হাঁটব। পা ব্যথা করলে ইলিউশাও মাঝে মাঝে গাড়িতে উঠে বসবে। এমনি করে আমরা চলে যাব এখান থেকে অনেক দূরে কোন অজানা দেশে।

এ হোলো পরশুদিনের বিকেলের কথা, কিন্তু কাল সন্ধ্যেবেলা সব কিছু বদলে গেল। সকালবেলা স্কুলে গিয়েছিল, ফিরে এল যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। বেলা পড়তে ওর হাত ধরে আবার বেড়াতে নিয়ে গেলাম। সূর্য ডুবে গেছে, গোধূলি ঘনিয়ে আসছে, বাতাসে শরতের আভাস। দুজনে হাঁটতে লাগলাম,—

দুজনেরই মন তার। খানিকক্ষণ পরে জোর করে সেই পুরোনো কথাটা আবার পাড়লাম,—হ্যাঁরে ইলিউশা, কবে আমরা যাব বল্ দেখি এখান ছেড়ে?' সে কোনো উত্তর দিল না, শুধু আমার হাতের মুঠোয় ওর নরম আঙুলগুলো শক্ত হয়ে কেঁপে উঠল। আমি বুঝলাম, ওর আহত মনে নতুন করে আবার কোনো ঘা লেগেছে। এই যে পাথরটা দেখছেন, এই পাথরের ওপর এসে বসলাম। আকাশে অনেকগুলো ঘুড়ি উড়ছে, গোটা তিরিশ তো হাতে গোনার মধ্যে। আমি বললাম,—'ঐ দ্যাখ ইলিউশা, তোর গত বছরের ঘুড়িটা কোথায় রেখেছিস্। বার করে দিব, সারিয়ে দেব এবার।' কোনো উত্তর দিল না ছেলেটা, মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। হঠাৎ বাতাসের একটা ঘূর্ণি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ও দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চেপে ধরল আমাকে। এতোদিন যতো ব্যথা, যতো দুঃখ বরফের মতো জমে ছিল ওর ছোট্ট বুকের মধ্যে, সে-বরফ গলল। ওর চোখের জলে সারা মুখ ভেসে গেল আমার। সে জলের বিরাম নেই, কান্না তার আর থামে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে,—'বাবা, বাবা, কতো অপমান তুমি সয়েছ।' আমিও কাঁদলাম,—হ্যাঁ স্যার, ঐ ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমিও চোখের জল ফেললাম। সে দৃশ্য কেউ দেখেনি, শুধু ঐ আকাশের ওপার থেকে ভগবান দেখেছেন বাপ-ব্যাটাকে। সে দৃশ্য ঈশ্বরের মন থেকে মুছে যাবে না।

অতএব হুজুর, ক্যাপ্টেনের গলায় রুক্ষ ভাঁড়ামির স্বর আবার ফুটে উঠল,—আপনার ঐ আঙুলটাতে কামড়ে দিয়েছে বলে আমার ছেলেটাকে আমি যে ঠ্যাঙাব, তা আপনি আশাও করবেন না।

অশ্রু উদ্গত হয়ে এসেছিল আলিওশারও চোখে। রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে,—ছি, ছি, বলবেন না। আপনার ছেলেটির সঙ্গে যদি আমি ভাব করতে পারতাম!

তা বটে!

নিজেকে সংযত করে এবার কথাটা পাড়ল,—শুনুন, আপনার সঙ্গে অন্য একটা কথা আমার আছে। আপনি বোধ হয় শুনেছেন,—আমার এই ভাই ডিমিট্রি—সে তার বাগ্দত্তাকেও এমনি নির্মমভাবে অপমান করেছে। মেয়েটি খুব বড়ো ঘরের, সাদামাটা, ভালো মেয়ে। ডিমিট্রির হাতে আপনার এই অপমানের কথা শুনে সে-ই আজকে আপনার কাছে আমাকে পাঠাল। সামান্য কটি টাকা সে আপনাকে পাঠিয়েছে। না, আমি নয়, আমার ভাইও নয়, ঐ মেয়েটি। আপনারা দুজনেই একজনের হাতে অপমানিত হয়েছেন,—একই নিষ্ঠুরতা। সে আপনার সমব্যথিনী, আপনার ছোট বোনের মতো। আমাকে বলেছে, তার এই সাহায্যটুকু আপনাকে নিতেই হবে। নইলে সে আরো আঘাত পাবে। বুঝবে, পৃথিবীতে বন্ধু বলে কেউ নেই, সবাই সবাইএর শত্রু। ধরুন এ সামান্য টাকা কটা, আপনি নিতে আপত্তি করবেন না।

একশো রুবল-এর দুটো ঝকঝকে নোট আলিওশা ক্যাপ্টেনের সামনে ধরল।

রাস্তার পাশে বেড়ার ধারে মস্ত পাথরটার কাছে তারা দুজন দাঁড়িয়ে, কাছাকাছি

কেউ কোথাও নেই। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নোট দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন। আলিওশার সঙ্গে কথাবার্তায় এই রকম একটা পরিণতি সে আশাই করে নি। কেউ যে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে তা তার স্বপ্নেরও বাইরে। তাছাড়া, এতোগুলো টাকা!

নোট দুটো হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র ভাব। একটু পরে বললে,—অ্যাঁ, এতো টাকা! সব আমার! এতোগুলো টাকা গত বারো বছরের মধ্যে আমি একসঙ্গে দেখিনি। আমার বোন পাঠিয়েছে আমার জন্যে! অজানা বোন? বলেন কি? সত্যি?

সত্যি। একবিন্দু মিথ্যে বলিনি আমি।

শুনুন বন্ধু শুনুন, হঠাৎ লাল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের মুখ,—এই টাকা যদি আমি নিই, তাহলে এ ছোটলোকের কাজ হবে না? আপনি বলছেন, যে পাঠিয়েছে সে আমার বোনের মতো। বুঝলাম তা, কিন্তু তবু যদি এই দানকে আমি পকেটে পুরি, তাহলে অন্তত আপনার চোখেও আমি খুব হীন হয়ে যাব না?

মোটেই না, কেন ওকথা ভাবছেন? তাছাড়া, আমি আর ঐ মেয়েটি আর তার এক বান্ধবী ছাড়া কেউ এ কথা জানে না, জানবেও না।

বাদ দিন বান্ধবীর কথা। আমার নিজের কথা আপনি শুনুন আলেক্সি ফিয়োদোরোভিচ। এই দুশো রুবলের দাম এখন আমার কাছে যে কী, তা আপনি বুঝবেন না, তাই আমার সব কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

দ্রুতগতিতে বলতে লাগল ক্যাপ্টেন, উত্তেজনায় এলোমেলো হয়ে উঠল তার ভাষা,—বোনের দান, মানী সম্মানী ঘরের আমার বোন—এ দান হাত পেতে নেওয়ায় আমার কোনো অসম্মান নেই। ঠিকই তো! তাছাড়া, এবার আমার স্ত্রীকে, আমার কুঁজো মেয়ে নিনাকে আমি দেখতে পারব। আমার ওপর দয়া করে সেদিন ডাক্তার এসে মা-মেয়েকে খুব ভালো করে দেখে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীর জন্যে বিধান দিয়েছিল, সমানে একনাগাড় খনিজ জল খেয়ে যাবার। তিরিশ কোপেক করে এক-একটা বোতলের দাম, খেতে হবে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বোতল। প্রেসক্রিপশনটা আমি শেলফের মাথায় তুলে রেখে দিয়েছি। মেয়েকে বলেছিল, গরমজলে একটা ওষুধ ফেলে সেই জলে নিয়মিত স্নান করতে। আমার বাড়ি তো দেখেছেন,—লোক নেই, জায়গা নেই, জল নেই। কোথা থেকে হবে? আপনি জানেন না, নিনার সর্বদেহে বাত, রাত্রে যন্ত্রণায় ওর শরীরের সমস্ত ডান দিকটা খসে পড়তে চায়, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে,—টুঁ শব্দ করে না বেচারী, পাছে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের খাবার পর পাতে যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে, তাই ও মুখে তোলে। ওর নীরব চোখদুটি বলে,—'আমি তোমাদের বোঝা, এর বেশি আমার কোনো দাবি নেই।' আমরা যদি ওর একটু সেবা করতে যাই, ও ভাবে,—কেন? আমি তো পঙ্গু, কোনো দাম নেই আমার, আমার জন্যে এ সব কেন আবার? অথচ, ওই আমাদের শান্তি। ওর মিষ্টি কথাগুলো আমাদের সকলের মনে সান্ত্বনার প্রলেপ। ভারভারা পর্যন্ত নরম হয় ওর কথায়। তাই বলে,

ভারভারার নিন্দে আমি করছি, তা আপনি ভাববেন না যেন। ভারভারাও বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে,—সেও কম কষ্ট পায়নি। গ্রীষ্মকালে আমাদের কাছে যখন এল, সঙ্গে ছিল ওর নিজের ছেলে পড়িয়ে রোজগার-করা জমানো টাকা, আঠারোটি রুবল। এখন এই সেপ্টেম্বর মাসে তার পিটারস্‌বুর্গে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওর টাকা আমরা খেয়ে বসে আছি, ফিরে যাবার ওর উপায় নেই। তার বদলে সারা দিনরাত দাসীবৃত্তি করে ও আমাদের সংসারে। রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়—দিনরাত দেখে পাগল মা আর পঙ্গু বোনকে। তাহলে বুঝুন, আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, এই টাকায় আমি সংসারে কাজ করার জন্যে একটা লোক রাখতে পারব, স্ত্রী-কন্যার চিকিৎসা করাতে পারব, ছাত্রীটাকে আবার পারব পিটারস্‌বুর্গে পাঠাতে। আমি মাংস কিনতে পারব, পারব ছেলেমেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে। দুশো রুবল! ঈশ্বর, এ যেন স্বপ্ন!

হতভাগ্য লোকটির এতোটা আনন্দের বাহক হতে পেরে বড়ো খুশী হোলো আলিওশা।

আবার এক নতুন স্বপ্নে মশগুল হোলো ক্যাপ্টেন। তাড়াতাড়ি বলতে লাগল সে, —দাঁড়ান আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, দাঁড়ান! বাচ্চা ইলিউশাটার স্বপ্ন, তাও হয়তো আমি সার্থক করতে পারব এবার। একটা গাড়ি আর একটা ঘোড়া কিনব,—লাল নয়, কুচকুচে কালো ঘোড়া ইলিউশার পছন্দ—তারপর সেদিনের কল্পনা মতো আমরা বিদায় নেব এখান থেকে। দূরের এক পুরোনো বন্ধু আছে, নামকরা উকিল। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে একটা মুহুরীর চাকরি আমাকে জুটিয়ে দেবেই। সেই শহরেই চলে যাব। নিনা আর তার মাকে গাড়িতে তুলব, ইলিউশা ধরবে ঘোড়ার লাগাম, আর আমি হাঁটব পাশে পাশে।

খুব ভালো হবে, আলিওশা উৎসাহভরে চিৎকার করে উঠল,—এজন্যে আরো যদি টাকা লাগে, ভাববেন না। কাটেরিনা আইভানোভ্‌নাকে বললেই সে আরো সাহায্য করবে। তাছাড়া, আমারও কিছু আছে। আমি জানি, আপনি অন্যত্র গেলে বেশ ভালো পয়সা রোজগার করবেনই। তখন না হয় শোধ দিয়ে দেবেন এ সব টাকা। দেরি নয়, তাড়াতাড়ি গেলে ছেলেটি বাঁচবে আপনার—শীতের আগেই চলে যান, পৌঁছে খবর দেবেন আমাকে। ভাবছেন কি? স্বপ্ন নয়, সত্যি।

এতো খুশী লাগছিল আলিওশার, মনে হচ্ছিল, এখুনি সে ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু হঠাৎ সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। লোকটা ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পান্ডুর মুখে কেমন একটা উন্মত্ত আভাস। ঠোঁট দুটো নড়ছে, কী যেন বলতে চাইছে, কথা ফুটছে না, বীভৎস দেখাচ্ছে।

চমকে উঠে বললে আলিওশা,—কী হোলো আপনার?

আলেক্‌সি ফিয়োডোরোভিচ, আপনি,··· মানে, আমি···আমি বলছিলাম কি—

বিস্ফারিত চোখ, সাংঘাতিক মুখভঙ্গি, পাগলের মতো হাবভাব, কী যেন ভাবছে প্রাণপণ, অথচ মীমাংসা করতে পারছে না। বাঁকা একটা হাসি পরক্ষণে ফুটে উঠল

হবে। ক্যাপ্টেন আবার বললে,—আপনাকে একটা কথা বলি স্যার,—মানে একটা খেলা দেখাই। ভারি মজার খেলা,—দেখবেন?

কিসের খেলা?

ভারি মজার। বলুন, দেখবেন? আপত্তি নেই তো?

মুখের বাঁ দিকটা বেঁকে গেছে ক্যাপ্টেনের, বাঁ চোখটা পাকিয়ে উঠেছে যেন। চাপা গলায় কথা বলছে, কিন্তু উচ্চারণে তার কোনো জড়তা নেই।

ভয় পেয়ে গেল আলিওশা, কী মজার খেলা? কী হোলো আপনার?

ডান হাতে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাঝে নোট দুটো নিয়ে ক্যাপ্টেন পাগলের মতো দুমড়োতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে লাগল,—দেখছেন? হেঁ-হেঁ, খেলা দেখছেন? তারপর মুঠো-করা নোট দুটো ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে আঙুল দেখিয়ে বললে,—এবার ঐ দেখুন!

দৌড়ে সে ক'পা এগিয়ে গেল এবার। পা দিয়ে নোটদুটোকে মাটিতে পিষতে লাগল সজোরে, আর উন্মত্ত আক্রোশে চিৎকার করতে লাগল,—নিকুচি করেছে আপনার! নিকুচি করেছে আপনার টাকার!

সে-চিৎকার শোনাল অনেকটা যেন আর্তনাদের মতো।

হঠাৎ আবার ছুটে এসে খাড়া হয়ে সে দাঁড়াল আলিওশার মুখোমুখি গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে। আকাশে হাত উঁচু করে দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে, — যারা আপনাকে পাঠিয়েছে তাদের বলবেন, ছাগলদাড়ি টাকার বিনিময়ে তার সম্মান বিক্রি করে না।

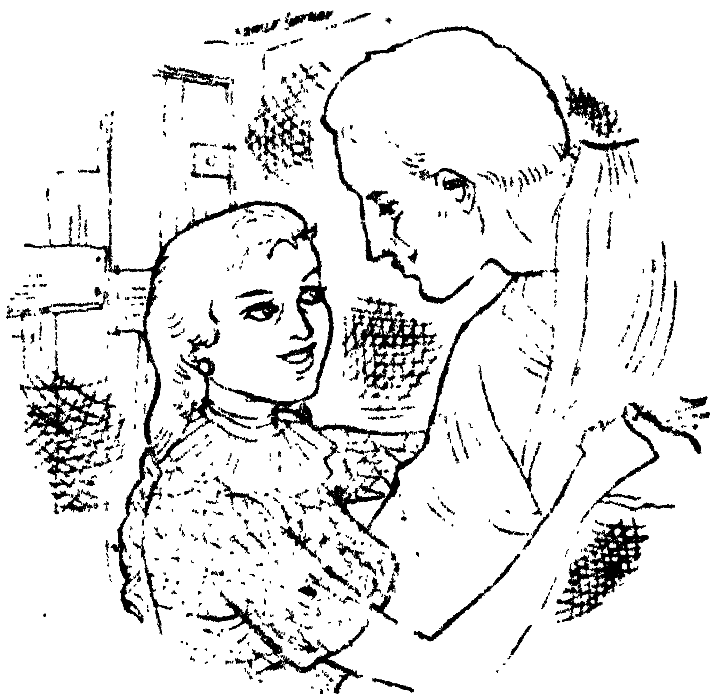
এক লহমায় মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল সে। কিন্তু চার-পাঁচ পা গিয়েই আবার পিছন ফিরে তাকাল, ডানহাতে চুমু খেয়ে সেই হাত বাড়াল আলিওশার দিকে। আরো পাঁচ-ছয় পা যাবার পর আবার সে ফিরে দাঁড়াল। আলিওশা দেখল, ক্যাপ্টেনের মুখে রাগের বা হাসির চিহ্নমাত্র নেই। সে-মুখ ভেসে যাচ্ছে জলে।

অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে চিৎকার করে শেষবারের মতো সে বললে,—আমার এই লজ্জার বিনিময়ে আপনার হাত থেকে টাকা যদি আমি নিই, তবে ঘরে ফিরে ছেলেটাকে আমি কী বলব?

এবার মুখ ঘুরিয়ে দৌড়তে লাগল লোকটা। আর দাঁড়াল না একবারও। আলিওশা ক্ষুব্ধ মনে শেষ পর্যন্ত তার অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আলিওশা বুঝল, ডেকে কোনো লাভ নেই, তাই ডাকল না আর তাকে। ক্যাপ্টেন দূরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আলিওশা মাটি থেকে নোট দুটো তুলল। দুমড়ে দলা পাকিয়ে গেলেও ছেঁড়েনি একটুও। হাতের তালু দিয়ে সোজা করল নোট দুটো সে। আনকোরা নোট, খসখসে আওয়াজ। তারপর ভাঁজ করে পকেটে পুরে সে ফিরে চলল আবার।

পা বাড়াল কাতেরিনার বাড়ির দিকে। এই দৌত্যের ফলাফল তাকে জানাতে হবে।



পঞ্চম অধ্যায় : আকাশ-পাতাল

এক

আবার প্রথম দেখা হোলো মাদাম হোলাকভের সঙ্গেই। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাঁর মুখ, ঘটনাটা আরো গড়িয়েছে। মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল কাটেরিনা আইভানোভনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা দেয়ে নেমেছে সাংঘাতিক দুর্বলতা। এখন নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে আছে, প্রলাপ বকছে অস্ফুট, জ্বরও এসেছে। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। খবর পেয়ে মাসিরাও এসেছেন, বসে আছেন ওর বিছানার পাশে,— কতোক্ষণে ডাক্তার আসবেন আর কতোক্ষণে জ্ঞান ফিরবে তারই অপেক্ষায়।

আলিওশা তার বক্তব্য শুরু করেছিল, কিন্তু শোনবার অবকাশ নেই এখন তাঁর। লিজার কাছে বসে বরং একটু অপেক্ষা করুক সে।

আলিওশার কানের কাছে মুখ নিয়ে মাদাম হোলাকভ বললেন,— একটা কথা বলি বাবা। আজ লিজার ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি। তোমার সঙ্গে আজ ও ঠাট্টা করছিল, কালও করেছিল, তাই না? ওমা, তুমি তো গেলে,— সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের কী অনুতাপ, কী কান্না! আমাকে নিয়ে কতো তো ঠাট্টা করে, কিন্তু এমনটি কখনো দেখিনি। তুমি বাবা রাগ কোরো না ওর ওপর, ক্ষমা কোরো ওকে। ও বলে, তুমি নাকি ওর ছেলেবেলাকার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, তোমার মনে দুঃখ দিয়ে এখন ওর বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি যদি ওকে খারাপ ভাবো তাহলে···তাই ভাবো নাকি বাবা আলিওশা? ও বড়ো বুদ্ধিমতী, বড়ো ভালো, কিন্তু তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছে না আর। আমার তো বাবা কাটেরিনাকে নিয়ে মাথা খারাপ হোলো বলে। তুমি একটু লিজার কাছে চলো, কতো বড়ো মন তোমার, একটু বুঝিয়ে মিষ্টি কথা বলো তাকে।

লিজা, ও লিজা! দুষ্টু মেয়ে, এই দ্যাখ্, আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ এসেছে আবার! একটুও রাগ করেনি ও তোর ওপর। যেমন বোকা মেয়ে তুই!

ঘরে ঢুকতেই লিজার মুখোমুখি। তাকে দেখে লিজার জড়োসড়ো অবস্থা, লজ্জায় টুকটুকে মুখ। এমনি লজ্জায় পড়লে স্বভাবতঃ লোকে যা করে সেও তাই করল,—যে কথার কোনো দাম নেই সেই কথা শুরু করল এমন ভাব দেখিয়ে, যেন সেই কথাটাই কতো মূল্যবান। নিজেকে সামলে নিয়ে সে আরম্ভ করল,—আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ, মা আমাকে বলছিলেন, ঐ গরীব অফিসার আর তার নিদারুণ অপমানের কথা। শুনে চোখে জল এল আমার। তুমি তাকে দুশো রুবল দিয়ে এলে তো? আহা, বেচারা!

না, দিতে পারলাম কই?

কেন?

সে এক কষ্ট কাহিনী।

লিজাও স্পষ্ট বুঝল, আলিওশাও বোঝে, এ কাহিনী তার কাছে সবিস্তারে বলা অপ্রয়োজনীয়, তবু এই অপ্রয়োজনীয় কথা বলেই সে স্বস্তি পাচ্ছে। এ কথা দুজনেরই কুণ্ঠার আবরণ।

টেবিলের ধারে বসে আলিওশা বলতে শুরু করল। সব ঘটনাটা বলল আস্তে আস্তে। বাদ দিল না কিছুই, তার দৌত্যের ব্যর্থতার আক্ষেপ ছড়িয়ে দিল বিবরণীতে। যখন তারা মস্কোতে থাকত, তখন এমনি করে অনেক দিন আলেক্সি লিজার কাছে এসেছে,—কী দেখেছে, কী শুনেছে, কোন্ বই পড়েছে, তা বলেছে লিজাকে—আলোচনা করেছে দুজনে কতো শৈশব-স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে। উভয়ে একসঙ্গে জাল বুনেছে কতো মনোহারী কল্পনার। আজ যেন সেই দু-বছর আগে ফেলে আসা মস্কোর দিনগুলো ফিরে এল। আলিওশার আজকের কাহিনী লিজার মনে সেই পুরোনো ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলল।

সব শুনে লিজা বললে,—টাকা নিল না? পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল? তুমি তাকে যেতে দিলে? তুমি কেন তাকে ছুটে গিয়ে ধরলে না?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি করে আলিওশা বললে,—না লিজা, লোকটাকে যেতে দিয়ে বোধহয় ভালোই করেছি।

কেন, কী ভালোটা করলে শুনি? ঘরে তার হয়তো একদানা খাবার নেই বেচারার! খাবার জোটার সম্ভাবনাও নেই হয়তো!

না, না, সম্ভাবনা আছে বইকি। টাকাটা তো রইল। আজ না নিক, কাল ঠিকই নেবে। দ্যাখো লিজা, আমি একটা বোধহয় ভুল করে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, ভুল করে ভালোই হয়েছে।

কী ভুল? ভালোই বা হোলো কী করে?

বলছি শোনো। লোকটি বড়ো ভালোমানুষ। অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে, তাই ভরসাহীন ভয়ভীতু। নোটগুলো যে মাটিতে ফেলে দু-পায়ে মাড়াবে তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেও ভাবেনি। অতোগুলো টাকা মুঠোর মধ্যে পেয়ে সত্যি সে খুশী হয়েছিল,—সেই নির্লজ্জ খুশীর অপমানটাই তার বেজেছিল সবচেয়ে বেশি। সরল লোক, আমার কাছে সে গোপন করেনি কিছুই—দুঃখের কথা, আশার কথা, সব কথারই। হাসতে হাসতে যা বলেছিল, আসলে তা কিন্তু হাসি নয়, কান্না। হঠাৎ আমার সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে ফেলার অপমানটা ও যখন বুঝল, তখন আমাকে ঘেন্না না করে ওর আর উপায় নেই। তখন দেখাল রাগের ভাব আমার ওপর। আবার টাকাটা যখন দেখালাম, তখন প্রথমটা গলে গেল একেবারে। ঠিক সেই সময়টাতেই আমি ভুল করলাম। বললাম, এ শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মতো যথেষ্ট টাকা যদি ওর না থাকে আমি দেব। সত্যিই যদি চাইত, আমার জমানো টাকা সব ওকে দিতাম। তখনই সে চমকে উঠল, বদলে গেল একেবারে। ভাবল, আমি ওকে করুণা করছি, ওর অপমানিত মুখে আরো বেশি করে কালি মাখিয়ে দিতে

চাইছি। শেষ পর্যন্ত ও ভাবেনি, টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাই করল। তবু এই-ই ভালো হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

ঠিক হোলো কী করে? অবাক চোখে শুধোল লিজা।

কেননা, এখনই যদি টাকাটা ও হাতে হাতে নিত, তাহলে ঘরে ফিরে অপমান আর আত্মনিগ্রহের অন্ত থাকত না ওর। হয়তো আগামী কাল সকালেই আমার কাছে এসে অমনি করে নোটগুলো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে রেখে ফিরে চলে যেত। কিন্তু আজ বাড়ি ফিরে গেল আত্মসম্মান নিয়ে, গর্বভরে বুক ফুলিয়ে,—সর্বনাশ হয়ে গেল তা জেনেও। সেইজন্যে কাল ওর হাতে টাকাগুলো আমি তুলে দিতে পারবই। আজ সারারাত টাকার প্রয়োজনটা ও ভালো করে ভাববে, কাল আবার আমি গিয়ে নোট-গুলো নিয়ে সাধব, আবার ক্ষমা চাইব, তখন ঠিক নেবে দেখো।

ঠিক নেবে, নিশ্চয়ই নেবে। খুশীতে হাততালি দিয়ে লিজা বললে,—সাঁত্য, কী বুদ্ধি তোমার! বয়েস এইটুকু হলে কী হয়, লোকের মনের কথা ঠিক তুমি বুঝতে পারো।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই, আলিওশা বলে চলল,—বেচারা ক্যাপ্টেনকে বোঝাতেই হবে যে সে কোনো অংশে আমাদের চেয়ে ছোট নয়। বরং সে আমাদের চাইতে অনেক বড়ো।

বাঃ, বাঃ, অনেক বড়ো! ঠিকই তো! বেশ বলেছ আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ।

সাঁত্য, তাই নয় কী?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই তোমার কথাই দ্যাখো না। তোমাকে আমার কতো ভালো লাগে। মনে ভাবি, তুমি বুঝি আমার সমান সমান। এবার থেকে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করব এই ভেবে যে আমাদের থেকেও তুমি কতো বড়ো। না, না, সাঁত্য আমি ঠাট্টা করছিনে। কিন্তু লোকটির সম্বন্ধে এমনিভাবে আলোচনা করে আসলে কি তাকে অবজ্ঞাই করছিনে আমরা?

না লিজা, অবজ্ঞা নয়। ওকে অবজ্ঞা করব কী করে? ও তো আমাদের অপেক্ষা হীন নয় কোনো মতেই। ওরই মতো আমরা সবাই, কেউ উঁচু নই একচুলও। তোমার কথা আমি জানিনে, কিন্তু নিজের কথা বলতে পারি। আমার নিজের অন্তরে অনেক হীনতা আছে, যে হীনতা ওর মধ্যে নেই। আমার চেয়ে শুভ্রতর ওর প্রাণ। অবজ্ঞা ওকে আমি করিনে। তাছাড়া আমার প্রভু বলেন,—শিশুর প্রতি, আতুরের প্রতি যেমন ব্যবহার শোভন, তেমনি ব্যবহার করা উচিত সমস্ত মানুষের প্রতি।

ঠিক আলেক্সি, ঠিক। তোমার প্রভুর উপদেশ মনপ্রাণ দিয়ে যদি গ্রহণ করতে পারতাম!

আমিও তাই ভাবি লিজা, আমিও তাই চাই। কিন্তু সব সময় পারিনে। মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, কখনো বা ঠিকমতো বিচার করে উঠতে পারিনে। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও বড়ো। আমার যা ব্যর্থতা, তুমি তা সফল করতে পারবে।

শ্নেতে বড়ো ভালো লাগে আলেক্সিস, তবে অমন করে আমাকে বাড়িয়ো না।

আমার কথা শ্নতে ভালো লাগে লিজা? একথা শ্নে আমারও কতো যে ভালো লাগল!

একটা কথা বলব আলেক্সিস? মাথা নিচু করে লিজা অস্ফুট স্বরে বললে,—তুমি বড়ো ভালো, আবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বড়ো দ্রের। আস্তে দরজাটি খ্লে দ্যাখো তো মা কোথায়?

আলিওশা লিজার হ্কুম মানলে,—না, দরজার কাছাকাছি কেউ নেই।

লিজার গাল দ্টিতে রক্তিমাভা। আস্তে আস্তে আবার সে বললে,—শোনো, কাছে এসো। তোমার ডান হাতটি আমার হাতে দাও। তোমার কাছে একটি কথা আমার স্বীকার করার আছে। আমি কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তা আমি ঠাট্টা করে লিখিনি।

লজ্জায় মাথা নিচু করল লিজা। হঠাৎ সে আলিওশার হাতটি কাছে টেনে নিল, আকুল আবেগে সে-হাতে চুম্বন করল বার বার।

আলিওশার ব্কে বান ডাকল আনন্দের। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বললে,—জানি, জানি আমি। তখনই আমি ব্ঝেছিলাম।

সত্যি? ঠিক বলছ? আলিওশার হাতটি লিজার দ্-হাতে তখনো ধরা। সে বললে আবার,—বাঃ, বেশ তো! তোমার হাতে আমি চুম্ খেলাম, আর তুমি···

এবার লাল হবার পালা আলিওশার। সে বললে,—তোমারও যা ভালো লাগে তাই আমি সর্বদা করতে চাই লিজা। কিন্তু কী করতে হবে তা তো জানিনে। তুমি শিখিয়ে দাও।

যাও, খ্ব হয়েছে। তোমাকে আমি বিয়ে করব, এটা ঠাট্টা নয়, ধ্রুব সত্য। তাই মনে করে ভারি দেমাক হয়েছে, না!

বারে, দেমাক কে বললে? তাছাড়া, সত্যিই তো তুমি আমার বউ হতে চাও, চাও না?

বয়ে গেছে। হাসিতে ঝিলমিকিয়ে উঠল লিজার চোখ। পরক্ষণেই বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি!

লিজার দ্টি হাত নিজের দ্-হাতে নিয়ে এক ম্হূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল আলিওশা। তারপর হঠাৎ মাথা নিচু করে চুম্বন করল লিজার ম্খে।

শিউরে উঠল লিজা।

আঃ, করছ কী?

অন্যায় করেছি, মাপ করো। তবে বয়ে গেছে বললে কেন? অমনি করে বললে চুম্ খেতেই হয়।

খিলখিল করে হাসল লিজা, তারপর ম্খ ঢাকল দ্-হাতে। বললে,—ওমা, গায়ে যে সাধ্র পোষাক। এই ব্ঝি সাধ্গিরি!

একটু পরেই গম্ভীর হয়ে গেল লিজা। বললে,—শোনো আলিওশা, এসব চুম্-টুম্

এখন বন্ধ। এসবের এখনো অনেক দেরি। এখনো অনেকদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাই না, লক্ষ্মীটি? তার বদলে একটি কথা আমাকে বলো তো? তুমি এতো বড়ো জ্ঞানীগুণী হয়ে আমার মতো এমনি একটা মুখ্যু আর রুগ্ন মেয়েকে পছন্দ করলে কী করে? আলিওশা, তোমার যোগ্য আমি নই, তবু তুমি আমাকে চাও, এ আনন্দ আমি রাখি কোথায়?

কে বললে তুমি আমার যোগ্য নও লিজা? শোনো, আর কদিন পরেই আমি সারা জীবনের মতো মঠ পরিত্যাগ করে আসব। তারপর আমাকে সংসারী হতে হবে, বিয়ে করতে হবে। এই আমার প্রভুর উপদেশ। তোমার মতো বউ আমি কোথায় পাব? তুমি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, তাছাড়া আমি জানি, তোমার গুণের অন্ত নেই। পৃথিবীর ভালোমন্দ অনেক কিছুই আমি এ বয়সে দেখেছি। আমি যে কারামাজভ সে কথা ভুলো না। তোমার সব ঠাট্টা আর চপলতার পিছনে করুণাভরা যে মনটি আছে, তাও আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

কী করে চোখে পড়ল?

একটু আগে যে ঐ ক্যাপ্টেনের সম্বন্ধে তুমি বলছিলে, ওকে নিয়ে এমনিভাবে আলোচনা করে ওর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছি না আমরা? এমনি কথার মধ্যেই তোমার মনটির পরিচয় পাওয়া যায়, যে-মন দুঃখকে বোঝে, করুণাকে লালন করে। এই রুগীর চেয়ারে বসে বসে নিজের কষ্ট শুধু তুমি ভাবোনি, অনেক মানুষের অনেক দুঃখের কথা তুমি ভেবেছ।

থামো আলিওশা, অস্ফুট স্বরে লিজা বললে,—চুপ করো, শুধু তোমার হাতটি আমার হাতে রাখো। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মঠ ছেড়ে এলে কী পোষাক তুমি পরবে? বলো না, কী তোমার পছন্দ?

মৃদু হাসল আলিওশা।

তাতো ভেবে দেখিনি। কী পরলে আমাকে ভালো দেখাবে তুমি বলো তো?

বলব? ঘন নীল রঙের ভেলভেটের কোট, সাদা ওয়েস্ট কোট, আর গ্রে-রঙের ফেল্টের টুপি। আচ্ছা শোনো, আমি যখন বললাম যে চিঠিতে যা লিখেছিলাম সব মিথ্যে, তখন তুমি কী ভাবলে?

ভেবেছিলাম, তোমার কথাটাই মিথ্যে আর লেখাটাই সত্যি।

হুঁ, তা বইকি। চালাক!

চালাকি মোটেই নয় লিজা। আমি ঠিক জানতাম, আমাকে তোমার ভালো লাগে।

খুশী চাপতে পারল না লিজা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে,—সত্যি, বাসি, বাসি—তোমাকে খুব ভালোবাসি। সকালবেলা তুমি আসবার আগে পর্যন্ত আমি কি ভাবছিলাম জানো? ভাবছিলাম, তোমার কাছে চিঠিটা তো চাইব,—তুমি যদি নিঃশব্দে চিঠিটা আমাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে বুঝব, তুমি আমাকে ভালোবাসো না, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালোবাসার হবে মৃত্যু। কিন্তু তুমি বললে চিঠিটা তুমি বাড়িতে ফেলে

এসেছ। তাতেই তো আশা হোলো। আচ্ছা, বলো তো, তুমি চিঠিটা ইচ্ছে করেই ফেলে এসেছ, না? ঠিক বুঝেছিলে, আমি ফেরত চাইব, সেই জন্যে। তাই না?

তাই বটে, কিন্তু চিঠিটা আসলে তো বাড়িতে ফেলে আসিনি, পকেটেই আছে। সকালেও ছিল। এই দ্যাখো।

হাসতে হাসতে পকেট থেকে লিজার চিঠিটা বার করে আলিওশা তাকে দেখাল। সে আবার বললে,—তাই বলে এটা তোমাকে ফেরত দেব না। দূর থেকে দ্যাখো।

ও মা! তাহলে সাধু হয়ে মিছে কথা বলেছিলে?

তা বলেছিলাম। চিঠিটা আমার কাছে মহামূল্য। মিথ্যে না বললে চিঠিটা যে হাতছাড়া হোতো। এটা আমি প্রাণ থাকতে কারুকে দেব না, যে লিখেছে তাকেও না।

আনন্দ আর ধরে না লিজার। হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। গলা নামিয়ে বললে,—উঁকি দিয়ে দেখো তো আলিওশা, মা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আছে কিনা!

ছি ছি! মাকে সন্দেহ? মা আড়ি পাততে যাবেন কেন? কেন তাঁকে এমন নীচ ভাবো?

নীচ? বারে! মেয়ে একলা ঘরে বসে পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে, মা আড়ি পাতবে না? এতো মা'র কর্তব্য। এটা নীচ কাজ হোলো কিসে? আমি যখন মা হব, আর আমার যদি এমনি মেয়ে থাকে, আমিও তো তার ওপর এমনি নজর রাখব। ভালো কথা, আমাদের বিয়ের পর ঠিক এমনি নজর তোমার ওপরেও আমি রাখব তা কিন্তু মনে রেখো। তোমার যতো চিঠি আসবে সব কিন্তু আমি খুলে খুলে পড়ব।

বেশ, বেশ, পোড়ো, আলিওশা উত্তর দিল, - তবে পরের চিঠি খুলে পড়াটা উচিত কাজ নয়।

তা না হোক। অতো বিশ্বাস তোমার ওপর আমার নেই। কী হোলো? প্রথম দিনেই ঝগড়া করবে নাকি?

ঝগড়া করব কেন? বলছি তো, পোড়ো। কিছুই যাবে না তাতে।

বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে! আচ্ছা আলিওশা, আমার সব কথা তুমি শুনবে? যখন যা করতে বলব করবে?

করব বইকি লিজা, মৃদু হেসে বললে আলিওশা,—তবে জানো, জীবনে কতকগুলো দরকারী কাজ করতে হয়, যেগুলো কর্তব্য। সেগুলো আমাকে করতে হবে বিবেকের নির্দেশে, আর কারো নির্দেশে নয়।

বেশ তাই কোরো। বেঁচে থাক তোমার বিবেক। উৎফুল্ল কণ্ঠে লিজা বললে,—আমি কিন্তু কারো হুকুম মানব না, কেবল তোমার হুকুম ছাড়া। তুমি যা ভালোবাসো, তুমি যা চাও তাই শুধু আমি করব খুশীমনে, সারা জীবন ধরে। দিব্যি করে বলছি,—কক্ষনো তোমার চিঠি খুলব না, শত লোভ হলেও না। এখন থেকে

তুমিই আমার বিবেক।… হ্যাঁ, একটা কথা সত্যি করে বলো, কাল আর আজ দুদিনই এতো বিষন্ন কেন তোমার মুখ? দুর্ভাবনা তোমার অনেক জানি, কিন্তু মনে হচ্ছে, এসব দুর্ভাবনার চেয়ে অনেক বড়ো কী একটা গোপন দুঃখ যেন মনে পুষে রেখেছ!

হ্যাঁ লিজা, করুণকণ্ঠে উত্তর দিল আলিওশা,—গোপন দুঃখই বটে। সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই তোমার চোখে ধরা পড়েছে।

বলবে না আমাকে?

এখন নয়, পরে। এখন তুমি বুঝতে পারবে না। হয়তো বুঝিয়ে বলতেও পারব না আমি।

আমি জানি, তোমার বাবা আর তোমার দাদারা—ওরাই তোমার এ দুঃখের কারণ।

একটুক্ষণ মুখ নিচু করে চুপ করে রইল আলিওশা। তারপর বললে,—ঠিক কথা।

হঠাৎ লিজা বললে,—তোমার দাদা, ঐ আইভানকে আমার মোটেও ভালো লাগে না আলিওশা।

আশ্চর্য হোলো আলিওশা একথা শুনে, কিন্তু এ নিয়ে প্রশ্ন করল না কোনো। একটু পরে ধীরে ধীরে বললে,—আমার দাদারা নিজেদের মাথার ওপর সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমার বাবাও তাই। সেই সর্বনাশে অপরকেও জড়াচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ফাদার পাইসি সেদিন বলছিলেন, এই অন্ধ মূঢ় আত্মধ্বংসী আবেগ কারামাজভ বংশের রক্তের মধ্যে আছে। এই আবেগকে কে রোধ করবে? ভগবানেরও বোধহয় অসাধ্য। আর আমি,—আমিও তো কারামাজভ। আমি সাধু! একটু আগে তুমি বলছিলে না যে আমি সাধু?

সাধুই তো তুমি! তুমি কেন ওদের মতো হবে?

কে জানে? ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়তো আমিও সত্যি সত্যি করিনে!

দু-চোখ বড়ো বড়ো করে সান্ত্বনার মৃদু কণ্ঠে লিজা বললে,—ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না তুমি? কী বলছ? আজ কী হয়েছে তোমার সত্যি করে বলো তো?

আলিওশা কোনো উত্তর দিল না। কী উত্তর দেবে সে জানে না। বিচিত্র একটা প্রশ্নচিহ্ন তার মনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে প্রশ্নের রহস্য এখনো আবছায়ায় ঢাকা, কিন্তু নিত্য-যন্ত্রণার মতো তার উপস্থিতি।

সে শুধু বললে,—আমার এখনকার সব চেয়ে বড়ো দুঃখ কি জানো? পৃথিবীর সব মানুষের শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি আমার গুরু, তিনি আজ মৃত্যু-পথযাত্রী! তুমি জানো না লিজা, এই গুরুর কাছে আমার সারা মনপ্রাণ কী ভাবে বাঁধা! গুরু যেদিন চলে যাবেন সেদিন আমার আর কেউ থাকবে না। না, না, ভুল বলেছি, তুমি থাকবে। সেদিন তোমার কাছেই আমি আসব।

হ্যাঁ আলিওশা, শুধু সেদিন নয়, তারপর চিরদিন। চিরদিন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকব। তাই না? এবার আর-একটি চুমু খাবে না আমাকে?

আলিওশার মুখে চুম্বন আঁকল লিজার ওষ্ঠে।

যাও এবার, আলিওশার দেহে ক্রুশচিহ্ন এঁকে লিজা বললে,—যীশু তোমার সঙ্গে থাকুন। অনেক তোমার দেরি করিয়ে দিয়েছি, আর নয়। তোমার গুরুর কাছে যাও। আজ আমি প্রার্থনা করব তাঁর জন্যে আর তোমার জন্যে। তোমার আর আমার খুব ভালো হবে, ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করবেন, তাই না?

নিশ্চয়ই লিজা, নিশ্চয়ই।

মাদাম হোলাকভের সঙ্গে আর দেখা করবার ইচ্ছা ছিল না আলিওশার, কিন্তু লিজার ঘর থেকে বার হতেই একেবারে মুখোমুখি তাঁর সামনে পড়ে গেল সে। তাঁর প্রথম কথা থেকে সে বুঝল, ভদ্রমহিলা তাকে ধরবার জন্যেই ঠিক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আক্রমণ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোলো,—অ্যা, আলেক্সি ফিয়োডোরোভিচ! এসব কী শুনলাম? কী ভয়ানক কাণ্ড! আমার তো মনে হোলো স্বপ্ন দেখছি। না, না, এ সব ঠিক না! একেবারে বোকামি, নিরর্থক ছেলেমানুষি।

ঠিকই বলেছেন মাদাম হোলাকভ, তবে লিজাকে এ কথা বলবেন না। তাতে বেচারী খুব আঘাত পাবে, আর ওর শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হবে।

বেশ, বেশ। এই তো বুদ্ধিমান ছেলের উপযুক্ত কথা। তাহলে বাবা একটা কথা শুধিয়ে নিই,—মেয়ের কথায় তুমি খুব গুরুত্ব দাওনি তো? মানে, এই সব যা এতোক্ষণ বলছিলে, রোগা মেয়েটাকে প্রবোধ দেবার জন্যেই বলছিলে, তাই তো?

না, মোটেই না, স্পষ্টস্বরে ঘোষণা করলে আলিওশা,—ওকে যা বলেছি, তা আমার মনের কথাই বলেছি। তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই।

অ্যা, সত্যি বলছ? কিন্তু এ যে অসম্ভব ব্যাপার! ভাবতেই পারা যায় না। না বাবা, তোমার এ বাড়িতে আসা আর চলবে না। যদি আসো, তাহলে ঠিক জেনো, লিজাকে নিয়ে এখান থেকে আমি চলে যাব।

কেন? একটু হাসি হেসে আলিওশা বললে,—এতো বিচলিত কেন হচ্ছেন? লিজা তো ছেলেমানুষ। সে তো অনেক দেরির ব্যাপার,—এক-দেড় বছর—

তা বটে! কিছুটা যেন আশ্বস্ত হলেন মাদাম হোলাকভ,—দেড় বছরের মধ্যে ঝগড়া করবার আর মত বদলাবার সুযোগ হাজারবার তোমরা পাবে। কিন্তু যাই বলো বাপু, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। এই জন্যেই মেয়ের মূর্ছা যাওয়া আর রাত্রে ঘুম নেই। মেয়ে করছেন প্রেম, আর মায়ের মৃত্যু-যন্ত্রণা! ভালো কথা, ঐ যে তোমাকে চিঠি লিখেছে,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি—সেই চিঠিটি বাপু দাও তো!

না, সে চিঠি নিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই। তার চাইতে বলুন, কাটেরিনা আইভানোভ্না এখন কেমন আছেন?

সেইরকমই মূর্ছাগত ভাব, জ্ঞান ফেরেনি। মাসিমা এসেছেন, পাশে বসে কান্নে মাঝিক হা-হুতাশ করছেন। ডাক্তার এসেছিল, তা রুগী দেখে সে বুড়ো নিজেই মূর্ছা যাবার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত আমার গাড়ি করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যন্ত্রণার কি শেষ আছে? তার ওপর আবার লিজার আর তোমার এই কাণ্ড! দাও, দাও, তোমার গুরুর দোহাই, চিঠিটা আমাকে দাও। অন্তত একবার পড়ে দেখতে দাও।

না, আপনাকে দেখাব না। লিজা বললেও না। চিঠিটা আমার। কাল আমি আবার আসব। যদি অনুমতি দেন, অনেক দরকারি কথা বলব আপনার সঙ্গে। আজকের মতো বিদায়।

দুই

নষ্ট করার মতো সময় ছিল না আলিওশার। লিজার কাছে যখন সে বিদায় নিচ্ছিল, তখনি সে মনে মনে ভাবছিল, যে-করে হোক দাদা দিমিত্রির সঙ্গে দেখা তাকে করতেই হবে। দিমিত্রি তাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছে, এদিকে বেলাও হোলো তিনটে। আলিওশার সমস্ত মনটা আসলে পড়ে আছে মঠে,--সেখানে রোগশয্যায় তার প্রভু জোসিমা শয়ান। কিন্তু দিমিত্রির সঙ্গে দেখা এখন করতেই হবে। প্রতি মুহূর্তে তার মনে আশঙ্কা গভীরতর হচ্ছে যে কোথায় কী একটা মহা বিপদ যেন ঘনাচ্ছে,--যদিও কী সে বিপদ আর সেই বিপদ যখন সত্যিই আসবে তখন দাদাকে কতোটুকু সে সাহায্য করতে পারবে তার নির্দিষ্ট ধারণা তার নেই। সে মনে মনে বললে,—আমার অদর্শনে আজ যদি আমার প্রভু দেহত্যাগও করেন, যতো বড়ো অনুশোচনার ব্যাপারই তা হোক,—তবু তাঁর নির্দেশ আমাকে পালন করতেই হবে, খুঁজে বার করতেই হবে দাদাকে।

আলিওশা ঠিক করল, গতকালের মতো আজও সে বেড়া ডিঙিয়ে বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকে আচমকা দিমিত্রিকে ধরবে। যদি দিমিত্রি তখন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ফোমাকে বা বাড়ির মেয়েদের জানিয়ে গোপনে অপেক্ষা করবে সে। তাতে যতো দেরি হয় হোক। রাত্রিবেলা মঠে ফেরা প্রায় অসম্ভব।

নির্বিবাদে সে বেড়া ডিঙিয়ে সকলের অগোচরে বাগানবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। কেউ নেই, চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল আলিওশা। ঘরটা যে কতোদিনের পুরোনো তা বলার নয়। টেবিলের ওপর গতদিনকার গড়ানো ব্র্যান্ডির দাগ। একলা বসে বসে নানান অর্থহীন চিন্তা তার মনে ভিড় করে এল। প্রতীক্ষা আর দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে অসহ্য লাগতে লাগল এই নিঃসঙ্গ পরিবেশ। হঠাৎ তার কানে এল, গীটারের টুংটাং শব্দ, কাছাকাছিই কেউ বাজাচ্ছে। বাগানবাড়িতে ঢোকবার পথে বাঁ দিকে ঝোপের ধারে নিচু একটা সবুজ বেঞ্চি—ঐখানেই নিশ্চয় কেউ এসে বসেছে।

এবার শুরু হোলো গীটারের সঙ্গে গান। পুরুষের কর্কশ গলাকে কষ্ট করে মিষ্টি করবার চেষ্টায় নাকী-সুরে এ আওয়াজ। গানের কথা ও সুর দুই-ই খুব নিম্নস্তরের।

গান থামল। এবার মেয়েলী গলা.—নাকী নয়, তবে নেকী,—

এতোদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি কেন পাভেল ফিয়োডোরোভিচ, আমরা কি আপনার দর্শন পাবারও অযোগ্য ?

পুরুষের গলা উত্তরে, গম্ভীর দাম্ভিক,—না, না. তা নয়, তবে কিনা—

আলিওশা ভাবল, পুরুষটি নিশ্চয় স্মারডিয়াকভ আর স্ত্রীলোকটি এই বাড়ির মেয়ে, যে সম্প্রতি মস্কো থেকে এসেছে।

মেয়েটি বললে,—কী সুর, কী ছন্দ! থামলেন কেন, গান আবার!

আগের মতো অস্বাভাবিক গলায় আর ক'টা লাইন গাইল স্মারডিয়াকভ।

কাল সেই যে গানটি গেয়েছিলেন,—আহা! আরো মধুর সে গানটি আর একবার গাইবেন না ?

গান, কবিতা—এ সব কিছু না, সব র‍্যাবিশ! গম্ভীর গলায় বললে স্মারডিয়াকভ।

কী যে বলেন ? কবিতা যে আমার কতো ভালো লাগে ?

মেয়েদের ঐ রকম যা র‍্যাবিশ তাই ভালো লাগে। কবিতায় লোকে কথা বলতে পারে ? গবর্ণমেণ্ট যদি আইন করে দ্যায় যে কবিতায় কথা বলতে হবে, তাহলে সে গভর্ণমেণ্টই উঠে যাবে।

তা ঠিক বলেছেন। মেয়েটির গলা আরো গদগদ হয়ে উঠল,—সত্যি, আপনার কী বুদ্ধি, কতো গম্ভীর ভাবনা আপনি ভাবেন ?

ও কথা বলে দুঃখ দিয়ো না মারিয়া কনড্রাটিয়েভনা, নাটকীয় অভিব্যক্তিতে বলতে লাগল স্মারডিয়াকভ,—আমার বুদ্ধিকে আর কোন্ কাজে লাগাতে পেরেছি আমি ? ভাগ্যের বিধান আমাকে পঙ্গু করে রেখেছে সারা জীবন। শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি এক নোংরা ভিখিরী মেয়ের গর্ভে আমার জন্ম, আমার কোনো পিতৃপরিচয় নেই। মস্কোতে যখন ছিলাম, এই অপবাদ শুনে শুনে বুক পাথর হয়ে গেছে আমার। গ্রিগরি ভ্যাসিলিয়েভিচ এই কথা প্রচার করেছে, কিন্তু তা না করে জন্মের সময় নুন খাইয়ে সে আমাকে মেরে ফেললেই পারত। কতো দয়া! কতো করুণা! বাউণ্ডুলে ভিখিরী মায়ের সন্তান বলে হাটে-বাজারে সকলের মুখে আমার জন্যে কী সহানুভূতি! মুখ্য চাষী সব! সহানুভূতি জানায় কিনা আমাকে ? চাষী আবার সহানুভূতির কী বোঝে ? বোকা পাথর সব! সারা দেশটার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে!

কিন্তু, বিগলিত কণ্ঠে রমণী বললে,—আপনি যদি সৈন্যদলের কোনো কর্তা হতেন তাহলে কিন্তু দেশকে এমনি করে ঘেন্না করতেন না। দেশরক্ষার প্রয়োজনে তলোয়ার হাতে আত্মবিসর্জন দিতে আপনি ছুটে যেতেন।

মোটেই না! তাছাড়া সৈন্য-টৈন্য সব উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

ও মা! শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে তাকে ঠেকাবে কে ?

কী দরকার ঠেকাবার ? উনিশ শো বারো সালে প্রথম নেপোলিয়ন রুশিয়া আক্রমণ করেছিল। যদি জয় করতে পারত, তাহলে সুসভ্য ফরাসীদের অধীনে এই রুশেরা মানুষ হতে পারত। এমনি অসভ্য থাকতে হোতো না আমাদের।

সত্যিই কি বিদেশীরা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো? একটু চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলে মারিয়া,—আমি কিন্তু একটি রুশ ভদ্রলোককে জানি, যার একবার বদলে তিনজন ইংরেজকেও পছন্দ করতে আমি রাজী নই।

তা, যার যেমন পছন্দ।

কিন্তু যাই বলুন, আপনাকে আমার কেমন বিদেশী বিদেশী লাগে, ন্যাকামিতে গলা ভিজিয়ে মারিয়া এবার বললে, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ লজ্জা করে।

স্মারডিয়াকভ গম্ভীর মেজাজে ঘোষণা করল,—হুঃ! আসল কথা শোনো। বিদেশী লোক আর এখানকার লোক, নোংরামিতে দুই-ই সমান। দুজনেই সমান বদমাইস। যে বিদেশীদের নোংরামি ধরা পড়ে না, ওরা পরে চকচকে পোষাক আর ঝকঝকে জুতো। আমাদের বাবুরা নির্লজ্জের মতো কাদায় গড়াগড়ি যায়। ফিয়োডোর পাভলোভিচ পাগল হলে কী হয়, ও ঠিকই বলেছে, আমাদের এই জাতটির ওষুধ হোলো মার,—প্রচণ্ড মার! মার না খেলে সিধে হবে না।

আচ্ছা, আপনি আইভান ফিয়োডোরোভিচকে খুব খাতির করতেন, না?

করতাম, তবে এখন আর করিনে। আমাকেও অপমান করেছে, বলেছে ভিখিরী। জানো, আমার যদি আজ পকেট-ভার্তি পয়সা থাকত, তাহলে এক মুহূর্ত আমি ওদের বাড়িতে থাকতাম না। এই ডিমিট্রিকেই দ্যাখো। খাঁটি ভিখিরী, একটি ফুটো পয়সা নেই পকেটে। কোনো কাজের নয়,—এক কাঁড়ি টাকা উড়িয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া। অথচ কী দেমাক, আর কী খাতির! আমার মতো রান্না সারা মস্কো শহরে কেউ করতে পারে না। মূলধন থাকলে হোটেলের ব্যবসা করে লাল হয়ে যেতে পারতাম। নিষ্কর্মা ডিমিট্রি সাহেব ডুয়েল লড়ার চ্যালেঞ্জ হেঁকে বেড়াচ্ছে।

ডুয়েল: মারিয়া কনড্রাটিয়েভ্না বাধা দিয়ে বলে উঠল,—কী মজা, কী চমৎকার!

উঃ। ডুয়েল লড়াইতে মজাটা কোথায়?

মজা নয়! ডান হাতে পিস্তল নিয়ে দুই তরুণ অফিসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জান-কবুল করে লড়বে হয়তো কোনো সুন্দরী প্রণয়িনীর জন্যে! কী সাহস, কী রোমাঞ্চ! ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! ইস্, যদি মেয়েদের ডুয়েল লড়াই দেখতে দিত! আমি যদি একবার দেখতে পেতাম!

হুঁ, ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে ঠিকই। কিন্তু পিস্তলের গুলি যখন বুকের মধ্যে ঢোকে, মোটেই মজার ব্যাপার নয় সেটা। দৃশ্যটা দেখার আগেই প্রাণ চাইবে ছুটে পালাতে।

কী যে বলেন আপনি? মারিয়া মৃদু বিদ্রূপ করে বললে,—ধরুন, আপনি ডুয়েল লড়তে গেলেন। পিস্তলের নল দেখেই ছুটে পালাবেন নাকি?

উত্তর দিল না স্মারডিয়াকভ। শুনতেই যেন পায়নি। গীটারে টুংটাং আওয়াজ তুলে আবার নাকী-সুরে গান ধরল।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটল একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার। হঠাৎ হেঁচে উঠল আলিওশা।

হাঁড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চাঁকতে বন্ধ হোলো গান। আলিওশাকে সামনে এগিয়ে যেতে হোলো। দ্যাখে, স্মারডিয়াকভের গায়ে চকচকে পোষাক, পায়ে ঝকঝকে বুট, মাথায় তেল-চুকচুকে তেড়ি। মারিয়ার পরনে ফিকে নীল রঙের ঝুমঝুমে পোষাক। মেয়েটি যুবতী তাতে সন্দেহ নেই,—সুন্দরীও বলা যেত যদি মুখটি গোলগাল আর গাল দুটি ব্রণকলঙ্কিত না হোতো।

আলিওশা যেন এতোক্ষণ ওদের কোনো কথাই শোনেনি, এমনি ভাব দেখিয়ে স্মারডিয়াকভকে জিজ্ঞাসা করল,—আচ্ছা, আমার দাদা ডিমিট্রি কি শীগগির ফিরবে ?

স্মারডিয়াকভ শিথিলভাবে উঠে দাঁড়াল। মারিয়াও দাঁড়াতে দেরি করল না।

নিরাসক্ত দাম্ভিক কণ্ঠে উত্তর দিল স্মারডিয়াকভ,—ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচের খবর আমি কোত্থেকে জানব, আমি কি তার রক্ষক ?

না, বুঝিয়ে বললে আলিওশা,—হয়তো জানো, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

না, জানিনে। জানতে চাইওনে।

কিন্তু দাদা আমাকে বলেছে যে আমাদের বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটছে সে খবর তুমিই তাকে জানাবে,—বিশেষ করে আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌নার আসার খবর।

চুপ করে গেল স্মারডিয়াকভ। কিন্তু মুখের ভাব তার একটুও বদলাল না। পরমুহূর্তে কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল,- তুমি এখানে ঢুকলে কী করে ? গেট তো একঘণ্টা আগে থেকে বন্ধ !

পিছনের গলি দিয়ে, তারপর বেড়া টপকে।

মারিয়া কনড্রাটিয়েভ্‌নাকে উদ্দেশ্য করে আলিওশা আবার বললে,—এমনিভাবে ঢুকেছি বলে মাপ করবেন আমাকে। আমি তাড়াতাড়ি দাদাকে খুঁজে পেতে চাই সেই জন্যেই—

বারে ! আলিওশার ক্ষমা প্রার্থনায় বিগলিত হোলো মারিয়া,—পিছন দিয়ে এসেছেন, তাতে কী হয়েছে ? ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচও তো কতোবার ঐ পথেই আসেন। উনি বাগানবাড়িতে নেই বুঝি ?

না। কোথায় আছে এখন, সত্যি জানেন ? খুব জরুরী দরকার আছে আমার।

সত্যি বলছি জানিনে। আমাদের তো বলে যান না।

বন্ধু হিসেবে এখানে আমি আসি, শুরু করল স্মারডিয়াকভ,—এখানে পর্যন্ত আমার পেছনে ধাওয়া করে আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে ঐ ডিমিট্রি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কর্তার সব খবর তার জানা চাই। কী হচ্ছে বাড়িতে ? কী করছে বাবা ? কে বাড়িতে ঢুকছে, কে যাচ্ছে চলে ? কতো খবর বলব ? জানো, এরই মধ্যে দু-বার আমাকে ভয় দেখিয়েছে খুন করবে বলে।

খুন করবে ! তোমাকে ? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল আলিওশা।

কেন, খুন করতে পারে না ? মেজাজ তো দ্যাখোনি কালকের ? বলেছে, আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌নাকে যদি আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই, আর যদি সে বাড়িতে রাত

কাটার, তাহলে প্রথম শাস্তি হবে আমার। ভগবান জানেন কখন কী হয়! আমি তো ভাবছি পুলিসে খবর দেব।

মারিয়া সায় দিল,—সত্যি, সেদিন তো বলেছেন একে পুড়িয়ে ছাতু বানিয়ে দেবেন।

ওঃ, ছাতু বানাবে যখন বলেছে, তাহলে ও কেবল কথার কথা। দাদার সঙ্গে আমার যদি দেখা হোতো তাহলে আমি ঠিক তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারতাম।

একটু ভেবে স্মারডিয়াকভ আস্তে আস্তে ভাঙল,—দ্যাখো, আমার নামটি যদি ফাঁস না করো তো বলি। আজ সকালবেলা আইভান আমাকে ডিমিট্রির কাছে পাঠিয়েছিল, দুপুরে বাজারের হোটেলে যেন ওর সঙ্গে অবশ্য দেখা করে সেই কথা বলতে। আটটার সময় পৌঁছেও ডিমিট্রির আমি দেখা পাইনি, বাড়িওয়ালীকে খবরটা দিয়ে এসেছিলাম। এদিকে আইভানও বাড়িতে যায়নি। কর্তা একলা খেয়ে এখন ঘুমেচ্ছেন। দুই ভাই এখন নিশ্চয়ই মধ্যাহ্ন-ভোজন সারছে হোটেলে।

তাই নাকি? ধন্যবাদ। তাহলে আমি এক্ষুনি ওদের সন্ধানে যাই। মেট্রোপোলিস হোটেলে তো?

হ্যাঁ। তবে আমায় কথা দাও, আমার কাছ থেকে খবর পেয়েছ এটি যেন বোলো না। তাহলে বেঘোরে আমার প্রাণটি যাবে।

না, না, কিছুতেই না। বলব,—এমনি যেন হোটেলে ঢুকে ছিলাম, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ঠিক। এ বেচারীকে ডুবিও না।

আর এক মিনিট দেরি করল না আলিওশা। পেছনের পথে বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ে দৌড়ল বাজারের দিকে। মঠের জোব্বা পরে হোটেলে ঢোকা অস্বাভাবিক, তাই সে ঠিক করল, হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাইদের খোঁজ নেবে। অসুবিধে হোলো না, হোটেলের জানলায় সে দেখল আইভানের মুখ। আইভান তাকে ডাকল।

সে বললে,—এই পোষাক পরে ভেতরে যাব?

নিশ্চয়ই, আলাদা একটা ঘরে বসব আমরা। চট্ করে ঢুকে পড়ো, তোমাকেই আমার দরকার।

দ্বিরুক্তি করল না আলিওশা।

কিন্তু টেবিলে একলা আইভান। ডিমিট্রি তো নেই!

তিন

আলাদা ঘর নয়, তবে ঘরের এক অংশ আলাদা করে পরদা দিয়ে ঘেরা। অন্য খরিদ্দারদের দৃষ্টির অন্তরালে। বাইরে পরিচারকরা সর্বদা যাওয়া-আসা করছে, সাধারণ কলরবের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ছিপি খোলার আর বিলিয়ার্ড বলে কাঠি মারার আওয়াজ। অর্গানও একটা বাজছে পাশের ঘরে। আলিওশা জানত যে আইভান

সাধারণত এই ভাঁটিখানায় আসে না,—এমনি জায়গায় বসে সময় কাটানো পছন্দই করে না সে। তবে হ্যাঁ, ডিমিট্রির সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এমনি আস্তানা সে বেছে নিয়েছে। কিন্তু ডিমিট্রি কই ?

আইভান সবে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চায়ে চুমুক দিয়েছে। বললে,—কিছু খাবে, না শুধু চা হলেই চলবে ?

খিদে পেয়েছে।

বেশ, আমি বলে দিচ্ছি। ও হ্যাঁ, সঙ্গে একটু চেরী-জ্যাম চলবে ! মনে আছে, ছেলেবেলায় জ্যাম খেতে কতো ভালোবাসতে ?

হ্যাঁ চমৎকার ! এখনো ভালোবাসি ! জ্যামও চাই।

পরিচারককে হুকুম দিলে আইভান। তারপর বললে,—ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে আমার। সেই তোমার বয়েস যখন এগারো আর আমার পনেরো, ততোদিন পর্যন্ত। তারপর তো একেবারে ছাড়াছাড়ি। মস্কোতে গিয়ে একেবারে ভুলে গেলাম তোমাকে। তারপর তুমি যখন মস্কোতে গেলে, তখনও তো তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি। আবার দুজনে এখানে রয়েছি। তিন মাস হোলো এসেছি, এর মধ্যে একদিনও বলতে গেলে কথাই হয়নি তোমার সঙ্গে। কাল আমি আবার চলে যাব, তাই ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে যদি একবার দেখা হোতো, তাহলে বিদায় নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক দেখি তুমি চলেছ সামনে দিয়ে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে সত্যিই তুমি উৎসুক ছিলে আইভান ?

সত্যি। নিবিড় কণ্ঠে আইভান উত্তর দিল,—আমি তোমাকে চিনতে চাই, আমিও চাই, তুমি আমাকে চেনো। তারপর বিদায়। এই তিন মাস ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই তুমি আমার চোখের দিকে চেয়েছ, সে দৃষ্টির মধ্যে একটা নীরব প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। আমার তা ভালো লাগত না, তাই এড়িয়ে থেকেছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে এসেছে তোমার দৃষ্টি। মনে মনে বুঝেছি, তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালোবাসো, তাই অমনি করে আমার দিকে তাকাও, তাই না ?

ভালোবাসি বইকি আইভান। তুমি আমার দাদা, ভালোবাসব না তোমাকে ? ডিমিট্রি বলে,—তুমি একটা ঠাণ্ডা পাথর। আমি বলি,—না, তুমি একটা প্রহেলিকা, একটা প্রশ্ন। এখনো আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন আছে, তবু মনে হয়, কিছুটা তোমাকে বুঝেছি, ঐটুকু আজ সকালের আগে পর্যন্ত বুঝতাম না।

হাসল আইভান, বললে,—কতোটুকু বুঝলে ?

আলিওশাও হাসিমুখে ঘুরিয়ে শুধোল,—বললে রাগ করবে না ?

না।

বুঝেছি এই যে তেইশ বছরের একটা তরুণ যতোটা ছেলেমানুষ হতে পারে, তুমিও ততোটাই, বরং তার চাইতে আরো অনেক বেশি। নিতান্ত কাঁচা। কী হোলো ? শুনে খুব অপমান বোধ করলে !

মোটেই না, বরং আশ্চর্য লাগল। ঠিক ধরেছ তুমি। আজ সকালে কাটিরার কাছ

থেকে ফেরার পর থেকে আমিও খালি আমার ছেলেমানুষির কথাই ভাবছি। এতো ভালোবাসলাম যে মেয়েকে, চূড়ান্ত ভাবে বিশ্বাস হারিয়েছি তার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে সারা সৃষ্টির ওপর আস্থা চলে গেল। মনে হোলো, বিষবৎ এই সংসার, অর্থহীন এই জীবন। কিন্তু তবু বেঁচে আছি, খাসা আছি। পানপাত্রে এক চুমুক দিয়েই দোষ সুধা নয়, তিক্ত কষায়,—তবু ছাড়ছিনে, সব পানীয়টা গলার মধ্যে উজাড় করে দেবই। তিরিশ বছর বয়েস হলে এক চুমুকই ভাবতাম যথেষ্ট, কিন্তু সে বয়েস এখনো হয়নি, তাই ভাগ্যের কটুস্বাদে ভয় পাইনে, বঞ্চনায় ভেঙে পড়িনে।—যৌবন জয় করেছে হতাশাকে। যৌবনের তৃষ্ণা হতাশা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারব না, জীবনের আগ্রহ দুর্ভাগ্য দিয়ে লুপ্ত করতে পারব না, অন্তত যতোদিন না তিরিশ বছর বয়েস হয়। তারপর সব হয়তো আপনিই যাবে। কিন্তু ততোদিন আঁকড়ে থাকব জীবনকে! এই দুরন্ত জীবন-পিয়াসা,—বুড়ো নীতিবাদীরা বলে, এ একটা নিকৃষ্টতরের কামনা। বোকা তারা, জানে না তারা, এই জীবন-পিয়াসা হোলো কারামাজভদের স্বধর্ম,—এ ধর্ম হীন নয়! সীমাহীন দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও সব কিছুর চেয়ে সকলের চেয়ে ভালোবাসি এই জীবনকে। বসন্তের নতুন পাতা আর নীল আকাশ, এদের ভালোবাসব না? কত মানুষ কাছে কাছে আসে, ভালোবাসব না তাদের? ইতিহাস আর বীরত্ব-গাথায় যাদের নাম, তাদের কথা ভেবে নেচে উঠবে না মন?…এই নাও, তোমার খাবার এসেছে। খাসা রান্না করে এরা, পেট ভরে খাও। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ঠিক করেছি, এইবার ইউরোপে পাড়ি দেব। যাব সভ্যতার সেই অপূর্ব সমাধি-রাজ্যে। সেখানকার প্রতিটি সমাধি-ফলকে লেখা আছে প্রাচীনের কতো জ্বলন্ত জীবনের কাহিনী, কতো বিশ্বাস, কতো সত্য, কতো সাধনার নিদর্শন। সেই সব সমাধি-ফলকে আমি চুম্বন করব, ফেলব চোখের জল। দুঃখের নয়, আনন্দের অশ্রু, জীবন-প্রেমের আবেগ। এই প্রেম অর্থহীন। তর্ক দিয়ে, তত্ত্ব দিয়ে একে মেলে না, মেলে শুধু যৌবন দিয়ে। কী বলছি বুঝতে পারছ আলিওশা?

খুব বুঝছি। জীবনকে তুমি এতো ভালোবাসো জেনে আমারও আনন্দের সীমা নেই। জীবনকে ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা।

ঠিক বুঝেছ। ভালো কথা, শুনেলাম, তুমি নাকি মঠ ছাড়ছ শীগগিরই।

হ্যাঁ, আমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকে সংসারে ফিরে আসতে।

চমৎকার! তাহলে সংসারের পথেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার তিরিশ বছর বয়েস হবার আগেই। পানপাত্রে বিমুখতা তখনো আমার আসবে না। বাবার অবশ্য ওটা আসবে না সত্তর বছরের আগে, অবশ্য মুখে বলে আশী বছরের আগে নয়। এদিকে ভাঁড় হলে কী হয়, কথাটা বাবা বলে ঠিক। বাসনার বিষবৃক্ষের মোটা গুঁড়িতে বাবার নৌকো বাঁধা। আমার পক্ষে তিরিশ বছরই যথেষ্ট। ভালো কথা, ডিমিট্রিকে দেখেছ আজ?

না, তবে স্মারডিয়াকভের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আলিওশা স্মারডিয়াকভের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বর্ণনা দিল। পরে বললে,—তুমি কিন্তু দাদাকে কিছু বোলো না। বেচারা স্মারডিয়াকভ মারা পড়বে তাহলে।

আইভান ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল। একটু পরে বললে,—নাই হোক দেখা ডিমিট্রির সঙ্গে, কোনো দরকার নেই আমার।

তুমি কি খুব শীগগির চলে যাবে?

হ্যাঁ, যতো শীগগির পারি?

কিন্তু, আলিওশা না বলে পারল না,—বাবা আর ডিমিট্রি,—এদের কী হবে? ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মিটবে কী ভাবে?

ধমক দিয়ে উঠল আইভান,—ঐ কথা তুমি বারে বারে বলো। আমি কি জানি? আমি কি ওদের রক্ষাকর্তা? আমি চলে যাব আমার নিজের পথে। ভেবো না যে আমি ডিমিট্রিকে হিংসা করি। তিন মাস ধরে তার সুন্দরী প্রেয়সীকে চুরি করার আমি চেষ্টা করছিলাম। আমার কাজ ছিল, সে কাজ মিটলেই আমার চলে যাবার কথা ছিল। তুমি নিজে দেখেছ যে সে কাজ আজ সকালে মিটেছে।

কাটেরিনা আইভানোভ্নার বাড়িতে?

হ্যাঁ, চিরদিনের মতো মুক্তি পেয়ে এসেছি আজ। তুমি জানো না, কতো হাল্কা হয়ে গিয়েছে আমার বুক। মুক্তির এই প্রথম প্রহরের আনন্দে আমি তো প্রায় মদ অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম আর কি! গত ছ-মাস ধরে যে যন্ত্রণায় আমি ভুগেছি, সেই যন্ত্রণার অবসান যে এমনি সহজে এক মুহূর্তেই ঘটে যাবে, কাল পর্যন্ত তা আমি ভাবতেই পারিনি।

ভারি যে ফুর্তি দেখছি তোমার! ভালোবাসার এমনি পরিণাম, এতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তোমার?

ভালোবাসা কাটিয়ার জন্যে? মনের গভীরে তাকিয়ে দেখছি চিহ্নমাত্র নেই। মোহ ছিল, আকর্ষণ ছিল,—এখনো আছে! তবু ওকে ছেড়ে যাওয়া শক্ত নয়।

আলিওশা গম্ভীর গলায় বললে,—তাহলে বোধহয় ভালো ওকে কোনোদিনই বাসতে না?

বাসতাম, বাসতাম, একশোবার বাসতাম। ভালোবাসার তুমি কি বোঝো হে! এই ভালোবাসার জন্যে যন্ত্রণাও কম পাইনি! কাটিয়াও ভালোবাসত আমাকেই, ডিমিট্রিকে নয়। কিন্তু ডিমিট্রি ওর সেধে-নেওয়া যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার নেশাতেই ও পাগল, ভালোবাসায় নয়। এই নেশা হয়তো সারা জীবনে ওর কাটবে না। মাঝখান থেকে আমি মুক্তি পেয়ে বাঁচলাম। বলো, একটু মদ খাবে আমার এই মুক্তির আনন্দে?

না ভাই, আলিওশা বাধা দিল,—মদ থাক। তাছাড়া মন আমার ভালো নেই।

ঠিক। মন তোমার ভালো নেই অনেকদিন থেকেই, তা আমার চোখে পড়েছে।

কাল সকালেই কি তুমি চলে যাবে?

সকালে যাব তা তো বলিনি; হয়তো তাই যাব। অনেকদিন আগেই ঐ বুড়োটার সঙ্গ ছেড়ে আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলার অনেক সময় আমার আছে। কথা আমাদের অনেক বাকি, তাই না?

উত্তর দিল না আলিওশা। চমকে উঠল একটু।

চমকালে কেন ? আইভান বললে,—কিন্তু কিসের কথা ? কাটিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসার ? ভাঁমিট্রি আর বাবার লড়াই-এর ? দেশের পরিস্থিতির ? নেপোলিয়নের ? নাকি এসব নয়, অন্য কথা, তাই না ?

হ্যাঁ আইভান। অন্য কথা।

জানি আমি, বিশ্বাসের কথা, উপলব্ধির কথা। গত তিন মাস ধরে তুমি নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছ আর মনে মনে প্রশ্ন করেছ, কী আমি বিশ্বাস করি, আর কী করিনে। বলো, ঠিক বলিনি ?

ঠিকই বলেছ। কিন্তু মনে মনে হাসছ নাকি ?

পাগল ! তুমি আমার আদরের ছোট ভাই, তোমার কথায় আমি হাসতে পারি ? বলো, কোথা থেকে আলোচনা শুরু করব ? প্রথমেই তুমি জানতে চাও, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি কিনা, তাই না ?

বাঃ, কালই তো তুমি বাবার ওখানে বলছিলে যে ঈশ্বর নেই !

সে বলেছিলাম তোমাকে চটাব বলে। কিন্তু আজ মুখোমুখি তোমার সঙ্গে বসে আলোচনা করতে আমার আপত্তি নেই। তুমি যে শুধু আমার ভাই তা নও, তোমার বন্ধুত্ব আমি চাই। সত্যি বিশ্বাস করো, ঈশ্বর আছেন একথা আমি মানি।

ঠাট্টা করছ না তো ?

এই দ্যাখো ! কাল জোসিমার ঘরেও ঐ একই অভিযোগ শুনলাম যে আমি নাকি ঠাট্টা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক পাপী বলেছিল,—ঈশ্বর যদি না থাকেন, তাহলে তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হবে। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, মানুষ তাঁকে আবিষ্কার করেছে, সৃষ্টি করেছে,—এইটেই মানুষের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এখন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন না মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে,—এ হোলো এক অনন্ত তর্কের কথা, যার কোনো মীমাংসা নেই। এ নিয়ে ছাত্রেরা মাথা ঘামাচ্ছে, পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাচ্ছেন, দার্শনিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি মাথা নাই বা ঘামালাম। আমার পক্ষে ঢের সহজ, সোজাসুজি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আর ঘনত্ব দিয়ে। এ নিয়েও আবার পণ্ডিতদের তর্কের অন্ত নেই ! জ্যামিতি বলে,—দুটো সমান্তরাল রেখা কখনো মেশে না। কোনো কোনো দার্শনিক বলেন,—মেশে, মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার বাইরে কোন্ এক অসীমে গিয়ে দুটো লাইন আলবৎ মিশে এক হয়ে যায়। অলৌকিক তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তাই সরলভাবে আমি বুঝি,—ঈশ্বর আছেন। কল্পনা করি,—তাঁর পরম করুণা আছে, তাঁর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত একটা অর্থ আছে,—যে অর্থ নাই বা বুঝলাম। তবে আমার অসুবিধে কোথায় জানো ? ঈশ্বরকে মানলেও তাঁর সৃষ্ট এই যে জগৎ-সংসার, সাদা চোখে একে আমি মানতে পারিনে।

তার মানে ?

বুঝিয়ে বলি শোনো। শিশু যেমন কল্পনা করে তেমনি আমিও কল্পনা করি যে

মানুষের সর্ববেদনার একদা অবসান হবে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের হীন কল্পনা একদা বিলীন হবে ম্লান মরীচিকার মতো, মানুষের জ্যামিতি-সংকীর্ণ মনের দৈন্যতা লুপ্ত হবে একদিন,—সৃষ্টি ও প্রলয়ের শেষ সন্ধিক্ষণে চরম ঐকতানের পরম মুহূর্তে শান্ত হবে সমস্ত যন্ত্রণা, সর্বপাপের হবে পরিত্রাণ, ক্ষমার পূত সলিলে পবিত্র হবে সৃষ্টি। কল্পনা করি, কিন্তু বিশ্বাস করিনে, মানতে পারিনে। সমান্তরাল দুই রেখা সত্যি যদি কোথাও মেলে, চোখে দেখলেও তা আমি মানব না।

এতোগুলো কথা হৃদয়াবেগের সঙ্গে বলে চুপ করল আইভান।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল আলিওশা,—বেশ, এবার তুমি বলবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকে কেন তুমি মানতে পারো না?

বলব বইকি, নিশ্চয়ই বলব। এতো কোনো গোপন কথা নয়। আলিওশা, ভাই, আমি তোমারই মতো তরুণ, কিন্তু এই সংসারের দৃশ্য তোমার থেকে কিছুটা বেশি আমি দেখেছি। তবু তোমাকে আমি খারাপ করতে চাইনে, তোমার বিশ্বাসের অটল দুর্গ ভাঙতে চাইনে আমি। তোমার সঙ্গে কথা বলে হয়তো নিজেরই অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাব আমি।

শিশুর মতো হাসি হাসল আইভান। এমনি হাসি আইভানের মুখে আগে কখনো আলিওশা দেখেনি।

চার

আইভান বলতে আরম্ভ করল,—একটা কথা তোমার কাছে স্বীকার করব। প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা, এ যে প্রকৃতপক্ষে সম্ভব তা আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। যারা দূরে থাকে, তাদের হয়তো ভালোবাসা যায়, কিন্তু যারা কাছে রয়েছে তাদের নয়। কুষ্ঠরোগীর গলিত ক্ষতের মার্জনা হয়তো কর্তব্যবোধে করা চলে, কিন্তু তার মধ্যেও আছে আত্মনিগ্রহ, ভালোবাসা নেই।

আলিওশা বললে,—হ্যাঁ, এ কথা প্রভু জোসিমাও অনেকবার উল্লেখ করেছেন। প্রেমের শিল্পকর্মে যে পারদর্শী নয়, সামীপ্য তার কাছে বাধা। কিন্তু তার বিপরীতও আছে। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের অতুলনীয় নিদর্শন আমি দেখেছি। সে প্রেম যীশুখৃষ্টের প্রেমের সমতুল।

হবে। তবে আমি জানিনে, আর আমার মতো পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকও এ প্রেমের পরিচয় পায়নি। আমার ধারণা, যীশুখৃষ্টের প্রেম এক অলৌকিক ব্যাপার,—সাধারণ লোকের অন্তরে তা খুঁজতে যাওয়া বিফল সন্ধান। তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, আমরা কেউই ঈশ্বর নই। মনে করো, আমি তীব্র যন্ত্রণা পাচ্ছি। সে যন্ত্রণা অপরে পাচ্ছে না, অপরে তা উপলব্ধিও করতে পারে না। তার কারণ, সে অন্য লোক, আমি নয়। তাছাড়া যে সব সামান্য যন্ত্রণা,—যেমন ধরো ক্ষুধার,—সে যন্ত্রণার সহানুভূতি মেলে, সাহায্য মেলে; কিন্তু যে যন্ত্রণা মহান,—যেমন আদর্শের যন্ত্রণা,

—তার কোনো সমব্যথী নেই। সে যন্ত্রণার কথা শুনলে অপরে নাক সিঁটকোয়।… বয়স্ক লোকেদের কথা থাক, শিশুদের কথা ভাবো। আমার মনে হয়, একমাত্র এই শিশুদেরই ভালোবাসা যায়। আমি জানি, শিশুদের তুমি খুব ভালোবাসো। এই আমরা,—স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, নীচ-মনা এই কারামাজভ গোষ্ঠীর বংশধর,—আমরাও শিশুদের ভালো না বেসে পারিনে। আমরা যারা বয়স্ক,—তাদের মতো ওরা নয়, ওরা যেন অন্য কোনো জীব—সেই জন্যেই। আমি এক জেলখানার আসামীকে চিনতাম, সে ডাকাতি করেছে, খুন করেছে, শিশুহত্যাও বাদ রাখেনি। কিন্তু জেলখানায় বসে শিশুদের ওপর তার কী টান! সারাদিন সে জানলার ধারে বসে দেখত জেলের প্রাঙ্গণে বাচ্চারা খেলা করছে,—তাদের সঙ্গে আশ্চর্য ভাব জমিয়েছিল সে। কী আলিওশা, শুনছ? থাক্, আর বলব না। আমারও মাথাটা ব্যথা করছে, মনটাও ভালো লাগছে না।

তোমার কথায় কী এক বিচিত্র আভাস পাচ্ছি, আইভান। তুমি যেন অন্য জগতের মানুষ।

ভাইএর কথায় কান না দিয়ে আইভান আবার বলতে লাগল,—ভালো কথা, কিছুদিন আগে মস্কোতে এক বুলগেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। স্লাভ-বিদ্রোহের আতঙ্কে তুর্কীরা সারা বুলগেরিয়ায় যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, সে কাহিনী সে আমাকে শোনাল। গ্রামকে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়, মেয়েদের সর্বনাশ করে, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে হত্যা করে। বন্দীদের কানে পেরেক মেরে সারারাত ঝুলিয়ে রেখে তার পরদিন খুঁচিয়ে মারে। আরো কতো রকম বীভৎস অত্যাচার, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। পাশবিক বললে কম বলা হোলো, মানুষের আবিষ্কৃত বীভৎসতার কাছে পশুর স্বাভাবিক হিংসা হার মানে। শিশুদের ওপর অত্যাচারের পদ্ধতিগুলো দ্যাখো। গর্ভিণী নারীর জঠর কেটে অজাত ভ্রূণকে তারা ধ্বংস করে, মা'র কোল থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে তাকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়নেট দিয়ে গাঁথে। খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে শিশুকে হাসায়, তারপর সেই হাসিমুখের কাছে একটা পিস্তল এগিয়ে নিয়ে যায়! খেলনা ভেবে শিশু হাত বাড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে হাসিমুখটি গুঁড়িয়ে দ্যায়। কী চমৎকার. নৃশংসতার কী নব-নব আবিষ্কার!

আলিওশা বাধা দিল,- এসব কথা বলছ কেন? কী তুমি বলতে চাও আইভান?

আমি বলতে চাই যে শয়তানকে মানুষই সৃষ্টি করেছে মানুষের নিজের রূপে।

তাহলে ঈশ্বরকেও মানুষই সৃষ্টি করেছে, আলিওশা উত্তর দিল,—আর সেই ঈশ্বরের মধ্যে মানুষেরই রূপ।

হেসে উঠল আইভান। বললে,—চমৎকার তুমি কথা ঘোরাতে পারো। আমার কথা দিয়েই আমাকে জবাব দিলে। খুশী হলাম। মানুষ যদি তার নিজের ছাঁচেই তার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে থাকে তাহলে সে ঈশ্বরও চমৎকার। আমি যা বলতে চাই তার মধ্যে তোমার তত্ত্বকথা নেই, শুধু কয়েকটা ঘটনা মাত্র তোমাকে বলি।

নৃশংসতার সত্য ঘটনা,—এমনি অনেক ঘটনা আমি বই থেকে, কাগজ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছি। এ সমস্ত ঘটনার কাছে ঐ বিদেশী তুর্কীদের অত্যাচার হার মানে। রিচার্ড লোকটার কাহিনী শোনো। বছর পাঁচেক আগে নরহত্যার অপরাধে মাত্র তেইশ বছর বয়সে লোকটার ফাঁসি হয়। সভ্য ইয়ুরোপের মধ্যমণি খাস সুইজারল্যাণ্ডের ঘটনা। রিচার্ড ছিল জারজ সন্তান, বাপ-মা বছর ছয় বয়সে তাকে পরিত্যাগ করে, মানুষ হয় সে পাহাড়ী শূকরপালকদের হাতে। শূকরপালকরা তাকে ভেড়া চরাবার কাজে খাটাত,—পোষাক দিত না! ভোর সাতটার শীতের অন্ধকারে পালের সঙ্গে তাকে মাঠে পাঠাত। একবারও মনে ভাবেনি তারা যে নিষ্ঠুর কাজ করছে, কেননা ছেলেটা তো তাদের দাস মাত্র। শূকরদের খাবার যদি বা খিদের জ্বালায় সে চুরি করে মুখে দিত, ধরা পড়লে সেই মুখে পড়ত চাবুক। তবু ছেলেটা মরল না, শক্ত-সমর্থ হোলো, হয়ে উঠল পাকা চোর। বড়ো হয়ে সে এল জেনিভা শহরে দিন-মজুরের কাজ করতে। জন্তুর মতো জীবন, যা রোজগার করে মদ খেয়ে ওড়ায়। চুরির উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধকে হত্যা করার অপরাধে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে সে। বিচারে হয় মৃত্যুদণ্ড। জেলখানার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো ধর্মযাজক, সমাজ-সংস্কারক আর পরোপকারী মহিলার দল তাকে ঘিরে ধরল। জেলখানার মধ্যে তারা লিখতে পড়তে শেখাল, শোনাল বাইবেলের বাণী। তারপর দিনের পর দিন কতো অনুরোধ, কতো উপদেশ কতো সংপরামর্শ,—তার নৈতিক মঙ্গল-বিধানের সে কী নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। অবশেষে সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করল। না করে উপায় নেই, ধর্মের খাঁচায় বাধা পড়েছে সে! বিচারকদের সে জানাল যে এতোদিন সে জন্তুর জীবন যাপন করেছে, আজ প্রভু মুখ তুলে চেয়েছেন, তাঁর আশীস-আলোর স্পর্শে সে মানুষ হয়েছে। সারা জেনিভা শহরের যতো ধর্মাত্মা আর মানব-প্রেমিকের দল,—তাদের উদ্দীপনার অন্ত নেই। শহরের সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় জেলখানায় ভেঙে পড়ল, তাকে চুম্বন করে বললে, 'এতোদিনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তুমি পেয়েছ। তুমি আমাদের ভাই।' রিচার্ডের অন্তরও কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে,—'হ্যাঁ, তাঁর আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। শিশুকালে শুয়োরের খাদ্যের এককণা ভিক্ষা মেগেও যে পায়নি, সেই আমিই কিনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম। আমার প্রাণদণ্ড মঙ্গলময়ের পায়ে আত্মদান।' ভ্রাতৃবৃন্দ বললে, —'হ্যাঁ রিচার্ড, ভগবানের নামে তুমি মরো। খুন যখন করেছ, তখন খুন হয়েই তোমার পরিত্রাণ। শুয়োরের খাবার যখন তুমি চুরি করতে, বড়ো পাপ কাজ করতে; কিন্তু তখন ঈশ্বরকে তুমি তো চেনোনি। এতোদিনে চিনেছ, এবার নির্ভাবনায় তাঁর নামে তুমি মরো।' মহিলারা প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বললে,—'সদ্গতি হোক তোমার।' জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এল। রিচার্ডের দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে, অস্ফুটস্বরে সে বললে,—'আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। প্রভুর আশীর্বাদ পেয়ে আজ আমি মরছি।' ভক্তরা সমস্বরে বললে,—'আহা! ভগবান তাঁর চরণে তোমাকে ঠাঁই দেবেন, মরো রিচার্ড মরো।' ভ্রাতৃবৃন্দের চুম্বন-অঙ্কিত দেহটা সান্ত্রীরা টেনে নিয়ে গেল গিলোটিনের নিচে, —পরম ভ্রাতৃবৎসলতার সঙ্গে তার মাথাটা তারা কাটল।

একটি শিশুর কাহিনী শুনবে? মাল-টানা ঘোড়াকে মালিক মারে, পিঠ মুখ চোখ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা মানুষের হাতে মার খাবার জন্যেই ঈশ্বর ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর শিশুর বেলায়? এক সুশিক্ষিত অভিজাত দম্পতি তাঁদের সাত বছরের মেয়েকে বার্চ গাছের ডাল দিয়ে ঠেঙাতেন। ডালটা ছিল কাঁটা-ভর্তি, এক-এক আঘাতে ডবল যন্ত্রণা হোতো, তাই এই অস্ত্রটাই তাঁরা পছন্দ করেছিলেন। এ ছাড়া কিল চড় লাথি, অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা—এ সব শাস্তি তো ছিলই! এক একবারের শাসন হোতো পুরো দশ মিনিট ধরে। প্রত্যেকবার শেষের দিকে মেয়েটা আর কাঁদতে পর্যন্ত পারত না, শুধু ছটফট করত আর অবোলা পশুর মতো হাঁফাত। কেমন করে জানিনে, ব্যাপারটা বিচারকদের কানে গেল। বাপ-মা'র হয়ে আদালতে দাঁড়ালেন বিখ্যাত এক ব্যারিস্টার। তিনি বললেন, —'বাপ-মা শিশুর মঙ্গলের জন্যে তাকে শাসন করবে এতো প্রতিটি ভদ্র-পরিবারের অতি স্বাভাবিক ঘটনা,—এ ব্যাপারটা যে কোর্টে গড়াবে সেইটাই লজ্জাকর অসভ্যতা।' জুরিরা বেকসুর খালাস দিলেন বাপ-মাকে, দর্শকেরা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল। আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তো ঐ বাপ-মা'র সম্মানের জন্যে কিছু চাঁদাও তুলে ফেলতাম! কিন্তু ঐ প্রহৃত নিপীড়িত অন্ধকারাগারে বন্দী শিশুটির কথা ভাবো। কেন সে অশ্রুজলে ভিজোবে তার বুক, ছোট্ট মুঠি দিয়ে বুকে আঘাত করে কেন সে কাঁদবে, রক্ষা করো ভগবান বলে! শিশুর শিক্ষা আর মঙ্গলসাধনের নামে তার ওপর বয়স্কদের এই বীভৎস নৃশংসতা কেন চলবে দিনের পর দিন! শিক্ষা! আর্ত শিশুর এক ফোঁটা চোখের জলের দাম তার সমস্ত শিক্ষার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি,—তা তুমি বোঝো সন্ন্যাসি? বয়স্ক লোকের দুঃখ-বেদনার কথা বাদ দাও, তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে, কষ্ট তো পাবেই। কিন্তু এই সরল নিষ্পাপ অবোধ শিশুরা? যাক আলিওশা, এসব কথা শুনতেও তোমার কষ্ট হচ্ছে, আর বলব না।

না, না, বলো ভাই বলো। আমিও কষ্ট পেতেই চাই।

আর একটিমাত্র কাহিনী। রুশ পুরাবৃত্তের এক কেতাব থেকে আমি পেয়েছি, লেখকের নামটা এখন মনে পড়ছে না। আমাদের রুশিয়ার জমিদারী-প্রথার ক্রূরতম এক নিদর্শন। জাঁদরেল এক সেনাপতি, সম্ভ্রান্ত তাঁর পরিবার, বহু অভিজাত ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা, মস্ত বড়ো জমিদারীর সকল প্রজার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। প্রাসাদে তিনি থাকতেন বিলাস আর আড়ম্বর নিয়ে, প্রতিবেশী প্রজারা তটস্থ। শত-শত শিকারী কুকুর ছিল তাঁর। তাদের সেবা করত একশোটি ইউনিফর্ম-পরা ভৃত্য। একদিন একটি চাষীর ছেলে খেলার ছলে ঢিল ছোঁড়ে। সেই ঢিলে জেনারেলের এক প্রিয় কুকুরের পায়ে আঘাত লাগে। জেনারেলের চোখে পড়ল। তিনি হাঁকলেন, কুকুর খোঁড়াচ্ছে কেন? ভৃত্যরা বলল,—হুজুর, ঐ ছেলেটা…! আট বছরের শিশুটাকে পাকড়াও করে এনে জেরা-কুঠরিতে বন্দী করে রাখা হোলো। তার পরদিন সকালবেলা শিকারের সাজে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চেপে জেনারেল এলেন, সঙ্গে পাত্র-মিত্র-সঙ্গী-শিকারী, ভৃত্য আর কুকুরের পাল! কতো রকম দামী পোষাক, কতো অশ্বারোহী! বিরাট এক মিছিল।

বাড়ির চাকর-বাকরকেও ডাকা হোলো। সবাই দাঁড়ালো জমিদার-বাড়ির সামনে। এবার ডাকা হোলো বন্দী শিশুর কুমারী মাকে। অপরাধী শিশুটিকে দাঁড় করানো হোলো মায়ের পাশে। জেনারেল হুকুম দিলেন শিশুকে বিবস্ত্র করতে। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে, জমে যাচ্ছে ছোট ছোট হাত-পা,—বুকের কান্নাটা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে শীতে। জেনারেল আবার হুকুম দিলেন,—দৌড় করাও। দৌড়ল শিশুটি, পর মুহূর্তে এক হুংকারে জেনারেল তার পিছনে লেলিয়ে দিলেন কুকুরের পালকে। শিকারী কুকুরের দল জননীর চোখের সামনে তার সন্তানকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল। তুমি বলো, এই যে জেনারেল,— এই নৃশংস শয়তান, এর কী শাস্তি হওয়া উচিত?

পাংশু মুখ তুলে রুদ্ধ কণ্ঠে আলিওশা বললে,—গুলি করে মারা উচিত লোকটাকে!

বহুত আচ্ছা! বাঁকা হাসি হেসে বললে আইভান,—তাহলে এমনি কথা তোমার মুখ থেকে বার হোলো! খাসা সাধু তো তুমি? তোমার বুকেও দেখি শয়তানের বাসা!

না, না, যা বললাম তা ঠিক নয়, তবে কিনা—

হ্যাঁ, প্রশ্ন ঐ--তবে কিনা, তোমাদের নীতিশাস্ত্র অনুসারে যা ঠিক নয়, যা অন্যায়, তারই এখন দুনিয়াতে দরকার তা নইলে এ দুনিয়ার আর কিছুই হবে না।

কী বলছ তুমি আইভান? অন্যায়ের প্রতিদান অন্যায় দিয়ে? কী তুমি জানো ভালোমন্দের?

জানি না, জানতে চাইও না তত্ত্বকথা। শুধু যা ঘটনা তাই নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চাই। এর বেশি জানতে গেলেই ভুল হবে, ঘটনাকে অস্বীকার করা হবে।

এসব কথা তুমি আজ আমাকে বলছ কেন? ক্লিষ্টকণ্ঠে আলিওশা শুধোলে,—কী তুমি চাও আমার কাছে?

ওরে শোন, শোন, তুই আমার বড়ো আদরের ছোট ভাই। তোকে আমি আঁকড়ে রাখতে চাই। তোর ঐ সাধু জোসিমার কাছে তোকে আমি ছেড়ে দিতে চাইনে।

হঠাৎ চুপ করল আইভান। দুঃখের গভীর ছাপ ফুটে উঠল তার মুখে। একটু পরে সংযত গম্ভীর গলায় বলতে লাগল সে,—শোন্, শিশুদের উদাহরণ আমি যে দিলুম, তা শুধু আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে। বিশ্বমানবের অশ্রুজলে মেদিনীর মূল পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেছে,—সেসব অশ্রু-বিসর্জনের কাহিনী নাই বা আলোচনা করলাম! আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণী,—এই অশ্রুর ইতিহাসের কারণ আমার কাছে অবোধ্য। মানুষেরই দোষ নিশ্চয়, ঈশ্বর তাকে স্বর্গে রেখেছিলেন। সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছে। তাই দুঃখই তার ভাগ্যলিপি, বৈজ্ঞানিক কার্যকারণের মতো দুঃখের বিধান—এ জন্যে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না, কিন্তু এমনি নৈতিক তত্ত্বে আর জ্যামিতিক তথ্যে আমার সান্ত্বনা কই? দোষ-গুণে সব কিছুর বিচার বিধাতার হাতে, একথা ভেবেই বা আমার স্বস্তি কই? অন্যায়ের বিচার চাই,—সে বিচারসভা স্থানকালের অন্তরীক্ষে বসলে চলবে না। এই পৃথিবীতে, এই নশ্বর জীবনেই সে বিচার সমাধা করতে হবে। এই বিচারে আমি বিশ্বাস করি, —আমি

নিজে চোখে দেখে যেতে চাই। পৃথিবী কবে কোন্ ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে, সে ভরসায় কি সারা জীবন শুধু অবিচার সহ্য করে যেতেই হবে? একদিন হয়তো উঁচুনীচ সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ থাকবে না, সত্য সুন্দর ও শিবের প্রতিষ্ঠা হবে এই পৃথিবীতে—সে-যুগের প্রতীক্ষা করে আছে সমস্ত মানুষ, সে-যুগের প্রার্থনা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে, বিশ্বাসে। সেই বিশ্বাস আমারও মনে আছে। কিন্তু আজকের ঐ শিশুরা? আজ যারা বঞ্চিত, নিপীড়িত? তাদের দুঃখের মুক্তি কই, তাদের প্রশ্নের উত্তর কই? প্রেম, ক্ষমা, সংযম, তিতিক্ষা—এরই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের পুণ্যালোক। ভালো কথা। শিশুর বলিদানে মাতার অশ্রুজলের বিনিময়ে সুদূর ভবিষ্যতের এই পুণ্যালোক আমি চাই না, আমি চাই এই মুহূর্তের বিচার। ঐ মা যেদিন ঈশ্বরের নামে তার সন্তানহন্তার রক্তাক্ত হাতে চুম্বন করবে, সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামবে বইকি! কিন্তু ঐ মৃত শিশুর বুকের ওপর ঐ স্বর্গরাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে আমি দেব না, আমি চাই প্রতিকার, এই মুহূর্তে। আজকের শিশুর এক ফোঁটা অশ্রুর মূল্য ধর্মাত্মাদের কল্পিত স্বর্গরাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি। সন্তানহন্তাকে মা ক্ষমা করুক, তা আমি চাই না। ক্ষমা করার অধিকার নেই মা'র। নিজের শোককে সে ভুলতে পারে তো পারুক, কিন্তু ঐ শিশুর যন্ত্রণাকে সে যেন না ভোলে! সে যন্ত্রণার কোনো মার্জনা নেই। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তাঁর স্বর্গরাজ্যের ঐ রক্তাক্ত প্রবেশমূল্য দিতে রাজী নই। তুমি রাজী আছ?

না, আমিও নই। কিন্তু আইভান, হঠাৎ দীপ্ত কণ্ঠে আলিওশা বললে,—এইমাত্র তুমি বলেছ যে অন্যায়কে ক্ষমা করার অধিকার পৃথিবীতে কারো নেই। কিন্তু একজন আছেন যিনি সর্বমানুষের সকল অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। পৃথিবীর সর্বকলুষ-মোচনের জন্যে আপনার নিষ্কলুষ রক্ত তিনি দান করেছেন। তাঁর প্রাণ, তাঁরই ক্ষমা, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবে ভাই! তিনি আবার আসবেন, বিশ্বমানব তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করে আছে।

ঠিক বলেছ। আছে বইকি! অপেক্ষা করে আছে লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী,—ঐ যারা বঞ্চিত, যারা উৎপীড়িত। আমি কল্পনা করি, একদিন আবার তাঁর আবির্ভাব হবে। মুখে তাঁর বিগলিত করুণার অনির্বচনীয় হাসি, বক্ষে তাঁর প্রদীপ্ত প্রেমসূর্য, চোখে তাঁর বরাভয়ের বিদ্যুৎ-দৃষ্টি। পথের মানুষেরা তাঁকে চিনবে, ঘিরে ধরবে তাঁকে, লুটিয়ে পড়বে তাঁর পায়ে। এক বৃদ্ধ জন্মান্ধ বলবে,—প্রভু, দৃষ্টি দাও, দেখতে দাও তোমাকে। তাঁর আশীর্বাদে তার চোখের আঁধার ঘুচে যাবে এক মুহূর্তে। সন্তানহীনা মাতা সদ্যমৃতা কন্যাটিকে তাঁর পায়ে রেখে বলবে,—প্রভু, জীবন দাও আমার কন্যায়। তাঁর স্পর্শে মৃত পাবে নবজীবন। কিন্তু ধর্মের যারা চূড়ামণি, তারা এসে ঘিরে ধরবে তাঁকে, চিৎকার করে বলবে,—তুই ঠগ, তুই আমাদের এতোদিনের এতো সাধের ধর্মরাজত্বের বনিয়াদে ফাটল ধরাতে এসেছিস্। বন্দী করবে তাঁকে তাঁরই ধর্মধ্বজেরা,—আবার তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারবে।

তুমি যে বিদ্রোহীর মতো কথা বলছ আইভান।

পাগল ! বিপ্লব আমি করব কেন ? বয়ে গেছে আমার ! আমার এলোমেলো কথায় কান দিয়ো না তুমি। বললিন, আমি চাই তিরিশটা বছর মাত্র বাঁচতে। তারপর, চূর্ণ হোক শূন্য পানপাত্র !

কিন্তু তোমার এই অন্তর্জ্বালা নিয়ে কী করে তুমি বাঁচবে ভাই ?

বাঁচব বইকি ! জ্বালা আছে, শক্তিও তো আছে। কারামাজভের শক্তি নিয়ে আমি বাঁচবো।

কারামাজভের শক্তি তো মদ্যপানের আর ব্যভিচারের শক্তি ! পাপের থেকে গভীরতর পাপে ডুব দেবার শক্তি।

সেই শক্তি কম নয়। জীবনের তিরিশটা বছর পার হবার পর সেই শক্তির ওপরই হয়তো ভর করব। ও কথা থাক আলিওশা, আমি ভেবেছিলাম, আমি চলে গেলে তুই আমাকে মনে রাখবি, কিন্তু এখন বুঝেছি সাধুভাইএর অন্তরে আমার কোনো ঠাঁই নেই। তোর কথা মনে রাখব, তোর কথা ভেবেই জীবনের যা কিছু সুন্দর তার প্রতি থাকবে আমার আকর্ষণ। এবার চল আমরা উঠি। তোর পথ ডানদিকে, আমার পথ বাঁয়ে। কালই যদি আমার না যাওয়া হয়, আবার যদি দেখা হয়, এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হবে না। ডিমিট্রির সম্বন্ধেও কোনো আলোচনা করবিনে। অনেক কথা হয়েছে ওকে নিয়ে. আর না। একটা প্রতিজ্ঞা করছি.—ত্রিশ বছর বয়সে. জীবনের পাত্রখানা চুরমার করবার আগে, যেখানেই থাকি, তোর কাছে একবার আমি আসবই। তখন আবার অনেক আলোচনা হবে, কেমন ? যাও, এখন লক্ষ্মীছেলের মতো তোমার গুরুর কাছে যাও। তিনি তো মৃত্যুপথযাত্রী, পৌঁছবার আগে যদি গত হন, তাহলে আমাকেই তুমি দুষবে। আচ্ছা, বিদায় !

হঠাৎ পিছন ফিরে আর একটি কথা না বলে আইভান দ্রুত চলে গেল। গতকাল ডিমিট্রিও এমনি হঠাৎ বিদায় নিয়েছিল আলিওশার কাছ থেকে। একটা ব্যথা যেন তীরের মতো বিঁধল আলিওশার বুকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে সে আইভানকে দেখতে লাগল। আইভান কেমন যেন ক্লান্ত পদক্ষেপে দুলে দুলে হাঁটছে, তার ডান কাঁধটা কেমন যেন খানিকটা বেশি ঝুলে পড়েছে।

পরক্ষণে আলিওশা দৌড় দিল মঠের উদ্দেশ্যে। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, কেমন যেন ভয়-ভয় করছে তার। গতকাল সন্ধ্যার মতো জোর হাওয়া দিয়েছে, মঠের ধারের প্রাচীন পাইন গাছগুলো বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছে সেই হাওয়ায়।

পাঁচ

আলিওশার কাছে বিদায় নিয়ে আইভান চলল তার পিতৃগৃহের অভিমুখে। মনে তার প্রচণ্ড এক বিষণ্ণতা। প্রতি পদক্ষেপে বিষণ্ণতার ভাব বেড়েই চলেছে যেন। এ যেন দুর্বিষহ বোঝা। মানসিক বিষণ্ণতা তার পক্ষে নতুন নয়, এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার

যথেষ্ট পরিচয়। বিশেষ করে আজ যখন সে পুরোতন সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আকর্ষণ পরিত্যাগ করে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে চলেছে, তখন মন খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবার থেকে সে আবার তার অভ্যস্ত একাকীত্বকে বহন করে চলবে, —কোন্ ভাগ্যসুখে, কোন্ সম্ভাবনায় ?

কিন্তু কারণটা তা নয়। বিষণ্ণতার সঙ্গে ক্লান্তি আর ক্লান্তির সঙ্গে বিরক্তির সমাহার। যে বাড়ির চৌকাট মাড়াতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়, সেই বাড়ির অভিমুখেই আবার চলেছি—এই জন্যে কি ? আলিওশার সঙ্গে এতোক্ষণ যে সব অর্থহীন কথাবার্তা হোলো, সেই জন্যে কি ? কী জানি, কেন বুঝিনে, কী চাই জানিনে, শুধু ভালো লাগে না, একবিন্দুও ভালো লাগে না।

বাড়ির গেটে ঢুকতেই চোখে পড়ল সামনের বাগানের একটা বেঞ্চির ওপর রাঁধুনি স্মারডিয়াকভটা বসে আছে। মনটা বিষিয়ে উঠল আরো। সমস্ত অন্তর দিয়ে লোকটাকে ঘৃণা করে আইভান। এই ঘৃণা গত কয়েকদিনে আরো পুঞ্জীভূত হয়েছে। এবার প্রথম যখন আইভান পিতৃগৃহে আসে, তখন অবশ্য এমনটি ছিল না। তখন প্রথম দিকে সে স্মারডিয়াকভের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। স্মারডিয়াকভকে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে সে প্রবৃত্ত করত, লোকটার কথাবার্তা যতো এলোমেলোই হোক, তার মধ্যে চিন্তাশীলতার পরিচয় সে অনুসন্ধান করত। দর্শন পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও সে স্মারডিয়াকভের সঙ্গে আলোচনা করত। ক্রমে সে স্মারডিয়াকভের চরিত্রের পরিচয় পেল। বুঝল, আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, আসলে লোকটার সচেতনতা কেবল নিজের প্রতি, নিজের আহত দাম্ভিকতার নির্বোধ বড়াই করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন থেকে লোকটার প্রতি আইভানের বিতৃষ্ণার শুরু। তারপর পরিবারে গণ্ডগোল বাধল, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল গ্রুশেংকা আর ডিমিট্রি। ওদের ব্যাপার নিয়ে চর্চা আর প্রশ্ন করতে স্মারডিয়াকভের উৎসাহের অন্ত নেই। আইভান এ ব্যাপারেও তার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করল। তার অশোভন কৌতূহল, পরচর্চা-প্রীতি আর কুটিলতা দেখে বিরক্তি আরো বাড়ল। বিতৃষ্ণা চরমে পৌঁছল, যখন তার স্বদাতার সুযোগ নিয়ে স্মারডিয়াকভ তার প্রতি অতি কুৎসিত অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। অবশ্য এ নয় যে লোকটা তার প্রতি কোনো রূঢ় ব্যবহার করত। বরং অতিরিক্ত বিনয় ও তোষামোদই সে করত, কিন্তু এমনভাবে কথা বলত ও ভাবভঙ্গী করত, যেন দুজনের মধ্যে খুব গোপন একটা শলা-পরামর্শের যোগাযোগ আছে।

গেটের কাছে স্মারডিয়াকভকে দেখে আইভানের মন অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সে এগিয়ে যাবে ভাবল, কিন্তু স্মারডিয়াকভ এমনই অমায়িক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, যেন কথা বলতেই হবে তার সঙ্গে। কোঁকড়ানো চুলগুলি পরিপাটি করে কপালের ওপর নামানো, পাংশুমুখে সবিনয় হাসি, চোখে সবজান্তা কটাক্ষ।

দূর হয়ে যা, মূর্খ কোথাকার! ঠিক এই কথাই আইভানের জিভে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সে শুনল যে সে নিজেই সংযত কণ্ঠে শুধোচ্ছে,—বাবা কোথায়? এখনো ঘুমোচ্ছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়োকর্তা এখনো ঘুমোচ্ছেন। কথাগুলো বলে স্মারডিয়াকভ পিছনে দুহাত আবদ্ধ করে বিচারের ভঙ্গিতে আইভানের দিকে তাকাল। আইভান বেঞ্চিটাতে বসল। কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে থেকে স্মারডিয়াকভ বললে,—আপনার ব্যবহারে আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে হুজুর।

বিতৃষ্ণাকে ছাড়িয়ে উঠল কৌতূহল। আইভান প্রশ্ন না করে পারলে না,—বটে! কিসে আশ্চর্য লাগছে শুনি?

চোখের ভ্রূকুটি করে মুচকি হাসি হেসে স্মারডিয়াকভ বললে,—আপনি স্যার কেন চারমাশনিয়াতে যাচ্ছেন না?

চারমাশনিয়াতে কেন যাব আমি?

একটু থেমে স্মারডিয়াকভ বললে,—বাঃ! কর্তা আপনাকে কতোবার অনুরোধ করেছেন। গেলেই বা?

এতোক্ষণে ধমক দিয়ে উঠল আইভান,—ছেঁদো কথা রাখো, কী মতলব তোমার?

আমার আবার মতলব কী? কথায় কথায় বললাম স্যার!

ডান পাটা বদলে বাঁ পা'র ওপর ভর করে দাঁড়াল স্মারডিয়াকভ, তেমনি বাঁকা হাসি আর ভ্রূভঙ্গী নিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল আইভানের মুখের দিকে।

প্রায় এক মিনিট এভাবে কাটল। স্মারডিয়াকভ যেন তারিফ করছে আইভানের মেজাজ। নিজেকে সংযত রেখে মিনিটখানেক পরে আইভান উঠে দাঁড়াল। স্মারডিয়াকভ যেন সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

স্পষ্ট করে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বললে,—আইভান ফিয়োডোরোভিচ,, আমি বড়ো বিপদের মধ্যে আছি! কী করে যে বাঁচব তাও বুঝতে পারছি না। এই বলে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আইভান আবার বসে পড়ল বেঞ্চিটায়।

স্মারডিয়াকভ শুরু করল,—আপনার বাবা আর আপনার দাদা ডিমিট্রি,—দুজনেই পাগল, দুজনেই শিশুর মতো অবুঝ! কর্তার ঘুম ভাঙল বলে। উঠেই তিনি জিজ্ঞাসা করবেন,—ও এসেছিল? আসেনি? কেন এল না? এই একই প্রশ্ন একশোবার ধরে চলবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত। তারপর আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌না রাত্রে যদি না আসে—না আসাই সম্ভব, তাহলে সকালে উঠেই আবার প্রশ্ন শুরু হবে,—কেন এল না? কখন আসবে? আরে, এল না, সে যেন আমারই দোষ। এদিকে অন্ধকার শুরু হতে না হতেই বন্দুক হাতে ডিমিট্রি চাঁদের উদয় হবে। সে হাঁকবে,—এই বদমাস, এই ব্যাটা রাঁধুনি, শোন্। নজর রাখবি, ঠিক কখন গ্রুশেংকা আসে, আর এলেই খবর দিবি। ফাঁকি যদি দিবি তো এক গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব! ভোরবেলা তারও ঐ বাঁধা প্রশ্ন,—আসেনি? আসেনি তো? কেন এল না? কখন আসবে?—নাও, এল কি এল না, এ যেন আমার দায়! এমনি চলেছে

দিনরাত, আর দুজনের মেজাজ ক্রমশই চড়ছে। আমার কপালে দুজনের অপঘাত মৃত্যু আছে!

তুমি এর মধ্যে নাক গলালে কেন? আইভান বললে,—ডিমিট্রির হয়ে পাহারাদারী করতে কে তোমাকে সেধেছিল?

সাধেনি? ওরে বাবা, করছি কি সাধে? প্রাণের ভয়ে গো! এ ব্যাপারে সাত হাত দূরে আমি ছিলাম, একদিন ডিমিট্রি ডেকে চোখ পাকিয়ে বললে,—ব্যাটা চাকর, আমার হয়ে নজর রাখবি, কড়া নজর। ভুল করেছিস কি খুন করব। নাঃ, কাল আমাকে বেশ কড়া রকমের মূর্ছা যেতে হবে দেখছি।

কড়া রকমের মূর্ছা মানে?

মানে, এমন মূর্ছা যা সহজে না ভাঙে। এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টা নয়, পুরো একদিন দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা। আগেও আমার একবার এইরকম হয়েছিল কিনা, তিন দিনের আগে জ্ঞান ফেরেনি।

চতুর প্রশ্ন করল আইভান,—কখন মূর্ছা যাবে মৃগীরোগী আগে থেকে তা জানতে পারে নাকি!

না, আমতা আমতা করল স্মারডিয়াকভ,—তা অবশ্য পারে না।

তাছাড়া শুনেছি, সেবার তুমি ছাদ না কোথা থেকে যেন উল্টে পড়ে গিয়েছিলে?

তা এবারও পড়ব। ছাদ না হয় সিঁড়ি থেকে পড়ব। পড়া আমার ঠেকায় কে?

স্মারডিয়াকভের দিকে কতোক্ষণ কটমটিয়ে তাকিয়ে রইল আইভান। তারপর বললে,—ভাঁড়ামি রাখো। অসুখের ভান করে তিন দিন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা, এই তো মতলব?

মাথা নিচু করে ডান পায়ের পাতাটা নাড়ছিল স্মারডিয়াকভ। মুখ তুলে বাঁকা হাসি হেসে বললে,—তা এমনি ভান করা যদি সম্ভব হয়, আমার তো মনে হয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাই করা উচিত। তাতে আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্না যদি কর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসেই, তাহলে ডিমিট্রি আমাকে দায়ী করতে পারবে না। কেননা তখন তো আমি অজ্ঞান অচৈতন্য, কিছুই জানিনে।

আইভানের রাগ বাধা মানল না, সে চীৎকার করে উঠল,—থামো, থামো, কাপুরুষ কোথাকার! তোমার মতো লোককে মারতে দাদার বয়েই গেছে। তার হাতে যার মৃত্যুভয়, সে তুমি নও!

মারবে, সবার আগে পিঁপড়ের মতো পিষে মারবে আমাকেই। তাছাড়া অন্য ভয়ও আছে বইকি! আপনার বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা ও করবে, তার মধ্যেও যদি আমি জড়িয়ে পড়ি?

তুমি জড়িয়ে পড়বে কেন?

পড়ব না? সবাই যে আমাকে ধরবে তোমার দাদার সহকারী বলে। গোপন সংকেতগুলো যে আমিই তাকে জানিয়ে দিয়েছি।

সংকেত! কিসের গোপন সংকেত? স্পষ্ট করে বলো।

হায় রে হায়! কী বিপদেই পড়েছি। ফিয়োডোর পাভ্‌লোভিচের সঙ্গে আমার একটা নিগূঢ় ব্যবস্থা হয়েছে যে। আজকাল কর্তা তো সন্ধ্যে হতে না হতেই শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এ‘টে দেন। কিছুতেই আর দরজা খোলেন না,—কেবল গ্রিগরি এসে ডাকলে তার গলা শুনে তবে খোলেন। কদিন গ্রিগরিও আসে না. আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌নার ব্যাপার শুরু হবার পর থেকে কর্তার খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনো করার ভার একলা আমার ওপর। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, কর্তা দরজা বন্ধ করার পর আমি মাঝরাত্তির পর্যন্ত জেগে থাকব, বাইরে উঠোনে পায়চারী করে বেড়াব আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্‌নার প্রতীক্ষায়। কর্তার ধারণা, ডিমিট্রির ভয়ে ও আসতে পারছে না, একদিন না একদিন রাত্রে পিছনের দরজা দিয়ে আসবেই। যদি আসে তাহলে দৌড়ে কর্তার ঘরের দরজায় বা বাগানের দিকের জানলায় আমাকে টোকা দিতে হবে। প্রথম দুটি টোকা খুব আস্তে, পরে তিনটি টোকা তাড়াতাড়ি আর জোরে। তার মানে পথ পরিষ্কার,—আর তা শুনলেই কর্তা দোর খুলবে। তাছাড়া যদি হঠাৎ কোনো জরুরী দরকার হয়, তাহলে আমার টোকা হবে প্রথমে দুটো জোড়ে, পরে একটা মাত্র আরো জোরে। তখন কর্তা দরজা খুলবে। আগ্রাফেনা যদি না এসেও কোনো খবর বা চিঠি পাঠায়, তাহলে এমনি টোকা বাজাতে হবে আমাকে। তাছাড়া যদি ডিমিট্রি আসে, যাকে কর্তার বড়ো ভয়, তাহলে দরজায় বাজাতে হবে জোরে জোরে তিনটি টোকা। তখন কর্তা ঘরের খিল আরো জোর করে আঁটবে। এই সব সংকেতের কথা ছিল শুধু কর্তা আর আমার মনে, কিন্তু এখন ডিমিট্রি সব জেনে ফেলেছে।

কী করে জানল? নিশ্চয়ই তুমি তাকে বলেছ?

বলেছি হুজুর বলেছি। নিতান্ত প্রাণভয়ে বলে ফেলেছি। না বললে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে ছাড়ত।

বাবার ঘরে মিথ্যে করে অমনি টোকা বাজিয়ে সে যদি ঢুকতে চেষ্টা করে, তুমি নিশ্চয়ই তাকে বাধা দেবে?

দেব না? নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তিন দিন যখন মূর্ছার ঘোরে পড়ে থাকব, তখন বাধা দেব কী করে?

মূর্ছা গেলেই হোলো? ঠগবাজী পেয়েছ? মূর্ছা যাবে না তুমি।

যেতে কি চাই হুজুর? কিন্তু উপায় কী? ভয়ের চোটেই যে মূর্ছা যাব। সর্বদা গেলাম-গেলাম মনে হচ্ছে!

বেশ, তাহলে যাবার আগে গ্রিগরিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে যাও। সে পাহারা দেবে বাবার দরজা।

ওঃ বাবা! কর্তার হুকুম ছাড়া তাঁর গোপন কথা আমি গ্রিগরিকে ফাঁস করতে পারি? তাছাড়া গতকাল থেকে গ্রিগরি অসুস্থ, উঠতে পারে না। মারফা ইগ্‌নোটিয়েভ্‌নার একটা টোটকা ওষুধ আছে, সেটা সে কাল গ্রিগরিকে খাওয়াবে ঠিক করেছে। বড়ো কড়া ওষুধ, মালিশও চলে, খেতেও হয়। একবার খেলে সারা রাত্তির অচৈতন্য। পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙে, রাতের জ্বর ফর্সা।

বটে! সব ব্যাপারটা বেশ ভালোই ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখছি। তুমি যাবে মূর্ছা, আর গ্রিগরি হবে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান। দাদার রাস্তা পরিস্কার। এটা তোমার প্ল্যান, তাই না!

কী সর্বনাশ! আমার প্ল্যান? আমি কি জানি এসবের? ডিমিট্রি ফিয়োডোরোভিচ এ বাড়িতে কখন আসবে না আসবে, তার আমি কি জানি হুজুর?

তাই নাকি? রাগে আইভানের মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠেছিল। আবার নিজেকে সংযত করে সে বললে, —কিন্তু আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্না যদি না আসে, ডিমিট্রিই বা আসবে কেন? তোমার তো ধারণা, মেয়েটা কেবল বাবাকে ঠকাচ্ছে। ডিমিট্রিরও তাহলে বয়ে গেছে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

কুটিল হাসি হেসে বললে স্মারডিয়াকভ,—আপনি নিজে বেশ ভালোই জানেন, ডিমিট্রি কেন আসবে। আমি কেন মূর্ছা গেছি জানলেই তার সন্দেহ হবে, সে তখন কর্তার দরজা ভেঙে ঢুকবে আগ্রাফেনার খোঁজে।

তাছাড়া এও সে জানে যে কর্তা বড়ো একটা খামের মধ্যে করকরে তিন হাজার রুবলের নোট পুরে খামের ওপর লিখে রেখেছেন আগ্রাফেনার নাম। আমিও সে খাম দেখেছি, বড়ো বড়ো করে কর্তার নিজের হাতের লেখা,—'আমার প্রাণ-প্রেয়সী গ্রুশেংকাকে।' তাহলে? ঐ খামখানার টান কি কম?

মূর্খ কোথাকার! রাগে ফেটে পড়ল আইভান, —টাকার লোভে ডিমিট্রি খুন করবে বাবাকে? খুন করতে চাইলে ঐ গ্রুশেংকার জন্যে কালই হয়তো করত। দাদা পাগল হতে পারে, ডাকাত হতে পারে, কিন্তু চোর নয়।

আপনি জানেন না আইভান ফিয়োডোরোভিচ,—ডিমিট্রির এখন টাকার দরকার—এতো বড়ো দরকার জীবনে আর কখনো আসেনি।

বেশ স্পষ্ট করে আইভানকে শুনিয়ে শুনিয়ে স্মারডিয়াকভ আরো বলতে লাগল, —তাছাড়া ঐ যে তিন হাজার রুবল,—ডিমিট্রি মনে করে, ও তার নিজেরই টাকা। আমাকে নিজেই ও বলেছে,—'ঠিক তিন হাজার রুবলই বাবার কাছে আমার পাওনা।' আর তাছাড়া, আর একটা দিকও একটু চিন্তা করে দেখুন। আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্না যদি ইচ্ছে করে, তাহলে কর্তাকে সে বাধ্য করবে তাকে বিয়ে করতে। এ বাড়ির কর্ত্রী হতে পারবে এই কড়ারে কর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে পারে,—এতো বড়ো লোভ এড়ানোর মতো মেয়ে সে নয়। বুদ্ধিতে সে তুখড় সেয়ানা, আপনার ডিমিট্রি ভাইয়ের মতো ভিখিরীকে বিয়ে করতে তার বয়েই গেছে। একবার কর্তাকে যদি বিয়ে করতে সে পারে, তাহলে ছেলেদের কপালে একটি ফুটো পয়সাও জুটবে না,—না ডিমিট্রির, না আপনার, না আলিওশার। কিন্তু তার আগেই কর্তা যদি চট্ করে চোখ বোজেন, তাহলে প্রত্যেক ছেলের অংশে অন্তত চল্লিশ হাজার রুবল। ডিমিট্রিও বাদ পড়বে না, কেননা কর্তার কোনো উইল নেই। এটা ডিমিট্রি বেশ ভালো করেই জানে।

মন দিয়ে শুনছিল আইভান। হঠাৎ শিউরে উঠল, মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল তার।

রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—তাহলে আমাকে চারমাশনিয়াতে যাবার উপদেশ দিচ্ছ কেন ? আমি এখান থেকে চলে গেলে কী যে হবে তা যখন বুঝতেই পারছ—

আইভানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গলা নামিয়ে স্মারডিয়াকভ বললে,—ঠিক মেজ হুজুর, সেই জন্যেই—

তার মানে ?

আপনাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি যদি হতাম, তাহলে এই সব নোংরামির মধ্যে নিজেকে জড়াতাম না। সটান উধাও হয়ে যেতাম এখান থেকে।

মুখ্যু একটা! শুধু মুখ্যু নয়, আসল শয়তান বটে!

অস্ফুটস্বরে কথাগুলো বলে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠল আইভান। হঠাৎ উত্তেজনায় সে ঠোঁট কামড়ে হাত মুঠো করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল স্মারডিয়াকভের ওপর। স্মারডিয়াকভও চমকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেল আত্মরক্ষার জন্যে। অবশ্য পরমুহূর্তেই আইভান নিজেকে সংযত করে নিল।

তুমি হয়তো জেনে খুশী হবে যে কালই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি—যাচ্ছি মস্কোয়। এই কথা বলে মুখ ঘুরিয়ে সে এগোল। একটু পরেই সে ভাবল, এ কথাটা স্মারডিয়াকভকে বলা তার উচিত হয়নি।

স্মারডিয়াকভ গলা তুলে তার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বললে,—বেশ হুজুর, এই বুদ্ধিটা খুব ভালো। আর এখানে যদি বা কিছু ঘটে যায়, মস্কোতে টেলিগ্রাফ করেও আপনাকে খবর দেওয়া চলবে।

থমকে দাঁড়াল আইভান। স্মারডিয়াকভের দৃষ্টিতে কেমন কুটিল অথচ বিনম্র আকুতি।

আর যদি আমি চারমাশনিয়াতেই যাই, সেখানে আমাকে খবর দেওয়া যাবে না ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়, অস্ফুটস্বরে স্মারডিয়াকভ উত্তর দিল,—কেন যাবে না ? আপনি চারমাশনিয়াতে গেলে তো আরো সুবিধে হবে!

হ্যাঁ, চারমাশনিয়া কাছেই, আর মস্কো অনেক দূর, তাই না ? খবর পেলেই তো ফিরে আসতে হবে। কাছাকাছি থাকলে ট্রেনভাড়াটাও কম পড়বে।

বিগলিত স্বরে স্মারডিয়াকভ বললে,—হেঁ-হেঁ, হুজুর এতোক্ষণে ঠিক ধরেছেন।

তার মুখে অসুস্থ হাসি। তাই দেখে হো-হো করে হেসে উঠল আইভান।

ছয়

বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসবার ঘরেই ফিয়োডোর পাভলোভিচের সঙ্গে দেখা। হাত নেড়ে আইভান বললে,—আমি ওপরে আমার ঘরে যাচ্ছি। এই বলে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। এই মুহূর্তে বাপের মুখোমুখি হতে একবিন্দু ইচ্ছা ছিল না তার।

আইভানের সঙ্গে কথা বলবে বলেই ফিয়োডোর বাইরের ঘরে এসে অপেক্ষা

করছিল। ছেলের মেজাজ দেখে হাঁ করে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সিঁড়িতে তার চেহারা অন্তর্হিত হবার পর স্মারডিয়াকভকে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কী? কী হোলো বাবুর?

স্মারডিয়াকভ এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা। ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্ক গলায় বললে,—কে জানে? মেজাজ বোধহয় গরম আছে।

চুলোয় যাক মেজাজ! তুই এক কাজ কর, জলদি সামোভারটা নিয়ে আয়। আর, অ্যাই শোন্। কী, কোনো খবর নেই? নেই তো?

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সদর দরজায় চাবি পড়ে গেল। কামুক বুড়ো তার অন্ধকার ঘরে একলা পায়চারি করে বেড়াতে লাগল উৎকর্ণ হয়ে—কখন বন্ধ দরজায় পাঁচটা টোকা পড়বে এই আশায়।

সেদিন রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত আইভানের চোখে ঘুম এল না। একলা অন্ধকার ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগল সে। এলোমেলো ভাবনা, তার কোনো সুনির্দিষ্ট ধারা এখানে লিপিবদ্ধ করার নয়। প্রচণ্ড ক্লান্তি, যেন জীবনের সব কটা সূত্রে জট পাকিয়ে গেছে তার। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ছটফট করতে লাগল সে। মাঝরাতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তার দেহ-মন,—এখনি সে নিচে নামবে, দরজা খুলে স্মারডিয়াকভের আস্তানায় গিয়ে তাকে দুর্দান্ত মার মারবে। লোকটার প্রতি ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় রাগে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু আগুন হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সে সামলাল। এইবার সারা মন জুড়ে নেমে এল কেমন একটা আতঙ্ক,—ভয়ানক আতঙ্ক। কিসের আতঙ্ক? বুক কাঁপছে কেন? গলা শুকিয়ে আসছে কেন?

আবার রাগ,—নিজের ওপরে, সকলের ওপরে, আলিওশার ওপরেও। আলিওশার সামনে কাটেরিনাকে অতো কথা সে বলতে গেল কেন? বড়াই করে কাটেরিনাকে বলে এসেছে কালই সে মস্কোতে যাবে। সত্যি যাবে? যেতে পারবে? এতো সহজে বন্ধন-মোচন কি সম্ভব?

সে রাত্রের কথা ভবিষ্যতে যখনই তার মনে পড়েছে, তখনই একটি কথা ভেবে নিজের ওপর অসম্ভব ঘৃণা হয়েছে তার। এমন কাজ সে কেমন করে করতে গিয়েছিল? সোফা থেকে সে উঠল, দরজা খুলে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কান পেতে রইল দরজার গায়ে, বুকের মধ্যে এক উদ্দাম আলোড়ন নিয়ে। বুড়ো ফিয়োডোরেরও চোখে ঘুম ছিল না। সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বন্ধ ঘরে, তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক কুৎসিত কৌতূহল তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ফিয়োডোরের রুদ্ধ ঘরের সামনে,—যার দ্বারে পাঁচটি টোকার প্রতীক্ষায় কান খাড়া রয়েছে বুড়োর।

রাত যখন দুটো, বুড়ো ফিয়োডোরও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন নিদ্রা এল আইভানের চোখে, চরম শ্রান্তিভরা ঘুম। সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল। আশ্চর্য, তখন

দেহে মনে তার কিছুমাত্র ক্লান্তি নেই। চট্ করে সে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নিল। তারপর গুছিয়ে নিল নিজের জিনিষপত্র। ন'টা নাগাদ মারফা ইগ্নোটিয়েভ্না এসে যথারীতি প্রশ্ন করল,—শোবার ঘরেই কি প্রাতরাশ নিয়ে আসব?

খুশী মনে আইভান নিচে নামল, কিন্তু তার হাবভাবে কেমন এলোমেলো ব্যস্ত-ত্রস্ততা। তাড়াতাড়ি বাপকে সাদরে সম্ভাষণ করে সে ঘোষণা করল যে সে এখুনি মস্কো যাত্রা করবে। কথাটা শুনে বাপ যে খুব আশ্চর্য হোলো তা নয়, ছেলে চলে যাচ্ছে বলে কোনোরকম দুঃখ প্রকাশ করতেও ভুলে গেল। বরং নিজের খুব জরুরী একটা কাজের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল তার।

বললে,—কী ছেলে দ্যাখো! এখুনি যাবি? তা অন্তত কাল বলতে হয়? যাই হোক, মন যখন করেছিস তখন আর আটকাব না। কিন্তু লক্ষ্মীছেলের মতো আমার একটি কাজ যে করে দিতে হবে বাবা! যাবার পথে একবার চারমাশনিয়া ঘুরে যাও!

সে আমি পারব না। অনেক পথ ঘুরতে হবে তাতে!

তোর ঘোড়ার গাড়ির পথেই তো পড়বে ডানদিকে একটু ঘুরে যেতে হবে ক-মাইল এই যা। তারপর ট্রেনে না হয় কালই উঠবি। কর বাবা, বুড়ো বাপের একটা উপকার কর। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু এখানে এমন একটা কাজে আটকে পড়েছি, তাই তো তোকে পাঠাচ্ছি।

আইভানকে নীরব থাকতে দেখে ফিয়োডোর বলে চলল,—ওখানে আমার দুটো জঙ্গল আছে জানিস তো? মাস্লভ বলে এক ব্যবসাদার গত বছর কাঠের দাম দিয়েছিল আট হাজার। নাম-করা ব্যবসাদার, সে যা বলে তার ওপর আর কেউ দর হাঁকতেই চাইল না। স্রেফ জলের দরে বাগিয়ে নিল। ওখানকার এক পুরুত আমার বন্ধু। সে লিখেছে যে এবছর গর্স্টকিন নামে এক মহাজন এগারো হাজার রুবল দিয়ে জঙ্গল দুটো জমা নিতে চায়। লোকটা ও অঞ্চলে নতুন, মাস্লভকে ভয় পায় না। লোকটা সাত দিন মাত্র চারমাশনিয়াতে থাকবে। তুই বাবা লোকটার সঙ্গে দেখা করে বিলি-বন্দোবস্তটা পাকা করে যা।

আইভান বললে,—তোমার পুরুত-বন্ধুকে চিঠি লেখো না, সেই তোমার হয়ে সব ব্যবস্থা করে দিক।

আরে দুর্-দুর্, পুরুত যে! পুরুতের কি ব্যবসা-বুদ্ধি আছে? লোকটা সজ্জন, কুড়ি হাজার টাকা বিনা রসিদে ওর হাতে আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু একেবারে হাবা গঙ্গারাম। একটা কাকও ওকে ঠকাতে পারে।

তুমি তো জানো, আমারও ব্যবসা-বুদ্ধি নেই। আমিও ঠকে যেতে পারি।

না, ঠকবিনে। আমার কথা শুনে যা, ঠিক পারবি। এই গর্স্টকিন লোকটাকে আমি চিনি, আগেও ওর সঙ্গে আমি কারবার করেছি। লোকটাকে চাষার মতো দেখতে, দুবেলা বৌএর হাতে মার খায়,—মুখে বিচ্ছিরি নোংরা একটা দাড়ি। তুই ওর ঐ দাড়িটার দিকে নজর রাখবি। যদি দেখিস লোকটা তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলছে আর

সেই সঙ্গে দাড়িটা কাঁপছে, তাহলে বুঝবি, আসলে ন্যায্য দামে ব্যবসা করতে চায়। আর যদি দেখিস, মিষ্টি কথা বলছে আর বাঁ হাত দিয়ে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে, তাহলে বুঝবি, লোকটার ঠকাবার মতলব। কথাবার্তা বলে দর-দস্তুর যদি ঠিক হয়, একখানি চিঠি পাঠাবি আমার কাছে। এগারো হাজার বলবি, তবে দরা-দরি করলে এক হাজার কমাতে পারিস। তার বেশি নয়। তোর চিঠি পেলেই আমি গিয়ে জঙ্গল দুটো জমা দিয়ে টাকাগুলো পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে আসব। যা বাবা, এ কাজটা করে দে। টাকার বড়ো টানাটানি যাচ্ছে।

না, ও সব ঝামেলা আমার পোষাবে না, আমাকে মাপ করো।

আরে মাপ তো করতামই। বুড়ো বাপের এইটুকু উপকারের জন্যে এতোটা কি তোকে সাধতাম? আর এক আছে আলিওশা, সে তো কোনো কম্মেরই নয়। তোকে পাঠাতে চাই তার কারণ তুই আমার সত্যিকারের বুদ্ধিমান ছেলে! লোকটার দাড়ির ওপর নজর তুই-ই ঠিক রাখতে পারবি, আর কেউ পারবে না।

তিক্ত হাসি হেসে আইভান বললে,—তাহলে ঐ চারমাশনিয়ায় তুমি আমাকে পাঠাবেই?

অ্যাই! বাবুর আমার মন ভিজেছে। তাহলে তুই যাবি, যাবি তো ঠিক?

যাব কিনা এখনই বলতে পারছিনে। পথে বেরিয়ে যদি ইচ্ছে হয় তো যাব!

ফিয়োডোর বললে,—ওটি কোরো না বাবা। মতিস্থির এখুনি করো। কাজটা সেরে, চিঠিটা পাঠিয়ে তারপর মস্কো কেন, ভিনিসে ঘুরে এস।

ফিয়োডোর খুব খুশী। সে চারমাশনিয়ায় তার বন্ধুর নামে চিঠি লিখল, নিজ মুখে গাড়িতে ঘোড়া জুতবার হুকুম দিল। ছেলেকে খাওয়াল। গাড়িতে ওঠবার মুখে তাকে চুম্বন করবার চেষ্টাও করল। আইভান তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। ডিমিট্রির কথা একবারও কেউ উল্লেখ করল না, বরং ফিয়োডোরের ব্যস্ততা দেখে আইভান ভাবল, বাবার আমাকে নিয়েও পোষাচ্ছে না, আমি চলে গেলেই যেন বাঁচে।

বিদায়ের মুখে ফিয়োডোর হেঁকে বললে,—ভালো হোক, খুব ভালো হোক তোর! হ্যাঁরে, আবার ফিরে আসবি তো? যখন মন চায় তখনি চলে আসিস, তোকে পেলে আমার বড়ো ভালো লাগবে।

আইভান গাড়িতে উঠল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ফিয়োডোর আবার বললে,—বিদায় আইভান, বিদায়। তোর বুড়ো বাপকে ক্ষমা করিস, তার ওপর মনে রাগ রাখিস নে বাবা!

ঠিক গাড়ি ছাড়বার মুখে স্মারডিয়াকভ লাফিয়ে পড়ল গাড়ির মধ্যে,—মেঝের পাপোশটা ঠিক করে পেতে দেবার জন্যে।

হঠাৎ আইভানের মুখ দিয়ে বার হোলো,—জানো হে, আমি চারমাশনিয়াতেই চললাম।

কথাটা বলে কেমন একটু বিব্রতবোধের হাসি সে হাসল।

আইভানের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মারীডিয়াকভও উত্তর দিল,—দেখুন তাহলে, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলোচনা সর্বদাই মূল্যবান। ঠিক কিনা?

যাত্রা শুরু হোলো। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাবিহীন আইভানের মন। তবু চারিদিকের প্রান্তর, গাছপালা, উড়ন্ত-পাখির ঝাঁক আর দূরের পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ক্রমে হালকা হয়ে এল তার মন। হঠাৎ খুশীতে তার বুক ভরে উঠল। কিছুটা গল্প জমাতে চেষ্টা করল গাড়োয়ানের সঙ্গে। ফুরফুরে বাতাস, উজ্জ্বল আকাশ। আলিওশা আর কাটেরিনা আইভানোভ্নার মুখ একবার ভেসে উঠল মনের মুকুরে। মৃদু হেসে সে-ছায়া মুছে ফেলল সে। স্মারডিয়াকভের শেষ কথাটা প্রহেলিকার মতো মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। ভাবল, চারমাশনিয়া যাচ্ছি, সে কথা ওকে বলতে গেলামই বা কেন? ভলোভিয়াতে পোঁছে গাড়ি দাঁড় করাল সে। এখান থেকে চারমাশনিয়া যাবার রাস্তা বেঁকে গেছে। বারো ভার্স্ট পথ।

হঠাৎ সে মত বদলাল। গাড়োয়ানকে বললে,—না, চারমাশনিয়া যাব না। রেল স্টেশনে সাতটার মধ্যে পোঁছতে পারবে?

তা পারব কর্তা। তাহলে ঘোড়া লাগাই?

আচ্ছা, কাল যখন শহরে ফিরবে আমার একটা কাজ করতে পারবে? আমার বাবার কাছে যাবে, তাকে খবরটা দিয়ে দেবে যে আমার চারমাশনিয়ায় যাওয়া হোলো না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব।

বেশ, এই নাও বকশিশ, খুশীমনে আইভান বললে,—বাবার কাছ থেকে যে কিছুই পাবে না তা তো জানো।

আজ্ঞে, সে আর বলতে! ধন্যবাদ, হুজুর।

সন্ধ্যা সাতটার সময় আইভান মস্কোগামী ট্রেনে উঠে বসল। মনে মনে বলল,—উড়ে যাক যা কিছু পুরাতন। বিদায় পুরোনো জীবনকে, তার কোনো ছায়া কোনো প্রতিধ্বনি যেন আর চোখে-কানে না ভাসে। নতুন দেশ, নতুন জীবন, নেই কোনো পিছু ফিরে দেখা।

কিন্তু আনন্দ নেই মনে। সারা অন্তর জুড়ে কালো অন্ধকার আর গভীর বেদনা। সারা রাত ট্রেনে সে বিনিদ্র কাটাল,—কতো ভাবনা, ভাবনার ভিড়ের শেষ নেই। ট্রেন উড়ে চলল, শেষ রাতে মস্কো। রাজধানীতে ট্রেন যখন পোঁছল তখন সে হঠাৎ মনকে ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল। বললে,—আমি একটা হতভাগা, শয়তান!

মধ্যম পুত্রকে বিদায় দিয়ে বেশ হৃষ্টচিত্ত হোলো ফিয়োডোর পাভলোভিচ। ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে সে বসে গেল,—খোশ-মেজাজে কাটাল ঘণ্টা দুই। তারপরেই যা ঘটল তাতে সারা বাড়িতে হইচই, ফিয়োডোরের মেজাজ একেবারে গেল বিগড়ে।

স্মারাডিয়াকভ সিঁড়ি থেকে উল্টে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। আর্তনাদের এই বিশেষ ধরণটা মারফা ইগ্‌নাটিয়েভ্‌নার চেনা,—এটা মৃগীরোগীর মূর্ছার সংকেত। শোনা যায় সে দৌড়ে গেল। সিঁড়ির ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচের ধাপে এসে পড়ে আছে স্মারাডিয়াকভ,—অজ্ঞান অচৈতন্য, হাত-পা ছুঁড়ছে,—মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, পড়ে গিয়ে হাত-পা একটা নিশ্চয়ই ভেঙেছে,—কিন্তু মারফা পরীক্ষা করে দেখে বললে,—না, ভগবান রক্ষা করেছেন। ডাক পড়ল পাড়াপড়শীর, সবাই মিলে বহু কষ্টে অচেতন মৃগীরোগীকে সিঁড়ির তলা থেকে তুলে নিয়ে এল। ফিয়োডোর পাভলোভিচ নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল। হাত-পার তড়কা কখনো বা বন্ধ হয়, আবার একটু পরেই জোর করে শুরু হয়। সবাই ভয় পেল সেই আগের বারের মতো এবারও দু-তিন দিন অন্তত ভোগাবে। মাথায় বরফ দেওয়া শুরু হোলো। বিকেলবেলা ডাক্তার এল, রোগী দেখে বিশেষ কিছু ঠাহর করতে পারল না এইটুকু খালি দেখল যে মূর্ছার প্রকোপ অতি ভয়ংকর। বলে গেল, আগামী কালও যদি রোগীর অবস্থা এই একই রকম থাকে, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ফিয়োডোর পাভলোভিচের ভাগ্যে সেদিন দুঃখের পর দুঃখ। স্মারাডিয়াকভ অপারগ, তাই রান্না করেছে মারফা। মুরগীর মাংসটা এতো শক্ত যে তাতে দন্তস্ফুট করা যায় না, আর সেই সঙ্গে ঝোলটা হয়েছে যেন নোংরা বাটী-ধোওয়া জল। মারফার ওপর খিঁচিয়ে উঠল ফিয়োডোর,—বুড়ীও মুখের ওপর জবাব দিল এই বলে যে সে কি পাস-করা রাঁধুনী?

সন্ধ্যাবেলার জন্যে আর এক ঝামেলা তোলা ছিল। খবর এল, গ্রিগরি বাতের বেদনায় একেবারে শুয়ে পড়েছে,—উত্থানশক্তি রহিত অবস্থা। যতো শীঘ্র সম্ভব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিয়োডোর দরজায় তালা দিল, সারা বাড়িতে সে একলা। মন-ভর্তি আশা-নিরাশার দারুণ উত্তেজনা। স্মারাডিয়াকভ তাকে সকালে আশ্বাস দিয়েছে যে আজ রাত্রে গ্রুশেংকা আসবেই। বুকের মধ্যে গুরু-গুরু করতে লাগল বুড়োর, অশান্ত প্রতীক্ষায় সে পায়চারি করতে লাগল শূন্য বাড়ির এঘরে ওঘরে। অন্যমনস্ক হলে চলবে না। ডিমিট্রি হয়তো কোথা থেকে নজর রাখছে, তাই মেয়েটা এসে যেই দরজায় টোকা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢুকিয়ে নিতে হবে বাড়ির ভিতর। বন্ধ দরজার সামনে এক মুহূর্ত যেন তাকে অপেক্ষা করতে না হয়, তাহলে হয়তো ভয় খেয়ে আবার পালিয়ে যাবে। উৎকর্ণ অপেক্ষা,—সেই সঙ্গে বুড়োর মাথার মধ্যে নানা কামুক কল্পনা কিলবিল করতে লাগল। প্রাণ-প্রেয়সী একবার খাঁচায় ধরা দিলে হয়!



ষষ্ঠ অধ্যায় : সাধু প্রসঙ্গ

মঠবৃদ্ধের ঘরে আলিওশা যখন প্রবেশ করল তখন দুর্ভাবনায় দুরুদুরু তার অন্তর। ঘরে ঢুকেই কিন্তু সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। সে আশঙ্কা করেছিল সংজ্ঞাহীন মৃত্যুপথযাত্রীকে সে নিশ্চল শয়ান অবস্থায় দেখবে। কিন্তু দেখল, জোসিমা চেয়ারে বসে আছেন। পাণ্ডুর দুর্বল মুখে আনন্দের আভা। চারপাশে ভক্তরা আসীন—মৃদুকণ্ঠে তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ করছেন।

আসলে আলিওশা আসার মাত্র মিনিট পনেরো আগে জোসিমা উঠে বসেছেন। সকালবেলা জোসিমা শয্যাগ্রহণ করেন, তার আগে ফাদার পাইসিকে বলেন যে অন্তত আর একবার সকলের সঙ্গে কথা না বলে তিনি দেহত্যাগ করবেন না। পাইসি প্রভুর এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছিলেন। যদি তিনি দেখতেন যে জোসিমার জ্ঞান লুপ্ত, তবু তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন, প্রভু শেষবারের মতো জাগবেনই। উপস্থিত ভক্তদেরও তিনি সেই আশ্বাসই দিয়েছিলেন। তাঁরা অনেক আগে থেকেই মঠবৃদ্ধের কুটীরের দ্বারে সমবেত হয়েছিলেন। জোসিমা প্রতিশ্রুতি মতো উঠলেন, চেয়ারে বসলেন, সকলকে কাছে আহ্বান করলেন।

ভক্তজন-সঙ্গে সাধু জোসিমার এই সর্বশেষ আলাপ। এ'রা চারজন মাত্র জোসিমার শ্রেষ্ঠ অনুচর—ফাদার পাইসি, ফাদার ইয়োসিফ, ফাদার মিহাইল আর ফাদার আনফিম। ফাদার মিহাইল এই আশ্রমের রক্ষক। খুব বৃদ্ধ তিনি নন, শিক্ষিতও নন খুব। নিতান্ত সাধারণ বংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস তাঁর যেমন নিবিড়, তেমনি গভীর তাঁর করুণা। যদিও বাহ্যিক রুক্ষতা দিয়ে এই করুণারূপ আচ্ছাদিত। চতুর্থ সাধু আনফিম অতি বৃদ্ধ। দীনতম কৃষাণের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল, অক্ষর-জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই। মুখে তাঁর কথা নেই। জোসিমার আসন্ন মহাপ্রয়াণ যেন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির বাইরের কোনো এক অলৌকিক ঘটনা,—নির্বাক হতভম্ব হয়ে তিনি বসে আছেন প্রভুর পদতলে। এই মূর্খ বিনীত বৃদ্ধ সাধুটিকে জোসিমা অত্যন্ত স্নেহ করতেন, যদিও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বাক্যালাপ ছিল বিরল। চল্লিশ বছর আগে যখন কস্ট্রোমার এক দীন মঠে জোসিমা তাঁর সাধুজীবন শুরু করেন, তখন এই সাধুটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এ'কে সঙ্গে নিয়ে সে সময় তিনি বছরের পর বছর সারা রুশিয়ার বিভিন্ন ধর্মক্ষেত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর মঠের উন্নতির জন্যে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে, ঘরের মধ্যেকার বাতিগুলি জ্বালা। আলিওশার বিব্রত মুখ দেখে জোসিমা প্রসন্ন হাসি হাসলেন, শীর্ণ দুই হাত বাড়িয়ে বললেন,—আয় বাবা, কাছে আয়। আমি জানতাম, তুই ঠিক আসবি।

আলিওশা তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখল। সারাদিনের বুকের ভার আর বাধা মানে না, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে।

ছিঃ বাবা, কাঁদতে নেই। জোসিমা ডান হাতটি তার মাথায় রাখলেন,—এই দ্যাখ না, আমি কেমন দিব্যি আছি, উঠে বসে গল্প করছি। কাল সেই মেয়ে-কোলে মা-টি আমায় বলেছিল না যে, আরো কুড়ি বছর আমি বাঁচব। হয়তো তার কথাই ফলছে। আহা, বেঁচে থাক্ ভক্তিমতী! পরফিরি, ওর দান তুমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলে তো?

গতকাল ভক্ত পল্লী-রমণীটি তার শ্রম-সঞ্চিত ষাটটি কোপেক জোসিমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, তার চেয়ে দরিদ্রতর কোনো লোককে এই টাকা দান করতে। কাল সন্ধ্যাবেলা জোসিমা মুদ্রাগুলি ফাদার পরফিরির হাতে দিয়ে তাকে পাঠিয়েছিলেন এক নিঃসহায়া বিধবার কাছে,—সম্প্রতি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে যার ঘর, যে পিতৃহারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভিক্ষায় নেমেছে পথে।

পরফিরি উত্তর দিয়ে জোসিমাকে সন্তুষ্ট করলেন।

জোসিমা আলিওশাকে বললেন,—ওঠো বাবা ওঠো, দেখি তোমার মুখ। বাড়ি গিয়েছিলে? ভাইএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

আলিওশা ভাবল, কোন্ ভাইএর কথা প্রভু বলছেন?

সাবধানে সে উত্তর দিল,—হ্যাঁ, এক ভাইএর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আমি বলছি তোমার বড়দাদার কথা, যার কাছে কাল আমি মাথা নিচু করেছিলাম।

তার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল, আজ আর হয়নি।

না বাবা, কাল আবার তুমি যাও, অন্যথা কোরো না। ওর সঙ্গে দেখা করে এক মহা বিপদ হয়তো তুমি সংবরণ করতে পারবে। তুমি জানো না, ওর কাছে আমি মাথা নিচু করিনি, করেছিলাম ওর ভাগ্যে যে প্রচন্ড দুঃখ ঘনিয়ে এসেছে তার কাছে।

এই কথা কটি বলেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন জোসিমা। কী যেন তিনি ভাবতে লাগলেন অন্যমনে। কাল ঘটনাটির দর্শক ছিলেন ফাদার ইয়োসিফ। তিনি নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ফাদার পাইসির সঙ্গে। আলিওশা চুপ করে থাকতে পারল না। বিচলিত কণ্ঠে সে শুধোল,—প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি খুলে বলুন, কিসের বিপদ দাদার শিয়রে?

প্রশ্ন কোরো না। কাল ওর চোখের দৃষ্টিতে এক সর্বনাশা ভয়ংকরের ইঙ্গিত আমি দেখেছি। ভয় পেয়েছি আমি নিজে। মানুষের চোখে এমনি দৃষ্টি আমি জীবনে আর মাত্র দু-একবার দেখেছিলাম, যে দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ চিত্রটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাল আমি তোমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম এই ভেবে যে ভাই হয়ে তুমি হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারবে! কিন্তু সবই করেন ঈশ্বর, আমাদের ভাগ্য ঈশ্বরেরই দান।

আবার তিনি করুণাঘন শান্ত চোখে আলিওশার মুখের দিকে তাকালেন। বলতে লাগলেন,—যেমন বাবা, ঈশ্বরের দান তোমার এই মুখখানি। তুমি জানো না আলেক্সি, তোমার এই মুখটি দেখে কতোবার নীরবে তোমাকে আমি আশীর্বাদ করেছি। আমি জানি, এই মঠের প্রাচীরের বাইরে তুমি চলে যাবে, কিন্তু সংসারী

জীবনও তুমি কাটাবে মঠবাসী সাধুর মতো। জীবনে অনেক শত্রু তোমার হবে, কিন্তু শত্রুরাও তোমাকে ভালো না বেসে পারবে না। অনেক আঘাত তুমি পাবে, কিন্তু সব আঘাত তোমার ভাগ্যে আনন্দ হয়ে ফুটে উঠবে।

মধুর হাসি হেসে এবার সাধুদের উদ্দেশ করে জোসিমা বললেন,—বন্ধুগণ, এই ছেলেটির মুখখানি আমার কেন এতো প্রিয়, তা এতোদিন আপনাদের কাছে আমি ব্যক্ত করিনি। আজ তা করতে চাই। ওর ঐ মুখে আমি যুগপৎ পেয়েছি স্মৃতির আভাস আর আদর্শের ইঙ্গিত। আমার শিশুকালে আমার এক দাদা ছিল। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। পরে আমি নিজে বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে উন্নততর জীবনের ইঙ্গিত ঐ দাদার চোখেই আমি দেখেছি। ঐ দাদাটি যদি আমার বাল্যজীবনে না আসত, সংসার-বৈরাগীর জীবন আমি পরে গ্রহণ করতে পারতাম না। আমার শৈশব শেষ হতে না হতেই সে বিদায় নেয়, আজ আমার জীবনের গোধূলিতে আবার সে এসেছে, এই আলেক্সির রূপ ধরে। সেই মুখ, সেই চোখের ইঙ্গিত। ওর মুখ আমার অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আলো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার এই দীর্ঘ জীবনের পিছনে ফেলে আসা মুহূর্তগুলি যেন নতুন করে জন্মলাভ করে, আবার এই জীবন-গোধূলির অন্ধকারও যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন যে প্রভু জোসিমার এই শেষদিনের বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে নয়,—জোসিমার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আলেক্সিই তাঁর শেষবাণী লিখে রাখে নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করে। শুধু জোসিমার কথাগুলি আলেক্সি লিখলেও এ নয় যে ঐ শেষ সন্ধ্যায় জোসিমাই একলা কথা বলেছিলেন। আসলে সাধু-সন্নিবেশে নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কথাবার্তা অগ্রসর হয়েছিল। তাছাড়া মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন জোসিমা, বিশ্রাম করে নিচ্ছিলেন শয্যায় দেহ এলিয়ে। মাঝে মাঝে ফাদার পাইসি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন, আলোচনা থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন অন্য সব সাধুরা। সেই রাত্রেই যে জোসিমার জীবনদীপ নির্বাপিত হবে কেউ তা ধারণা করেননি। দিনের বিশ্রাম তাঁকে নতুন শক্তি জুগিয়েছিল এই সান্ধ্য-আলোচনায়।

আলেক্সি লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি নিম্নে উদ্ধৃত হোলো।

দুই

প্রিয় সাধু ও বন্ধুগণ,

উত্তর দেশের এক সুদূর প্রদেশে এক অখ্যাত শহরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার পিতা সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন, যদিও অর্থসম্পদ বিশেষ কিছুই তাঁর ছিল না। আমার বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর, তখন তিনি মারা যান। তাঁকে আমার মনে পড়ে না। আমার বিধবা মা আর তার সন্তানদের জন্য বাবা রেখে যান

কাঠের একটি ছোট বাড়ি আর কিছু টাকা,—মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে যা অবশ্য যথেষ্ট উত্তরাধিকার। আমরা ছিলাম দুই ভাই,—আমার চেয়ে আট বছরের বড়ো দাদা মার্কেল আর ছোটভাই আমি। মার্কেলের মেজাজ ছিল রাশভারি, কিন্তু মনটি ছিল স্নেহশীল। বিদ্রূপ করে কাউকে কোনো কথা বলতে কেউ তাকে শোনেনি। সে অত্যন্ত কম কথাই বলত, এমন কি বাড়িতে মা, আমি বা ভৃত্যদের সঙ্গেও। পড়াশুনায় বেশ ভালো ছিল সে, স্কুলেও সে ছিল নির্বান্ধব, একাকী। মৃত্যুর মাস ছয় আগে, তার বয়স তখন সতেরো, এক রাজনৈতিক নজরবন্দী যুবকের সঙ্গে দাদার ঘনিষ্ঠতা হয়। নাস্তিক মত প্রকাশের অপরাধে যুবকটি মস্কো থেকে নির্বাসিত হয়ে আমাদের শহরে বসবাস করছিল, আবার কিছুদিন পরে পিটার্সবুর্গে ফিরে যায়। তার সঙ্গে পরিচয় দাদার মনে এক নতুন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সে বছর লেন্টের সময় দাদা ঘোষণা করল, সে উপবাস করবে না। ধর্মের অনুশাসন হেসে উড়িয়ে দিল সে। বললে, ভগবানের অস্তিত্বই আমি মানিনে। তার কথা শুনে মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ির চাকর-বাকর তো ভয়ে নিঃসাড়। আমার বয়স তখন মাত্র নয়, আমিও চমকে উঠলাম দাদার এমন দাবিতে।

দাদাকে দেখতে খুব সুদর্শন হলে কি হয়, এমনিতে স্বাস্থ্য তার ভালো ছিল না, বুকের দৌর্বল্য ছিল। লেন্টের ষষ্ঠ সপ্তাহে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তার জ্বর হোলো। ডাক্তার দেখে মা'র কানে কানে বললেন,—সর্বনাশ! এ যে রাজযক্ষ্মা!

দাদার কাছে খবরটা লুকিয়ে মা অঝোরে কাঁদলেন, তারপর দাদাকে বললেন,—বাবা, মন্দিরে চল্। প্রার্থনা করবি। মুখ ফেরাসনে ঈশ্বরের কাছ থেকে।

দাদা চটে উঠল, শুনল না মা'র কথা।

অসুখের মধ্যে দাদা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকদিন থেকেই বোধহয় সে জানত যে সে সুস্থ নেই। একদিন খাবার টেবিলে নিতান্ত শান্ত গলায় সে আমাদের বললে,—তোমাদের মধ্যে আব বেশী দিন আমি নেই। বোধকরি আর একটা বছরও নয়।

আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করলে দাদা।

তিনদিন পরে পুণ্য সপ্তাহ পড়ল। মঙ্গলবার সকালবেলা দাদা গির্জায় গেল। হাসি মুখে মাকে বললে,—এ কিন্তু শুধু তোমার জন্যে মা,—তুমি খুশী হবে বলে।

যুগপৎ আনন্দে আর দুঃখে মা'র চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরল। আনন্দ, দাদার ধর্মে মতি দেখে; দুঃখ, এই আশঙ্কায় যে, ছেলের আয়ু বুঝি ফুরিয়ে এল।

কিন্তু বেশী দিন আর গির্জায় যাওয়া হোলো না দাদার। শয্যা নিল একেবারে,—ঘরে শুয়েই প্রার্থনা করত, পাপ নিবেদন করত পুরোহিতের কাছে।

এল ইস্টারের পুষ্পগন্ধ-ভরা উষ্ণ উজ্জ্বল দিন। সেদিন সারা রাত ধরে দাদা শুধু কেশেছে, ঘুমুতে পারেনি এক লহমার জন্যেও। সকালবেলা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পোশাক পরে আরাম-চেয়ারে উঠে বসল। দাদার সেই চেহারাটি এখনো আমার চোখে ভাসে।

কী মিষ্টি ভাব, উজ্জ্বল হাসি-খুশী মুখ,—এতো অসুস্থ তবু আশ্বাস আর

সারারাত চোখের দৃষ্টিতে বিচ্ছুরিত। আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে যেন তার মনে, হৃদয়ের নিবিড়তম গভীর যেন কোন্ আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধা নার্স এসে বললে,—বাবা, প্রভুর মূর্তির সামনে প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিই!

হ্যাঁ, জ্বালো, জ্বালো মা। একদিন গেছে যেদিন আমি তোমাকে বারণ করেছি, তাই না? রোজ যখন তুমি প্রদীপটি জ্বালো,—তোমার এই কাজ প্রার্থনার মতো ফুটে ওঠে। আর তোমার এই প্রার্থনাটি দেখে আমার আনন্দ হয়,—এই আনন্দটি আমারও প্রার্থনা হয়ে ওঠে। তুমি আমি,—একসঙ্গে প্রার্থনা করি আমরা।

বিচিত্র তার কথা। মা শুনে পাশের ঘরে গিয়ে কেঁদে আকুল। ভালো করে চোখ মুছে আবার ছেলের কাছে এল, কিন্তু ঠিক ধরা পড়ে গেল। দাদা বললে,—কাঁদছিলে বুঝি? কেঁদো না মা। জীবন বড়ো আনন্দের,—আরো অনেকদিন আমি তোমাদের কাছে থাকব, আনন্দ করব!

বলিস্ কি বাছা? সারারাত তুই ঘুমুসনে, কেশে কেশে তোর বুক ফেটে যায়, কী আনন্দ তুই আর পাস্ রে!

বোলো না মা ও কথা। বোঝো না তুমি। এ জীবন স্বর্গ, স্বর্গের আনন্দ-আভায় জীবন উজ্জ্বল। আমরা সবাই তা বুঝিনে, বিশ্বাস করিনে। যদি তা পারতাম, তাহলে এ পৃথিবী আর পৃথিবী থাকত না, স্বর্গরাজ্য হয়ে যেত এক লহমায়।

সবাই অবাক হোতো তার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা শুনে। যারা দেখতে আসত তাকে, তাদের সে বলত,—আশ্চর্য! কিছু আমি করিনি কারুর জন্যে, তবু সবাই আমাকে কতো ভালোবাসে। মানুষের এতো ভালোবাসা আগে তো জানতে পারিনি!

ভৃত্যদের সে ডেকে বলত,—ভাইবোন, তোরা আমার জন্যে কতো করিস! ভগবান যদি দিন দেন, তোদের জন্যেও আমি করব। প্রত্যেকে সেবা করবে প্রত্যেককে, এই তো মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

মা বলতেন,—থাম্ বাপু। অসুখ শরীর নিয়ে ওদের সঙ্গে আর বকবক করিসনি।

দাদা বলত,—এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক পৃথিবীতে চিরদিনই থাকবে না মা, তাই আমি চাই এই ভৃত্যদেরও ভৃত্য হতে। আর একটা কথাও মনে রেখো, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের পাপের শেষ নেই, আর এই পাপ সবচেয়ে বেশি আমার।

অশ্রুজলে হাসি মিশিয়ে মা উত্তর দিতেন,—তোর পাপ হতে যাবে কেন বাবা? তুই কি খুনে, না ডাকাত?

মা গো, লক্ষ্মী সোনা আমার, মমতাময়ী আমার, বিশ্বাস করো, সর্ব-মানবের কল্যাণের দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের, তাই প্রত্যেক মানুষই পাপী; এতোদিন হেসেছি, কেঁদেছি, রাগ করেছি, কিন্তু নিজের এই পাপটিকে বুঝতে পারিনি। আজ বুঝেছি বলেই বেঁচে গেছি।

দিন কাটতে লাগল, দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল দাদার শরীর। মন তার ভরে উঠতে লাগল কোন্ আশ্চর্য আনন্দ-জ্যোতিতে। ডাক্তার জবাব দিলেন,—আর বেশী দিন নেই।

দাদা শুনে বললে, বয়েই গেল। দিনের হিসেব কে রাখে। সব সুখ তো মানুষ একটি দিনেই সঞ্চয় করতে পারে। একটি দিন, যেদিন কোনো হিংসা-দ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রেম আর আনন্দ,—অক্ষয় সেই দিন।

ডাক্তার চুপি চুপি মাকে বললে,—রোগ মস্তিষ্কে গিয়ে চড়েছে।

রোগীর শয্যার পাশে খোলা জানলা, বাইরে বাগানে বুড়ো বুড়ো গাছে নবীন মঞ্জরী ধরেছে। নব বসন্তের পাখিরা ডালে বসে গান গায়, কখনো বা জানলার ধারে এসে বসে। সেদিকে তাকিয়ে ঐ পাখিদের উদ্দেশ করে দাদা বলে,—আনন্দ-মাখা স্বর্গের পাখিরা, তোমাদের কাছেও আমি পাপী, তোমরাও আমাকে ক্ষমা করো!

আমাদের বলত,—তোমরা বুঝবে না। ঐ সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ, এই সব গাছ আর পাখি,—এদের আমি এতোদিন চিনিনি, উপলব্ধি করিনি এদের সৌন্দর্য আর মহত্ত্ব। এতোদিন দৃষ্টি আমার অন্ধ হয়ে ছিল যে!

মা চোখ মুছিয়ে দিতেন দাদার। বলত সে, - মা গো, ভেবো না। ভেবো না যে দুঃখে কষ্টে আমি কাঁদছি। এ আমার বড়ো আনন্দের অশ্রুজল। সকলের কাছে আমি পাপ করেছি, তবু সকলের মার্জনা আমি পেয়ে গেলাম। এ আনন্দের শেষ আছে?

মনে পড়ে, একদিন দাদার ঘরে আমি গেছি। ঘরে আর কেউ নেই, সূর্য পাটে বসেছেন, অস্ত-আলোয় সারা ঘর উদ্ভাসিত! দাদা আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতে আমার দু-কাঁধে দু-হাত চেপে সে করুণ নির্নিমেষ নয়নে কতোক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর শান্ত স্বরে বললে,—যাও ভাই খেলা করোগে, আমার হয়ে জীবনকে উপভোগ করোগে যাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। বুঝিনি। পরে কতোবার চোখের জল ফেলে ভেবেছি দাদার কথা। ঈস্টারের পরবর্তী তৃতীয় সপ্তাহে দাদা মারা গেল। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চৈতন্য ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আর ছিল চোখ-মুখের অবিচল আনন্দ-দ্যুতি। দাদার জীবন আর মৃত্যু আমার শিশুমনে যে স্পর্শ রেখে গিয়েছিল, তা কখনো মোছেনি, বরং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল পরবর্তী কালে।

দাদার মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে মা আমাকে পাঠালেন পিটারসবুর্গে সামরিক বিদ্যালয়ে। রাজকীয় সেনাবাহিনীতে ভবিষ্যতে আমি যাতে যোগ দিতে পারি, তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা। একমাত্র সন্তানকে দূরে পাঠাতে মা'র চোখে জল এল। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি নিজে আমাকে পিটারসবুর্গে দিয়ে গেলেন। আর তাঁকে আমি দেখিনি। বছর তিনেক পরে আমার অসাক্ষাতে তিনি মারা যান।

শিশুকালে যে গৃহে আমি দিন কাটিয়েছি তার কতো মধুর স্মৃতি আজো মনে জাগরূক আছে। সবচেয়ে উজ্জ্বলতম স্মৃতি সংসারের সেই বাইবেল-গ্রন্থটির, যেটি আমি পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়তাম। আর একটি বইও আমার বড় প্রিয় ছিল সেটি ছিল নানা ধর্মকাহিনীর বই, পাতায় পাতায় ছবি ভর্তি। বইটি এখনো আমার কাছে আছে

ঐ শেলফের ওপর—অতীতের প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন। ধর্মজীবনের মৃদু প্রেরণা আমি প্রথম লাভ করি যখন আমার বয়স মাত্র আট বৎসর। ঈস্টারের পূর্বেকার সোমবার দিন মা'র হাত ধরে গির্জায় গিয়েছি। চমৎকার দিন। ধূপদানি থেকে ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে জানলা দিয়ে আসা রৌদ্রের কাঁচা আলোয়। মস্ত একটা বই হাতে নিয়ে এক তরুণ দাঁড়াল সভার ঠিক মাঝখানে। বই খুলে পড়তে লাগল সে,—উজ দেশে এক ধর্মভীরু মহদাশয় লোক বাস করতেন। বহু বিত্তশালী তিনি —নাম যোব। ঈশ্বর শয়তানকে ডেকে বললেন,—দ্যাখো ঐ যোবকে, কতো বড়ো ভক্ত আমার। শয়তান ক্রুর হাসি হেসে বললে,—রাখো, রাখো তোমার বড়াই! লোকটাকে দু'দিন আমার হাতে ছেড়ে দাও, তারপর দেখবে অভিশাপ দিচ্ছে তোমাকে। ঈশ্বর বললেন,—বেশ, দেখা যাক। শয়তানের অদৃশ্য আঘাতে যোবের সব কটি সন্তান মারা গেল, ধূলিসাৎ হোলো তার সব ঐশ্বর্য। যোব কী করল এমনি সর্বনাশে? অঙ্গের শেষ বস্ত্রটি পরিহার করে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রার্থনা করল,—ঈশ্বর, মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, আবার উলঙ্গ হয়েই ফিরে যাব সমাধির গর্ভে। তার মাঝখানে তুমি যা কিছু দিয়েছিলে, সব কিছু ফিরিয়ে নিয়েছ। প্রভু জয় হোক তোমার!

সাধুগণ, শিক্ষকগণ,—আমার সেই বহু-বিগত শৈশবের কথা স্মরণ করে আজ যদি চোখে জল আসে, ক্ষমা কোরো। শয়তানের আস্ফালন টিকল না, ভক্ত যোব বললে, প্রভু, আমাকে শাস্তি যে দিলে, এ তোমারই দান। জয় হোক তোমার। শিশুকালে শোনা এই কাহিনী গতকালও আমি আবার পড়লাম। ঈশ্বরের দান আর ভক্তের প্রাণ,—কী অনির্বচনীয় রহস্যের যোগসূত্রে এ দুটি বাঁধা! সৃষ্টির প্রথম দিনে সৃষ্টিকর্তা বলেছিলেন,—আমার সৃষ্টি সুন্দর! সেই প্রসন্ন দৃষ্টি আবার ভক্ত যোবের ওপর রেখে আবার ঈশ্বর বলেছেন, হ্যাঁ, আমার সৃষ্টি সুন্দর! আর ঐ ভক্ত যোব, সে শুধু ঈশ্বরকে ভক্তি করেনি,—তার ভক্তি ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্বভূতে চিরকালের জন্য প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করেছে। আশ্চর্য এই বাইবেল, বিশ্বমানবের সর্বশক্তির মূল উৎস এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দে। এমন গ্রন্থ আর কখনো রচিত হবে না। অন্তরের সমস্ত অজ্ঞান আর অবিশ্বাসের অন্ধকার এই গ্রন্থের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপর কী হোলো যোবের? ঈশ্বর আবার তাকে তুললেন,—দিলেন যশ, মান, সম্পদ। আরো অনেক বছর কেটেছে, নতুন সন্তান-সন্ততি হয়েছে যোবের,—যোবের মন জুড়িয়েছে! কিন্তু একেবারে কী জুড়িয়েছে! মৃত সন্তানদের শোক সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নবজাত সন্তানদের পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতে সে কি পারে? পারে বইকি, পেরেছে বইকি! মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্যই এই যে শোকের দাহ ক্রমে রূপান্তরিত হয় মেদুর করুণ আনন্দে। যৌবনের উত্তপ্ত রক্তের চাঞ্চল্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় শান্ত পরিণত গাম্ভীর্যে। আগেকার মতো আজও আমি প্রভাতের সূর্যোদয়কে অভিনন্দিত করি। কিন্তু আজকাল আমি বেশি ভালোবাসি সূর্যাস্তকে—অস্তগামী সূর্যের দীর্ঘ বঙ্কিম রেখা শান্ত মধুর কতো স্মৃতিকে বহন

করে আনে,—আমার এই দীর্ঘ জীবনের কতো আনন্দ-মুহূর্তকে মনে পাড়িয়ে দ্যায়, চিরন্তন সত্যকে এই সূর্যাস্ত-আভা আলোকিত করে কারুণ্যে, ক্ষমায় আর তিতিক্ষায়। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু প্রতিদিনই আমি অনুভব করছি এক বিচিত্র অনন্ত মহাজীবনের ডাক প্রাণে বাজছে,—সেই আহ্বানের পুলক-আবেগে শিউরে উঠছে আমার বুক,—আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠছে আমার চোখ।

সাধুগণ, শিক্ষকগণ, শিশুর মতো কতো কী আজ বকবক করছি, সেজন্যে আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি যা বলছি তা আমার চেয়ে অনেক ভালো করে অনেক শিক্ষণীয় করে আপনারা বলতে পারেন। আমি আজ শুধু প্রাণের আনন্দে কথা বলে চলেছি, প্রাণের আনন্দে চোখের জল ফেলছি,—এই সব কথা আর এই অশ্রুকে আপনারা ক্ষমা করুন। আমার সর্ব আনন্দের উৎস শুধু ঈশ্বরের বাণী,—ঐ বাইবেল। এই বাণীকে ভালোবেসে আপনারাও চোখের জল ফেলুন,—দেখবেন, ঐ অশ্রুর বাণী দীনতম কৃষাণেরও কানে বাজবে। ওদের কাছে যান,—বক্তৃতার দরকার নেই, উপদেশের দরকার নেই, শুধু বাইবেলের কাহিনীগুলি ওদের কানে শোনান। দেখবেন, ওরা আপনাদের এই দানের শতগুণ প্রতিদান দেবে, সম্মান দেবে, প্রয়োজনের সব সাহায্য ঐ দরিদ্রদের কাছ থেকেই আপনারা পাবেন। বিশ্বমানব ওরাই, দরিদ্র কৃষিকর্মীর দল, ওদের কাছেই যেতে হবে যদি বিশ্বকর্মকর্তার কাছে পৌঁছতে হয়। ঈশ্বরের সন্তানদের যদি না বিশ্বাস করেন, তাহলে ঈশ্বর-বিশ্বাস হোলো কই? পিতার প্রতি প্রেম কেমন করে সম্ভব, পিতার সন্তানদের প্রতি প্রীতি যদি প্রবাহিত না হয়? এই জনসাধারণের অন্তরের শক্তিই অবিশ্বাসীদের হার মানাতে পারে,—ফিরিয়ে আনতে পারে বিশ্বাসের পিতৃভূমিতে।

যীশুখৃষ্টের বাণীই তো আমাদের জীবন। আমাদের জীবনই তাঁর ধর্মের উদাহরণ! নইলে নিষ্ফল ধর্ম, নিষ্ফল বাণী, তাই না?

অনেক দিন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে,—আমার তখন যুবা বয়স,—আমি আমাদের মঠের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সারা রুশিয়া ভ্রমণ করেছিলাম। ফাদার আনফিম আর আমি—দুজনে। একদিন এক নদীর ধারে জেলেদের কুটীরে আমরা রাত্রিবাস করি। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি সুদর্শন কৃষাণ কিশোর। বছর আঠারো বয়স, চোখে বিশ্বাসভরা স্বপ্নালু দৃষ্টি। সকালে উঠে সেও যাত্রা করবে তার কাজে। জুলাই মাসের উষ্ণ উজ্জ্বল রাত্রি, নদীবক্ষ জুড়ে অল্প একটু কুয়াশার আবরণ, চারিদিকে নিঃসীম অন্ধকার আর স্তব্ধতা, সুগভীর রাত্রি যেন তপস্যামগ্ন। আমার আর ঐ ছেলেটির চোখে ঘুম নেই। আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করছিলাম ঐ সুন্দর প্রকৃতি আর তার সৃষ্টিকর্তার কথা। প্রতিটি তৃণ আর প্রতিটি সোনালী মৌমাছি,—প্রতি পশু, প্রতি পতঙ্গ—মানুষের বুদ্ধি তাদের নেই, তবু তারা জানে কেমন করে তারা বড়ো হবে, কোন্ পরিণতির পথে তারা যাত্রা করবে। এই অনন্ত কালপন্থায়

তারাও নির্ভীক পথিক, সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক বিধানকে উপলব্ধি করে তাঁর বিচিত্র সংকীর্তনে তারাও জীবনের সুর মিলিয়েছে।

ছেলেটি আসলে ব্যাধ। অরণ্যে থাকে. সব পাখি আর পাখির ডাক চেনে। সে বললে,—প্রকৃতির সব কিছুই সুন্দর। তবে আমি বনে থাকি, বনই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

আমি উত্তর দিলাম, ঠিকই বলেছ ভাই. সৃষ্টির সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই মহান। ঘোড়া, গরু, যারা মানুষের নিকটতম বন্ধু,—অবোলা জীব, কতো মার সহ্য করেও নীরবে মানুষের সেবা করে চলেছে। তাদের নিঃশব্দ বিনম্র সাধনার কী মাধুর্য। মানুষই পাপী, কিন্তু এই পশুদের মধ্যে কোনো পাপ নেই। মানুষেরও আগে প্রভু যীশুর আশীর্বাদ তারাই পেয়েছে।

কী বলেন আপনি? যীশুর আশীর্বাদ পেয়েছে পশুরা?

নিশ্চয়, তাঁর আশীর্বাদ সকলের জন্যে,—কী পশু, কী উদ্ভিদ, কী মানুষ। প্রতিটি তৃণ, নববিকশিত প্রতিটি কিশলয় প্রতি মুহূর্তে তাঁরই বন্দনা গাইছে। তাঁর বাণী স্পন্দিত হচ্ছে বিশ্বচরাচরে।

গ্রাম্য তরুণটি ভাবাবেগে বললে,—কী সুন্দর! কী সুন্দর তাঁর আশীর্বাদ!

শান্ত হয়ে নিষ্পাপ নিরুদ্বেগ ঘুমে সে চোখ বুজল। আমি নিদ্রা যাবার আগে প্রার্থনা করলাম, তার জন্যে, সকলের জন্যে। বললাম,—প্রভু, তোমার শান্তি তোমার আলোক সর্বভূতে প্রবাহিত হোক।

তিন

পিটারস্‌বুর্গের সামরিক স্কুলে আমার আট বছর কেটেছিল। সেখানকার অভিনব পরিবেশে শৈশবের অনেক স্মৃতি একেবারে মুছে না গেলেও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। নানা নূতন চিন্তা ও অভ্যাস সংগ্রহ করার ফলে ক্রমে আমি এক নিষ্ঠুর মত্তপ্রাণ যুবকে পরিণত হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে ফরাসী ভাষা আর আধুনিক অভিজাত সমাজের পালিশ-করা আচার-ব্যবহার আমার রপ্ত হয়েছিল।

শিক্ষা শেষ করে আমরা অফিসার হয়ে স্কুল থেকে বার হলাম। মুখে আমরা তখন বলি যে নিজের নিজের সৈন্যবাহিনীর সম্মানের জন্যে প্রাণ দিতে আমরা সক্ষম, কিন্তু আসলে সম্মান কাকে বলে তার বিন্দুবিসর্গও আমরা জানিনে। মদ্যপান ব্যভিচার আর নৃশংসতা, এই আমাদের দম্ভ করবার মতো বস্তু। আসলে আমরা যে অন্তরে অন্তরে খারাপ ছিলাম তা নয়, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রায় ভব্যতার লেশমাত্র ছিল না। দলের মধ্যে চূড়ান্ত অভব্য ছিলাম আমি, তার কারণ, পৈত্রিক অর্থ আমার হাতে এসে গিয়েছিল, আমাকে তখন আর ঠেকায় কে?

বই পড়তে আমি চিরকালই ভালোবাসি। তখনও পড়তাম, কিন্তু বাইবেল গ্রন্থটি আমার সঙ্গে থাকলেও একদিনের জন্যেও এ বই আমি খুলিনি।

আরো চার বছর এমনি জীবন-যাপনের পরে আমি আমার সৈন্যদলের সঙ্গে কোনো একটি শহরে বদলী হলাম। সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমার যৌবন, পদমর্যাদা আর অর্থ,—এই তিন মিলে আমাকে সকলের সমাদরের আসনে বসাল।

সেইখানে হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল, যা আমার জীবনকে সম্পূর্ণ অন্য পথে নিয়ে গেল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি সুন্দরী শিক্ষিতা ও চরিত্রবতী কন্যার প্রতি আমি আসক্ত হলাম। মেয়েটির পরিবারবর্গ আমাকে তাঁদের মধ্যে সাদরে আহ্বান করে নিলেন। কন্যাটিও আমার প্রতি অনুরক্ত নয়, এই মনে করে আমার কল্পনাস্রোত রঙিন হয়ে উঠল। এই আরম্ভ উদ্দীপনা যে প্রকৃত ভালোবাসা নয়, তা অবশ্য আমি পরে উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু সে সময়ে কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টায় আমি যে তার পাণি-প্রার্থনা করিনি তার কারণ আমার স্বার্থপরতা। উদ্দাম খেয়াল-খুশীর পাখাকে বিবাদের জালে জড়িয়ে ফেলতে সে-মুহূর্তে আমার মন চায়নি। মেয়েটির কাছে আমার মনোভাব পরোক্ষভাবে অবশ্য প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু কোনো পাকা প্রস্তাবে আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলিনি।

এমনি সময়ে দু-মাসের জন্যে হঠাৎ আমাকে অন্যত্র বদলী হতে হোলো। দু-মাস পরে ফিরে এসে দেখি, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে! স্বামীটির বয়স আমার চাইতে বেশি হলেও তিনি যুবাপুরুষ। আভিজাত্যে ও শিক্ষাতেও আমার চাইতে অনেক বড়ো। এই ঘটনায় আমি যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আরো বিভ্রান্ত হলাম, যখন জানলাম যে মেয়েটি বহুদিন থেকেই এই ভদ্রলোকের বাগ্‌দত্তা ছিল। একথা সকলেই জানত, আমিই কেবল জানতাম না। মেয়েটির বাড়িতে ভদ্রলোককে আমি পূর্বে বহুবার দেখেছিলাম, কিন্তু নিজের মূঢ় দাম্ভিকতায় তাঁর স্বাভাবিক ব্যবহারগুলি আমি লক্ষ্য করিনি। রাগে আগুন হয়ে উঠলাম। মনে পড়ল, আমি কতোবার মেয়েটির প্রতি আমার অনুরক্তি প্রকাশ করেছি, কিন্তু সে কিছু বলেনি, বাধাও দেয়নি, নিশ্চয় মনে মনে হেসেছে। সে যে ঠাট্টা করে আমার হৃদয়াবেগকে উড়িয়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেত আমারই ভালোর জন্যে, তখন সে কথা আমার মনে এল না, মনের দাবদাহ তখন শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থের উপায় খুঁজতে লাগল।

সুযোগ আসতে দেরি হোলো না! একদিন এক আসরে বহু গণ্যমান্য জনসমক্ষে আমার প্রেমের সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক সামান্য অছিলায় কুৎসিতভাবে অপমান করলাম ও আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে আহ্বান করলাম। ভদ্রলোক আমার চাইতে বয়সে ও সম্মানে অনেক বড়ো, তবু তিনি আমার আহ্বান গ্রহণ করলেন। আইনত ডুয়েল লড়া অপরাধ হলেও অভিজাত মহলে এমন লড়াই তখন হামেশাই চলত।

জুন মাসের শেষাশেষি। একদিন ভোর সাতটায় শহরের প্রান্তে এক প্রান্তরে আমাদের লড়াই হবে। আগের দিন রাত্রিবেলা যখন ঘরে ফিরলাম তখন প্রতিহিংসা গ্রহণের উৎসুক আবেগে আমার মনে জ্বালাধরা উন্মত্ততা। অকারণ ক্রোধে ভৃত্যটাকে মারলাম। এমন প্রচণ্ডবেগে পর-পর দুই ঘুষি মারলাম যে তার সারা মুখটা রক্তে

ভেসে গেল। তার পর শুতে গেলাম বিছানায়। ঘণ্টা তিনেক ঘুমোলাম। জাগলাম প্রত্যুষে। আর ঘুম এল না, শয্যাত্যাগ করে জানলা খুলে দাঁড়ালাম। পূর্ব আকাশে তখন নবোদিত সূর্যের অরুণ আভা, প্রত্যুষের পাখিরা গান শুরু করেছে।

প্রভাত-প্রকৃতির সুদাকিল প্রসন্নতা, কিন্তু আমার অন্তর জুড়ে কেন এতো গ্লানির কালিমা? নরহত্যা করতে যাচ্ছি বলে? না, তা তো নয়! ভীরু আমি, প্রাণভয়ের ব্যাকুলতায়? না, তাও তো নয়! তবে কেন? হ্যাঁ বুঝেছি, ঠিক বুঝেছি এবার। কাল রাত্রে ঐ নিরপরাধ ভৃত্যটাকে মেরেছি বলে। মুছে গেল সূর্যালোক, চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই অমানুষিক দৃশ্যটা। আমার সামনে নিরীহ বেচারা দাঁড়িয়ে আছে, আমি সজোরে তার মুখে ঘুষি মারলাম, লোকটা আত্মরক্ষার জন্যে হাতদুটো পর্যন্ত উঁচু করল না, অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল। আবার ঘুষি মারলাম তার মুখে। কী বীভৎস দৃশ্য! মানুষ মানুষকে মারছে, ভাই ভাইএর মুখে হানছে হীনতম আঘাত। মনুষ্যত্বের এই পরিণতি! এ কী পাপ! সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরিকা যেন আমার মর্মস্থলকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। হঠাৎ উপলব্ধির যন্ত্রণায় আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সামনে পূর্ব-আকাশে সূর্য উঠতে লাগল, পাখিরা গাইতে লাগল বন্দনা-গান। ক্ষণেক পরে দু-হাতে মুখ ঢেকে আমি বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বহুদিন পরে মনের মুকুরে ভেসে উঠল দাদার মুখ, জীবনের শেষ কটি দিনে পারিবারিক ভৃত্যদের সঙ্গে তার ব্যবহার।

দাদা তাদের বলেছিল,—তোমাদের সেবার উপযুক্ত আমি নই।

সেই কথা আমার কানে বাজতে লাগল।

দাদা মাকে বলেছিল,—মা গো, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব তোমার আমার প্রত্যেকের। এই দায়িত্ববোধ যদি সকলের থাকত তাহলে এই পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠত।

সেই কথাগুলিও আমার কানে বাজতে লাগল।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে অস্ফুটস্বরে আমি বলতে লাগলাম,—ঈশ্বর, কোথায় আমার সেই দায়িত্ববোধ? আমি যে সকলের চেয়ে পাপী!

এক চরম সত্য আমার অশ্রুধৌত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কী করতে চলেছি আমি আজ? একজন শিক্ষিত ভদ্র সাধু ব্যক্তি, যে আমার কোনো ক্ষতি করেনি, তাকে হত্যা করতে আর তার স্ত্রীকে সারা জীবনের মতো স্বামীসুখহারা করতে আমি চলেছি। যে রমণীকে ভালোবাসি বলে মনে করি, তার সর্বনাশ সাধনের জন্যে চলেছি আজ, এরই নাম ভালোবাসা?

বালিশে মুখ ঢেকে কতোক্ষণ এমনি পড়েছিলাম জানিনে, চমক ভাঙল তুরেন্সের কণ্ঠের ডাকে। পিস্তল নিয়ে সে এসেছে। বললে, বাঃ, ঘুম ভেঙেছে? ওঠো, তৈরী হও। আর দেরি নেই।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। পথে বার হবার সময় বললাম,—এক মিনিট দাঁড়াও, আমার টাকার ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমার ভৃত্যের ঘরে গেলাম।

ভৃত্যকে বললাম,—ওরে, কাল তোকে আমি অন্যায়ভাবে মেরেছি, তুই আমাকে ক্ষমা কর!

লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অফিসারের ঝকঝকে পোষাক-পরা অবস্থায় আমি তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলাম, তার পায়ে মাথা রেখে বললাম,—ক্ষমা কর্ আমাকে!

লোকটা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে ছিল। এতোক্ষণে সে চীৎকার করে উঠল.—প্রভু! এ কী করছেন? আমি যে আপনার দাস!

এই বলে ঠিক আমি যেমন কেঁদেছিলাম, তেমনি সে ডুকরে কেঁদে উঠল, দু-হাতে ঢাকল মুখ। আমি দৌড়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠলাম। বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললাম,—ভায়া, আজকের লড়াই-এ কে জিতবে জানো? আমি—আমি!

আমার স্ফূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেল বন্ধুটি। বললে,—আশ্চর্য. একটুও ঘাবড়াওনি? সত্যিই বুকের জোর আছে তোমার. এই ইউনিফর্মের মর্যাদা তুমিই রাখবে।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেখি প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে, মাঝে বারো হাতের ব্যবধান। প্রথম পিস্তল ছোঁড়ার পালা তাঁর। আমি হাসিমুখে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে ভয় নেই বিন্দুমাত্র, আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি।

তাঁর গুলি ঠিক আমার গালের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি বললাম,—ধন্যবাদ, কোনো নরহত্যা ঘটল না। আমার হাতের পিস্তলটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দূরে বনের মধ্যে।

তার পর প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এসে আমি বললাম,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মূর্খের মতো আপনাকে অকারণ অপমান করেছি, আমার গায়ে গুলি ছুঁড়তে আপনাকে বাধ্য করেছি. এ অপরাধ আমার মার্জনা করুন। আপনি আমার চাইতে দশগুণে মহৎ। আপনার যিনি প্রিয়পাত্রী, তাঁকে আমার এই স্বীকৃতির কথা আপনি বলবেন।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করে উঠল।

বিরক্তিভরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বললেন,—লড়তে যদি না চাও তো আমাকে এখানে ডেকেছিলে কেন?

হাসিমুখে আমি উত্তর দিলাম, গতকাল পর্যন্ত আমি মূর্খ ছিলাম, সে মূর্খতা থেকে আজ সকালে মুক্তি পেয়েছি।

গতকাল পর্যন্ত মূর্খ ছিলে তাতে সন্দেহ নেই, আজকের ব্যাপারেই আমার সন্দেহ। যা হোক, তুমি গুলি ছুঁড়বে কিনা?

যতো খুশী ঠাট্টা করুন, কিন্তু পিস্তল আমি স্পর্শ করব না। আপনি যদি চান, আর-একবার গুলি করতে পারেন আমাকে।

চীৎকার করে উঠল আমার সহচর,—ছি! ছি! ডুয়েল লড়তে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ক্ষমা চাইছ! রেজিমেণ্টের নাম ডোবালে তুমি!

আমি বললাম,—বন্ধুগণ! কেউ যদি তার অন্যায়কে উপলব্ধি করে সর্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করে, সেটা কি আজকের দিনে খুবই একটা আশ্চর্য ঘটনা?

কিন্তু তাই বলে ডুয়েল লড়তে এসে? আবার প্রতিবাদ করল আমার সহচর।

হলেই বা! কেন নয় বলো? আমি বললাম,—অবশ্য আমার উচিত ছিল এখানে পৌঁছেই দোষ স্বীকার করা, তাহলে আমার বন্ধুকেই নরহত্যার প্রবৃত্তির পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারতাম। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর গুলির সামনে যদি প্রথমেই বুক পেতে না দাঁড়াতাম, তাহলে আমার কথা আপনারা কেউ বিশ্বাসই করতেন না। ভাবতেন, আমি কাপুরুষ। উঁচোনো পিস্তল দেখে মৃত্যুভয়ে আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি।

বন্ধুগণ, আমার অন্তর থেকে কথাগুলি বার হয়ে এল। একবার চারদিকে তাকান, দেখুন, চারদিক জুড়ে জগদীশ্বরের কতো অপরূপ আশীর্বাদ। স্বচ্ছ আকাশ, মধুর বাতাস, নবীন তৃণ, পাখির গান—সারা প্রভাত-প্রকৃতিতে নিষ্পাপ মাধুর্যের লীলা। এর মধ্যে আমরাই কেবল অবোধ, আমরাই পাপী। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবার পথে আমরাই বাধা। ঈশ্বরের ঐ লীলাকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করুন। সূর্যালোকে অন্ধকার যেমন কেটে যায়, তেমনি মন থেকে সর্বমালিন্য দূর হবে, মানুষ মানুষকে প্রিয়তম বলে করবে আলিঙ্গন।

আরো কথা আমি বলতাম, কিন্তু অনির্বচনীয় আনন্দে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। এতো বিপুল আনন্দের আস্বাদ জীবনে আর কখনো পাইনি।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বললেন,— কথাগুলো তো বেশ সুন্দরই বললে, এখন দেখছি তুমি এক আশ্চর্য মানুষ।

হাসিমুখে আমিও উত্তর দিলাম,—হাসুন, আমার কথা শুনে যতো খুশী হাসুন, কিন্তু একদিন বুঝবেন, আমি ঠিকই বলেছি।

না, একদিন কেন, আজই বুঝলাম যে, মন থেকেই তুমি এসব কথা বলছ। সত্যি তুমি সাধু লোক। এসো ভাই, আমার হাতে হাত রাখো, করমর্দন করি।

না, আজ নয়। যেদিন প্রকৃতপক্ষে আপনার এই সম্মানের আমি অধিকারী হব, সেদিন। আজ বিদায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকালবেলাকার ঘটনা সমস্ত অফিসারদের কানে পৌঁছলে, সহকর্মীরা বিচার করতে বসল আমার ব্যবহার। প্রায় সকলেই বললে,—ও সামরিক পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়। এখনি ওর ইস্তফা দেওয়া উচিত।

আমার পক্ষ নিয়ে কয়েকজন বললে,—কিন্তু ওতো প্রতিপক্ষের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল। নিজের পিস্তল তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তার পরে। ব্যাপারটা অতো সহজ নয়, তলিয়ে দ্যাখো।

আমি পরম আনন্দে মজা দেখতে লাগলাম, তার পর বললাম,—ভাই সব, আমার

ইস্তফা দেওয়া উচিত কিনা, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। কেন না, আজ সকালেই আমি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। যে মুহূর্তে আমি ছাড়া পাব, সোজা এ স্থান ত্যাগ করে কোনো মঠে গিয়ে আশ্রয় নেব। এই উদ্দেশ্যেই আমি সৈন্যবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমার কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল,—ও, তাই বলো, তুমি সাধু হবে! আগে বলতে হয়! সাধুবাবার তো সাতখুন মাপ!

হাসি আর শেষ হয় না। তবে হাসির মধ্যে ধিক্কার নেই, আছে আনন্দ। মাসখানেক পরে যখন আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হোলো, তখন সবাই আবার ঘিরে ধরল আমাকে, বললে,—এ কোন্ পথে তুমি চলেছ ভাই? এ পথ ছাড়ো।

কেউ কেউ বললে,—না, ওকে বাধা দিয়ো না। মৃত্যুকে ও ডরায়নি, হত্যাকে ও এড়িয়েছে। সেই ডুয়েলের আগের দিন রাত্রে স্বপ্নে ঈশ্বর ওকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সন্ন্যাসী হবার জন্যে।

সমাজেও আমাকে নিয়ে মহা উত্তেজনা। আমার প্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি, বিশেষ স্নেহ। সকলেই আমাকে নিমন্ত্রণ করে কাছে ডাকে। মুখে বলে, আমি পাগল, কিন্তু মনে মনে ভালোবাসে। আমি বুঝলাম, তাদের ঠাট্টার মধ্যে তিক্ততা নেই,—তাই ক্রমে আমিও নির্ভয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। পুরুষ মহিলা অনেকেই নিবিষ্টভাবে আমার কথা শুনতে লাগল।

ওরা হেসে বললে,– কী পাগলের মতো তুমি কথা বলো? সর্বমানবের কল্যাণের দায়িত্ব প্রত্যেকের! তাহলে তোমার ভালোমন্দের দায়িত্বও আমার? সত্যি, তাই নয় কি?

আমি বললাম,—হ্যাঁ, ধ্রুব সত্য! কিন্তু বহু যুগ ধরে পৃথিবী যে পথে চলেছে তাতে মিথ্যাকেই সত্য বলে চিনতে আমরা শিখেছি। এই দেখুন, আমার এই সারা জীবনে একটিমাত্র সত্য কাজ আমি করলাম, আর আপনারা সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন!

যে মহিলার আকর্ষণে আমি ডুয়েল লড়তে গিয়েছিলাম, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। কখন তিনি এসেছেন আমি আগে লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমার সামনে এসে আমার দু-হাত ধরে বললেন,—না বন্ধু, আর যে কেউ হাসুক, আমি হাসিনি। আপনি যে কাজ করেছেন, সেজন্য আমার সমস্ত অশ্রু, সমস্ত শ্রদ্ধা আপনি গ্রহণ করুন।

তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর স্বামীও উঠে এসে আমার করমর্দন করলেন। তার পর উপস্থিত সকলে বহু প্রীতি-সম্ভাষণে অভিষিক্ত করলেন আমাকে।

এই সভায় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর নাম আমি জানতাম, কিন্তু এর পূর্বে কখনো আলাপ-পরিচয় হয়নি। ভদ্রলোক শহরের একজন উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারী। ধনী ও দানশীল বলে প্রসিদ্ধ। গম্ভীরদর্শন,

স্বল্পবাক, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। প্রায় দশ বছর হোলো বিবাহিত,—যুবতী স্ত্রী ও তিনটি সন্তান তাঁর।

মিলিটারিতে পদত্যাগপত্র পাঠাবার পরই আমি আগেকার কোয়ার্টার ত্যাগ করে এক বন্ধুর বাড়িতে বসবাস শুরু করি। সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় এই ভদ্রলোক সহসা দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন।

তিনি বললেন,—গত ক'দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় আপনি যে সব কথা-বার্তা বলেছেন, তা আমি মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার ও ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করবার আমার অভিলাষ। আপনি কি তা পূরণ করবেন?

ভদ্রলোকের আবির্ভাবে ও এমনি সম্ভাষণে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমতা-আমতা করে বললাম,—নিশ্চয়, এতো আমার সৌভাগ্য। আসুন, বসুন।

ভদ্রলোক বসলেন। গম্ভীরকণ্ঠে আবার তিনি বললেন,—আমি বুঝেছি যে আপনি অতি দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। আপনি সত্যের সেবা করেছেন, তার ফলে যদিও সকলের অবজ্ঞাটুকুই আপনার লাভ হয়েছে।

আমি বললাম,—আজ্ঞে, আমার মনে হয়, আপনি আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করছেন।

না, অতিরিক্ত নয়, আগন্তুক বললেন,—বিশ্বাস করুন, আপনি যা করেছেন তা অত্যন্ত কঠিন, যতো কঠিন আপনি নিজে মনে করেন তার চেয়েও। এই জন্যেই আমি আকৃষ্ট হয়ে আপনার কাছে এসেছি। একটি কৌতূহল আমার আছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে তা আপনাকে মেটাতে হবে। সেই ডুয়েলের দিন আপনি যখন প্রতিপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার মনের অনুভূতি কি ছিল তা আপনি আমার কাছে বর্ণনা করুন। ভাববেন না যে এ আমার নিতান্ত খেয়ালী প্রশ্ন। আমার কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে,—ভগবান যদি সুযোগ দেন, আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যদি হতে পারি, তাহলে আমার উদ্দেশ্যের কথা আপনাকে জানাব।

ভদ্রলোক যখন কথা বলছিলেন, আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা আমার মনে জাগল, ঔৎসুক্যও জাগল তাঁর রহস্য জানবার জন্যে। আমি প্রাণ খুলে তাঁকে সব কথা বললাম। ভৃত্যের প্রতি আমার দুর্ব্যবহার ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কথাও গোপন করলাম না।

সব শুনে তিনি বললেন,—কিছু মনে যদি না করেন, আবার আমি আপনার কাছে আসব।

তার পর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ভদ্রলোক আমার কাছে আসতে শুরু করলেন। আমার ধ্যান-ধারণা অনুভূতি নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন, আমার সব বক্তব্য তিনি মন দিয়ে শুনতেন। আমি তাঁর চাইতে বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনি আমাকে সমান জ্ঞানে সম্মান করতেন। তাঁর মতো উদার-মন ভদ্রলোকের সাহচর্যে আমারও

উপকার কম হোলো না। তবে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোনো কথাই তিনি আলোচনা করতেন না।

একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন,— দেখুন, স্বর্গ আর কোথাও থাক বা না থাক, এই মরজীবনই স্বর্গের আসন, এই একটি বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল।

কথা কটি বলে তিনি মৃদু হাসলেন। আমার মনে হোলো, আরো কিছু বুঝি তাঁর বলবার ছিল, সংবরণ করলেন নিজেকে।

আবার একটু পরে তিনি বললেন,—জানেন, মানুষের অন্তরের আড়ালেই স্বর্গ লুকিয়ে থাকে। যদি চাই, কালই মনকে উন্মোচন করে সেই স্বর্গকে চিরজীবনের জন্যে আমি উদ্ঘাটিত করতে পারি।

আমি একদৃষ্টে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর উচ্চারণে গভীর হৃদয়াবেগের প্রকাশ, তাঁর দৃষ্টিতে কী এক রহস্য—তিনি যেন কোনো প্রশ্ন করছেন আমাকে।

আর এই যে আপনি বলছেন,—প্রত্যেকের জন্যে আমরা প্রত্যেকে দায়ী, সকলের কল্যাণ আমাদের সকলের ব্রত,— এর চেয়ে বড়ো সত্য আর নেই,—এই সত্য আপনি অতি সহজে কী করে উপলব্ধি করলেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। এই সত্য যতো শীঘ্র সর্বমানব উপলব্ধি করবে, ততো শীঘ্র পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে।

ক্লান্তকণ্ঠে আমি বললাম,—কিন্তু কবে তা হবে? কতো যুগ পরে? স্বপ্ন কি চিরদিন স্বপ্নই থাকবে?

কী বললেন? আপনি বিশ্বাস করেন না? যা আপনি প্রচার করেন তাতে আপনার নিজের আস্থা নেই? কিন্তু হবে বন্ধু, স্বপ্ন সত্য হবেই। তবে এখুনি না, কেন না, সব পরিবর্তনেরই একটা রীতি আছে। এই রীতি মানসিক, আত্মিক। এই পৃথিবীকে নতুন করে যদি গড়তে হয়, তাহলে মানুষকে তার মানোজগতের নতুন পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যদি একে অপরের ভাই না হই, তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কি শুধু মুখের কথায় আসবে? আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষাই বলুন, সমস্বার্থের প্রেরণাই বলুন, কিছু দিয়েই মানুষে মানুষে সম্পত্তি ও সুযোগের সমবণ্টন সম্ভব হবে না। প্রত্যেকে বলবে,—আমার ভাগে কম পড়েছে,—প্রত্যেকে অপরকে হিংসা করবে, আক্রমণ করবে। আপনি প্রশ্ন করছেন,—সে মহাদিন কবে আসবে? আসবে নিশ্চয়ই একদিন, তবে সেই স্বর্ণযুগের তীরে পৌঁছতে হলে তার আগে আমাদের পার হতে হবে একাকিত্বের কালসমুদ্র।

একাকিত্ব বলতে আপনি কী বোঝেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

কেন? এ যুগের যুগধর্মই তো একাকিত্ব। বিশ্বজোড়া এই নীতি। এর বিকাশ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তবে হবার পথে চলেছে। প্রত্যেকটি লোক দেখুন, নিজেকে অপরের কাছ থেকে যতোদূর পারে সরিয়ে রাখছে, প্রত্যেকে চায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,—চায় নিজের সুখ, নিজের সমৃদ্ধি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা। ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্য নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নয়। বোঝো না, ব্যক্তিগত সার্থকতার জন্যে সারা জীবন যে প্রচেষ্টা করে, সে প্রচেষ্টা তাকে আত্মোপলব্ধির পথ দেখায় না, নিয়ে যায় আত্মধ্বংসের পথে, আত্মসর্বস্ব একাকিত্বের অন্ধকারে। আমাদের যুগের মানব-সমাজ বিন্দু বিন্দু ব্যক্তিত্বে ভাগ হয়ে গেছে. প্রত্যেকে অপরের থেকে আলাদা, প্রত্যেকে নিজের কোটরের মধ্যে বন্দী। সে কোটরের মধ্যে আত্মগোপন করে নিজের নিজের যা কিছু সঞ্চয় সে লুকিয়ে রাখে, ব্যষ্টিকে সে বর্জন করে। ব্যষ্টিও বর্জন করে তাকে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের স্তূপের ওপর একলা বসে সে মনে করে, কতো সম্পদ আমার, কতো শক্তি আমার। মূর্খ সে। বোঝে না, যতো তার সঞ্চয়, ততো সে নিরাশ্রয়, ততো তার আত্মধ্বংসী ক্লৈব্য। সমাজ থেকে নিজেকে প্রত্যেক মানুষ বিচ্ছিন্ন করেছে, সে শুধু নিজের ওপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক সাহচর্যের শিক্ষা সে পায়নি, মানুষ আর মানবত্বকে বিশ্বাস করতে সে শেখেনি। তাই সে শুধু ভয়ে কাঁপে, এই বুঝি ওরা হাত বাড়াল, এই বুঝি তার সব গেল। সামাজিক পরিকল্পনা যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বড়ো, একথা এ যুগে কেউ উপলব্ধি করে না। কিন্তু এই সর্বনাশা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মৃত্যু একদিন আসবেই,—সেদিন সকলে বুঝবে, মানুষ হয়ে মানুষকে এড়িয়ে কী ভুল তারা করেছে। সেদিন সকলে ভাববে, এতোদিন আত্ম-সর্বস্বতার অন্ধকারে কী মোহে বসেছিলাম? তখন নতুন আলো ফুটবে,—ঈশ্বরের সন্তানের আশীর্বাদের আলো। কিন্তু ততোদিন পর্যন্ত পতাকা তো আমাদের উঁচু করে রাখতেই হবে। সে পতাকা যার কাঁধে, তারও হয়তো সঙ্গী জুটবে না। লোকে তাকে পাগল বলবে। তবু সেই হবে পথ-প্রদর্শক, মানুষের নিরুদ্ধ আত্মাকে সেই আহ্বান করবে ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শে। নইলে এই আদর্শের স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে যে।

দিনের পর দিন সন্ধ্যাবেলা এমনি আবেগময়ী সদালোচনা আমাদের মধ্যে হোতো। লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আমি প্রায় ছেড়েই দিলাম। নবাগত বন্ধুটির প্রতি আমার আকর্ষণ দিনের পর দিন বাড়তেই লাগল। তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চাদর্শের কথাবার্তায় আমি তো আকৃষ্ট হলামই, তাছাড়া কেবলই আমার মনে হতে লাগল, তাঁর জীবনে কোনো একটা রহস্য আছে, যা তিনি নানা চিন্তার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। সেই রহস্য নিয়ে তিনি দিনের পর দিন চিন্তা করছেন, যেন বৃহৎ কোনো কর্তব্যের জন্যে প্রস্তুত করছেন নিজেকে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো-ভাবেই আমি তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতাম না,—তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো কৌতূহলই আমি প্রকাশ করতাম না। আমার এই ব্যবহারটা মনে হয় তাঁর ভালো লেগেছিল। তবে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের মাসখানেক পরে নানা আভাসে-ইঙ্গিতে আমার মনে হতে লাগল, তাঁর জীবনের কোনো গোপন রহস্য তিনি যেন আমার কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক।

একদিন তিনি আমাকে বললেন,—জানেন, এই যে আপনার সঙ্গে আমি এতো মিশি,

এটা শহরের লোকেরা আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখে। হোক আশ্চর্য আর কিছুদিন, একদিন আসবে যেদিন তাদের সব কৌতূহলের শেষ হবে।

কোনো কোনো দিন কেমন হঠাৎ একটা উত্তেজনা উত্তাল করে তুলত তাঁর মনকে। কথাবার্তায় ক্ষান্ত দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিতেন। কোনো দিন বা তিনি নিঃশব্দে এমন স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে আমার মনে হোতো, এই বুঝি কোনো গভীর ব্যক্তিগত রহস্যকে তিনি প্রকাশ করবেন। কিন্তু না, একটু পরেই তিনি কথা ঘুরিয়ে নিতেন। কোনো দিন বা মাথাধরার নাম করে হঠাৎ চলেও যেতেন।

একদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে করতে হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সারা শরীর যেন শিউরে উঠল তাঁর, মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেল। স্থির অথচ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম,—কী হোলো, শরীর খারাপ লাগছে আপনার?

আমতা-আমতা করে তিনি বললেন,—না, ঠিক তা নয়। একটা কথা···জানেন, আমি খুন করেছি।

কথা কটি বলেই তিনি পাংশু হাসি হাসলেন, মৃতের মতো পাণ্ডুর তাঁর মুখাকৃতি। আর সেই কথা কানে যেতে না যেতেই সর্বপ্রথম আমার মনে হোলো, এতে হাসি কিসের? সঙ্গে সঙ্গে আমারও মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে উঠলাম,—কী বলছেন আপনি?

প্রেত-হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন,—একবার ভেবে দেখুন, এই কথাটি উচ্চারণ করতে কতো কষ্ট আমায় করতে হয়েছে। কিন্তু একবার যখন উচ্চারণ করতে পেরেছি, তখন আর দ্বিধা নেই। এবার সব কথাই আপনাকে বলতে আমার বাধবে না।

প্রথমে আমি বিশ্বাসই করিনি। ভেবেছি, লোকটি পাগল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনে বুঝলাম, লোকটি পাগল নয়, মহা দুঃখী। ভয়ঙ্কর এক পাপের বোঝায় হৃদয় তাঁর পাষাণভার।

চৌদ্দ বছর আগে এক স্ত্রীলোককে তিনি হত্যা করেন। মেয়েটি সুন্দরী ও যুবতী, বিধবা, বহুবিত্তশালিনী। ভদ্রলোক তার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হন, বারে বারে প্রণয় নিবেদন করেন, তাকে বিবাহ করতে চান। মেয়েটি কিন্তু ইতিমধ্যেই অপর একজনকে হৃদয় নিবেদন করেছে। তার প্রেমাস্পদ সামরিক বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী, যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। মেয়েটি তার ফিরে আসার দিন গুনছে। মেয়েটি ভদ্রলোকের প্রস্তাবে স্বীকৃত হোলো না, বরং তাঁকে তার কাছে আসা-যাওয়া করতে বারণ করল। মেয়েটির বাড়ি যাওয়া তিনি বন্ধ করলেন, কিন্তু ক্রমে তার প্রতি তাঁর আসক্তি রূপ নিল প্রতিহিংসার।

একদিন রাত্রে পিছনের জানলা দিয়ে তিনি মেয়েটির বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ঢুকলেন মেয়েটির শোবার ঘরে। পরিচারিকারা সেদিন গেছে এক নিমন্ত্রণে, ভৃত্যরা তাদের ঘরে নিদ্রামগ্ন। মেয়েটি একলা ঘুমচ্ছে তার বিছানায়, পাশে জ্বলছে একটি মৃদু আলো।

সেই নিভৃত ঘরে আধো-অন্ধকারে সুখ-নিদ্রিতা প্রেয়সীকে দেখে হঠাৎ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল, তার বুকের মধ্যে সজোরে ছুরি বসিয়ে দিলেন তিনি। একটি শব্দ বার হোলো না মরণাহত নারীর মুখ থেকে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পর ঘৃণ্য দুষ্টবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। মেয়েটির চাবি খুলে বাক্স আলমারি লণ্ডভণ্ড করে কিছু কিছু জিনিষ তিনি সরালেন। বেশী দামী অলঙ্কার বাদ দিয়ে গোটাকতক কম দামী মোটা গহনা তিনি পকেটে পুরলেন। লোকে যেন সন্দেহ করে, ভৃত্য বা ঐ জাতীয় কোনো বর্বর চোরেরই এই কাজ। তার পর মেয়েটির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আরও কয়েকটি জিনিষ সংগ্রহ করে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তিনি যে এই নৃশংস হত্যালীলার নায়ক তা কোনো লোক কোনো দিন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি। মেয়েটির প্রতি তাঁর এই আসক্তির কথা তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কখনো প্রকাশ করেননি। প্রতিবেশীরা জানত তিনি তার পরিচিত, এই মাত্র। হত্যাকাণ্ডের আগে প্রায় দু-সপ্তাহ তিনি তার বাড়িতে একবারও যাননি। নানা কারণে পিয়তর নামে মেয়েটির এক প্রজার ওপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হোলো। লোকটাকে বন্দী করা হোলো। কিন্তু বন্দী হবার কদিন পরেই লোকটা জেল-হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা গেল। পার্থিব বিচারের যবনিকা পড়ল এখানে।

কিন্তু আসল বিচার আর শাস্তির শুরু হোলো তার পরে। প্রথম কদিন বিবেকের কোনো দংশনই তিনি অনুভব করেননি। তাঁর মনে অবশ্য অনেকদিন ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল, তা শুধু এই কারণে যে প্রেম-পাত্রীকে হত্যা করলেও তার প্রতি তাঁর বাসনার দাহ নিবৃত্তিলাভ করেনি। সেই জ্বালা তাঁর রক্তে তেমনি নিদারুণ। কিন্তু এক নিষ্পাপ নারীকে হত্যা করেছেন বলে কোনো পাপের অনুশোচনা প্রথমে তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করেনি। তাঁর প্রেমাস্পদ যে অন্য কোনো পুরুষের রমণী হবে, এ কল্পনা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। তাই তিনি মনকে প্রবোধ দিতেন এই বলে যে, যা করেছেন তা না করে তাঁর কোনো উপায় ছিল না।

নিরপরাধ লোকটি ধরা পড়ায় তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন, তবে লোকটি বিচারের পূর্বেই মারা যাওয়ায় সে ব্যাপারেও কোনো দুশ্চিন্তা আর রইল না। মেয়েটির ঘর থেকে যে টাকা তিনি চুরি করেছিলেন, তার অনেক বেশি টাকা তিনি স্থানীয় এক আতুরশালায় দান করে দিলেন। ভাবলেন, মনের সব ময়লাই ধুয়ে ফেলা হোলো।

এর পর অনেকদিন তিনি বেশ শান্তিতেই ছিলেন। সরকারী চাকুরিতে ঢুকে শক্ত শক্ত কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন, ভ্রমণ করলেন নানাস্থানে, সুনাম ও সম্পদ অর্জন করলেন। অতীত চাপা পড়ে গেল চেষ্টার্জিত বিস্মৃতির অন্ধকারে। পরোপকারও তিনি অনেক করলেন। শহরের নানা কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় ও সাহায্যে অনেক অর্থ তিনি ব্যয় করলেন, মস্কো ও পিটারসবুর্গের নানা নামকরা জনহিতকর সমাজে তিনি যোগদান করে বহু প্রশংসা লাভ করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতীতের স্মৃতি আবার উদ্‌ঘাটিত হোলো, কোনো চেষ্টাতেই সে বাধা মানে না। মনের অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় তিনি একটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা তরুণীকে বিবাহ করলেন। ভাবলেন, স্ত্রী ও সংসারের প্রতি কর্তব্যে যদি নিজেকে মগ্ন রাখেন, তাহলে হয়তো শান্তি পাবেন আবার—স্মৃতির অজগর মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু তিনি যা আশা করেছিলেন, ঘটল তার বিপরীত। বিবাহের প্রথম মাস থেকে তাঁর মাথায় ভাবনা ঢুকল, আমার স্ত্রী আমাকে এতো ভালোবাসে, কিন্তু সে যদি জানতে পারে যে আমি হত্যাকারী! যেদিন প্রথম শুনলেন যে তাঁর স্ত্রী সন্তান-সম্ভাবিতা, সেদিন থেকে শুরু হোলো নতুন ভাবনা,—পৃথিবীতে নতুন জীবনের জন্ম দিতে আমি চলেছি, কিন্তু আমি যে নিজে হাতে জীবননাশ করেছি, আমি যে হত্যাকারী! তার পর ছেলেমেয়ের বাপ হলেন। কেবল মনে ভাবনা, কোন্ অধিকারে আমি ওদের শিক্ষা দেব, মানুষ করে তুলব, ভালোবাসব, আদর করব, চোখ তুলে তাকাব ওদের নিষ্পাপ মুখের পানে,—আমি যে হত্যাকারী!

ক্রমে তাঁর পাপ দিনের পর দিন তাঁকে ভয় দেখাতে লাগল। নিহতা নারীর ছায়া-মূর্তি যেন তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দাবি করতে লাগল প্রতিহিংসা। ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আর দুঃস্বপ্ন হরণ করতে লাগল দিনের শান্তি আর রজনীর নিদ্রা। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে তিনি নিজেকে সংযত করে রাখলেন। ভাবলেন, এই মানসিক যন্ত্রণার দাহনেই নিভৃতে তাঁর পাপস্খালন হবে, শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তি পাবেন আপন অন্তরের নিষ্ঠুর আততায়ীর হাত থেকে। কিন্তু সে আশা বৃথা। কোথায় মুক্তি, কোথায় শান্তি? যন্ত্রণা তাঁর দিনে দিনে বেড়েই চলল।

এদিকে পরোপকার আর বদান্যতার জন্যে সমাজে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ যেন তাঁর অন্তর্দাহে নতুন ইন্ধন। সকলে তাঁকে সমীহ করত, কিন্তু তাঁর মুখের কঠিন গাম্ভীর্য দেখে তাঁকে এড়িয়েও চলত। তিনিও শত চেষ্টা করেও স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারতেন না কারো সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত এক বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দিনে রাতে তাঁর চৈতন্যকে আঁকড়ে ধরল। কে যেন তাঁর মনের মধ্য থেকে সদা-সর্বদা তাঁকে বলতে লাগল,—স্বীকার করো, স্বীকার করো, সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো তোমার পাপ, নইলে তোমার রক্ষা নেই। তিনিও দৃঢ় নিশ্চয় হলেন যে একমাত্র স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই তিনি শান্তি পাবেন, কেবল এই পন্থাতেই তাঁর ক্লিষ্ট আত্মার মালিন্য ঘুচবে। কিন্তু কেমন করে তিনি স্বীকার করবেন? সে সাহস মনে কই?

তিনি আমাকে বললেন,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার কাহিনী শুনে আর আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হতে পেরেছি। গত তিন বছর ধরে আমার এই সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে এই কদিনের আলাপ সমস্ত দ্বিধার অবসান ঘটিয়েছে।

আমি বললাম,—কিন্তু লোকে তো আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। এ যে চৌদ্দ বছরের পুরোনো ঘটনা।

সজোরে মাথা নেড়ে তিনি বললেন,—করবে বন্ধু, নিশ্চয়ই করবে। আমার কাছে একটা প্রমাণ আছে, তা আমি সবাইকে দেখাব।

আমি উচ্ছ্বসিত আবেগে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

একটু পরে ম্লান মুখে তিনি বলতে লাগলেন,—কিন্তু একটা কথা আপনি বলুন, আমার স্ত্রীর কী হবে, আমার সন্তানদের কী হবে? তাদের ভবিষ্যৎ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দুঃখে গ্লানিতে অকালে ঝরে পড়বে আমার স্ত্রী আর আমার সন্তানরা। সব সম্পত্তি আর মর্যাদা হারিয়ে তারা পৃথিবীতে পরিচিত হবে খুনী আসামীর বংশধররূপে। তাদের পিতার সম্বন্ধে কী কুৎসিত স্মৃতিই তারা মনের মধ্যে বহন করবে সারা জীবন।

কোনো উত্তর এল না আমার মুখে।

আবার তিনি বললেন,—তাছাড়া বিদায়, জন্মের মতো বিদায় ওদের কাছ থেকে, বিদায় এই পৃথিবী থেকে।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি নীরবে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমার বন্ধুর জন্যে।

প্রার্থনা শেষ হলে তিনি বললেন,—কই, বলুন?

আমি বললাম,—যান আপনি। অপরাধ স্বীকার করুন, পাপস্খালন করুন সর্ব সমক্ষে। মনে রাখবেন, এক সত্য ছাড়া সব কিছুই অনিত্য। আপনার সন্তানরা যখন বড়ো হবে তারা আপনার এই সংকল্পের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবে, উপলব্ধি করবে সত্যের মূল্য।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। মনে হোলো, তিনি মনস্থির করেছেন। প্রায় দিন পনেরো পরে আবার তিনি এলেন। তখনো তিনি প্রস্তুত হননি, মনে দ্বিধা আছে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—আমি জানি, যে মুহূর্তে পাপস্বীকার করব, সেই মুহূর্তে আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে যাব। এই চৌদ্দ বছর ধরে আমি প্রতি মুহূর্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার সন্তানরা যখন বড়ো হবে, তখন তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারবে, কেন এই কঠিন প্রায়শ্চিত্তের পথ আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলাম। তারা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন আপনি। আপনার এই আত্মদান সকলেই উপলব্ধি করবে। আজ না হয় কিছুদিন পরেও। তারা বুঝবে, আপনি সত্যের সেবা করেছেন, সে সত্য স্বর্গীয়।

সেদিন তিনি বিদায় নিলেন, কিন্তু আবার একদিন এলেন। পাংশু মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তাঁর দিকে তাকাতে যেন ভয় করে। করুণায় আমার সমস্ত অন্তর আর্দ্র হয়ে গেল।

তিনি বললেন,—জানেন, এই যে আপনার কাছে এলাম, বিদায় নিয়ে এলাম স্ত্রীর কাছ থেকে। স্ত্রী কাকে বলে আপনি জানেন না, আপনি জানেন না স্ত্রীর মূল্য।

ছেলেরাও ছিল, ডেকে বললে, বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো. গল্পের বই পড়বে আমাদের সঙ্গে। জানেন, সে ডাকের কী আকুতি? কিছুই জানেন না। আমার দুঃখের বিন্দুমাত্রও ধারণা করার ক্ষমতা আপনার নেই।

শুষ্ক চোখ দুটো জ্বলছে. কাঁপছে ঠোঁট। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন. টেবিলে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে বললেন,—কেন স্বীকার করব? কার কী লাভ তাতে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কাউকে করতে হয়নি, কেউ ফাঁসিকাঠে ঝোলেনি। আর আমারও শাস্তি কম হয়নি,—চৌদ্দ বছর ধরে আমি জ্বলেছি। আর স্বীকার করলেই বা কী? কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা, পাগল বলে উড়িয়ে দেবে আমাকে। জানি, এই মনের মধ্যে পাপ পুষে রেখে সারাজীবন আমি জ্বলব। তাই হোক। আমার স্ত্রী, আমার সন্তানরা তো বাঁচবে: তাদের মাথা তো ধুলায় লুটিয়ে পড়বে না চিরদিনের জন্যে!

কালো হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত মুখ। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

মৃতের মতো রক্তহীন মুখ তুলে বিভ্রান্ত চোখে তাকালেন আমার দিকে। আর্তনাদ করে উঠলেন,—বলুন, বলুন, কী আমি করব? কী আমার ভাগ্য?

আমি অস্ফুটস্বরে বললাম,—পাপস্বীকার করুন, প্রায়শ্চিত্ত করুন।

আর কোনো উপদেশ আমার মুখ দিয়ে বার হোলো না। ধর্মগ্রন্থটি হাতে নিয়ে তেমনি নিম্নকণ্ঠে তা থেকে বিশিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ আমি পড়তে লাগলাম।

কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে ভদ্রলোক আমার হাত থেকে বইটি কেড়ে নিলেন, তার পর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে।

সংঘাতিক এই বই! ভয়ঙ্কর এর দাবি!

কাঁপতে কাঁপতে তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—এবার বিদায়। হয়তো এ জীবনে আমার সঙ্গে আপনার আর দেখা হবে না।

আমি ভাবলাম, তাঁকে একবার আলিঙ্গন করি, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করলাম। তিনি বিদায় নেবার পর আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। আমার দুর্ভাগা বন্ধুর জন্যে একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম।

বহুক্ষণ অতিবাহিত হোলো প্রার্থনায়। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ। ভদ্রলোক আবার এসেছেন।

আমি শুধোলাম,—কোথায় ছিলেন এতোক্ষণ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন,—রুমাল না কী যেন একটা ফেলে গিয়েছি… না, না, আসলে তা নয়, আপনার ঘরে একটু বসতে দেবেন এখন?

নিশ্চয়ই, বসুন না।

তিনি চেয়ারে বসলেন, বললেন,—আপনিও বসুন।

আমি বসলাম। প্রায় দু-মিনিট কাটল নিস্তব্ধভাবে। গভীর দৃষ্টিতে আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তার পর হঠাৎ উদার প্রসন্ন হাসি হেসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন,—এই দ্বিতীয়বার কী মনে করে আপনার কাছে এসেছিলাম জানেন?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

এসেছিলাম আপনাকে খুন করতে। এতোক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম,—ঝড় বইছিল বুকের মধ্যে! হঠাৎ মনে হোলো, সবচেয়ে ঘৃণা করি আপনাকে। এতো ঘৃণা যে তা বুকে চেপে রাখলে বুক ফেটে যাবে। কেবল আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না আমার জীবনের গোপন রহস্য। আপনিই আমার বিচারক। জানি, আমার গুপ্ত কথা আপনি জনসমক্ষে প্রচার করবেন না, তবু আপনার হাত থেকে আমার রক্ষা নেই। সারাজীবন পৃথিবীর এক প্রান্তে আমি যদি থাকি, আর অপর প্রান্তে আপনি যদি থাকেন, তবু জানব, কোথাও না কোথাও আমার দুষ্কর্মের সাক্ষী আছে। যতোদিন আপনি জীবিত, ততোদিন আমার কলঙ্কের আয়ু। আপনাকে হত্যা না করলে আমার মুক্তি নেই।

আমি জানতাম না, পরদিন ভদ্রলোকের জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবার তিনি এক উৎসবের আয়োজন করতেন,—এবারেও করলেন। শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উৎসবে আমন্ত্রিত হলেন। সান্ধ্য-ভোজনের পর একটি কাগজ হাতে তিনি কক্ষের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। এই কাগজে লেখা আছে তাঁর অপরাধ-স্বীকৃতি। স্থির উচ্চকণ্ঠে তিনি পড়লেন তাঁর সেই বিস্মৃত পাপঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

পাঠ শেষ করে তিনি বললেন,—আমি অমানুষ নরহন্তা—নরসমাজে অপাঙক্তেয় আমি। এতোদিন পরে ঈশ্বর আমাকে দেখা দিয়েছেন। আমার পাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

চোদ্দ বছর ধরে যে সব স্মৃতিচিহ্নগুলি তিনি গোপনে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, এবার সেগুলি বার করে এনে সকলকে দেখালেন। সেই নিহতা নারীর গলার হার, কয়েকটি অলঙ্কার ও চিঠিপত্র।

হাঁ করে তাঁর প্রতিটি কথা শুনল সবাই, কিন্তু প্রথমে কেউ বিশ্বাস করল না তাঁকে। ভাবল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পুলিশ তাঁর কাছে এল না, আইন তাঁকে স্পর্শ করল না। চোদ্দ বছর আগে নিহতা নারীর ঐ কটি নিদর্শন থেকে প্রমাণ করা যায় না যে ঐ নিদর্শনগুলির মালিক তার হত্যাকারী। এও তো হতে পারে যে সে ওগুলি তাঁকে উপহার দিয়েছিল বা তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। অলঙ্কারগুলি যে মেয়েটিরই তা তার আত্মীয়রা সনাক্ত করল, এইমাত্র।

পাঁচদিন পরে খবর রটল, ভদ্রলোক সাংঘাতিক অসুস্থ, জীবনের আশঙ্কা উপস্থিত। ঠিক কী অসুখ তাঁর করেছিল তা আমি বলতে পারব না, কেউ বললে হৃদ্‌রোগ। প্রকাশ পেল যে তাঁর স্ত্রী অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে তাঁর মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়েছিলেন এবং চিকিৎসকরা বিধান দিয়েছিলেন যে রোগীর প্রধান ব্যাধি উন্মত্ততা।

আমার কাছে এসে অনেকে নানা প্রশ্ন করেছিল, আমি অবশ্য কোনো কথাই কাউকে বলিনি। কিন্তু অনেকদিন ধরে রোগীর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারিনি,— কারণ ছিল তাঁর স্ত্রী।

শুধু তাঁর স্ত্রী নয়, শহরের প্রায় সব লোকই আমার ওপর বিরূপ হয়েছিল। তাদের ধারণা, আমার সঙ্গে মিশেই ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তাঁরই শেষ বিদায়ের আহ্বানে তাঁর কাছে যাবার অনুমতি আমি পেলাম। তখন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে, কৃপণ প্রহর গুনেছে জীবন। হাত কাঁপছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রক্তহীন হলুদে মুখমণ্ডলে প্রসন্ন প্রশান্তি।

মৃদুকণ্ঠে আমাকে বললেন,—দেখুন, ঠিক পেরেছি, পারিনি? কিন্তু এতোদিন আসেননি কেন বলুন? আমি যে আপনারই প্রতীক্ষায় দিন গুনছি।

ওদের বাধাতেই আমি আসতে পারিনি, একথা আমি তাঁকে অবশ্য বললাম না।

স্খলিতকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন,—ঈশ্বর আমাকে করুণা করেছেন, তাঁর কাছে পৌঁছবার ডাক এসেছে। আমার আর বেশী দিন নেই, কিন্তু বহু বছর পরে আবার আমি প্রাণে আনন্দ পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি। যে মুহূর্তে আমি পাপস্বীকার করলাম, সেই মুহূর্তে স্বর্গ এসে বাসা বাঁধল আমার অন্তর জুড়ে। আমার স্বীকারোক্তিতে কেউ বিশ্বাস করেনি, না আত্মীয়-পুত্র-পরিজন,—না বিচারকরা। সমাজে মাথা আমার হেঁট হয়নি, ঈশ্বরের এ এক বিচিত্র করুণা। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করেছি, এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।

সপ্তাহ খানেক পরে ভদ্রলোক মারা গেলেন। শহরবাসী প্রত্যেকে তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিল। প্রধান পুরোহিত হৃদয়বিদারক বক্তৃতা দিলেন। শোক করল সকলে। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর থেকে একটি লোকও রইল না যে আমার ওপর ক্রুদ্ধ নয়। অনেকে আবার তাঁর কাহিনী নিয়ে আমাকে বারে বারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে উত্যক্ত করে তুলল। আমি কিন্তু আমার জিহ্বাকে কঠোরভাবে সংযত রাখলাম ও শীঘ্রই ঐ স্থান পরিত্যাগ করলাম। তার মাস পাঁচেক পরে ঈশ্বরের অদৃশ্য অঙ্গুলিপাতে আমি আমার জীবনের পরমপন্থায় পদক্ষেপ করলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ অতুল সেবকটিকে আমি ভুলিনি, প্রতিদিনের প্রার্থনায় আমি তাঁকে স্মরণ করেছি।

চার

সাধু জোসিমার শেষ উপদেশাবলী :

ফাদারগণ ও শিক্ষকগণ, সন্ন্যাসী কাকে বলে? আধুনিক সংস্কৃতিবান সমাজে কেউ এই শব্দটিকে ঠাট্টার সঙ্গে উচ্চারণ করে, কারো কাছে এই শব্দ ভর্ৎসনা-সূচক। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি অবজ্ঞা এই সমাজে ক্রমবর্ধমান। অতি দুঃখের হলেও এটা মিথ্যা নয় যে বহু অকর্মণ্য, লোভী, দুশ্চরিত্র ও দুর্বিনীত ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর সাজে

সমাজে ঘুরে বেড়ায়। শিক্ষিত লোকেরা এদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে বলে, তোমরা সমাজের অলস পরগাছা, পরান্নসেবী ভিক্ষুক। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীর তো অভাব নেই। বিনয় যাদের ভূষণ, পরোপকার যাদের ব্রত, নিস্তব্ধ শান্তি ও নিরলস আরাধনা যাদের আদর্শ, তাদের কেউ চেনে না, সম্মান করে না। লোকে শুনলে খুবই আশ্চর্য হবে, কিন্তু আমি বলব, এই সব প্রকৃত সন্ন্যাসীদের দ্বারাই একদিন আমাদের মাতৃভূমি রুশিয়ার মুক্তি ঘটবে। তারাই যুগ যুগ ধরে প্রভু খৃষ্টের মূর্তিকে অমলিন রেখেছে, তাঁর বাণীকে রেখেছে প্রাণবন্ত, তাঁর জ্যোতিকে রেখেছে অনির্বাণ। সময় যখন আসবে তখন প্রলয় অন্ধকারে আশার আলোক দেখাবে এই সাধুরাই। পূর্ব গগনে আবার নূতন তারার উদয় হবে।

সাধুদের সম্বন্ধে এই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস কি মিথ্যা? এ কি বৃথা গর্বভাষণ? সমস্ত জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, লক্ষ্য করুন তাদের, যারা মানুষের দেবতা আর তাঁর বাণীকে বিকৃত করে তুলেছে তারা বিজ্ঞানকে বড়ো মনে করেছে, কিন্তু যা মাত্র ইন্দ্রিয়গোচর, বিজ্ঞান তো শুধু তাকে নিয়েই। মানব-চেতনায় যে অতীন্দ্রিয় জগৎ, বিজ্ঞান তাকে ঠাট্টা করে, ঘৃণাভরে হেলায় উড়িয়ে দিতে চায়।

এ যুগে স্বাধীনতার রাজত্ব, কিন্তু বাস্তব জগতে স্বাধীনতার অর্থ কী? শুধু দাসত্ব আর আত্মবিনাশ। বাস্তববাদীরা বলে,—'ওহে মানুষ, তুমি স্বাধীন, বাসনা আছে, পরিতৃপ্ত করো। আরো, আরো বাড়াও তোমার বাসনাকে। কীসের বাধা তোমার? এই হচ্ছে আধুনিক জগতের নববিধান। এরই নাম স্বাধীনতা। অসংযত বাসনায় কী ফল? যারা ধনী, তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দুর্গ গড়ে তার মধ্যে আবদ্ধ আত্মার অপমৃত্যু ঘটায়। আর যারা দরিদ্র, তারা শেখে হিংসা করতে, হত্যা করতে। স্বাধীনতার নামে মানুষে মানুষে হানাহানি জান্তব বৃত্তিকেও ছাড়িয়ে যায়।

পণ্ডিতগণ, এই স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করবেন না। এ স্বাধীনতা লোভকে খর্ব করবার, লোভকে জয় করবার নয়। এ স্বাধীনতা আত্মসংযমকে বাধা বলে মানে, নিশান ওড়ায় আত্মাধিকারের। এতে যারা বিশ্বাসী, তারা নিজেদের চরিত্রকে বিনষ্ট করে, অর্থহীন মূঢ় বাসনার পিছনে পতঙ্গের মতো ছোটে। বিলাস, আড়ম্বর, দম্ভ আর হিংসা, এই নিয়েই তারা বাঁচে। আত্মস্বার্থবিধান হয় একমাত্র লক্ষ্য, না হয় আত্মহত্যা। মদ্যপানে যখন আর তৃপ্তি হয় না, তখন ছোটে রক্তপানের নেশায়। আমি এমনি স্বাধীনতার একজন অগ্রদূতকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম, যাঁকে বিপ্লবী সন্দেহে বন্দী করা হয়। কারাগারে তামাক না মেলায় তাঁর এমনিই কষ্ট হোলো যে, তাঁকে বিদ্রোহের নানা গোপন তথ্য ফাঁস করে মুচলেকা লিখে দাসত্বমোচন করতে হয় আর কি।

এমন লোক কী করে যুদ্ধ করবে? কোন্ সংগ্রামের সে উপযুক্ত? হঠাৎ উত্তেজনায় কোনো কঠিন কাজ সে হয়তো করে ফেলতে পারে, কিন্তু সুদীর্ঘ সংযত সাধনা তার জন্যে নয়। ভ্রাতৃপ্রেম, সমাজ-সংগঠন, মানবকল্যাণ,—এ সবই তার কাছে মুখের কথা। প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা প্রবৃত্তির কাছে আত্মার দাসত্ব,—আত্মার স্বাধীনতা প্রবৃত্তি-নিগ্রহে।

অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর জীবন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তার উপবাস, সংযম ও নিরানন্দবর্তিতা আধুনিক লোকের উপহাসের বস্তু। কিন্তু এই উপহসিত পন্থাতেই আত্মার মুক্তি। আমার নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বাসনানিচয়কে আমি দূর করেছি, আমার গর্বোদ্ধত উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি বেঁধেছি সংযমের শাসনে, তবেই না আত্মা মুক্তি পাবে, পাবে মুক্তির দুর্লভ আনন্দ! বাস্তব প্রয়োজনের শৃঙ্খল যে মোচন করতে পেরেছে, সেই পারে আদর্শকে অনুধাবন করতে,—বাসনাবিলাসী ধনীরা তা পারে না। সন্ন্যাসীদের ওরা বলে, তোমরা মঠের প্রাচীরের আড়ালে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকো, সর্বমানবের সেবা তোমরা করবে কেমন করে? ভুল কথা। এই সাধুসমাজ থেকেই চিরদিন দুর্গত মানবসমাজের মন্ত্রগুরুর আবির্ভাব ঘটেছে,—এই নিত্যবিনীত দীন সাধুই আবার সেই নেতৃত্ব গ্রহণ করবে,—মানবসমাজকে নব আদর্শের পথে আহ্বান করবে। রুশিয়ার ভবিষ্যৎ তার জনগণ, আর এই জনগণের অন্তর থেকে সাধুরা বিচ্ছিন্ন নয়। এই জনগণের আস্থা আমাদের উপর নিবেদিত। কোনো অফিসবাসী সমাজ-সংস্কারক শত শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও এই জনজীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। সাধুগণ, আপনারা ঐ জনগণকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিন। ঐ মূক কৃষাণদের মধ্যে যান, তাদের মুখে দিন ভাষা, প্রাণে দিন শিক্ষার আলো। তাদের অন্তরের ভগবানকে পুজো করুন, সেই হবে সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ পুজো।

বন্ধুগণ, একথা অবশ্য আমি অস্বীকার করতে পারি না যে কৃষাণদের মধ্যেও পাপ নেই। প্রতিদিন প্রতি প্রহরে তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রসারিত হচ্ছে। এই দুর্নীতি আসছে উপরতলা থেকে। আত্মসর্বস্বতার ব্যাধি সাধারণ জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যবসাদার আর কুসীদজীবীর দল তাদের সর্বনাশ করছে। দরিদ্র কৃষকরা তাদের দুঃসহতাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে মদের নেশায়, এই নেশা তাদের গ্রাস করছে। এই নেশার প্রত্যক্ষ ফল নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন। কারখানার শ্রমিকদের জীবনও আমি দেখেছি। কারখানার নোংরা পরিবেশ, যন্ত্র-দানবের হুহুংকার, অমানুষিক পরিশ্রম, অশ্লীল আলোচনা, দারিদ্র্য আর মদ্যপান,—এদের তলায় দরিদ্রের নিষ্পাপ জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য আর প্রেম চাপা পড়ে যাচ্ছে, এদের চাপে চূর্ণ হচ্ছে মানবশিশুর আত্মা। সাধুগণ, এমনি শিশু-নির্যাতন কতোদিন আর সহ্য হবে? এর প্রতিকার নেই? যতো শীঘ্র সম্ভব সেই দাবি নিয়ে আপনাদেরই দাঁড়াতে হবে সর্বসমক্ষে।

তবু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মুক্তি এই দরিদ্র জনগণের মধ্যেই নিহিত আছে। তারা পাপ করে, কিন্তু পাপের উপলব্ধি তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস এখনো তারা হারায়নি। তারা জানে, তাদের জীবনের সমস্ত মালিন্যের উপর বর্ষিত হচ্ছে ঈশ্বরের করুণ অশ্রুজল।

কিন্তু যারা উপরতলার অধিবাসী, তারা যে উপরের আসনে বাস্তব বিজ্ঞানকে বসিয়েছে। অন্যায়কে অন্যায় বলে তারা মানে না, পাপের অস্তিত্বই তারা স্বীকার

করে না। ঠিক কথা, ঈশ্বরই যদি না থাকেন তাহলে পাপই কী আর পুণ্যই কী? ইয়োরোপে আমরা লক্ষ্য করছি, জনসাধারণ হিংস্র বিপ্লবের পথে ধনিক সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত হানছে। তাদের নেতারা তাদের উপদেশ দিচ্ছে এই বলে যে রক্তপাত অন্যায় নয়, হিংসাই স্বাভাবিক। কিন্তু যা পাপ তা পাপই,—যা অন্যায়, প্রয়োজন তাকে কখনো ন্যায়ের বস্ত্র পরাতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর রুশিয়াকে রক্ষা করবেন, তার জনগণের বিশ্বাস আর তিতিক্ষা বহুবার দেশকে বাঁচিয়েছে, আবার বাঁচাবে।

ক্যাদারগণ ও শিক্ষকগণ, আমার এই স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আমাদের দেশের সাধারণ জনসাধারণের মৌলিক মহত্ত্ব সারাজীবন ধরে আমি লক্ষ্য করেছি আর চমৎকৃত হয়েছি। সাধারণের আত্মমর্যাদা আর সংযমবোধ দেখে বারে বারে গৌরবান্বিত হয়েছে আমার মন। এই মর্যাদা তার পাপ, দারিদ্র্য আর মালিন্যকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে মাথা তুলেছে। এই কৃষাণ শত শতাব্দী ধরে সে ভূমিদাস,—তবু দাসত্বের গ্লানি তার মানবত্বকে ক্লিষ্ট করেনি। চিত্ত তার স্বাধীন, সে স্বাধীনতা দম্ভ হিংসা আর প্রতিশোধ বাসনায় প্রকট না হলেও ধনীকে সে বলেছে,—বেশ, তোমার অনেক আছে, তুমি অনেক বড়ো। কিন্তু আমিও আছি, আমিও মানুষ। তোমাকে যে আমি ঈর্ষা করিনে, সেই আমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

দীনতম কৃষাণের অন্তরে আমি এই উদার প্রশান্তির এই নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছি,—যার চিহ্নমাত্র ধনীর আচার-ব্যবহারে আমি দেখিনি। তাই আগামী ভবিষ্যতের রূপ আমার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। আমি দেখেছি,—একদিন আসবে সেদিন অতি বড় দাম্ভিক ও দুর্নীতিপরায়ণ ধনীও তার ঐশ্বর্যের লজ্জাকে দরিদ্রের কাছে নত করবে, এবং তার এই গৌরবান্বিত লজ্জার মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে দরিদ্র তাকে প্রদান করবে প্রকৃত শ্রদ্ধায়। সাম্য কেবলমাত্র অর্থসম্পদে নয়, মানবত্বের অন্তরগরিমার সাম্যই প্রকৃত সাম্য। সেই সাম্য ধনীকে নামায় না, দরিদ্রকে ওঠায় না, উভয়কে মনুষ্যত্বের সমান গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সাম্য রুশিয়ার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে একদিন। সেই সাম্যের পথপ্রদর্শক যীশুর আদর্শ-আলোক!

যারা অবিশ্বাসী, যারা দুর্মুখ, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন,—আমাদের এই আশা যদি বৃথা স্বপ্নই হয়, তাহলে তোমাদের বুদ্ধিসর্বস্ব নাস্তিকতা দিয়ে কবে সাম্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবে এই পৃথিবীতে? আসলে, বন্ধুগণ, বাস্তববাদী আমরা,—বৃথা স্বপ্ন দেখে ওরাই। ওরা মুখে ন্যায়পরায়ণতার বড়াই করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পরিহার করে ন্যায়াধিকারের নামে তারা হিংসার আগুন জ্বালাতে চায়, বহাতে চায় রক্তের স্রোত। যে অপরের প্রতি তরবারি তোলে, তরবারির দ্বারাই সে ধ্বংস হয়। যীশুর প্রেমবাণী যদি মানুষের অন্তরকে কল্যাণের পথে প্রবুদ্ধ না করত, তাহলে পরস্পরে হানাহানি করে মনুষ্যজাতি এতোদিনে লুপ্ত হয়ে যেত। পরম প্রভু যীশুর বাণীই সাধারণ মানুষের অন্তরে শান্তির কল্পরূপে নিত্য প্রবহমান।

এ যুগের তরুণ-তরুণীদের প্রতি আমার উপদেশ,—প্রার্থনাকে তোমরা কখনো অবহেলা কোরো না। আন্তরিকতার সঙ্গে যদি প্রার্থনা করো, তাহলে প্রতিবারের প্রার্থনায় মনে তোমাদের নতুন অনুভূতি জাগবে, নতুন তাৎপর্যের সন্ধান পাবে, অন্তরে পাবে নতুন শক্তি,—উপলব্ধি করবে যে প্রার্থনা শিক্ষা ও আত্মবোধনের নামান্তর। যখনই সময় পাবে, তখনই বলবে, - 'ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট সর্বমানবকে তুমি করুণা করো।' এই করুণা, এই বিশ্বপ্রেম ঈশ্বরের করুণারূপে তোমাদেরই মাথায় বর্ষিত হবে। তোমাদের সমস্ত অপরাধের মার্জনা হবে সেই করুণায়।

ভ্রাতৃগণ, পাপকে ভয় কোরো না। পাপীকেও ভালোবেসো,—সেই ভালোবাসা ঈশ্বরের ভালোবাসারই অংশ। এই পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি,—এখানকার প্রতিটি বালুকণাকে ভালোবাসতে হবে,—প্রতিটি তৃণ, প্রতিটি প্রাণী, ঈশ্বরের সূর্যালোকের প্রতিটি রশ্মি। অন্তরের প্রেমকে যদি সর্বভূতে প্রসারিত করতে পারো, তাহলেই সর্বভূতের অন্তরে পরমাত্মার লীলাকে উপলব্ধি করতে পারবে। তবেই প্রেম ঈশ্বরোপলব্ধির সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। ঐ দ্যাখো, মূক প্রাণীগুলি,—ওরাও ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওদের প্রতি নিষ্ঠুর হোয়ো না,—জীবনের আনন্দ থেকে ওদেরও বঞ্চিত কোরো না। মানুষের গর্ব যে, সে পশু নয়, কিন্তু এ গর্ব তো মিথ্যা। পশুর অন্তরে পাপ নেই, আর মানুষই সৃষ্টিকে অপবিত্র করে পাপে। ঐ শিশুদের দ্যাখো, ওরা স্বর্গদূতদের মতো নিষ্পাপ, পবিত্র,—ওরা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে কোমল করে, আমাদের চিন্তাকে শোধন করে, আমাদের পুণ্যের পথ দেখায়। ওদের ভালোবেসো সকলের চেয়ে বেশি।

মানুষের পাপ দেখে অনেকে শিহরিত হয়। ভাবে, এতো পাপের বিরুদ্ধে বিনীত ভালোবাসার শক্তি কতটুকু? বিশ্বাস করো, এই প্রেমের শক্তি অসীম,- ক্ষমা, প্রেম ও অহিংসা পর্বতকে টলায়, সাগরকে বন্ধন করে।

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখো, নিজের প্রতিটি কাজকে কঠিনভাবে বিচার করো। মনে রেখো, ঐ নিষ্পাপ শিশু তোমাকে লক্ষ্য করছে। তোমার ব্যবহার যেন শিশুর মনে কোনো কলঙ্ক-ছায়া না ফেলে। তার সরল মনে কোনো পাপের বীজ যেন তোমার ব্যবহার উপ্ত না করে। তোমার হিংসা তার চরিত্রে হিংসার পাপকে বপন করবে, তোমার প্রেম প্রেমের শিক্ষায় তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করবে। ভ্রাতৃগণ, প্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তবে এই সাধনা সহজলভ্য নয়। বহুদিনের বহু পরিশ্রমে বহু আত্মনিরীক্ষা ও আত্মদানের পথে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। কেন না, সাময়িক প্রেম তো দুর্বৃত্তের মনেও কখনো কখনো জাগতে পারে। যে প্রেম চিরন্তন, তার সাধনা করতে হয় জীবনের প্রতি মুহূর্ত ধরে, তাকে বিস্তারিত করতে হয় সর্বজীবে সর্বভূতে।

বন্ধুগণ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো আনন্দের জন্যে,—শিশুর যে আনন্দ, সে আনন্দ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গেরও। অন্য লোকের পাপের ভাবনায় তোমাদের পুণ্যকর্মের

পথে তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। একথা বোলো না যে, পাপ বিরাট, অন্যায় বিরাট, দুর্নীতিময় পরিবেশ বিরাট,—তার মাঝখানে আমরা শক্তি সহায়হীন সামান্য, নিরুপায় আমাদের সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা। এই রকম হতাশভাব মন থেকে দূর করো। শুধু এই কথাটি মনে রাখো যে, অপরের মঙ্গলের জন্য তোমরা দায়ী, অপরের পাপের জন্য তোমরা দায়ী, ধরিত্রীর দুঃখমোচনের দায়িত্ব তোমাদেরই। তাহলে হতাশা আসবে না, কর্মশক্তিকে শৈথিল্য হরণ করবে না, হিংসা জাগবে না। কখনো পরাজয় বরণ করতে হবে না শয়তানের কাছে।

শয়তানের শক্তি অতি বিচিত্র ও নিগূঢ়। তাকে বুঝতে পারা শক্ত, তাই একদিকে যখন ভাবি যে আমরা কোনো উত্তম ও মহৎ কাজ করছি, তখন হয়তো আমরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের গর্বের ফাঁদেই পা দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে জীবনের অনেক কিছু গভীরতম অনুভূতি ও প্রেরণার অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তবে তা কোনো বাধা নয়, দায় খুশী করবার তা কোনো অছিলাও নয়। যিনি চরম বিচারক, তাঁর বিচার যা তোমার উপলব্ধির মধ্যে তা নিয়ে। যা উপলব্ধির নয়, তা নিয়ে নয়। বৃহত্তর উপলব্ধি অভিজ্ঞতার অবদান,—যে অভিজ্ঞতার শেষ নেই। মহত্তম উপলব্ধি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর যীশুর রূপ। এই উপলব্ধি না থাকলে সমগ্র মানবজাতি বন্যার অতলে তলিয়ে যেত। এ পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, কিন্তু তার বিনিময়ে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে এক দুর্লভ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। সে অনুভূতি এই যে অন্য কোনো মহত্তর জগতের সঙ্গে এক অদৃশ্য স্বর্ণ-সূত্রজালে আমাদের অস্তিত্ব বাঁধা, আমাদের চেতনার মূল এ জগতে নয়, অন্য কোনো লোকোত্তর লোকে। এইজন্যে দার্শনিকরা বলেন,—অস্তিত্বের নিগূঢ় সত্য আমাদের ইন্দ্রিয়োপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত নয়।

সেই জগৎ থেকে বীজ সংগ্রহ করে এই পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বর সেই বীজ পুঁতেছেন, সেই বীজ থেকে বিকশিত হয়েছে এই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির সুগোপন গভীরে আছে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের চেতনা। সেই চেতনা যদি দুর্বল হয়, তাহলে তোমার আমার জীবনে স্বর্গ-সুরভিও ম্লান হয়ে আসবে। শুকিয়ে আসবে জীবনের আনন্দ, তার স্থানে আসীন হবে শয়তানের গর্ব আর হিংসা।

মানুষই মানুষের বিচার করে, এ এক মূঢ় অক্ষমতা। অপরাধীকে সামনে দাঁড় করিয়ে বিচারক যদি স্বীকার করতে পারে যে সে নিজেও অপরাধী কম নয়, বরং অপরাধের দায়িত্ব তার নিজেরই সবচেয়ে বেশি, তবেই সে প্রকৃত বিচারক। কথাটা শুনতে আশ্চর্য লাগে সত্য। আমি নিজে যদি সৎ হতাম, তাহলে আমার সামনে কোনো অপরাধীকেই কখনো দাঁড়াতে হোতো না। অপরাধীর অপরাধকে যদি নিজের অপরাধ বলে গণ্য করতে পারতাম, তাহলেই হোতো শ্রেষ্ঠ বিচার। শাস্তি দেওয়া সহজ, কিন্তু শাস্তির দ্বারা অপরাধের নিষ্পত্তি হয় না। অপরাধের মার্জনা সম্ভব ক্ষমায়। একমাত্র ক্ষমার অশ্রুজলেই অপরাধীর অন্তর পাপের মালিন্য থেকে মুক্ত হয়।

ভ্রাতৃগণ, তাই বলি, বিচার কোরো শুধু নিজেকে, আর নিয়ত নিজেকে মগ্ন রেখো তোমাদের কর্তব্যে। যে কর্তব্য আজ রাত্রে করবার, কাল প্রভাতের জন্য তাকে রেখে দিয়ো না। তোমাদের প্রচার লোকে যদি না শোনে, তোমাদের বাণী শুনে লোকে যদি ধিক্কার দেয়, দোষী মনে কোরো নিজেকে। আমারই অপরাধ, তাই আমার বাণী স্পর্শ করল না শ্রোতার হৃদয়। কথা যদি না শোনে, নীরব বিনয়ে সেবা কোরো,— মুখের ভাষা যেখানে হার মানে, সেবার ভাষা সেখানে পৌঁছবে। যদি হঠাৎ কোনো পাপ করো, আর সেই পাপের জন্য অনুতাপ করতে হয় চিরদিন, তথাপি এই আনন্দটুকু মনে রেখো যে ঈশ্বরের পৃথিবীতে পুণ্যের অভাব নেই, এ সৃষ্টি পুণ্যের।

মানুষের অন্যায় অত্যাচারে মন যদি বিষাক্ত হয়, যদি জর্জরিত হয় প্রতিশোধ-বৃত্তিতে, সবলে সংযত করো মনকে। উপরন্তু ঐ অত্যাচারের সামনে নিজের বুক পাতো, আপন অন্তর দিয়ে সহ্য করো সেই যন্ত্রণা,—যেমন অপরাধ তোমার, প্রায়শ্চিত্তও তোমার। কেন না, যে অন্যায় করে, তাকে ন্যায়ের আলো দেখাবার দায়িত্ব তোমার ছিল, সে দায়িত্ব পরিপূর্ণ পালন করেছ কি তুমি? তোমার আদর্শ আর তোমার কর্ম,—এ দুইএর মাঝখানে যে ফাঁক, যে ত্রুটি, তার দায়িত্ব যে তোমারই! বন্ধুগণ, ঈশ্বরের আলোক-বর্তিকা তোমাদের হাতে। উজ্জ্বল রাখো আলো, তার রশ্মি আজ না হয় কাল অত্যাচারীর অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকিত করবেই। এই আলোক অনির্বাণ,—এক যুগ অন্ধকারে থাকলেও পরবর্তী যুগকে তা উদ্ভাসিত করে। সাধুর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়, কিন্তু যে দীপ তিনি জেলে যান, তার আলো নেভে না। যিনি মুক্তি দিতে আসেন, তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেন মুক্তির যজ্ঞে, এই আত্মোৎসর্গ নিষ্ফল হয় না। ধর্মের শহীদকে মানুষ চিরদিনই হত্যা করেছে, আবার মানুষই করেছে তার পূজো। সেই আত্মদানের আদর্শ প্রাণে রেখে নির্লোভ ফলাফল-চিন্তাবিহীন কর্তব্য শুধু করে যাও, পুরস্কার দেবেন প্রভু। নিষ্কাম হও, শান্ত হও, নির্ভীক হও। দিনের কর্ম অবসানে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করো নিঃসঙ্গ প্রার্থনা। চুম্বন করো ধরিত্রীকে, নিষিক্ত করো তাকে প্রেমানন্দের অশ্রুজলে।

শিক্ষকগণ, বন্ধুগণ, আমি মনে মনে ভাবি, নরক কাকে বলে?

আমার মনে হয়, ভালোবাসতে না পারার যন্ত্রণাই নরকযন্ত্রণা। অনন্তকালপরিধি-ব্যাপী অস্তিত্বের মাঝখানে পরমাত্মার অংশ একটিবার মানবজন্ম গ্রহণ করে, 'আমি ভালোবাসি, তাই আমি আছি'—এই অনির্বচনীয় আত্মঘোষণার সুযোগ একটিবার পায়। সেই সুযোগকে যদি সে পরিহার করে, সেই প্রেমকে যদি সে ব্যবহার না করে, সৃষ্টির আনন্দলীলার উৎসব থেকে নিজেকে যদি সে দূরে সরিয়ে রাখে, তাহলে হেলায় হারায় সে তার জীবনকে। তার পর আবার অনন্তকাল ধরে তার আত্মা নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার করে,—'ভালোবাসিনি, ঐ পৃথিবীর আশ্চর্য জীবন-সৌভাগ্যকে বঞ্চনা করেছি,—ভালোবাসিনি।'

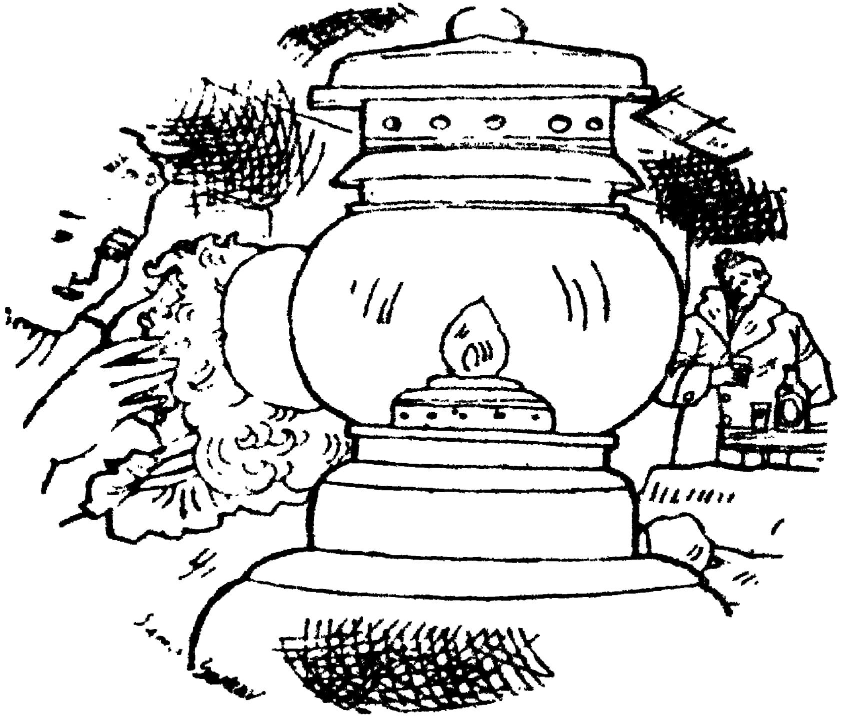
লোকে বলে, নরকে আগুন জ্বলে, সেই আগুনে ধিকিধিকি দগ্ধ হয় পাপী।

নরকের এমন ব্যবহারিক চিত্রে আমার আস্থা নেই। বাস্তবিকই যদি আগুনে জ্বলত, তার বাস্তব যন্ত্রণা আত্মার যন্ত্রণার চাইতে অনেক কম হোতো। আগুনে নেভে, কিন্তু আত্মার যন্ত্রণার অবসান নেই। ঈশ্বরের ক্ষমাও বোধকরি সে যন্ত্রণার লাঘব করতে পারে না। যন্ত্রণার উপলব্ধি থেকেই শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার উপশম হয়, নরকবাসী অভিষিক্ত হয় স্বর্গের শান্তিজলে।

আমি জানি, নরকে গিয়েও অনেকের চেতনা হয় না, লোপ পায় না গর্ব ও নৃশংসতা। তারা চিরকালের জন্য তাদের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছে। নরককে তারা স্বেচ্ছায় বরণ করেছে, শয়তানের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্তি নেই। অভিশাপ দিয়েছে তারা ঈশ্বরকে, চির-অভিশপ্ত তাদের প্রাণ। মরুভূমির তৃষ্ণার্তের মতো তারা আপন রক্ত পান করে। যে যন্ত্রণার অবসান অনুতাপে, সে যন্ত্রণার দাহ তাদের চিরন্তন। ঈশ্বরকে তারা ঘৃণা করেছে, মৃত্যুকামনা করেছে তারা ঈশ্বরের আর তাঁর সৃষ্টির। তাই আপন রুদ্রের আগুনে চিরকাল তারা দগ্ধ হয় সে দাহনেরও মৃত্যু নেই…

আলেকসি ফিয়োদোরোভিচ কারামাজভের পান্ডুলিপির এইখানেই শেষ। এই পান্ডুলিপিতে শুধু জোসিমার প্রথম জীবনের কিছুটা চিত্র মাত্র অঙ্কিত হয়েছে, বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর উপদেশাবলী।

মঠবৃদ্ধের জীবনদীপ নির্বাপিত হোলো নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর জীবনের শেষ সন্ধ্যায় তাঁর কেদারার পাশে যেসব ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সবাই জানতেন যে তাঁর জীবনের আশা নেই। কিন্তু মৃত্যু যে এমন আচম্বিতে এসে তাঁকে গ্রহণ করবে, তা তাঁরা ধারণা করেননি। বরং তাঁর মুখের আনন্দোজ্জ্বল ভাব ও দীর্ঘ কথাবার্তা শুনে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে তাঁর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালোর দিকেই চলেছে। মৃত্যুর পাঁচমিনিট আগেও তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেননি। তার পর হঠাৎ তিনি বুকে ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন, নীরক্ত হয়ে উঠল মুখমন্ডল, শিথিল দু-হাত চেপে ধরলেন বুকের ওপর। উপস্থিত সকলে চকিতে আসন থেকে উঠে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। অতো যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি মৃদু হাস্য করলেন তাদের দিকে চেয়ে, তার পর ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। আস্তে আস্তে মাথাটি নত হয়ে ভূমি স্পর্শ করল, দু-হাত প্রসারিত হোলো দুধারে। জীবধাত্রী ধরিত্রীকে শেষবারের মতো চুম্বন ও আলিঙ্গন করে প্রসন্ন স্তব্ধতায় তিনি তাঁর শেষ নিশ্বাস জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করলেন।



সপ্তম অধ্যায় : আলিঙ্গনা

পূর্বনির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে সাধু জোসিমার মরদেহ সমাধির জন্যে প্রস্তুত করা হোলো। সাধু-সন্তদের মৃতদেহকে সমাধির পূর্বে স্নান করানো রীতি বিরুদ্ধ। গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে সেই কাপড় দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুছিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। ফাদার পাইসি নিজে হাতে এই কাজ করলেন, তার পর সাধুর পোষাকে দেহ সজ্জিত করে দিলেন। কালো মসৃণ কাপড় দিয়ে মুখটি ঢেকে দেওয়া হোলো, মাথার উপরে লাগানো হোলো আটটি ক্রুশচিহ্নিত ছত্র। মৃতদেহের ডান হাতে ধরিয়ে দেওয়া হোলো একটি সুন্দর ধর্মস্মারক। কফিনটি আগেই তৈরি করা ছিল। প্রভাতে দেহটি শুইয়ে দেওয়া হোলো কফিনের মধ্যে। পাশের বসবার ঘরে দেহাধারটিকে সাজিয়ে রাখা হোলো সারা দিনের জন্যে, যাতে ভক্তেরা প্রভুর শেষ দর্শনলাভ করতে পারেন। মাথার কাছে সাধুরা বসলেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুরু হোলো। সমবেত প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফাদার ইয়োসিফ পাঠ আরম্ভ করলেন। ফাদার পাইসির ইচ্ছা ছিল যে সারা দিনরাত ধরে প্রভুর শিয়রে বসে তিনিই গস্পেল পাঠ করবেন, কিন্তু মঠবাসীদের ও নগরবাসী আগন্তুকদের নিয়ে তিনি এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হোলো না। যতো বেলা বাড়তে লাগল, দর্শনার্থীদের ভিড় ও উত্তেজনা ততোই বাড়তে লাগল। ফাদার পাইসি ও ফাদার ইয়োসিফ তাদের শান্ত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রভাতের আলো ফুটতে না ফুটতেই শহর থেকে বহু লোক রুগ্ন শিশুদের সঙ্গে করে উপস্থিত হোলো। তারা যেন আসবে বলে অপেক্ষা করেই ছিল। তাদের মনে নিশ্চিত ধারণা, মঠবৃদ্ধের মৃতদেহ স্পর্শ করলে চির রুগ্নের রোগমুক্তি ঘটবে। জোসিমার অলৌকিক ক্ষমতায় উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনে যে কী দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবার তা প্রমাণিত হোলো।

ফাদার জোসিমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে লোক আর ধরে না। তাঁর কুটিরের চারদিকে ভিড়। কাতারে কাতারে লোক আসছে শেষদর্শন-পুণ্যের আশায়। মঠবাসীরা পর্যন্ত এমনি অবাঞ্ছিত ঔৎসুক্য আর উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল যে ফাদার পাইসি তাদের মৃদু তিরস্কার না করে পারলেন না। কিন্তু তাঁর কথা শোনে কে? সকলেই তখন উদ্গ্রীব হয়ে আছে, কোনো এক অলৌকিক ঘটনা এখুনি ঘটল বলে!

তাঁর তিরস্কার কোনো কাজেই এল না দেখে ফাদার পাইসি দুশ্চিন্তিত হলেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাঁরও অন্তরের গভীরে সেই একই প্রতীক্ষা, যদিও ভিড়ের নানাজনের বিরক্তিকর অভিব্যক্তি তাঁর অপছন্দ। জোসিমার কক্ষে কয়েকটি লোকের মুখ দেখে তিনি বিশেষ উত্ত্যক্ত বোধ করলেন। তাদের মধ্যে একজন রাকিতিন, আর একজন দূরাগত সেই সাধুটি। দুজনকে দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হোলো তাঁর.

এই সাধুটির কৌতূহল জনতার সকলের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। এখানে

ওখানে সে চাবিকর মতো ঘুরছে, একে ওকে প্রশ্ন করছে, ফিসফিস করে কি কথা বলছে এর ওর কানে। মাদার হোলাকতের বিশেষ অনুরোধে গ্রাকীতন ভোর হতে না হতেই এসে উপস্থিত। ভদ্রমহিলা যখন বুঝলেন যে তাঁর পক্ষে মঠে প্রবেশ করা অসম্ভব, তখন তিনি সোজা গ্রাকীতনকে ধরে বসলেন। এমনই তাঁর ঔৎসুক্য যে গ্রাকীতনের ওপর নির্দেশ হোলো যে সে যেন মঠে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর তাঁকে কাগজে লিখে জানায়। গ্রাকীতনেরও উৎসাহের অভাব নেই, লোককে পটিয়ে কথা আদায় করতে সে ওস্তাদ।

কুটির থেকে বার হতেই ফাদার পাইসির মনে পড়ল আলিওশার কথা। কোথায় সে? তাকে তো ভোর থেকেই তিনি দেখেননি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে পড়ল, অদূরে সমাধিক্ষেত্রের এক নিভৃত কোণে আলিওশা পিছন ফিরে বসে আছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, এক প্রাচীন সমাধির কোলে দু-হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদছে আলিওশা। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে।

ফাদার পাইসি এর পিছনে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

অবশেষে তার পিঠে হাত রেখে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন,—থামো বৎস, থামো, আর না। কাঁদছ কেন? আজ তো শোকের দিন নয়, আনন্দের দিন। আজ আমাদের গুরু আনন্দলোকে গিয়ে পৌঁছেছেন।

আলিওশা একবার ফাদার পাইসির দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই আবার দু-হাতে মুখ ঢাকল। রোরুদ্যমান শিশুর মতো তার চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে।

ফাদার পাইসি আর বাধা দিলেন না। মনে মনে বললেন,—কাঁদুক, যতক্ষণ পারে কাঁদুক। ঐ অশ্রুজল যীশুরই দান। শোকের অবসানেই ওর মনে আসবে তৃপ্তি।

তাঁর নিজের চোখেও জল আসছিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সময়। সারাদিন চলেছে ধর্মানুষ্ঠান ও শাস্ত্রপাঠ। ফাদার পাইসি ফাদার ইয়োসিফের পাশে এসে বসেছেন। বিকেল যখন প্রায় তিনটে, তখন ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাটি সামান্য এবং নিতান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু একেত্রেও তা যে ঘটবে একজনও তা কল্পনা করতে পারেনি। এই ঘটনায় সকলের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আলিওশার মানসিক বিবর্তনে এই ঘটনা অত্যন্ত গভীর স্পর্শ রেখেছিল। তার বুদ্ধিবৃত্তিকে অত্যন্ত আহত করলেও তাকে দৃঢ়তর করেছিল ও এক সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিল। তাই এই গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ।

প্রত্যূষে জোসিমার দেহ যখন শবাধারে ভরে সামনের ঘরে এনে রাখা হয়, তখন কয়েকজন ঘরের জানলাগুলি খুলে রাখার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু বাকি সকলেই এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেননি। সাধুর দেহ যে গলিত হতে পারে, এ ধারণা দৈবীশক্তির প্রতি অবিশ্বাসের নামান্তর। অসম্ভব তো বটেই।

কিন্তু দ্বিপ্রহর পার হতে না হতেই মৃতদেহে যে সব চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল, তা

দেখে ভক্তজনেরা নির্বাক বিস্ময়ে শিহরিত হলেন। তিনটে বাজতে না বাজতেই এই চিহ্ন এমনি প্রকট হয়ে উঠল যে তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না। কুটির থেকে মঠে, মঠ থেকে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। যারা অবিশ্বাসী, তারা তো উল্লাসে বিভোর হোলোই, যাঁরা ধর্মাত্মা ভক্ত তাঁদেরও কারো মন অবিশ্বাসীদের অপেক্ষাও অধিকতর খুশী হয়ে উঠল।

শবাধারের মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হতে লাগল, স্পষ্টই প্রতীয়মান হোলো যে শব পচতে গলতে শুরু করেছে। প্রাণহীন মৃতদেহে যে কয়েক ঘণ্টা পরেই পচন আরম্ভ হয় এটা খুবই স্বাভাবিক। সাধুদের দেহের বেলাতেও একই কথা, কেন না, তাঁদের দেহও স্বাভাবিক মরদেহ। কিন্তু সাধু জোসিমার দেহের বিকৃতির সংবাদে সারা মঠ জুড়ে যে বীভৎস দুষ্কৃতি রূপ নিল, তেমনি কলঙ্কময় ঘটনার কোনো অনুরূপ মঠের সারা ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। প্রকৃত ঈশ্বরদ্রষ্টা সাধুদের দেহের বিকার নেই, বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই বিশ্বাস ভক্তদের মনে আছে। কিন্তু এ যুগে সেই বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়ে যে কুৎসিত কার্যাবলী আরম্ভ হোলো তা সম্পূর্ণ অকল্পিত।

এর কারণ একটি নয়,—সাধারণ মানুষের অন্ধবিশ্বাস তো শুধু নয়ই। মঠ, ধর্মজীবন ও সাধুদের প্রতি অবিশ্বাসীদের রোষ একটি কারণ তো বটেই। তাছাড়া সাধু জোসিমার প্রতি অনেক মঠবাসীর গোপন হিংসাও একটি বিশেষ কারণ। এই গোপন হিংসাই এতোদিনে দুষ্কর্মে ইন্ধনদানের চরম সুযোগ পেল। কারো ক্ষতি তিনি কখনো করেননি। অলৌকিক শক্তি তিনি কখনো প্রদর্শন করেননি, শুধু হৃদয়-মাধুর্য দিয়েই তিনি অগণিত ভক্তের হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর সেই প্রেমপূর্ণ উন্মুক্ত হৃদয়টির প্রতি পরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ এইবার হিংসুকদের মিলল!

বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, ধনী দরিদ্র, সাধু দুর্বৃত্ত অগণিত লোক আসতে লাগল,—তাঁকে দেখতে নয়, তাঁর মৃতদেহের গন্ধ শুঁকতে। ফাদার পাইসি সেখান থেকে নড়লেন না। আপনমনে ধর্মগ্রন্থ পড়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কোলাহল বাড়তেই লাগল।

জনতার মধ্যে থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল,—ভগবানের বিচার ঠিক ফলেছে।

হেঁকে উঠল আর একজন,—আলবৎ, সারা জীবনের ভড়ং খসে পড়েছে এবার।

সাধুরাও চুপ করে রইলেন না। কয়েকজন বললেন,—সত্যি, এরকম কী করে হোলো? ও'র ছোট্ট শরীর, দেহে শুকনো হাড় ছাড়া তো আর কিছু নেই। তবু এতো তাড়াতাড়ি·

আর কয়েকজন মন্তব্য করলেন,—ভায়া হে, চাষীর দেহও পচতে চব্বিশ ঘণ্টা নেয়। এ হোলো ঈশ্বরের বিধান, যীশু আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দিলেন আর কি!

গ্রন্থাগারিক ফাদার ইয়োসিফ যেমন মহাপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন জোসিমার পরম ভক্ত। তিনি দুর্বিনীত ভক্তদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন এই বলে যে, সাধু-অসাধু

প্রত্যেক জীবদেহই প্রাকৃতিক বিধানের অধীন। তাছাড়া সাধুদের মৃতদেহ যে অবিকৃত থাকে, তা কোনো ধর্মীয় রীতি নয়, সংস্কার মাত্র। কোনো ধর্মগ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর শান্ত উপদেশে কোনো কাজ হোলো না। বরং উত্তরে তাঁকে শুনতে হোলো,—রাখুন আপনার পাণ্ডিত্যপনা,—সংস্কার মানেই বিশ্বাস, বিশ্বাসের দাম সবচেয়ে বড়ো। ওসব আধুনিক চালবাজি আমাদের না শোনালেও চলবে।

ক্ষুন্ন মনে ফাদার ইয়োসিফ স্থান ত্যাগ করলেন। জনতা ততোক্ষণে অসংযত হয়ে উঠেছে। অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বলা যায় না। সুবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধুদের কথা কেউ শুনতে চায় না। জোসিমার অনুরক্ত ভক্তেরা নিরুৎসাহ হয়ে এককোণে সরে গিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

জোসিমার প্রবল শত্রুরা আবার নূতন গুজব ছড়ালো,—মঠবৃদ্ধ ভার্সিনোফি যখন মারা যান, মনে আছে? তাঁর দেহ তো পচেইনি, বরং তা থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধ বার হচ্ছিল।

নিশ্চয়ই! হবে না, তিনি তো আর খালি মঠবৃদ্ধ ছিলেন না, সত্যিকারের পুণ্যাত্মা ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাধু জোসিমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিষোদ্গার শুরু হোলো। তিক্ত ভাষণের আর শেষ রইল না। জোসিমা শিক্ষা দিতেন,—এ জীবন আনন্দ-নিকেতন। শত্রুরা কোলাহল করে উঠল,—'এ শিক্ষা মিথ্যা। বুড়োর সাহস দ্যাখো, বলত কিনা নরকে সত্যিকারের আগুন জ্বলে না।' কেউ বললে,—'খানদানি মেয়েরা মিষ্টি ভেট দিত, সাধু হয়ে তা খেতে একটু বাধত না।' সব চাইতে যারা কুটিলমনা, তারা বললে,—'অতি দম্ভের ফল, দলে দলে লোক এসে প্রণাম করত, আর সাধুবাবা ভাবতেন, তিনি বুঝি সত্যিই স্বর্গের সাধু হয়ে গেছেন। এবার সব ধরা পড়ল।'

দূরাগত সাধুটি পরম উৎসাহে এইসব আলোচনায় কান পাতছিল। মাথা নেড়ে সে বললে,—ঠিক, ঠিক, ফাদার ফেরাপন্ট কাল ঠিকই বলেছিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হলেন ফেরাপন্ট নিজে। গির্জাতেও তিনি কদাচিৎ আসতেন,—এজন্যে অবশ্য মঠের অন্যান্য অধিবাসীরা মনে কিছু করতেন না। অপর সকলের সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহারের যে তুলনা চলে না, তা সদা স্বীকৃত ছিল। এমনি সময়ে নিজের কোটর ছেড়ে ফেরাপন্টের আবির্ভাবে চমকিত হলেন অন্য সব সাধুরা। তাঁরা জানতেন না যে তাঁর কাছে বার্তাবহ হয়ে গিয়েছিল ঐ দূরাগত সাধুটিই।

সাধু ফেরাপন্ট সকলকে ধাক্কা মেরে অগ্রসর হতে হতে সোজা এসে ঢুকলেন জোসিমার কুটিরে। ফেরাপন্টের পিছনে এলেন আরো কয়েকজন সাধু ও নাগরিক। বাইরে জনসমুদ্রে তখন বিরাট কলরোল উঠেছে। দ্বারে দাঁড়িয়ে ফেরাপন্ট দু-হাত তুলে দাঁড়ালেন। বজ্রকণ্ঠে বললেন,—বেরো, বেরো, দূর-হ, দূর-হ, দূর-হ।

কুটিরের মধ্যে ঢুকে প্রতি কোণে ক্রুশচিহ্ন এ'কে এ'কে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন,—বেরো, বেরো শয়তান, দূর-হ, দূর-হ, দূর-হ।

পরনে তাঁর সেই জির্ণতম মোটা পোষাক। জোয়ান বক্ষদেশ অনাবৃত। কোমরে দড়ি বাঁধা। নগ্ন পদ। প্রতি পদক্ষেপে অঙ্গে বাঁধা লোহাগুলো ঠন্ ঠন্ করে বাজছে। তাঁর তীক্ষকণ্ঠ কুটির থেকে বাইরে জনতার কানে গিয়ে পৌঁছল। আতঙ্কে স্তব্ধ হোলো জনতা।

ফাদার পাইসি ধর্মগ্রন্থ মুড়ে রেখে ফেরাপণ্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—আপনি এখানে কেন এসেছেন পিতা? এখানকার পবিত্র শোকানুষ্ঠানে বাধাই বা দিচ্ছেন কেন?

আমি এখানে কেন এসেছি? হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ফেরাপণ্ট,—সত্যি জানতে চাও? এ ঘরে কতোগুলো শয়তান বাসা বেঁধেছে, তা আমি গুণে গুণে দেখব। তার পর ঝাঁটার বাড়ি মেরে সব ব্যাটাকে এখান থেকে দূর করে দিয়ে ঘরটাকে মুক্ত করব।

কী বলছেন ফাদার? পাপ আত্মাকে দূর করতে আপনি এসেছেন? আমার তো মনে হয়, আপনি সেই পাপেরই দাসত্ব করছেন! শয়তান কোথায় নেই? আমি নিষ্কলুষ পুণ্যাত্মা, এ কথা কে বলতে পারে?

আমি বলেছি আমি পুণ্যাত্মা? আমি তো নরকের কীট। পরম পুণ্যাত্মা তিনি, যাঁর পায়ে হাজার পাপী-তাপী এসে গড় করত, আর আরাম-চেয়ারে যিনি বসে বসে মেয়েদের হাতের মোয়া চিবুতেন। পুণ্যাত্মা! তাই এখন পোকা-ভর্তি গা থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে।

ফাদার পাইসি কঠিনস্বরে বললেন,—আপনি এখান থেকে চলে যান ফাদার। ভজনভক্তির মধ্যে অকারণ গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন না। বিচারের অধিকার ঈশ্বরের, মানুষের নয়। সব সঙ্কেতের অর্থ মানুষে বুঝতে পারে না।

থামো, থামো, গর্জন করে উঠলেন ফেরাপণ্ট, ঈশ্বরের সঙ্কেতকে মানুষে লুকোতে পারে না, এই হোলো সত্যি কথা। উপবাস করব না, আত্মসংযমকে ঝুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব, মেয়েমানুষে থালা-ভরা মিষ্টি আনবে, আর তাই দিয়ে নির্বিচারে পেটপুজো করব, তারই প্রতিফল এটা।

বুড়ো হয়ে ছেলেমানুষের মতো কথা বলবেন না, ধমক দিয়ে উঠলেন ফাদার পাইসি,—আপনি খুব উপবাস-বিশারদ তা আমরা জানি। হয় ভদ্রভাবে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলুন, নইলে বেরিয়ে যান এখান থেকে।

চমকে উঠলেন ফেরাপণ্ট,—অ্যাঁ! বেরিয়ে যাব, তুমি কি বলছ?

আবার সজোরে ধমক দিলেন ফাদার পাইসি,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলছি, আমার হুকুম। বেরিয়ে যান এখুনি।

ফেরাপণ্ট সংযত হলেন। গর্জন বন্ধ হোলো। তিক্তকণ্ঠে বললেন,—বেশ, আমি যাচ্ছি। আমি মূর্খ, আমার বুদ্ধি নেই, আমি দীন, তাই তো আমাকে প্রায়ই

করো না। মনে রেখো, একদিন আমিও একেবারে যাব, সেদিন আমার ওপর ঈশ্বরের কী দয়া হয় তাও তোমরা দেখবে। চূর্ণ হবে তোমাদের গর্ব।

প্রচণ্ড বেগে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি কুটির পরিত্যাগ করলেন। জনতার দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করল। প্রায় কুড়ি গজ যাবার পর হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন অস্তগামী সূর্যের দিকে।

নিঃশব্দে কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তার পর ভীম চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

মেরেছ, ভগবান মেরেছ! অস্তগামী সূর্যকে তুমি জয় করেছ! পূর্ণ হয়েছে তোমার ইচ্ছা।

হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, কখনো বা লুটিয়ে পড়ে কপাল ঠুকতে লাগলেন মাটিতে। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে বুক, দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। বহু লোক ছুটে গেল তাঁর দিকে, কিন্তু কেউই স্পর্শ করতে সাহস করল না। তারা তাঁর চারপাশে ঘিরে তাঁরই মতো কাঁদতে আর আর্তনাদ করতে শুরু করল।

উচ্ছ্বসিত জনতার মধ্যে একজন ফিসফিস করে বললে,—ইনিই তো প্রকৃত সাধু। ইনিই ঈশ্বরের প্রতিনিধি!

আর একজন বললে,—হ্যাঁ, এঁকে আমরা চিনতে পারিনি. ইনিই যোগ্য মঠবন্ধু।

তৃতীয়জন প্রতিবাদ করল,—তোমরা জানো না, ইনি মঠবন্ধু হতে চান না, সে পদ ইনি হেলায় ত্যাগ করেছেন। ঝুটো কর্তামির দণ্ড এঁকে স্পর্শ করে না।

গুঞ্জন উঠল বহুকণ্ঠে। সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়েই গির্জায় সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। ভক্তবৃন্দ সংযত হয়ে নিজ নিজ দেহে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করলেন। ফাদার ফেরাপণ্টও উঠে দাঁড়িয়ে নিজ দেহে ক্রুশচিহ্ন করে যাত্রা করলেন তাঁর কুটিরের উদ্দেশ্যে। তখনো তিনি আপনমনে বিড়বিড় করে বকছেন। কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করলেও অধিকাংশই প্রার্থনায় যোগ দিতে চললেন। ফাদার ইয়োসিফের হাতে ধর্মগ্রন্থ দিয়ে ফাদার পাইসি জোসিমার কুটির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ধর্মান্ধদের উচ্চকিত চিৎকার এতোক্ষণ তাঁকে বিচলিত করেনি, কিন্তু এখন হঠাৎ তাঁর সমস্ত মন কেমন এক ম্লান বেদনায় পূর্ণ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করলেন এই বেদনার কারণ। তাঁর মনে পড়ল, কুটিরদ্বারের ভিড়ের মধ্যে একবার আলিওশার মুখ তাঁর চোখে পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ ব্যথায় ভরে উঠেছিল তাঁর মন। মনে মনে তিনি বললেন,- ছেলেটা কি এতোই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে আমার?

আলিওশা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু গির্জার অভিমুখে নয়। ফাদার পাইসির চোখে চোখ পড়ল তার। আলিওশা তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে মাটিতে চোখ নামাল। তার মুখভাব দেখে ফাদার পাইসি কল্পনা করলেন তার অন্তরে কী ঝড় উঠেছে।

বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন তাকে,—শোনো বৎস, তুমিও কি প্রলোভনে আসক্ত হয়েছ? অবিশ্বাসীদের কথা শুনে তোমার গুরুকে তুমিও কি ভুলে গেলে?

আলিওশা থামল। ফাদার পাইসির মুখের দিকে নিরর্থক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে আবার সে মুখ ঘুরিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

কোথায় চলেছ তুমি? ঘণ্টা শোনোনি? প্রার্থনায় যাবে না?

এবারও কোনো উত্তর দিল না আলিওশা।

তুমি কি মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছ বৎস! কাউকে না বলে,—আমাদের আশীর্বাদ না নিয়ে?

এতোক্ষণে কেমন এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে ফাদার পাইসির মুখের দিকে আলিওশা তাকাল। এই সাধু তার প্রণম্য, তার প্রিয়তম উপদেষ্টা, এঁরই হাতে মৃত্যুর পূর্বে গুরু জোসিমা তাকে সমর্পণ করে গেছেন। কেমন বিশীর্ণ নীরস একটা হাসি ফুটল তার মুখে। তার পর সম্মানসূচক কোনো অভিবাদন না করে, শুধু একবার হাত নেড়ে, সে দ্রুত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলল, সোজা পার হয়ে গেল আশ্রম-দ্বার।

ফাদার পাইসি চমকে উঠলেন। পরমুহূর্তে ম্লান হাসি হেসে আলিওশার অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আপনমনে উচ্চারণ করলেন,—আবার তুমি ফিরে আসবে বৎস।

দুই

আলিওশার অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছুটা আভাস ফাদার পাইসি পেয়েছিলেন,—সম্পূর্ণটা নয়। তিনি যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন,—বৎস, তুমিও কি এই ধর্মান্ধ অবিশ্বাসীদের দলে? তার কোনো উত্তর সে দেয়নি। জোসিমার মৃতদেহে পচন ধরেছে,—এই কারণে তাঁর প্রতি তার সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি চঞ্চল হয়েছে,—এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই। আলিওশার পবিত্র অন্তর মূর্খের মূঢ়তার আঘাতে বিচলিত হবার নয়। জোসিমার মৃত্যুর পর কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবে এমনি কুসংস্কারেও তার মন আচ্ছন্ন হয়নি। গত এক বৎসর ধরে সে তার অন্তরের সমস্ত অর্ঘ্য নিবেদন করেছে তার গুরু জোসিমার পায়ে। তার ভাবনা-চিন্তা, আদর্শ, কল্পনা সব কিছু দিয়ে সে নিত্য পূজো করেছে এই গুরুকে, এই গুরুর অন্তরকে। শুধু সে নয়, সে দেখেছে, সারা মঠবাসীর অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন মঠবৃদ্ধ। কিন্তু সব ধূলিসাৎ হোলো এক মুহূর্তে? কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতার আঘাতে এতো ভক্তি, এতো শ্রদ্ধা, সব খান্‌খান্‌ হয়ে চুরমার হয়ে গেল? কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো বিচার নেই?

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন যাঁর, তাঁর এমনি নিষ্ঠুর অবমাননা? কেন? কেন? কে তাঁকে বিচার করেছে,—কে ঘোষণা করেছে তাঁর শাস্তি? মূর্খ জনতা আর মূর্খতর ধর্মান্ধের দল সেই নামকে পথের ধুলোয় নামাল, যে নাম সুন্দরতম,—সেই আত্মাকে পঙ্কিলকে ভূষিত করল, যে আত্মা মহত্তম। কোথায় সেই শ্রেষ্ঠতম বিচার,

যে বিচার ঈশ্বরের ? সঙ্কট মুহূর্তে কেন সেই বিচার শাসন করল না তাদের, যারা শাসনের অনুপযুক্ত ? ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম ভক্তের পুণ্যাত্ম আত্মার চরম অবমাননার ক্ষণে কেন অক্ষম রইল সেই অমোঘ ন্যায়দণ্ড ?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আশ্রম থেকে মঠের অভিমুখে পাইন বনের পথ দিয়ে চলেছিল রাকিতিন। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটা গাছের তলায় মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে আলিওশা। একেবারে নিশ্চল, ঘুমিয়ে আছে যেন। সে কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকল।

আলিওশা! কী আশ্চর্য, তুমি--

আলিওশা মুখ তুলল না। কিন্তু তার দেহ নড়ে উঠল ডাক শুনে।

কী হোলো তোমার ?

মুহূর্ত পরে রাকিতিনের বিস্ময় কাটল, মুখে ফুটে উঠল বিদ্রুপের বাঁকা হাসি।

আরে, শোনো হে শোনো। দু-ঘণ্টা ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর ভাবছি তুমি লুকোলে কোথায় ? কী ছেলেমানুষি করছ ? মুখ তোলো। বলি, হোলো কী তোমার ?

মাথা তুলে আলিওশা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসল। চোখে তার জল নেই, কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে তার আরক্তিম মুখ যেন ফেটে পড়ছে।

এ কী ? তোমার মুখের এমনি চেহারা কেন ? কোথায় গেল সেই সাধু-সাধু খোকা-খোকা ভাব ? রাগ করেছ ? বাবারা তোমার ওপর দুর্ব্যবহার করেছে ?

আলিওশা রাকিতিনের মুখের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না, স্বাভাবিক বোধশক্তি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

রাকিতিন আশ্চর্যকণ্ঠে বললে,—রাগ কোরো না ভাই। তুমি সাধুই হও আর যাই হও, তোমাকে আমি শিক্ষিত লোক বলেই জানতাম। তোমার গুরুর দেহ থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে, তাই কি তুমি এতোটা বিচলিত ? তুমিও ঐসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করো ? তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে, বুড়ো মরলে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে ?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করতাম, এখনো বিশ্বাস করি, চিরদিন করব। শুনলে তো ? হয়েছে এবার ?

না, কিছুই হয়নি। বারো বছরের স্কুলের ছেলেও অমন কুসংস্কার বিশ্বাস করে না। তোমার ঐ ভগবানের ওপর রাগ হয়েছে, না ? কেন ভগবান ভেল্কী দেখাল না, তাজ্জব বানিয়ে দিল না মুখ্যুদের ? বেশ আছ তোমরা !

আধ-খোলা দৃষ্টিতে আলিওশা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাকিতিনের দিকে। তার পর হঠাৎ তার দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ম্লান হাসি হেসে স্পষ্ট গলায় সে বললে,—না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই। কেবল তাঁর যাদুঘরটাকে আমি মানিনে।

তার মানে ? রাকিতিন একটু ভেবে বললে,—বুঝতে পারলাম না তো ?

কোনো উত্তর দিল না আলিওশা।

রাকিতিন এবার বললে,—থাক, অনেক বাজে কথা হয়েছে। ওঠো, সারাদিন কিছু খাওনি তো?

কী জানি, মনে নেই—খেয়েছি বোধহয়।

মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না। তাছাড়া কাল সারারাত ঘুমোওনি একটুও। একটু প্রলাপ হয়তো সকালবেলা জুটেছিল। আমার পকেটে একটু সসেজ আছে, কিন্তু সসেজ কি তোমার চলবে?

দাও, খাব।

বলো কী? একেবারে বিদ্রোহ শুরু করলে যে? তাহলে ভালো করেই করো। আমার বাড়ি চলো, পেট ভরে খাবে। এতো ক্লান্ত লাগছে, একটু মদ খাওয়াও দরকার। তোমার চলবে?

হ্যাঁ, মদও খাব।

কেয়াবাৎ! তুমি একেবারে তাজ্জব করে দিলে যে ভায়া? একসঙ্গে খানা আর মদ? বহুত আচ্ছা! তবে আর দেরি নয়, ওঠো, চলো।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল আলিওশা। চলতে শুরু করল রাকিতিনের পাশাপাশি।

হাঁটতে হাঁটতে রাকিতিন বললে, তোমার ভাই আইভান যদি তোমাকে এখন দেখত খুব আশ্চর্য হয়ে যেত, তাই না? ভালো কথা, আইভান তো আজ মস্কো যাত্রা করেছে, তুমি জানতে নাকি?

নিষ্প্রাণ গলায় আলিওশা উত্তর দিল, —হ্যাঁ, আমি জানি। হঠাৎ দাদা ডিমিট্রির মুখটা তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। মুহূর্তে তার মনে পড়ল, সাংঘাতিক কিছু একটা সম্ভাবনা রয়েছে কোথায় লুকিয়ে যেন। তারও রয়েছে মস্ত একটা কর্তব্য, বিরাট একটা দায়িত্ব, যা করতেই হবে, এড়ানো চলবে না।

রাকিতিন মনে মনে ভাবতে লাগল,—আইভান একবার বলেছিল, আমি নির্বোধ, আলিওশাও একবার শুনিয়েছিল, আমার সম্মানবোধ নেই। আচ্ছা, এইবার আমি দেখব, তোমাদের সম্ভ্রম আর বুদ্ধির দৌড় কতটা।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল- চলো হে, এই রাস্তাটা ধরে সোজা শহরের দিকে যাই। মাদাম হোলাকভের ওখানে গেলেও চলত। তবে তাঁকে তো চিঠিতে সবই জানিয়েছি। কী দুঃখ তাঁর। কতোদিনের আশা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। সত্যিই তোমরা বেশ আছ।

ও! হ্যাঁ, একটা কথা বলি। চট করে দাঁড়িয়ে উঠে রাকিতিন আবার বললে,—কোথায় গেলে এখন সবচেয়ে ভালো হয় জানো?

নিশ্চিন্তকণ্ঠে আলিওশা বললে, যেখানে খুশী। কোথায় যেতে চাও?

উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় রাকিতিন প্রস্তাব করল,—চলো, গ্রুশেংকার বাড়ি যাই।

আলিওশা তেমনি শান্তকণ্ঠে তার প্রস্তাব সমর্থন করল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল রাকিতিন, এতোটা সে আশাই করেনি। পাছে বন্ধু আবার মত বদলায় সেই

ব্যাকুলতায় সে তার হাত ধরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। বিড়বিড় করে একবার বলল,—খুব খুশী হবে গ্রুশেংকা তোমাকে দেখলে।

শুধু গ্রুশেংকাকে খুশী করবার জন্যেই যে রাকিতিন আলিওশাকে তার কাছে নিয়ে চলল তা নয়। আসলে সে পাকা বাস্তববাদী,—নিজের স্বার্থের সম্ভাবনা যেখানে নেই সেখানে এক-পা বাড়াতে সে রাজী নয়। এখানে তার উদ্দেশ্য ছিল দু-প্রকার। প্রথমটি প্রতিহিংসামূলক। আলিওশার সাধুগিরির মুখোশ এবার খুলবে, মশগুল হবে সে পাপের নেশায়. এই অভিসন্ধিতে বিভোর হয়ে উঠল রাকিতিন। এছাড়া অপর এক নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থও রাকিতিনের ছিল, যা আমরা পরে লক্ষ্য করব।

মনে মনে বিদ্বেষভরা খুশী নিয়ে সে ভাবতে ভাবতে চলল. – হুঁ বাবা, এইবার এসেছে দারুণ মওকা, এ সুযোগ ছাড়া চলবে না।

তিন

শহরের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত অঞ্চলে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের কাছে গ্রুশেংকার বাস। মোরোজভ নামে এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলার বহু প্রাচীন ও জীর্ণ একটি দোতলা পাকা বাড়ি, সেই বাড়িরই উঠোনের সংলগ্ন ছোট একটি কাঠের বাসাবাড়িতে বাস করে গ্রুশেংকা। বিধবাটি থাকেন তাঁর দুটি অবিবাহিতা ভাইঝি নিয়ে, তাদেরও প্রবীণ বয়স। ভাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও সাম্‌সোনভ নামে এক আত্মীয়কে খুশী করবার জন্যে বিধবা চার বছর আগে কাঠের বাড়িটি গ্রুশেংকাকে ভাড়া দেয়। সাম্‌সোনভ ছিল গ্রুশেংকার অভিভাবক। অনেক বয়স এবং প্রচুর টাকা। সাম্‌সোনভ বিধবাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যেন এই ভাড়াটিয়া কন্যার হালচালের প্রতি কড়া নজর রাখে। কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধা বুঝল, এ নির্দেশ অর্থহীন। কদাচিৎ তার সঙ্গে গ্রুশেংকার দেখা হতে লাগল, দেখা করে কেনই বা তাকে বিরক্ত করা? প্রথম যখন ভিন্ন এক শহর থেকে সাম্‌সোনভ গ্রুশেংকাকে আমদানি করে, তখন সে ভয়চকিতা লজ্জানতা করুণ-নয়না অষ্টাদশী তন্বী। তার পর চার বছর কেটেছে। ইতিমধ্যে গ্রুশেংকা পরমা সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে অনেকে, কিন্তু কেউই খোঁজ পায়নি তার ইতিহাস। যেটুকু লোকে জেনেছে, তা কল্পনা আর রটনা। লোকে বলে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে এক অফিসার তাকে প্রলুব্ধ করে, স্বার্থচরিতার্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করে। তার প্রথম প্রেমের পরিসমাপ্তি হয় কলঙ্কে আর দুর্নামে। ভদ্রঘরের মেয়ে হলেও অপবাদের জন্য সে স্বজন-পরিত্যক্ত হয়। নিতান্ত নিরসম্বল যখন অবস্থা, তখন তার ওপর নজর পড়ে বৃদ্ধ সাম্‌সোনভের, সে তাকে আশ্রয় দেয়।

এই ভাগ্যহীনা লাঞ্ছিতা ভীরু কিশোরী সম্পূর্ণ বদলে গেছে চার বছরের মধ্যে।

সুপুষ্ট দেহবল্লরী, প্রতি অঙ্গে যৌবনের রক্তিম আভা, চটুল অথচ গর্বোদ্ধত দৃষ্টি, আচারে-ব্যবহারে চতুর দূরবুদ্ধির পরিচয়। ব্যবসায়বুদ্ধি ছিল গ্রুশেংকার। যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনের আর অর্থসঞ্চয়ের তীক্ষ্ণ অভিলাষ ছিল তার। লোকে জানে, ইতিমধ্যেই সে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। প্রেমলুব্ধ ভক্তেরও অভাব ছিল না, কিন্তু এই চার বছরে অনেক আনাগোনা করেও কোনো পুরুষ তার কাছে পাত্তা পায়নি, অবশ্য তার বৃদ্ধ রক্ষাকর্তা ছাড়া। অনেক প্রেমপ্রার্থীকে গত দু-বছরের মধ্যে দুর্গতিতে মুখ কালো করে হটে আসতে হয়েছে। তাদের বলতে হয়েছে, ও মেয়ে সহজ নয়। অধুনা টাকা লেনদেনের কারবারী বলে গ্রুশেংকার নাম। দুর্মুখরা বলে, মেয়েটা ইহুদী। অবশ্য এ নয় যে কাঁচা টাকা লোককে ধার দিয়ে সে সুদ আদায় করে। বুড়ো কারামাজভের সঙ্গে একত্রে এক নতুন কারবার সে খুলেছে, যা হচ্ছে নামমাত্র মূল্যে হতাশ ঋণের দলিলপত্র কেনা, আর তার থেকে দশগুণ লাভ উসুল করা।

বুড়ো বিপত্নীক সাম্‌সোনভের ঐশ্বর্য প্রচুর, কিন্তু লোকটা যেমন কৃপণ তেমনি নির্দয়। তার বয়স্ক ছেলেদের ওপর সে সমানে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। গত একবছর ধরে সে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, আর নিত্য নির্ভরশীল গ্রুশেংকার ওপর। প্রথমে সে গ্রুশেংকাকেও খুব দারিদ্র অবস্থায় রেখেছিল। গ্রুশেংকা নিজের বুদ্ধিবলে বুড়োর অর্থ-দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। তাহলেও তার ওপর বুড়োর অপরিসীম বিশ্বাস। সে জানে, তাকে ছেড়ে অন্য কোনো পুরুষে আসক্ত হবে না। গ্রুশেংকাকে ছেড়ে তার একদিনও চলে না, কিন্তু তা বলে তার নামে বেশ কিছু ধনসম্পত্তি লিখে দেবার পাত্র সে নয়। গ্রুশেংকা যদি তাকে ছেড়ে দেবার ভয় দেখাত তাতেও সে টলত না। মাত্র আট হাজার রুবল তার নামে সে সম্প্রতি লিখে দিয়েছে। বলেছে,—দ্যাখো, তোমার বুদ্ধি আছে, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই তোমাকে করে নিতে হবে। যতোদিন বেঁচে আছি, ততোদিন নির্দিষ্ট মাসহারা পাবে। তার পর চোখ বুজলে আর একটি পয়সার আশা কোরো না।

কথার নড়চড় হয়নি। সত্যিই যখন সাম্‌সোনভ মরে, তার উইলে গ্রুশেংকার নামোল্লেখটুকুও ছিল না। সব সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যায় তার ছেলেদের, জীবদ্দশায় যাদের সে চাকরের মতো করে রেখেছিল। তবে তারই উপদেশ আর পরামর্শে গ্রুশেংকা স্বাধীন-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এমনি একটা ব্যবসার ব্যাপারেই গ্রুশেংকার সঙ্গে ফিয়োডোর পাভলোভিচের পরিচয় হয়। ফিয়োডোর যখন গ্রুশেংকার প্রেমে পাগল হয়ে উঠল, ব্যাপার দেখে সাম্‌সোনভের কৌতুকই হোলো প্রচুর। গ্রুশেংকা সাম্‌সোনভকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করত, কোনো কথা গোপন করত না তার কাছে। সম্প্রতি যখন ডিমিট্রি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হোলো, তখন কিন্তু হাসি বন্ধ হোলো সাম্‌সোনভের। উল্টে সে গ্রুশেংকাকে কড়া ধমক আর পাকা উপদেশ দিল। সে বললে,—দ্যাখো, বাপ-ব্যাটা দুজনের মধ্যে একজনকে যদি তোমার নিতে হয়, তাহলে বাপটাকেই পছন্দ করো, অবশ্য যদি কবুল করিয়ে নিতে পারো যে হারামজাদা তোমাকে বিয়ে করবে আর আগে থেকেই বেশ কিছু জমিজমা

তোমার নামে লিখে দেবে। ঐ কাপ্তেন ছোকরার সঙ্গে মাখামাখি কোরো না, ওর মনে কোনো মধু নেই।

এক স্ত্রীলোক নিয়ে কারামাজভ পিতাপুত্রের বীভৎস ও সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শহরের অনেকেরই জানা ছিল। কিন্তু এদের কার প্রতি গ্রুশেংকার মনোভাব কী, তা ছিল কল্পনারও অসাধ্য। এমন কি তার বাড়ির লোকেরও কোনো সঠিক ধারণা ছিল না এসব সম্বন্ধে। অবশ্য বাড়ির লোক বলতে গ্রুশেংকার ছিল দুটি মাত্র পরিচারিকা। সে বড়ো সাবধানী মেয়ে, বসবাসেও বিলাসিতার কোনো চিহ্ন ছিল না তার।

রাকিতিন আর আলিওশা যখন পৌঁছল, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। গ্রুশেংকার ঘরে তখনো আলো জ্বলেনি। বসবার ঘরে চামড়া-ঢাকা শক্ত একটা পুরানো সোফার ওপর গ্রুশেংকা শুয়ে আছে। বিছানার দুটো বালিশ তার মাথার নিচে। চিত হয়ে নিশ্চলভাবে সে পড়ে আছে, হাত দুটি মাথার পিছনে ছড়ানো। পরনে কালো সিল্কের সান্ধ্য পোষাক, মাথায় একটি লেসের টুপি, কাঁধের ওপর ছড়ানো একটি লেসের ওড়না, মস্ত একটা সোনার ব্রোচ দিয়ে আটকানো। কারো জন্যে সে যেন প্রতীক্ষা করছে। ক্লান্ত অধীর প্রতীক্ষা তার মুখের পাণ্ডুরতায়, তার ওষ্ঠের স্ফুরণে। আগন্তুকদের পায়ের শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। বাইরের হল থেকে তারা শুনতে পেল তার সন্ত্রস্ত চিৎকার,—কে ? কে এল ?

পরিচারিকা চাপা গলায় খবর দিল,—না, সে নয়, অন্য দুজন।

রাকিতিন আলিওশাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বললে,—ব্যাপার কী এদের ?

ভয়-চকিত চোখে সোফার ধারে দাঁড়িয়ে আছে গ্রুশেংকা। তার ঘন ব্রাউন চুলের একগুচ্ছ লেসের টুপির শাসন এড়িয়ে ডান কাঁধের ওপর নেমেছে। আগন্তুকদের চিনতে পেরে সে বললে,—ওঃ, রাকিতিন, তুমি ? উঃ, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে ? অ্যা, কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ ? কী ভাগ্যি আমার !

কতোদিনের যেন ঘরোয়া বন্ধু, এমনি দরাজ গলায় রাকিতিন বললে,—হয়েছে, হয়েছে। ঘরে আলো আনো দিকিন্।

ঠিকই তো। ওরে ফেনিয়া, শীগগির একটা আলো আন্। ইস্, ভালো সময়েই তুমি ওকে আমার কাছে আনলে !

. আলিওশার দিকে তাকিয়ে গ্রুশেংকা মুখ ফেরাল আরশির দিকে। দু-হাত তুলে অবাধ্য কেশগুচ্ছকে শাসন করল। গলার স্বরে কেমন অস্বস্তি।

ক্ষুন্ন হোলো রাকিতিন,—কেন ? খুশী হলে না বুঝি ?

না, তা কেন ? তবে সত্যি বলছি, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আলিওশার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললে,—তুমি যে আসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই, কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, হঠাৎ বড়ো ভয় পেয়েছিলাম। ভাবলাম, ঐ বুঝি মিটিয়া এল।

রাকিতিন প্রশ্ন করল,—তাতে ভয়টা কিসের ?

ঠকিয়েছি যে ওকে। বলেছি, আজ সারা সন্ধ্যে কুজমা কুজমিচের ওখানে আমার কাটবে। সপ্তাহে একটা দিন আমার সন্ধ্যেটা ওর কাছে কাটে। দরজা বন্ধ করে ওর টাকার হিসেব করে দিতে হয়, বুড়োর আর কাউকে বিশ্বাস নেই। মিটিয়াকে মিথ্যে বুঝিয়ে আবার আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি, অপেক্ষা করছি একটা জরুরী খবরের জন্যে। হ্যাঁরে ফেনিয়া, এরা আসার পর দরজা বন্ধ করেছিলি তো ? যা আবার, একবার দরজাটা খুলে ভালো করে দেখে আয়। আশেপাশে ক্যাপ্টেন কোথাও নেই তো ? কী যে বিপদ !

না গো নেই,—দরজার ফাঁক দিয়ে এইমাত্র আমি দেখে এলাম। ভয়ে আমারও সারা গা কাঁপছে যে।

জানলার ছিটকিনিগুলো সব বন্ধ আছে তো ? পরদাগুলো ভালো করে টেনে দে। বাইরে থেকে যদি চোখ পড়ে যে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে তাহলে দরজা ভেঙে ঢুকবে। সত্যি আলিওশা, তোমার দাদা মিটিয়াকে আজ আমার বড়ো ভয় !

নিজে হাতে জানলার পরদাগুলো টেনে দিতে লাগলো গ্রুশেংকা। মুখে যতো ভয়ই বলুক, গলার স্বরে খুশীর আমেজ।

রাকিতিন শুধোলে,—মিটিয়াকে ভয় ? তোমার ? আমি তো জানি, তোমার একটি কড়ে আঙুলে তুমি ওকে নাচাও !

শোনো, আজ একটা খবরের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। অমূল্য খবর। এখন যদি মিটিয়া এসে পড়ে তাহলে সব পণ্ড। আমার মনে হয়, আমি যে সারা সন্ধ্যেটা কুজমা কুজমিচের ওখানে থাকব এ ও বিশ্বাস করেনি। ও ঠিক ওর বাড়ির সামনে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে আমি ফিয়োডোর পাভলোভিচের কাছে যাব ভেবে। তাহলে অবশ্য ভালোই, এখানে আর আসবে না। কুজমা কুজমিচের কাছে ওর সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম। আমাকে পৌঁছে দেবার পর ওকে বললাম রাত বারোটা নাগাদ আবার এসে যেন আমাকে নিয়ে যায়। ও চলে গেল, তার দশ মিনিট পরেই আমি একা বাড়ি ফিরে এলাম। ভয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসেছি, যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যাই !

তা তোমার এখন এতো সাজ-পোষাকই বা কেন ? রাকিতিন শুধোলে আবার,— তোমার মাথার টুপিটা তো বেশ মজার হে !

তোমার কথাগুলোও খুব মজার রাকিতিন। ঐ বললাম না, একটা শুভ খবরের প্রতীক্ষা করছি। খবর যদি আসে, তাহলে আর একমুহূর্তও এখানে থাকব না, বিদায় চিরদিনের জন্যে। সেইজন্যেই তো একেবারে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি।

অ্যাঁ ! বিদায় ? ব্যাপার কী, কোথায় যাবে আমাদের মায়া কাটিয়ে ?

বেশি খবর জানতে চেয়ো না, বুড়ো হয়ে যাবে।

না, না, সত্যি তোমার গলায় এমনি খুশীর সুর কখনো শুনিনি। তাছাড়া, গ্রুশেংকার ওপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে রাকিতিন শেষ করল,—এমনি সাজসজ্জা করেছ যেন এখনি চলেছ কোনো নাচের আসরে।

কতো কেন নাচের আসর দেখেছ?

তুমি অনেক দেখেছ, তাই না?

নিশ্চয়, দেখেছি বইকি। তোমার মতো? নাঃ, আশ্চর্য! আজকের দিনে আমি কিনা বসে বসে তোমার সঙ্গে বকবক করছি। সত্যি কথা বলতে কি, এমন সময় তুমি যে এখানে উদয় হবে তা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। কী হোলো আলিওশা? চাঁদমুখখানি কালো হয়ে উঠল নাকি আমার কথা শুনে? না, না, বোসো, বোসো, ভারি খুশী হয়েছি তোমার আসায়। ইস্! রাকিতিন, আলিওশাকে গতকাল বা গত পরশু যদি নিয়ে আসতে! নাঃ, আগে আসেনি হয়তো ভালোই হয়েছে।

সোফাতে আলিওশার পাশে বসল গ্রুশেংকা। আলিওশাকে পেয়ে সত্যিই সে খুশী। মুখ-চোখ তার হাসিতে খুশীতে আনন্দে ডগমগ। গ্রুশেংকার এই অকপট সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হোলো আলিওশা। মেয়েটির সঙ্গে তার স্বল্পতম পরিচয়। গত পরশুদিন শুধু তাকে ভালো করে দেখেছে,—দেখেছে কাটেরিনা আইভানোভ্নার প্রতি তার ক্রূর ব্যবহার। মনে মনে খুবই দুর্ভাবনা ছিল তার, কিন্তু এখন গ্রুশেংকাকে দেখে সে ভাবল, বাঃ, এযে একেবারে অন্য মেয়ে। মন তার শোক-ভারাক্রান্ত হলেও গ্রুশেংকার সুন্দর মুখের থেকে সে চোখ ফেরাতে পারল না। গতদিনকার চরিত্রের লেশমাত্র আজ এ মেয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি তার দেহ-ভঙ্গিমায় নেই গতকালকার সেই আন্দোলিত আমন্ত্রণ, কণ্ঠের ভাষায় নেই সে ঘৃণার্হ উচ্চারণ। শিশুসুলভ সারল্য আর সহজ আন্তরিকতা তার ব্যবহারের ভূষণ।

ঝরণার মত ঝরঝরিয়ে উঠল গ্রুশেংকার কণ্ঠ,—ইস্! কী কাণ্ড? যা কিছু সব এই আজকের দিনেই ঘটে যাচ্ছে। তবে সত্যি বলছি আলিওশা, তুমি এসেছ বলে ভারি আনন্দ হোলো আমার। অকারণ আনন্দ! কেন আনন্দ, তা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।

বটে, বটে! রাকিতিন বললে,—কেন আনন্দ, কীসের আনন্দ তা জানো না? এদিকে ওকে তোমার কাছে ধরে আনবার জন্যে দিনরাত আমাকে পাগল করেছ এতোদিন। কী উদ্দেশ্য ছিল তোমার বলো তো?

উদ্দেশ্য যা ছিল তা এখন আর নেই। আমি এখন অনেক ভালো হয়ে গেছি। কিন্তু আলিওশা, একটু দুষ্টু হাসি হেসে গ্রুশেংকা বললে,—তোমাকে অমন বিরস দেখাচ্ছে কেন? ভয় করছে আমাকে?

রাকিতিন ফস্ করে হেঁকে উঠল,—ওর মন খারাপ। ওর ভগবান ভেল্কী দেখায়নি···

তার মানে?

ওর গুরু মরেছেন, গা থেকে মড়ার গন্ধ উঠেছে। তাই···

চুপ করো তুমি। কি সব বিশ্রী কথা বলছ! একটুও শ্রদ্ধাভক্তি নেই? তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না আলিওশা। হ্যাঁ, তোমার হাঁটুতে একটু বসব? এমনি করে?

চট করে আলিওশার কোলের ওপর উঠে বসল গ্রুশেংকা, আদুরে বিড়ালছানার মতো নিজেকে এলিয়ে দিল তার বুকে, ডান বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার গলা।

বললে,—লক্ষ্মীমেয়ে, দ্যাখো, এক মিনিটে তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি। কী, রাগ করলে না তো? হুকুম করলেই নেমে যাব।

আলিওশা কোনো কথা বলল না। একটু নড়তেও পারছে না, হুকুম করবে কি, কোনো উত্তর নেই তার মুখে। কিন্তু তার দিকে ঈর্ষাভরা চোখে তাকিয়ে রাকিতিন যে কথা ভাবছিল তেমনি ভাবনাও তার মনে ছিল না। যে পরম শোক তার মনের সমস্ত চরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কাছে সব অনুভূতি পরাস্ত,—শোকের বর্ম পরেছে তার অন্তর, সে বর্মে বাসনার তীব্রতম আঘাতও প্রতিহত। তার শোক-নিসাড় মনে এই চিন্তাটুকু শুধু জাগল, এই নারী, এই সাংঘাতিক রমণী তার মনে কোনো আতংক তো জাগাল না? নারীজাতির সঙ্গে আলিওশার পরিচয় খুবই কম। মোটামুটি মেয়েদের সে দূরে থেকে ভয় পায়। কাছাকাছি এসে সে দেখেছে যে এই গ্রুশেংকা ভয়ঙ্করী বাঘিনী। সেই বাঘিনী এখন বসে আছে কোলের ওপর, দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে তার গলা। তার মনে যে অনুভূতিটা আস্তে আস্তে প্রকট হোলো, তা এক অতি বিচিত্র অভাবনীয় অনুভূতি। ভয় নয়, ঘৃণা নয়, হঠাৎ-জাগা লালসাও নয়।

রাকিতিন বললে,—অনেক হয়েছে। দৃশ্য দেখে পুলকে আমার মন ভরে গেল। এবার একটু শ্যাম্পেন খাওয়াও তো! তুমি জানো, এ শ্যাম্পেন তোমার কাছে আমার পাওনা।

নিশ্চয়ই খাওয়াব। জানো আলিওশা, আমি রাকিতিনকে কথা দিয়ে ছিলাম, ও যদি কোনোদিন তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে, তবে ওকে শ্যাম্পেন খাওয়াব। ফেনিয়া বোতলটা আন তো? জানো, আমি বড়ো কৃপণ, তবে তুমি এসেছ এই আনন্দে একটা বোতল খরচ করাই যাক। কী বলো? তাছাড়া, আজ মদ খেতে বড়ো ইচ্ছেও করছে আমার!

কিন্তু আজ তোমার কী ব্যাপার বলো তো? কোন্ খবরের জন্যে তুমি অপেক্ষা করছ? খুব গোপনীয় নাকি?

রাকিতিনের প্রশ্নকে এবার এড়িয়ে গেল না গ্রুশেংকা। বললে,—না, গোপনীয় কিছুই নয়? তুমিও জানো। তার পর আলিওশার মুখের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাকিতিনের দিকে স্পষ্ট করে ঘাড় বেঁকিয়ে চাপা উদ্বেগপূর্ণ গলায় বললে,—আমার অফিসার আসছে রাকিতিন, আমার অফিসার আসছে।

তাঁর আসার কথা তো শুনেছিলাম। এরই মধ্যে পৌঁছে গেলেন নাকি?

এখন মক্রোতে এসেই চিঠি লিখেছে। আজ এখন যে কোনো মুহূর্তে তার দূত এসে পৌঁছতে পারে।

তা, এখানে না এসে মক্রোতে কেন?

সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না।

কিন্তু মিটিয়া? মিটিয়া জানে?

পাগল হয়েছ? মিটিয়া জানতে পারলে তো একটা খুনোখুনি হবে। তবে আমি নিজে ওর ছুরির ভয় আর করিনে। আমার বুকে আর কতো ছুরি ও বসাবে? থাক,

ওর কথা এখন ভাবতেও চাইনে। আমি এখন আলিওশার কথা ভাবব, আলিওশার কোলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব, কেমন? অতো মুখ ভার কেন লক্ষ্মীটি, আমার বোকামি আর আমার মনের খুশী দেখেই না হয় একটু হাসো।···এই, এইতো লক্ষ্মীছেলের মুখে হাসি ফুটেছে। পরশুদিন সেই মহিলার প্রতি আমার ব্যবহার দেখে, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করছিলে, তাই না? ভেবেছিলে আমি মানুষ নই, কুকুর। ঠিক কিনা? সত্যি, সেদিন ভীষণ দুর্ব্যবহার করেছিলাম আমি!

মুখে একটি নিষ্ঠুর রেখা ফুটে উঠল গ্রুশেংকার। সে বলে চলল,—বেশ করেছিলাম, খুব ভালো করেছিলাম। মিটিয়া বললে, আমি চলে আসার পর হাত-পা ছুঁড়ে ও নাকি চেঁচিয়েছে আর বলেছে, আমাকে বেত মারা উচিত। হি-হি, আমিই বেত মেরে এসেছি ওর মুখের ওপর! আমাকে চকোলেট খাইয়ে ভোলাতে চেয়েছিল মায়াবিনী। বেশ করেছি, খুব করেছি! কিন্তু এখন যে আমার বড্ডো ভয় করছে আলিওশা, তুমি যে আমার ওপর ভীষণ রাগ করে আছ!

কথাবার্তা শুনে ঘাবড়ে গেল রাকিতিন, বললে,—শুনছ হে সাধু! তোমাকেই গ্রুশেংকার সবচেয়ে বেশি ভয়!

ভয়ই তো! ঠোঁট ফুলিয়ে বললে গ্রুশেংকা,—ও-ই তো ভয় পাবার মতো লোক। ওর যে বিবেক আছে। তোমার মতো? তবে শুধু কি ভয়? আমার মনপ্রাণ দিয়ে আমি ওকে ভালোবাসি। তুমি জানো আলিওশা, আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি।

নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার! আরে, হাঁ করে বসে রয়েছ কী আলেক্সি? গ্রুশেংকার কথাগুলো কানে ঢুকল? ও যে তোমাকে দেখে পটে গেছে একেবারে!

বেশ করেছি। আমি যে ভালোবাসি আলিওশাকে!

আর তোমার ঐ অফিসার? যার ডাকের আশায় সেজেগুজে বসে আছ।

সে হোলো অন্যরকম ভালোবাসা। সে তুমি বুঝবে না রাকিতিন।

তাতো বটেই! মেয়েমানুষের মন বোঝে কার সাধ্য!

তুমি আমাকে রাগিও না বলছি রাকিতিন, দপ্ করে উঠল গ্রুশেংকা,—আলিওশার প্রতি আমার ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসার মতো নয়। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। সত্যি কথা তোমাকে বলি আলিওশা, তোমার ওপরেও আমার কুট নজর ছিল। কিন্তু উপায় কি, মেয়েটাই যে আমি খারাপ। জানো আলিওশা, অন্য সময়ে তোমার কথা যখন ভাবতাম, তখন আমার বিবেকের কথা আমার মনে পড়ত। মনে মনে ভাবতাম, তোমার মতো সৎলোক আমার মতো মেয়েকে কতো ঘৃণাই না করে। পরশুদিন যখন সেই কাটেরিনার বাড়ি থেকে ফিরছিলাম, তখনো ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। তোমার কথা ভেবে, তোমাকে দেখে আমার নিজের জীবনের জন্যে আমার লজ্জা হয়, ধিক্কার দিই নিজেকে শতবার। কতোদিন থেকে যে মনে মনে তোমার কথা আমি ভাবছি, তা আমার মনে নেই।

ফেনিয়া ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। ট্রে-তে ছিপি-খোলা শ্যাম্পেনের বোতল আর তিনটি গ্লাস।

বাঃ, এই তো শ্যাম্পেন এসে গেছে! চমৎকার! ত্বরিতগতিতে টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল র‍াকিতিন। বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে সেটা শেষ করল। দ্বিতীয়বার গ্লাসটা ভর্তি করতে করতে বললে,—শ্যাম্পেন কখনো ঢোক গিলে খেতে নেই। আলিওশা, তুমি একবার দেখাও দিকিন্! তোমার গ্লাসেও ঢালি গ্রুশেংকা! দুজনে খাও, আর বলো,—জয়, স্বর্গের সিংহদ্বারের জয়!

কোন্ স্বর্গ র‍াকিতিন?

গ্রুশেংকা আর আলিওশা দুজনেই গ্লাস হাতে নিল। আলিওশা গ্লাসটা টেবিলে রেখে বললে,—আমি না হয় নাই খেলাম!

বাঃ, একটু আগে যে খুব বড়াই করছিলে! এখন না কেন?

গ্রুশেংকাও সঙ্গে সঙ্গে বললে,—আমিও নাই খেলাম! বোতলটা তুমি একলাই শেষ করো র‍াকিতিন। মানে, আমার খেতে খুব ইচ্ছে নেই, তবে আলিওশা যদি খায়, তাহলে তার সঙ্গে এক ফোঁটা আমি খেতে পারি।

ইস্! কী রঙ্গই তুমি জানো গ্রুশেংকা? কোলে বসে গলা জড়িয়েও বুঝি সাধ মিটছে না? আরো কিছু চাই? কিন্তু দ্যাখো বাপু, আলিওশার মন আজ ভীষণ খারাপ, দারুণ রেগে আছে। মদ খাবে, সসেজ খাবে—এইসব কথা বলেছে!

কেন, কী হয়েছে?

ওর গুরু যে মরেছে। ফাদার জোসিমা, ঐ সাধুবাবা!

অ্যাঁ! সাধু জোসিমা মারা গেছেন? আমি তো জানতাম না? ছি ছি, এমনি সময় আমি একি করছি?

ত্রস্তভাবে আলিওশার কোল থেকে উঠে দাঁড়াল গ্রুশেংকা, ভক্তিভরে নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিয়ে পাশে সোফার ওপর বসল।

আলিওশা বিস্ময়ভরা গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ-উপলব্ধির কোনো এক আলো যেন জ্বলে উঠল তার হৃদয়ে।

স্পষ্ট গম্ভীর গলায় সহসা সে কথা বলতে আরম্ভ করল,—র‍াকিতিন, বৃথা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। তোমার ওপর রাগ করতে আমি চাইনে, তুমিও আমাকে অকারণ চটিয়ো না। জীবনের কী অমূল্য ধন আজ আমি হারিয়েছি তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই গ্রুশেংকাকে বরং দ্যাখো, এও আমার দুঃখ বুঝেছে। আমি আগে ভেবেছিলাম, কুটিল ও, পাপী ও,—নিজের মনে পাপ ছিল কিনা, তাই। কিন্তু স্পর্শ পেলাম একটি করুণ হৃদয়ের, লাভ হোলো মস্ত সম্পদ, প্রাণের বোন। আগ্রাফেনা আলেকজান্দ্রোভ্না, তোমাকে একটুও আমি বাড়িয়ে বলছিনে। আমার অন্ধকার গুহাশ্রয়ী আত্মাকে তুমি আলোর ইশারা দেখালে!

আহা হা! কী কথাই বললে! আসলে তোমার ঐ আত্মাটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পোরবার ওর মতলব! বুঝেছ বোকারাম?

থামো রাকিতিন থামো, লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ করল গ্রুশেংকা,—দয়া করে তোমরা দুজনেই চুপ করো, আমাকেই বলতে দাও। যা বললে, আর বোলো না আলিওশা, লজ্জা দিয়ো না আমাকে। আমি ভালো নই, সত্যিই আমি বড়ো মন্দ মেয়ে। আর তুমিও যা বলছ রাকিতিন, তাও সত্যি নয়। আলিওশাকে হাতের মুঠোয় আনবার দুরভিসন্ধি একদিন আমার ছিল বটে, কিন্তু সে মনোবৃত্তি এখন আর আমার নেই।

প্রবল অনুভূতিতে কাঁপতে লাগল গ্রুশেংকার কণ্ঠস্বর। রাকিতিন একবার গ্রুশেংকার আর-একবার আলিওশার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললে,—পাগলা গারদে এলাম নাকি? দুজনই দেখি সমান পাগল, এখুনি ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলবে।

হ্যাঁ রাকিতিন, আবার গ্রুশেংকা বললে,—আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছে, কাঁদতে আমার বাকি নেই। আমাকে বোন বলে ও ডেকেছে, এ ডাক একবার যখন শুনেছি জীবনে আর ভুলব না। তুমি ভাবো কি বন্ধু, আমি খুব খারাপ? তাই না! জানো, একটি পেঁয়াজ আমিও একদিন দান করেছিলাম!

পেঁয়াজ? কী বলছ তুমি? সত্যি তোমার মাথা খারাপ হোলো নাকি?

আলিওশার দিকে ফিরে একটু সন্ত্রস্ত হাসি হেসে গ্রুশেংকা বললে,—রাকিতিনকে এই যে বললাম আমার পেঁয়াজ দানের কথা, এটা কোনো গর্বের কথা নয়। সুন্দর একটা গল্প এটা, ছেলেবেলায় আমি শুনেছিলাম। এক চাষীর বৌ, ভারি বজ্জাত, জীবনে একটা ভালো কাজ করেনি। সে যখন মরল, যমদূতেরা তার আত্মাকে নিয়ে চলল নরকের আগুনে দগ্ধাতে। অনেক ভেবে ভেবে দেবদূতের মনে পড়ল, জীবনে একটিমাত্র সৎকাজ মেয়েটা করেছে, নিজের বাগান থেকে একটি পেঁয়াজ তুলে এক ভিক্ষুণীকে দিয়েছে। ঈশ্বরকে সে কথা তিনি বললেন। ঈশ্বর বললে, 'বেশ, নরকের অগ্নি-হ্রদের ধারে গিয়ে তার ঐ পেঁয়াজটি তার দিকে বাড়িয়ে দাও। ঐ পেঁয়াজটা ধরে ও ঐ তরল আগুন থেকে বেরিয়ে আসুক। তার পর ওকে স্বর্গে নিয়ে এসো। কিন্তু খুব সাবধান, পেঁয়াজটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে আর ওর পরিত্রাণ নেই।' দেবদূত দৌড়ে গেলেন রমণীর কাছে, বললেন, 'খুব শক্ত করে এই পেঁয়াজটা চেপে ধরো। তার পর আমি তোমাকে আস্তে আস্তে টেনে তুলব।' খুব সাবধানে দেবদূত তাকে অগ্নিপঙ্ক থেকে টেনে তুলতে লাগলেন। প্রায় এসেছে, এমন সময় অন্য পাপীরা তার গা-হাত-পা চেপে ধরতে লাগল। তারাও তার সঙ্গে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু পাজী স্ত্রীলোকটা অন্য সবাইকে লাথি মারতে লাগল আর বলতে লাগল,—'ওটা আমার পিঁয়াজ। আমি মুক্তি পাব। তোরা কেন? ইস্!' যেই না এমনি বলা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পেঁয়াজটা ভেঙে গেল, আর সে আবার গড়িয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। আজ পর্যন্ত সেখানেই সে ফুটছে। আমিও আলিওশা ঐ গল্পের মেয়েমানুষটার মতো পাজী আর বজ্জাত,—তবে হ্যাঁ, জীবনে ওর মতো একটি পেঁয়াজ আমি দান করেছি, ওটুকু পুণ্য আমার তোলা থাকবে, তার বেশি নয়। তুমি আমাকে প্রশংসা কোরো না আলিওশা, তোমার প্রশংসা শুনলে আমার বড়ো লজ্জা করে। হ্যাঁ, আর একটা

কথাও স্বীকার করি। শোনো ভাই, তোমাকে ধরবার জন্যে কী রকম ব্যাকুল হয়েছিলাম জানো? রাকিতিনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ও যদি তোমাকে আমার কাছে আনতে পারে তো ওকে আমি পঁচিশ রুবেল দেব। তোমার কথাটা শোধ করে দিই, এই নাও রাকিতিন।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে পঁচিশ রুবেলের একটি নোট গ্রুশেংকা বার করে দিল।

হতভম্ব হয়ে গেল রাকিতিন। গ্রুশেংকা যে আলিওশার সামনে কথাটা বলবে তা সে কল্পনা করেনি। আমতা-আমতা করে সে বলল,—কি যাচ্ছে ছেলেমানুষী হচ্ছে গ্রুশেংকা!

না রাকিতিন, এ আমার ঋণ, এ তোমাকে নিতেই হবে। আর নেবে নাই বা কেন? তুমি নিজেই তো চেয়েছিলে।

এমন লজ্জায় রাকিতিন কখনো পড়েনি, তবু কপট ঔদ্ধত্য দিয়ে সে লজ্জা চাপা দিতে চেষ্টা করল, হ্যাঁ, তা নেব বইকি। টাকা হাতে পেলে যে ছাড়ে সে বোকা! বুদ্ধিমানের সুবিধের জন্যেই তো বোকার সৃষ্টি।

গ্রুশেংকার ছুঁড়ে দেওয়া নোটটা সে কুড়িয়ে নিল।

বেশ, শোধবোধ হয়ে গেল, গ্রুশেংকা বললে,—আর একটি কথা বলবে না, আমাদের তুমি ভালোবাসো না, আমাদের আলোচনাও তোমার ভালো লাগবে না,—মুখটি বন্ধ করে এবার এককোণে গিয়ে বসে থাকো।

গ্রুশেংকার কাছ থেকে তার পাওনা সে যে ঠিক পাবে তা রাকিতিন জানতই। কিন্তু আলিওশার সামনাসামনি ধরা পড়ে যাওয়ায় এমনি অপমান! মরুক গে, যা হবার তা হয়েছে। টাকা যখন পেয়েই গেছি তখন আর আত্মসম্মান কীসের?

দাঁত খিঁচিয়ে সে উত্তর দিল,—ভালোবাসব! দরদে বুক ফেটে যাবে আমার! কীসের জন্যে শুনি?

কীসের জন্যে আবার? স্বার্থ ছাড়া যে ভালোবাসা, তাই আসল ভালোবাসা। যেমন ভালোবাসা আলিওশার।

ইস্, আলিওশার জন্যে একেবারে পাগল হলে দেখছি? কোথায় দেখলে ওর ভালোবাসা!

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল গ্রুশেংকা। সম্বিৎ-হারানো উচ্চস্বরে সে জবাব দিল,—থামো রাকিতিন, বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আমার সঙ্গে এমনি নির্লজ্জের মতো কথা বলার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে? নিজের সম্মান যদি রাখতে চাও তো নিঃশব্দে বসে থাকো। হ্যাঁ, শোনো আলিওশা, সত্যি কথা আমি তোমাকে বলব, আমার স্বরূপ তোমার কাছে আমি গোপন করব না। ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, সত্যিই আমি তোমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যে আমি রাকিতিনকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলাম, যাতে তোমাকে একবার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পাই। তুমি এর কিছুই জানতে না। তুমি চিনতেই না আমাকে, কখনো চোখে চোখ পড়লে

চোখ নামিয়ে তুমি চলে যেতে। একপলোবার আমি তোমার দিকে চেয়েছি, জনে-জনে কতো লোককে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কথা। নিত্য দুঃস্বপ্নের মতো আমার বুকে ফুটে উঠেছে তোমার মুখ। মনে মনে খালি ভেবেছি, 'ঘৃণা করে আমাকে, চোখ তুলে তাকায় না আমার দিকে, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।' কতো চেষ্টা করেও তোমার মুখকে আমার মন থেকে মুছতে পারিনি। কেমন এ আকর্ষণ? কী ভীষণ এ আকর্ষণ! মনে মনে ভেবেছি, মুঠোর মধ্যে তোমাকে পাব একদিন, সেদিন চুরমার করব তোমার দম্ভ। এই যে আমার এখানে কতো পুরুষ আসে, বিশ্বাস করো, কোনো দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে এখানে আসবার সাহস কারো নেই। এক কুঞ্জমা ছাড়া কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কুঞ্জমা বুড়োর কাছে আমি নিজেকে বিক্রি করেছি, শয়তান ওর সঙ্গে আমাকে বেঁধেছে। কিন্তু জানো, তোমার কথা আমি ভাবতাম? যদি একবার পাই, লালসার আগুনে তোমাকে আমি দগ্ধ করব, তোমার সাধুত্বের মুখোশ ঘুচিয়ে ভিতরের জন্তুটাকে টেনে বার করব আমি,—তার পর তোমার মুখের ওপর হো-হো করে হাসব। এমনি ঘৃণ্য বাসনা আমি দিনরাত মনে পুষে রেখেছি, আর আজ সেই তুমি আমার কাছে এলে, প্রথম সম্ভাষণে তুমি কিনা আমাকে বোন বলে কোলে তুলে নিলে! পাঁচ বছর আগে আমার সর্বনাশ যে লোক করেছিল, সেই লোকও আবার ফিরে আসছে, তারই ডাকের অপেক্ষা আজ আমি করছি। পাঁচ বছর আগে, আমার সেই চরম সর্বনাশের পর কুঞ্জমার আশ্রয়ে আমি যখন এ বাড়িতে আসি, তখন আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকতাম—কেউ যেন না আমাকে দেখতে পায়, কেউ যেন না আমার শব্দ শোনে! আমি তখন নিতান্ত মূর্খ মেয়ে, সারা দিনরাত কাঁদতাম আর ভাবতাম,—কোথায় সে, যে আমার এমনি সর্বনাশ করে গেল? কোথায় কোন্ অন্য মেয়ে নিয়ে সে এখন ফুর্তি করছে! একবার যদি তার দেখা পাই, তাহলে এর প্রতিশোধ আমি নেবই। বিনিদ্র রাতের পর রাত চোখের জলে ভেসে গেছে, অস্ফুট জপ করেছি অন্ধকারে,—প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ নেব। যে আমাকে অপমান করেছে, যে আমাকে অবজ্ঞা করেছে, যে আমাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে কঠোর হাসি হেসে সরে পড়েছে, তাকে আমি ছাড়ব না। দুঃখে আর হিংসায় সমস্ত মন কালি হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আকাশটাকে দু-হাতে কুটিকুটি করে ছিঁড়ি! দিন কাটতে লাগল। ক্রমে শক্ত হোলো মন, পাকা হোলো বুদ্ধি! বঞ্চিতা কিশোরী রূপান্তরিত হোলো ছলনাময়ী নটীতে। পয়সা হোলো, প্রতিপত্তি হোলো, প্রেমিক জুটল একাধিক, কিন্তু কেউ জানে না, এখনো এক-একদিন রাত্রে চোখে ঘুম আসে না, তখন বুকের মধ্যে দপদপ করে সেই বঞ্চনার ক্ষত, দাঁতে দাঁতে চেপে মনে মনে বলি,—প্রতিশোধ নেব। মালিওলা, ভাবো একবার,—সেই প্রতিশোধ নেবার সময় এতোদিন পরে এসেছে। মাসখানেক আগে হঠাৎ তার চিঠি পেলাম, এখন সে বিপত্নীক, আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়। বুকের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। মনে হোলো, এতোদিন পরেও একটিবার যদি সে শিস দিয়ে ডাকে, তাহলে হয়তো পোষা কুকুরের মতো তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব। এতোদিন ধরে যে হিংসাকে সযত্নে পোষণ করে রেখেছি, তাকে কেন খুঁজে

পাইনে ? তার বদলে কেন এই আত্মসমর্পণের ক্লীব অনুভূতি ? না যাব না। কিছুতে যাব না। তার ফাঁদে পা দেব না। তুমি জানো না আলিওশা, ঐ সব-হারানো আকর্ষণকে এড়ানোর জন্যেই মিতিয়ার সঙ্গে খেলা করে চলেছি। এ প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয়ও নয়, গত একমাস ধরে এ আমার প্রতিমুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা। তোমরা আসার আগে আমি একলা ঘরে বসে ভাবছিলাম, কী করব, কী হবে আমার ভবিষ্যৎ ? হ্যাঁ আলিওশা, তোমার ঐ অভিমানী বান্ধবীকে বোলো, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। আমার যে কী জ্বালা, কী অন্তর্দাহ তা কেউ বুঝতে পারবে না। জানিনে, যাব কি না ? যদিও বা যাই তাহলে একটা ছুরি হাতে নিয়ে যাব কিনা !

এতোক্ষণ কথা বলে উদ্‌গত উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল গ্রুশেংকা। সোফার উপর লুটিয়ে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

আলিওশা উঠে রাকিতিনের কাছে গেল। বললে,—মিশা ভাই, রাগ কোরো না। গ্রুশেংকা তোমাকে বকেছে, তা নিয়ে ক্ষোভ রেখো না মনে। ওর কথা সব শুনলে তো ? মানুষের সহ্যশক্তির কাছে খুব বেশি আশা করতে নেই, বাকিটা ক্ষমা করে নিতে হয়।

আপন হৃদয়ের আবেগে আলিওশা রাকিতিনের কাছে গ্রুশেংকার হয়ে ক্ষমা চাইল। রাকিতিন কিন্তু ক্রুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, ঘৃণার হাসি হেসে বললে,—কাল সারারাত্রি তোমার সাধুবাবার উপদেশ শুনে বদহজম হয়েছে, এখন তার ঢেঁকুর ছাড়ছ আমার উপর, না ? খুব হয়েছে, আর ধর্মকথা শোনাতে হবে না।

উদ্‌গত অশ্রু দমন করে আলিওশা বললে,—হেসো না রাকিতিন, আর আমার স্বর্গত গুরুর নামে ঠাট্টাও কোরো না। পৃথিবীর যে কোনো লোকের চেয়ে তিনি মহান ছিলেন। আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাইনি, সে অধিকার আমার নেইও। আমার এই বোন গ্রুশেংকার তুলনায় আমি তো কিছুই না। আমি তো নিজের সর্বনাশ কামনা করেই এখানে এসেছিলাম,—এসেছিলাম হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালিকা হয়ে। কিন্তু এই মেয়ে, পাঁচবছর ধরে যে নরক-যন্ত্রণায় জ্বলেছে, একটি দিনের একটি মিষ্টি কথায় সব যন্ত্রণা ও ভুলে গেল, সব বঞ্চনা ও ক্ষমা করে নিল। যে লোকটি ওর প্রতি অপরাধ করেছিল, সে ফিরে এসেছে, ওকে আবার আহ্বান করেছে। সে আহ্বানে সাড়া কি দেবে না ? আর সাড়া যদি দ্যায় তাহলে প্রতিহিংসায় হিংস্র ছুরি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কি যাবে ? না, যাবে নিশ্চয়ই, অশ্রুধৌত ক্ষমার পরিচ্ছদে হৃদয়টি নিয়ে ও যাবে। তোমার কথা আমি জানিনে মিশা, কিন্তু আমি জানি, ওর প্রেমের তুলনা হয় না, ওর মহত্ত্ব অপরিসীম। এর্দুনি ও কি বলছিল শোনোনি ? কাল যার প্রতি মন্দ ব্যবহার করেছিল, সে যেন ওকে ক্ষমা করে। নিশ্চয় ক্ষমা করবে ওকে কাতেরিনা, ওর দুঃখকে একবার উপলব্ধি করলে ওর কোনো মালিন্যই যে আর চোখে পড়ে না ভাই ! শুধু স্বীকার করতে হয়, মালিন্যের নিচে মানিক্য আছে—

নিষ্প্রাণ মুগ্ধ হয়ে এল আলিওশার। সে থামল। মেজাজ যতোই তিক্ত হোক, অবাক না হয়ে পারল না রাকিতিন। আলিওশার মুখে একসঙ্গে এতোগুলো কথা সে কখনো শোনেনি।

হাঁ-টা বন্ধ করে এবার সে বললে,—যাক, গ্রুশেংকার চরিত্রলীলায় একজন প্রচারক তাহলে জুটল। ব্যাপার কী হে ? প্রথম আলাপেই প্রেম নাকি ? বাঃ বাঃ গ্রুশেংকা, তোমার আবার একজন নতুন প্রেমিক জুটল,—আমাদের সাধুবাবা একেবারে পটে গেছে দেখেছি ! কর্কশ হাসি হাসল রাকিতিন।

বালিশ থেকে মুখ তুলে অশ্রুভেজা হাসিমাখা দৃষ্টিতে গ্রুশেংকা আলিওশার দিকে তাকাল। বললে,—আলিওশা, প্রিয় আমার, ও ইতরের মতো যা খুশী বলুক, কান দিয়ো না কথায়। তুমি আমার কাছে এসো। এইখানে,—হ্যাঁ, ঠিক আমার পাশে এসে বোসো। তোমার ডান হাতটি আমার হাতে দাও। হ্যাঁ, এইবার তুমি বলো, আমার জীবনের ঐ যে সর্বনাশা পুরুষ, ওকে সত্যি আমি ভালোবাসি কিনা ? তুমি আসার আগে এই কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি। কিন্তু আর সময় নেই, তুমিই আমার হয়ে বিচার করে দাও আলিওশা। আমি ওকে ক্ষমা করব কি করব না।

প্রশান্ত হাসি হেসে আলিওশা বললে,—কিন্তু ক্ষমা করতে তো তোমার বাকি নেই ! ঠিক, ঠিকই ধরা পড়ে গেছি তোমার কাছে ! ক্ষমা করতে আর বাকি নেই।

লাফিয়ে উঠে গ্রুশেংকা গ্লাস ভর্তি মদ এক চুমুকে নিঃশেষ করে শূন্য পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। ঝনঝনিয়ে গ্লাসটা ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুর একটি রেখা ফুটে উঠল তার মুখে।

মাটিতে মুখ নামিয়ে আপনমনে সে বললে,—না, হয়তো তাকে আমি ক্ষমা করি নি। সে বলতে লাগল কেমন ভয়-দেখানো কণ্ঠস্বরে,—আমার অন্তর তাকে ক্ষমা করতে চায়, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধা দেয়। জানো আলিওশা, গত পাঁচবছর ধরে আমার ক্ষোভকে শুধু ভালোবেসে এসেছি, লালন করে এসেছি আমার অশ্রুকে। এতোদিন পরে মানুষকে ভালোবাসা কি সোজা কথা ?

আবার বাধা দিল রাকিতিন, অবজ্ঞায় নাক সিটকিয়ে বললে,—বটে, বটে। তবে এতো সাজগোজের ঘটা কার জন্যে ?

চুপ করো রাকিতিন, আমার সাজসজ্জা নিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করতে এসো না ! রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল গ্রুশেংকা,—কী জানো তুমি আমাকে ? জানো, কীসের জন্যে এই সাজ ? আমি ওর সামনে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কটাক্ষ করে বলব,—কী গো, এমনটি আমাকে আগে দেখেছিলে ? চিনতে পারো ? সরলা এক কিশোরীর সর্বনাশ করে সরে পড়েছিলে একদিন, সেই কিশোরী আমি ! পছন্দ হচ্ছে আমায় ? জিভে জল আসছে আমাকে দেখে ?—ওকে পাগল করব, ওর গর্বকে লুটোবো আমার পায়ের নিচে, সেই হবে আমার চরম প্রতিশোধ। আর সেই জন্যেই এই সাজসজ্জা।

কী ভাবছ তুমি আমার কথা শুনে ? পারব না ? খিলখিল করে হাসল সে পাগলিনীর মতো,—তুমি জানো না, আমার রাগ কতো বড়ো, কতো বড়ো আমার প্রতিহিংসা। আমি সব পারি। শোনো আলিওশা, এই আমার সাজ-পোষাক, এ আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি এই মুহূর্তে। এই আমার রূপ,

হুড়ি দিয়ে ফুর্তি-টিকুর্তি করতে পারি আমার মুখে, পথে বার হতে পারি ভিখারী হয়ে। যদি ইচ্ছে করি, কোথাও যাব না, কারো কাছে যাব না। যদি ইচ্ছে করি, কুজমার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি, সব কিছু একদিনে তাকে ফেরত দিয়ে চলে যেতে পারি দু-চোখ যেদিকে যায়,—দাসীবৃত্তি করে কাটাতে পারি বাকি জীবন। দাঁত বার করে চেয়ে দেখছ কী? সব পারি আমি। এখনই গিয়ে ঐ অফিসারকে বলতে পারি, সরে পড়ো, জ্বালিয়ো না আমাকে আর। তুমিও আমাকে জ্বালিয়ো না রাকিতিন।

রাকিতিন উঠে দাঁড়াল, বললে,—এবার যেতে হয়, নইলে বেশি রাতে মঠের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

সম্বিৎ ফিরে পেল গ্রুশেংকা। মিনতি করে আলিওশাকে বললে,—সে কি আলিওশা, তুমিও এখনই চলে যাবে? তাহলে আমার কী হবে? তুমিই তো আমাকে এতো কষ্ট দিলে, জ্বালিয়ে তুললে আমার বুকের আগুন,—এখন সারারাত আমি একলা কী করে কাটাই?

কঠোর ঠাট্টা করল রাকিতিন,—অ্যাঁ! তুমি চাও আলিওশা সারারাত তোমার কাছে থাকুক, তোমার বুকের আগুন ঠাণ্ডা করুক! বেশ, বেশ, মন্দ কিছে সাধুবাবা? আমি তাহলে কেটে পড়ি।

চুপ করো দুর্মুখ। কথা বলতে আলিওশা জানে। সত্যি যে-কথা শুনলে মনের জ্বালাযন্ত্রণা জুড়োয়, তেমনি কথা তুমি বলবে কোত্থেকে।

যাট, যাট। কিন্তু এমন প্রাণ-জুড়োনো কী কথা ও তোমাকে বলল ভাই?

আমি জানিনে, কী কথা বলেছে তা আমি নিজে মুখে বলতে পারব না। কিন্তু যা বলেছে, তা শুধু মুখের কথা নয়, তা আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধেছে, নিয়ে নিয়েছে অন্তরের কষ্ট-যন্ত্রণা।

আকুল আবেগে সে আলিওশার সামনে বসে পড়ল। উন্মাদিনীর মতো তার দু-হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল,—কেন তুমি এতোদিন পরে এলে বন্ধু? প্রিয় আমার, তোমারই মতো বন্ধুর জন্যে সারাজীবন ধরে আমি প্রতীক্ষা করে আছি,—যে শুধু একটি কথায় একটিবারের স্পর্শে আমার সমস্ত বেদনা মোচন করবে, সমস্ত মালিন্য ঘুচিয়ে দেবে। যতো কলঙ্কিনীই হই না কেন, নিষ্কলঙ্ক প্রেমে সে আমাকে ধন্য করবে।

মাথা হেঁট করে আলিওশা গ্রুশেংকার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, দু-হাত ধরে তাকে মাটি থেকে তুলল। মৃদু হাসি হেসে শান্ত স্বরে বললে,—কিছুই তো তোমার করিনি। কেবল একটি পেঁয়াজ ছাড়া কিছুই দিইনি তোমাকে। ছোট্ট পেঁয়াজ, একটিমাত্র পেঁয়াজ, তার বেশি আর কিছু নয়।

এই কথাগুলি বলতে বলতে উদগত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল আলিওশার। ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল বাইরে, ঘরের মধ্যে দৌড়ে প্রবেশ করল পরিচারিকা ফেনিয়া। গ্রুশেংকা লাফিয়ে উঠল আতঙ্কে।

ফেনিয়া চিৎকার করে বললে,—শুনুন, আপনার গাড়ি এসে গেছে মস্কো থেকে, তিন ঘোড়ার গাড়ি। সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে দূতও এসেছে—এই নিন চিঠি।

হাতের চিঠিটা সে নিশানের মতো ওড়াচ্ছে। গ্রুশেংকা তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে আলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েকটি মাত্র লাইন। এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করল।

সারা মুখ তার নীরক্ত পাণ্ডুর। এক আশ্চর্য হাসিতে বিচিত্র মুখভঙ্গিমা।

ডেকেছে, ডেকেছে আমাকে সে। শুনেছি তার বাঁশির ডাক।

মুহূর্ত পরে হঠাৎ রক্তের ঝলকে তার সমস্ত মুখ নবব্রীড়াবতীর মতো লাল হয়ে উঠল। বললে,—হ্যাঁ, আমি যাব। পাঁচ বছরের জীবনকে পিছনে ফেলে যাব আমি, পিছু ফিরে একবারও আর তাকাব না। আমার ভাগ্য স্থির হয়ে গেল, আলিওশা। বিদায়, বন্ধু বিদায়। যাও তোমরা এবার, জীবনে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। গ্রুশেংকা এবার চলেছে নতুন জীবনের পথে। তুমি মনে রাগ রেখো না রাকিতিন,—ভেবো, আমার এই যাত্রা নবজীবনে নয়, হয়তো মৃত্যুর পথে অভিসার।

এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে শোবার ঘরে ছুটে গেল গ্রুশেংকা।

থাক! রাকিতিন বললে,—আমাদের নিয়ে নষ্ট করার সময় ওর হাতে আর নেই। চলো, এই সুযোগে সরে পড়ি, নইলে আবার হয়তো মেয়েলী চিৎকারে কান ঝালাপালা হবে। ঢের হয়েছে, আর না।

মন্ত্রচালিতের মতো বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলো আলিওশা। বাইরে পথের ধারে একটি চারদিক ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি। নতুন ঘোড়া লাগানো হয়েছে গাড়িতে। লণ্ঠন হাতে ছুটোছুটি করছে সহিসরা।

গ্রুশেংকার শোবার ঘরের জানলাটি হঠাৎ খুলে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকুলকণ্ঠে আলিওশাকে ডাক দিয়ে গ্রুশেংকা বললে,—শোনো আলিওশা, একটি কথা শুনে যাও। তোমার দাদা মিতিয়াকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। বোলো তাকে, দুঃখ দিলেও সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। বোলো তাকে, গ্রুশেংকা তোমার মতো মহৎ হৃদয়ের মূল্য বুঝল না, তাই এক দুরাত্মার সঙ্গে চলে গেল। আমার হয়ে একটি অনুরোধ তুমি কোরো—একটি প্রহরের জন্যে আমি তাকে ভালো-বেসেছিলাম, সেই প্রহরটির স্মৃতি যেন সারা জীবন সে মনে রাখে।

অশ্রুরুদ্ধ তার কণ্ঠ। দড়াম করে জানলাটা বন্ধ হোলো আবার।

আবার কঠোর হাসি হাসল রাকিতিন, বললে,—বহুত আচ্ছা! মিতিয়ার বুকে ছুরি মারল মেয়েটা, তার পর বলে কিনা ছুরির আঘাতটা সারা জীবনে যেন ভোলে না! রাক্ষসী একেবারে!

আলিওশা কোনো উত্তর দিল না, যেন শুনতেই পায়নি রাকিতিনের মন্তব্য। দেরি হয়ে গিয়েছে অনেক, আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে লাগল। আলিওশার ব্যবহারে একেবারে জ্বলে উঠল রাকিতিন, যেন তার পুরানো ক্ষতে নতুন

বুকে জ্বালা ধরেছে। গ্রুশেংকার সঙ্গে আলিওশার আলাপ করিয়ে দেবার ফল এরকম হবে সে আশা করেনি। তার ধারণা ছিল অন্যরকম। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটেই না।

নিজেকে সংযত করে সে বলতে লাগল,—গ্রুশেংকার ভালোবাসার যে লোক, ঐ অফিসার—লোকটা একটা পোল, তাছাড়া এখন আর অফিসারও নয়। সাইবেরিয়াতে বা চীন সীমান্তে কোথায় যেন সরকারী চাকরি করত, সে চাকরি গেছে। খবর পেয়েছে, গ্রুশেংকার খুব টাকা হয়েছে, তাই আবার পুরোনো প্রেম জানাতে এসেছে। ব্যাটা ভিখিরী কোথাকার!

এবারও আলিওশা তার কথায় কর্ণপাত করল না বা কোনো উত্তর দিল না।

আর সামলাতে পারল না রাকিতিন। দাঁত খিঁচিয়ে হেঁকে উঠল,—কী ভাবছ হে একমনে? পাপীয়সীকে পরিত্রাণ করে এলে বুঝি, ম্যাগডালানকে নিয়ে এলে পুণ্যের সড়কে, তাই না? ফুসমন্তরে সাত শয়তান লাজে গুটিয়ে পালাল! সারাদিন অলৌকিক কিছু ঘটল না, ঘটল এইবার,—না?

ক্ষুব্ধ স্বরে আলিওশা শুধু বললে,—থামো রাকিতিন।

কেন থামব? কীসের জন্য? আমার সঙ্গে কথা বলতেও তোমার লজ্জা! কেন? ঐ পঁচিশটা রুবল গ্রুশেংকার কাছ থেকে বাগিয়েছি বলে আমাকে ঘেন্না করছ বুঝি? তা ভাই তুমি স্বয়ং যীশুও নও, আর জুডাসও নই আমি!

কী সব বাজে বকছ! সত্যি বিশ্বাস করো, একথা আমার মনেও ছিল না। তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিলে

এবার বাঁধ ভাঙল। চিৎকার করে উঠল রাকিতিন,— জাহান্নমে যাও তুমি। কী জন্যে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম গ্রুশেংকার কাছে? ন্যাকা কোথাকার! অকর্মার ধাড়ী! যাও, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই!

পাশের গলির মধ্যে ঢুকে রাকিতিন হনহন করে চলে গেল। অন্ধকার পথে একলা আলিওশা। শহর পরিত্যাগ করে সে মাঠের মধ্যে নেমে চলল মঠের উদ্দেশ্যে।

চার

আলিওশা যখন আশ্রমে ফিরল তখন মঠবাসীদের পক্ষে অনেক রাত্রি। গেট বন্ধ, দারোয়ানকে ডেকে পাশের দরজা খুলিয়ে তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হোলো। ন'টা বেজে গেছে, সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর সারা মঠে নেমেছে ক্লান্তি, এখন বিশ্রামের সময়। সন্তর্পণে সে দরজা ঠেলে মঠবৃদ্ধের ঘরে ঢুকল। শবাধারটি তখনো রয়েছে। ঘরে আর কেউ নেই, কেবল কফিনের ধারে বসে ফাদার পাইসি একমনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। পরম শ্রান্তিতে পাশের ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমোচ্ছে পর্ফিরি নামক ব্রহ্মচারী ছেলেটি। ফাদার পাইসি বুঝলেন, আলিওশা ফিরেছে, কিন্তু তবু তিনি তার দিকে তাকালেন না, একমনে পাঠ করতে লাগলেন। আলিওশা ঘরের ডান দিকের কোণে গিয়ে নতজানু হয়ে নীরব প্রার্থনায় মগ্ন হোলো।

বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির বন্যায় তার অন্তর ভেসে যাচ্ছে,—এক অনুভূতির স্রোতের উপর লুটিয়ে পড়ছে অন্য অনুভূতির তরঙ্গ। কিন্তু তার মনে আর কোনো দুঃখ নেই, এক আশ্চর্য স্থির শান্ত আনন্দ বিরাজ করছে। চোখের সামনে শবাধার, যার মধ্যে তার প্রিয় পুত্রের মৃতদেহ, কিন্তু সকালবেলাকার উচ্ছ্বসিত বেদনা আর ক্রন্দনের কোলাহল এখন আর মনে নেই। এ শবাধার যেন তার অন্তর-দেবতার পূজো বেদী, যার সামনে সে পুলকোদ্ভাসিত মনে আরাধনা করতে বসেছে। একটি জানলা খোলা, শীতল বাতাস আসছে মৃদু মৃদু। পূতিগন্ধের জন্যেই জানলাটা খুলতে হয়েছে, কিন্তু এ নিয়েও তার মনে আর বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। প্রসন্ন মনে সে প্রার্থনা করতে লাগল। একটু পরে সে লক্ষ্য করল যে সে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে প্রার্থনার শব্দগুলি মনে মনে উচ্চারণ করছে। আকাশের মেঘের মতো তার মনে ভেসে ভেসে যাচ্ছে একের পর এক চিন্তা। তবু তার মনে কোনো ব্যাকুলতা নেই, আছে শুধু এক প্রশান্ত অখণ্ডতা। একমনে সে প্রার্থনা করতে লাগল, ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করতে লাগল তার ভক্তি আর ধন্যবাদ।

প্রার্থনার মধ্যে তার কানে ভেসে এল ফাদার পাইসির ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তিনি তখন পড়ছেন :

'তৃতীয় দিবসে গ্যালিলির কানা শহরে এক বিবাহ। যীশু-মাতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহে যীশু এবং তাঁহার শিষ্যগণও আহূত হইলেন।'

বিবাহ? সে আবার কী? কার বিবাহ? আলিওশার ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে এলোমেলো নানা ভাবনা ঘুরতে লাগল। মাও এসেছেন···আহা! তাঁরও নিশ্চয় খুশী লাগছে···আর দুঃখ নেই তাঁর। দুঃখই বা কেন? দুঃখের পথ তো কালো, আলো চলে আনন্দের পথে। সে পথ উদার উন্মুক্ত, স্ফটিক শুভ্র···কী যেন পড়লেন ফাদার?

'অতিথিরা যখন মদ্যপান করিতে চাহিল, তখন যীশু-মাতা যীশুকে বলিলেন, মদ্য তো নাই!'

হ্যাঁ, কান পেতে কাহিনীটা শুনতে হবে ভালো করে। এই তো প্রভুর অলৌকিক কার্যাবলীর প্রথমটি। মানুষের দুঃখের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গে যীশু তাঁর অলৌকিক করুণার প্রসঙ্গে সেই আনন্দকে বহুগুণে বর্ধিত করেছিলেন। মানুষকে যে ভালোবাসে, সে মানুষের হৃদয়ের আনন্দকেও ভালোবাসে,—এই সত্য কতবার যীশু ঘোষণা করেছেন। আর মিটিয়া, হ্যাঁ, মিটিয়াও বলে, স্ফূর্তি না হলে জীবনই বৃথা। খাঁটি কথা। স্ফূর্তি মানেই-আনন্দ, দুঃখকে ক্ষমা না করলে আনন্দ আসে না। প্রভু বলছেন,—যা মঙ্গল, যা সত্য, ক্ষমার ভিত্তিতে তার প্রতিষ্ঠা।

'যীশু কহিলেন,—মাতঃ, ইহাতে তোমারই বা কী, আর আমারই বা কী? আমার লগ্ন এখনো আসে নাই।'

'যীশু-মাতা ভৃত্যদের বলিলেন,—উনি যাহা বলিবেন, সেই মত তোমরা কর।'

কী করতে হবে? যারা দরিদ্র, তাদের [illegible] অন্তরে [illegible] হবে আনন্দ

নিতাম। দারিদ্র্য বটেই, নইলে বিবাহ-উৎসবেও একফোঁটা মদ জোটে না! ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন যে সে সময়ে জেনিসারেথ হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। যীশু-জননী জানতেন যে তাঁর মহান সন্তানের সময় তখনো আসেনি। মূঢ় মূক দরিদ্র কৃষিজীবীর দল, তাদের দীন বিবাহ-উৎসবে যীশুকে তারা নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু কী ভাবে তাঁকে তারা অভ্যর্থনা করবে তার কোনো বোধ নেই। যীশু বলেছিলেন, 'আমার সময় এখনো আসেনি।' এই কথা বলে মৃদু হেসেছিলেন মা'র মুখের দিকে চেয়ে। এখনো সময় আছে, জয়যাত্রা এখনো শুরু হয়নি। যীশু দরিদ্রের ভোজ-সভায় মদ্য সরবরাহ করার জন্য প্রেমময় অবতাররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হননি, তবু মাতার মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করলেন।

'যীশু ভৃত্যদের বলিলেন, পাত্রগুলি জলদ্বারা পরিপূর্ণ কর। তাহারা সেই মতো করিল।'

'তখন তিনি পুনরায় ভৃত্যদের বলিলেন,—এইসব পাত্র হইতে এখন জল লও এবং প্রধান নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন কর।'

কী আশ্চর্য! যীশুর কৃপায় সমস্ত জল সুস্বাদু মদ্যে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এ কী হোলো! ঘরটি যেন ক্রমশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে! কতো গোলমাল, কতো লোক! ওঃ, এই যে বিবাহ সভা,—ঐ যে বরবধূ, চারদিকে নিমন্ত্রিতের দল, আনন্দ-উজ্জ্বল পরিবেশ, মাঝখানে বড়ো টেবিলে প্রধান অতিথি উঠে দাঁড়ালেন। কে, কে তুমি? চেনা-চেনা যেন মনে হচ্ছে! প্রভু, তুমি? তুমি এসেছ? তুমি তো কবরাধারের মধ্যে শুয়েছিলে? কেমন করে উঠে এলে?

শীর্ণ-দেহ বৃদ্ধ, বলিরেখাঙ্কিত মুখে শান্ত করুণ হাস্যরেখা। পরনে সেই পোষাক, যা কাল পর্যন্ত অঙ্গে ছিল। উদ্ঘাটিত মুখমণ্ডল, উদ্ভাসিত দৃষ্টি। বিবাহসভায় তাঁরও আমন্ত্রণ হয়েছে?

মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন,—হ্যাঁ বৎস, আমারও আমন্ত্রণ হয়েছে, আমিও ডাক শুনেছি। কিন্তু তুমি কেন এক কোণে মুখ লুকিয়ে আছ? সামনে এসো!

গুরুদেবের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর। সামনে এসে দাঁড়িয়ে শিষ্যের অবনত শিরে তিনি হাত রাখলেন। নতজানু শিষ্যের দু-কাঁধে হাত দিয়ে তিনি তাকে দাঁড় করালেন। বললেন,—দেখছ না বৎস, কত আনন্দের দিন আজ! নবীন আনন্দ-সুরা আমরা আজ পান করছি। বরবধূ ও প্রতি নিমন্ত্রিতের হৃদয় এই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমার মতো একটি দানের পুণ্য কাজ আরো অনেকেই করেছে, সবাই তারা উপস্থিত হয়েছে এই আসরে। এক ক্ষুধার্ত নারীকে একটি পেঁয়াজ তুমিও আজ দিয়েছ। তোমার জীবনের ব্রত আজ থেকে শুরু হয়েছে। আশীর্বাদ করি, সুগম হোক তোমার যাত্রা। হ্যাঁ বৎস, আমাদের সূর্যকে তুমি দেখছ? তাঁর মূর্তি তোমার চোখে পড়েছে?

চুপি চুপি আলিওশা বললে,—চোখ তুলে তাকাতে ভয় করে যে প্রভু!

কীসের ভয়? হ্যাঁ, মহত্ত্বে তিনি ভয়ঙ্কর, দেখবে তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু

অনন্ত তাঁর করুণা। এই করুণার চুম্বক-আকর্ষণে তিনি নেমে এসেছেন আমাদের সমতলে। আমাদের আনন্দের জন্য তিনি জলকে পরিণত করেছেন সোমরসে! কতো নূতন অতিথিকে তিনি আহ্বান করেছেন সৃষ্টির আনন্দ-উৎসবে। অশেষ এই উৎসব, অনির্বাণ তাঁর আবাহন। দ্যাখো, অসংখ্য পানপাত্র অনন্ত আসরে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

এক অলৌকিক জ্যোতি যেন জ্বলে উঠল আলিওশার হৃৎকন্দরে। হৃদয়তন্ত্রীতে ব্যথার মতো বাজতে লাগল এক অনির্বচনীয় সুর, হৃদয়কন্দর বিদীর্ণ করতে লাগল অনাস্বাদিত আনন্দের অশ্রুধারা। দু-হাত বাড়িয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল আলিওশা, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হোলো তার।

আবার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, মাঝখানে শবাধার, পার্শ্বে উন্মুক্ত বাতায়ন। ফাদার পাইসির সেই শান্ত স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর, একমনে তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। আশ্চর্য, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে করতে সেই অবস্থাতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে জোসিমার শবাধারের কাছে এগিয়ে এল। ফাদার পাইসি একবার চোখ তুলে তাকালেন, তার মুখের অস্বাভাবিক ভাব তাঁর চোখ এড়াল না। তিনি বুঝলেন, তার মনের মধ্যে কোনো এক অপূর্ব ভাবনার আন্দোলন জেগেছে। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন গ্রন্থের দিকে। স্তব্ধ হয়ে আলিওশা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শবাধারের দিকে তাকিয়ে রইল। এই তার প্রভুর নিশ্চল দেহ, সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা, মাথায় সাধুর টুপি, বুকের ওপর একটি যীশুমূর্তি রাখা। একটু আগেই সে তার প্রভুর কণ্ঠস্বর স্বপ্নে শুনেছে, সে স্বর এখনো তার কর্ণে বাজছে! এখন তার জাগ্রত চৈতন্য তাঁর বাণী আর একটিবারের জন্যেও শুনবে না, শত প্রতীক্ষা সত্ত্বেও? হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে বন্ধ ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

বাইরে এসেও ক্ষণেকের জন্যে সে থামল না, কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কীসের এক অনির্বচনীয় আনন্দে তার সারা মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—প্রাণ চাইছে মুক্তি, প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে উদার আশ্রয়। তার মাথার ওপর নিঃসীম আকাশ, অনাদ্যন্ত দুয়োরে অসংখ্য তারকার মেলা। সেখানে মধ্য থেকে চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছায়াপথ, অগণ্য নীহারিকাপুঞ্জের নীলাবর্ত! নিস্তব্ধ রাত্রির ছায়াতল নিষুপ্ত নিস্পন্দ, কৃষ্ণনীল আকাশপটে ধর্মমন্দিরের সোনালী চূড়া আর সাদা মিনারগুলির ধূসর ছায়ারূপ। শরতের পুষ্পভরা উদ্যানটি ঘুমিয়ে আছে। আকাশ আর ধরিত্রী একই শান্তিতে একই স্তব্ধ রহস্যে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আলিওশা। তার পর হঠাৎ সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, দু-হাত বাড়িয়ে ধরণীকে সে করল আলিঙ্গন।

বারবার সে চুম্বন করল ঐ মাটিকে। উত্তপ্ত অশ্রুজলে ভিজিয়ে দিল ধরণী,

বালকের প্রতিজ্ঞা তখন মনে মনে,—ভালোবাসবে, সে চিরকাল ভালোবাসবে এই অপূর্ব সৃষ্টিকে।

'আনন্দের অশ্রুতে তুমি ধরণীকে সিক্ত করো, আর ভালোবাসো ঐ অশ্রুবিন্দু-পূর্ণকে।' ঐ বাণী তার হৃদয়-কন্দর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অনিবার।

কীসের এই অশ্রু? কেন এই কান্না?

গানের ঐ প্রহেলিকা—যারা সৃষ্টির এই মহোৎসবে নটরাজের মতো নৃত্য করে চলেছে, যারা পৃথিবীর মানুষের প্রাণে এনেছে জগৎ থেকে জগতান্তরের আমন্ত্রণ, যারা ঈশ্বরের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মালার ডোরে বেঁধেছে,—তাদের পুলক-স্পন্দন প্রাণে এসে বাজছে, এ কান্না সেই পুলকের, এ অশ্রু সেই রোমাঞ্চের। ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, নেই কোনো কল্পনার অভিমান। ক্ষমা করো সকলে, সকলের জন্যে আমাকে প্রার্থনা করতে দাও।

প্রতি মুহূর্তে আলিঙ্গা উপলব্ধি করতে লাগল যে ঐ আকাশেরই মতো পরম বিরাট এক পরম সত্য এসে তার সমস্ত প্রাণকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এই সত্যের সিংহাসন তার অন্তরে চিরদিনের জন্যে হয়েছে পাতা। মাটিতে যখন সে লুটিয়ে পড়েছিল তখন সে ছিল দুর্বল বালক মাত্র, এখন সে পূর্ণতায় সমগ্র শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আত্মোপলব্ধির এই আশ্চর্য স্মৃতিটুকু তার সারাজীবনের অক্ষয় ঐশ্বর্য হয়ে রইল।

সারাজীবন ধরে তার পরম প্রত্যয় ছিল যে এই মুহূর্তটিতে ঠিক তার হৃদয়টির উপরে এক পরম পুরুষের অমোঘ স্পর্শ সে লাভ করে ছিল।

গুরুদেবের নির্দেশমত তিনদিনের মধ্যে আলিঙ্গা আশ্রম পরিত্যাগ করল,—যাত্রা করল পৃথিবীর পথে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত